নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

ভস্মপুতুল

শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার

অগ্রজপ্রতিমেষু

ভস্মপুতুল

এক

বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থেকেই অনেকগুলো শব্দ শুনল সত্যজিৎ। পর পর।

একতলার সিঁড়ির মুখের ঘড়িটায় টং টং করে আটটা বাজল—যদিও এখন পাঁচটার বেশি নয়। তীক্ষ্ণ কুশ্রী গোটাকয়েক চিৎকার—দাঁড়ের বুড়ো কাকাতুয়াটা। কলতলায় একরাশ বাসনপত্রের ঝংকার। সেটার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই টকাস টকাস করে ঘোড়ার খুরের শব্দ—চাকার আওয়াজ। বাবা বেরিয়ে গেলেন গঙ্গাস্নানে।

ওই শব্দগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে সত্যজিতের। সব একরকম। বাকী তিনশো চৌষট্টি দিনের মতো আর একটি দিনের সূচনা মুখার্জি-ভিলায়। আজ কুড়ি বছর ধরে (তার আগের কথা মনে করতে পারে না সত্যজিৎ) ওই ঘড়িটা অমনি করে ভুল বেজে চলেছে—কেউ একটুখানি গরজ করে ওটাকে ঠিক করে দেয়নি। আর ঠিক ওরই মতো ভুলের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে মুখার্জি-ভিলা, ওই শব্দটার সঙ্গে তাল রেখে একটু একটু করে শ্যাওলা জমছে সামনের কম্পাউণ্ডে ইতালীয়ান মূর্তিগুলোর ওপর, বিবর্ণ হচ্ছে অব্যবহার্য চেকবইগুলোর পাতা, বাড়ির ফাটা কার্ণিশে দুটো-একটা করে চারা গজাচ্ছে—আর তিল তিল করে শুকিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে প্যারালিসিসের পেশেণ্ট বড়দা ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

বড়দা ইন্দ্রজিৎ—এই বাড়ির ভবিষ্যৎ। বাবা শিবশঙ্কর—এই বাড়ির অতীত।

বেসুরো ছন্দোহীন বাড়িটার বুকের ভেতর থেকে সুর নির্ঝরিত হয়ে পড়ল। প্রীতি গাইছে। কান পেতে সুরটা বুঝতে চাইল সত্যজিৎ। আলাহিয়া বিলাওল। দিন কয়েক পরে রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম আছে ওর।

মাথার পাশের জানালাটায় আবছা ভোরের আলো। বারান্দায় ঝোলানো একটা অর্কিডের টব দেখা যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে—অর্কিডের পাতাগুলো কাঁপছে গোটাকয়েক ভূতুড়ে আঙুলের মতো। আর একটুখানি গড়িয়ে নেবে ভেবে পাশ ফিরতেই গলায় ঠাণ্ডা শক্ত মতন কী যে ঠেকল সত্যজিতের।

এক ভল্যুম অমনিবাস শেক্সপীয়র। রাত্রে ঘুমোবার আগে খেয়ালখুশিমতো টেনে নিয়েছিল শেলফ থেকে। সনেটগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে কখন ঘুম নেমে এসেছিল চোখে। বেড্-সুইচটা অফ করে দিয়েছে—কিন্তু বইখানা আর সরিয়ে রাখা হয়নি।

শেক্সপীয়র। আর একটা দিন। সাড়ে দশটা থেকে ক্লাস আরম্ভ—একটানা সাড়ে চারটে পর্যন্ত। পাঁচ বছর ধরে পড়ানো পুরনো বইয়ের পাতা খুলে মুখস্থের মত একটানা বলে যাওয়া। সরগমের মতো বাঁধা ছকে স্বরের ওঠা নামা। নকল আবেগ। কতগুলো তৈরি-রাখা প্যারালাল প্যাসেজ। হাজারবার আওড়ানো হিউমারের পুনরুক্তি—তার কয়েকটা ছাত্রজীবনে মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

সত্যজিৎ উঠে বসল। আড়মোড়া ভেঙে আরো খানিকক্ষণ চুপ করে বসে শুনল প্রীতির গান। আলাহিয়া বিলাওল দিয়ে শুরু হয়েছে যদি বেহাগের সুরে দিনের ক্লান্তিকে মিলিয়ে দেওয়া যেত অন্তবিহীন অগ্নিধারার সুরে বাঁধা শুদ্ধ রাত্রির তারায় তারায়। যদি রবীন্দ্রনাথের ভাব-সঙ্গীতের মতো নম্র নিবেদনে আস্তে আস্তে বুজে আসত চোখের পাতা। যদি প্রার্থনার মতো একটি সকাল দেখা দিত কবি-শিল্পী ব্লেকের প্রভাতী তারার মতো। যদি—

নিচের দোতলার ঘরে একটা চায়ের পেয়ালা আছড়ে পড়ার আওয়াজ। তীব্র জান্তব চিৎকার তার সঙ্গে।

—খাব না—খাব না এ সব। দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

ইন্দ্রজিৎ। ব্লেকের প্রভাতী তারা নিশ্চিহ্ন। এলিয়টের বিবর্ণ-ধূমল সকাল। পেঁকো-নর্দমায় শীর্ণদেহ একটা কদাকার বেড়াল একরাশ পচা মাখন চাটছে।

চটিতে পা গলিয়ে ঘর থেকে বেরুল সত্যজিৎ। কলঘর। টুথ্‌ব্রাশ। শাদা সাপের মতো খানিকটা পেস্ট্‌ কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে এল টিউব থেকে। পায়ের তলায় খানিকটা জায়গা চট্‌চট্‌ করছে কাদার মতো। একটুকরো ক্ষয়ে-যাওয়া সাবান গলে গেছে ওখানে। শরীরটা শিরশির করে উঠল।

বাড়ির পুরনো চাকর রঘু কী করে টের পায়! মাথার চুল শাদা—পিঠ বেঁকে গেছে খানিক, বাঁ হাতটা অল্প অল্প কাঁপে সব সময়। তবু এ বাড়ির একতলা-দোতলা-তেতলায় ভোর চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তার অক্লান্ত সঞ্চরণ।

আটটার পরে আর রঘুকে পাওয়া যায় না। বাড়িতে মানুষ মরলেও না। তখন রঘু বড় একতাল আফিং খায়। আফিং খেয়ে ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে।

কিসের স্বপ্ন? কতদিন আগেকার?

সেই সব দিনের—যখন শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দুটো কোলিয়ারী ছিল—একটা রাণীগঞ্জে, একটা ঝরিয়া ফিল্ডে? যখন কোডার্মার ওদিকে অভ্রের খনির স্পেকুলেশন করতেন তিনি? রঘু কি আজো স্বপ্ন দেখে—বৈঠকখানা-ঘরে বিরাট ফরাসের ওপর গানের আসর বসেছে, আর সে গেলাসে গেলাসে হুইস্কির সঙ্গে সোডা মেশাচ্ছে? রঘু কি দেখতে পায় হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী থেকে ফরাসী সুগন্ধি

ছড়াতে ছড়াতে শিবশঙ্কর বেরিয়েছেন তাঁর সান্ধ্য অভিসারে? আজকের পুরনো ঘোড়ার গাড়িটা নয়—প্রকাণ্ড ব্রুহ্যাম চলেছে তখনকার ইট-বাঁধানো পথ দিয়ে—আর রঘু তাতে দাঁড়িয়ে আছে চাপরাশ এঁটে?

রঘুই জানে। রাত আটটার পর নিজের মনের ওপর একটা দরজা টেনে দেয় সে। আজকের মুখার্জি-ভিলার—যার 'ভি'-টা উঠে গেছে আর 'এল'-টাও প্রায় নিশ্চিহ্ন, তার সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু ভোর পাঁচটা থেকে রাত আটটা। একতলায় রঘু, দোতলায় রঘু, তেতলায় রঘু। চায়ের পেয়ালা, খবরের কাগজ, আগন্তুকের ঘোষণা—অসংখ্য ফুট-ফরমাস—শিবশঙ্কর ফিরে এলে তাঁর গাড়ির দরজা খুলে দেওয়া—সব জায়গাতেই রঘু।

কখনো কখনো মনে হয় সত্যজিতের। কোনো কোনো রাত্রিতে পড়তে পড়তে ঘুম না এলে, অথবা কখনো কখনো সামনের রাস্তা দিয়ে মড়া-যাওয়ার উৎকট হরিধ্বনিতে চমকে জেগে উঠলে, কিংবা কোনো বিশ্রী বীভৎস স্বপ্নের আঘাতে সজাগ হয়ে উঠলে। ঠিক সেই সময় হয়তো সিঁড়ির নিচের ঘড়িটায় দুটো-তিনটে-চারটে-পাঁচটা যা খুশি বাজতে থাকে, আর কী আশ্চর্য, সত্যজিতের তখন মনে পড়ে রঘুকে। রূপকথার গল্পের একটা উপমা ভেসে ওঠে তার মনের মধ্যে। শিবশঙ্কর নয়—ইন্দ্রজিৎ নয়—সত্যজিৎও নয়। ডাইনিদের মারণ-ভোমরার মতো মুখার্জি-ভিলার প্রাণটাও যেন লুকিয়ে আছে ওই রঘুর মধ্যেই। যেদিন ও মরে যাবে, সেদিন সঙ্গে-সঙ্গেই এই পুরনো বাড়িটাও একটা তাসের ঘরের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে রুটি-মাখন আর চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সত্যজিৎ। রঘু রেখে গেছে। ঠিক টের পেয়েছে সত্যজিৎ উঠেছে—ঢুকেছে কলঘরে। প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

রঘু যেদিন থাকবে না—

কী হবে এসব এলোমেলো ভাবনায়? তার আগেই হয়তো মুখার্জি-ভিলাও হারিয়ে যাবে। গত বছরও একটা মর্টগেজ পড়েছে বড়বাজারের কোন্ শেঠজীর কাছে—নামটা সত্যজিতের জানা নেই। জানবার কৌতূহলও নেই। প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্তেই সে টের পায় এ বাড়ির সঙ্গে তার শেকড়টা আল্‌গা হয়ে আসছে। মুখার্জি-ভিলা—রঘু—শিবশঙ্কর—সবই যাওয়ার আগে তাকেই হয়তো চলে যেতে হবে এখান থেকে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল সত্যজিৎ। প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকল বীথি।

ছোট বোন। শিবশঙ্করের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ওর জন্মের পরের বছর মা মারা যান। সে আজ আঠারো বছর আগেকার কথা।

রঙ আর রূপের খ্যাতি আছে মুখুজ্যে-পরিবারের। তার মধ্যে একটুখানি ব্যতিক্রম এই বীথি মেয়েটি। উজ্জ্বল গৌর নয়—একটুখানি শ্যামল রঙের ছায়া পড়েছে তার ওপর। যেন এই বাড়ির পড়ন্ত দিনের এক টুকরো বিষণ্ণতাই নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছে বীথি। আর সেই বিষণ্ণতা বীথির ঠোঁটের রেখায়—আলগোছে গালে হাত রেখে বসবার করুণ ভঙ্গিতে। কিন্তু ওটুকু ত্রুটি সে পুষিয়ে নিয়েছে চোখে। এমন গভীর কালো—প্রাণের ছায়ায় এমন উজ্জ্বলন্ত চোখ এ বাড়িতে আর কারো নেই। এমন যে রূপের জন্য বিখ্যাত প্রীতি, সমান সমান ঘর হল না বলে যার তেইশ বছর বয়েসেও সুপাত্র জুটল না—অমন চোখ তারও নেই।

প্রীতি শান্ত, স্তিমিত। বাইরে রূপটা যে পরিমাণে প্রখর—ভেতরে সেই পরিমাণেই নির্বাপিত। শুধু গান গাওয়া ছাড়া জীবনে সে কখনো জোরে কথা বলেনি, শব্দ করে কখনো হেসেছে, সত্যজিতের তা মনেই পড়ে না। আর বাইরে ছায়াচ্ছন্ন হয়েও বীথি অদ্ভুত জীবন্ত—আশ্চর্য চঞ্চল। এ বাড়িতে ঢুকলে সকলের আগে তার গলা শুনতে পাওয়া যায়—তার হাসির শব্দ ঝিম্-ধরা পুরনো মোটা মোটা দেওয়ালগুলোকে যেন ব্যঙ্গের আঘাত করতে থাকে—একতলার সিঁড়ি বেয়ে যখন সে উঠে আসে, তখন তেতলার ঘর থেকেও টের পাওয়া যায় সেটা।

খাতা আর কলম নিয়ে চটাস্ চটাস্ চটি টেনে বীথি ঘরে এল।

—ছোঁড়দা?

—কী মহাপ্রভু?

—একটা উপকার করবে?

—আদেশ দাও?

—না, ঠাট্টা নয়!—টেবিলের কোলটা ধরে বীথি দাঁড়াল: পি-এন্-সি টিউটোরিয়্যালে বেয়াড়া 'এসে' দিয়েছে একটা। ফিউচার অব ইণ্ডিয়া—কী লিখি বলো তো?

—খুব সহজে আর সংক্ষেপেই লিখে দে। দু কথায়। লেখ্—ফিউচার অব্ ইণ্ডিয়া একেবারে অন্ধকার। মাত্র দুটো হাইড্রোজেন বোমা হলেই নিশ্চিন্ত।

বীথি ভ্রূকুটি করল।

—আমরা মানুষের শান্তির শক্তিতে বিশ্বাসী—হাইড্রোজেন বোমার আতঙ্ক মানব না, এই আমাদের পণ। ও চলবে না। সত্যি ছোড়দা—কয়েকটা পয়েন্ট্ বলে দাও না।

—এত ছাত্রী-আন্দোলন করিস কলেজে—একটা রচনা লিখতে পারিস নে?

বীথি বললে, নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আমি যে-সব কথা লিখব, পি-এন্-সির তা পছন্দ হবে না। তোমার কলিগকে তুমি আমার চাইতে ঢের বেশি জানো ছোড়দা। দশের মধ্যে দুই বসিয়ে দেবে।

সত্যজিৎ হাসল।

—তা হলে হাইড্রোজেন বোমার চাইতেও ভয়াবহ কিছু আছে দেখছি। সেটা পি-এন্-সির টিউটোরিয়াল্ ক্লাস ?

—তা বলতে পারো।—বীথিও হাসল : শুধু তো টিউটোরিয়ালই নয়—তারপরে আছে টেস্টের খাতা। সত্যি ছোড়দা—ক্লাসের মেয়েরা রাতদিন কী প্রার্থনা করে—জানো ? পরীক্ষার খাতা যেন সব সময় এস-এম-এর হাতেই পড়ে !

—তার মানে, তোমাদের ধারণা আমি বেশি নম্বর দিই ?

বীথি বললে, বেশি নম্বর দাও না—কিন্তু তুমি খাতা দেখলে জাস্টিস হয়।

—জাস্টিস হয় !—সত্যজিৎ চটে উঠল : ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেণ্ট সব—যা ইংরিজি লিখিস—তোদের ওপর আবার জাস্টিস্ ! দাঁড়া—তোদের টেস্টের খাতা এবার আমিই নেব, আর সব ফেল করিয়ে দেব একধার থেকে।

—পারবে না ছোড়দা—বীথির কালো চোখ দুটো জলজল করতে লাগল : পি-এন্-সির মতো অতটা স্যাডিস্ট্ তুমি কিছুতেই হতে পারবে না।

—হতে পারব কিনা দেখিস।—টেবিল থেকে চুরুট তুলে নিয়ে ধরাতে ধরাতে সত্যজিৎ বললে, তোদের ইংরিজি লেখার যা নমুনা—ওই পি-এন্-সিই হল তোদের ওষুধ।

—কেন আর ইংরেজির জন্মে অত মাথা ঘামাচ্ছ ছোড়দা ? ইংরেজির যুগ তো শেষ হতে চলল। ইংরেজের গোলামি থেকে মুক্তি পেয়েছি, আর ইংরেজির গোলামি সইব বসে বসে ?

এবার সত্যি সত্যিই রাগ করল সত্যজিৎ। দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাশট্রেতে না ফেলে ছুঁড়ে দিলে ঘরের কোনায়।

—রাজনীতি করিস, অথচ তোদের এই জগদ্দল মূর্খতা দেখলে গা জ্বালা করে। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যালিজম্‌কে ঝেঁটিয়ে দূর কর্—তার চাইতে মহৎ কাজ আর কিছু নেই। তাই বলে অতবড় কালচারটার অসম্মান করবি ? গান্ধীজির রাজনীতি যাই হোক—লাস্ট্ ওয়ারের সময় একটা খুব দামী কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'ওয়েস্ট্-মিনিস্টার অ্যাবি'র ওপরে বোমা পড়বে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে। কোন বুদ্ধিমান লোকই তা পারে না। জিব্রালটারের শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংস হোক—কিন্তু ওয়েস্ট-মিনিস্টার কিংবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গায়ে আঁচড় লাগালেও সেটা সভ্যতার দুর্দিন। সেইটেকেই বলা যায় আসল ভ্যাণ্ডালিজম্।

—কিন্তু তার সঙ্গে ইংরেজির সম্পর্ক কী ?

চুরুটে লম্বা টান দিয়ে সত্যজিৎ বললে, সম্পর্ক আছে। আজ তোরা ইংরেজিকে

বিদায় করতে চলেছিস—তার অর্থ-ই হল সারা পৃথিবীর সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ীর বাঁধনটা কেটে দিতে যাচ্ছিস। চালিয়ে যা তোদের নতুন রাষ্ট্রভাষা—পিছু হটতে হটতে একদম রাম-রাজ্যে পৌঁছে যাবি।

বীথির চোখে কৌতুক জলজল করতে লাগল: এ তোমার রাগের কথা ছোড়দা। পৃথিবীতে অনেক জাতই আছে যারা ইংরেজি না শিখেও আজকের দিনে সভ্যতার প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি কি বলতে চাও ইংরেজি না জানলে জার্মান সায়েন্টিস্ট্‌দের পেপার তৈরি করার অধিকার নেই? ইতালীয়ান লেখক গল্প লিখতে পারবে না?

—কী বললুম, কী বুঝলি!—সত্যজিৎ বিরক্ত হল: আরে, ওয়ার্লডের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে তো। ইংরেজি যারা জানে না, তারা হয় ফ্রেঞ্চ জানে, নয় জার্মান জানে, নইলে রাশিয়ান জানে। মোটের ওপর দুনিয়ায় একটা জানালা তারা খোলা রাখেই। এমন ভাবে তারা সারা দেশের অন্ধকূপ হত্যার প্ল্যান করে না।

—এরও জবাব আছে ছোড়দা। আসলে তোমার ভয়টা কী জানো? ইংরেজি উঠে গেলে কলেজ থেকে তোমার চাকরি যাবে।—বীথির ঠোঁটের কোণা হাসিতে বাঁক নিল।

—আশ্চর্য ধরেছিস। একেই বলে উয়োম্যানস্ ইন্‌স্‌টিংক্‌ট—নারীর সহজাত বীক্ষণ-শক্তি! এবার আর তোকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকা গেল না।

—সাধু ভাষায় যত ঠাট্টাই করো এই হল আসল ব্যাপার। কিন্তু আমাদের বি.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত ইংরেজি যে বাহাল তবিয়তে থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তার চাইতেও বেশি নিঃসন্দেহ পি-এন্-সি—আমাদের শেষ পর্যন্ত হাড় জ্বলিয়ে মারবেন। সত্যি ছোড়দা—বলে দাও গোটাকয়েক পয়েন্ট।

—আগে লিখে নিয়ে আয়—তার পরে ঠিক করে দেব।

—তার মানে ফাঁকি দেবার মতলব?

—না—না—অনার ব্রাইট। লিখে রাখিস—দেখে দেব সন্ধ্যেবেলায়।

বীথি উঠে যাচ্ছিল—সত্যজিৎ ডাকল।

—তোদের ইউনিয়নের কাল ইলেকশন ছিল না? কী হল রে?

—আমরা জিতেছি—উৎসাহে বীথির মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল: মেজরিটি আমাদের ক্যাণ্ডিডেট। এবার ইউনিয়ন আমাদের হাতে ছোড়দা।

—তার মানে আন্দোলন করে কলেজটাকে জ্বালিয়ে মারবি।

—চেষ্টা করব।—বীথি আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে: জানো ছোড়দা—আনন্দের চোটে আমাদের কমন রুমে একটা ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স্ হয়ে গেল কালকে।

—ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স্ ?

—একেবারে।—বীথির চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল : কোন্ প্রফেসার কী ভাবে পড়ান—কেমন করে কাশেন, তাঁদের কী কী মুদ্রাদোষ—আমরা সেগুলোর নিখুঁত ডেমনস্ট্রেশান দিলাম।

—কী গুরুভক্তি! আর এদেরই আমরা এত করে পড়াই!

—আমাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ভবিষ্যতে প্রফেসার হতে পারে। তাই পরীক্ষা করে দেখলাম—গুরুদেবদের কাছ থেকে আমরা ঠিকমত ট্রেনিং নিতে পেরেছি কিনা! —বীথি জবাব দিলে তৎক্ষণাৎ।

—হুঁ।—সত্যজিৎ টোকা দিয়ে চুরুট থেকে খানিকটা ছাই ঝাড়ল : আমিও বাদ যাইনি মনে হচ্ছে।

—যাঁরা পপুলার—তাঁদেরটাই তো আগে। শুনবে তোমার পড়ানোর নমুনা?

বীথি দু পা পেছনে সরে দাঁড়ালো। এক হাত দিয়ে চেপে ধরল টেবিলের কোণা —শাড়ির আঁচলটাকে রুমালের মতো মুখের ওপর বুলিয়ে নিলে বারকয়েক। তারপর আরম্ভ করল :

"হোয়েন উই কাম্ টু কোল্‌রিজ—ইউ সি—উই এন্‌টার এ স্ট্রেঞ্জ ল্যাণ্ড্। ইউ সি—দেয়ার উই ফাইণ্ড্ কুব্‌লাই খান—"

—ঠিক হয়নি ছোড়দা?—বীথি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—শাট্ আপ্!—সত্যজিৎ লাল হয়ে উঠল : পার্সেণ্টেজ্ কেটে দেব সবগুলোর।

—শুধু একজনের বাদে। খালি পূরবী দত্ত আপত্তি করেছিল। তোমার পালা এলে চটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।—বীথির চোখ আবার মিটমিট করতে লাগল : পূরবীকে তিনটে পার্সেণ্টেজ্ তোমার বেশি দেওয়া উচিত।

—গেট্ আউট—চেঁচিয়ে উঠল সত্যজিৎ। দেশলাইটা তুলে ছুঁড়ে মারল বীথিকে। উচ্ছলিত হাসির কলধ্বনি তুলে ঘর থেকে পালিয়ে গেল বীথি।

সত্যজিৎ চুরুটটাকে অ্যাশ্‌ট্রের ওপর নামিয়ে রাখল। একটু আলোড়ন—কয়েকটা ছোট ছোট ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে যাওয়া। নদীর জলে একটা শিমুল ফুল ঝরে পড়ার মতো। পূরবী দত্ত।

ওরা কি সবাই জানে? নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে কথাটা নিয়ে? নাকি শুধু বীথিই? সত্যজিৎ নিশ্বাস ফেলল একটা। এত অসংখ্য মানুষ আর চারদিকের এই নগ্ন কৌতুহলের মাঝখানে তুমি কিছুতেই মগ্ন থাকতে পারো না নিজেকে নিয়ে। এমন একটুখানি অবকাশ তোমার নেই—যেখানে তোমার সীমা-স্বর্গ। শান্ত সন্ধ্যা—সামনে আলো-অন্ধকার মাখানো একটুখানি জল—হাতে-হাত মিলিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে

বসে থাকা। জীবনের কাছ থেকে এক মুঠো পলায়ন। সেদিন আর নেই। বনশ্রী চলে যাওয়ার পর থেকে—নাঃ, বনশ্রী থাক।

ভীড় আর যন্ত্রণা। ক্ষুধা আর আক্রোশ। অফুরন্ত মিছিল চলেছে একটা। লক্ষ কোটি মানুষ চলেছে এগিয়ে। এক পা বর্তমানে, আর এক পা ভবিষ্যতে। এক চোখে অনির্দেশ অতল অন্ধকার—আর এক চোখে অনাগতের আলো : এখনো সম্পূর্ণ রূপ ধরেনি —টুকরো টুকরো জোনাকির মতো জ্বলছে।

জলের ধার—হাতে হাত মেলানো—শান্ত সন্ধ্যা। পূরবী দত্ত। ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ। আজ কেবল যন্ত্রণায় ভরা মিছিলের দিন। বীথির হাসিটা ব্যঙ্গের মতো কানে বাজতে লাগল।

কিন্তু বেরুতে হবে। যেতে হবে হীরেনের কাছে। সত্যজিৎ উঠে পড়ল। গালে হাত বুলিয়ে নিলে একবার। দাড়িটা এ-বেলা না কামালেও চলে। পৌরুষের এই এক যন্ত্রণা—দাড়ি কামানো। ঋষি রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই সাবধান ছিলেন।

প্রীতির গান থেমে গেছে। বিশ্রী চিৎকার করছে বুড়ো কাকাতুয়াটা। রঘু ঘরে এসে ঢুকল। নিঃশব্দে কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার। সত্যজিৎ হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল, রঘুর পায়ে শব্দ হয় না।

জামা-কাপড় বদলে ঘর থেকে বেরুল সত্যজিৎ।

দোতলায় নামতেই পাশে ইন্দ্রজিতের ঘর। একটা খবর নিয়ে যেতে হবে। অর্থহীন সৌজন্যের দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি।

একটা ডেক-চেয়ারে পাতলা চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। চেয়ারটা প্রকাণ্ড। কেনা হয়েছিল সেই আমলে—যখন দুটো কোলিয়ারি আর একটা মাইকা মাইনের মালিক ছিলেন শিবশঙ্কর—যখন শেলাকের ব্যবসায় তাঁর টাকা আসত মুঠো মুঠো। সে দিনগুলো চলে গেছে, আর সেই সঙ্গে এই চেয়ারটা এসে জায়গা পেয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ইন্দ্রজিতের ঘরে। কেমন রূপকের মতো মনে হয়।

সকাল বেলায় রঘু ওকে বিছানা থেকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়েছে এই চেয়ারে। অত-বড় চেয়ারের ভেতরে আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে একদা-কেম্ব্রিজ ব্লু দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ ইন্দ্রজিৎ মুখার্জিকে। আজকে ইন্দ্রজিৎ কেবল ওই চেয়ারটার ওপর বসে থাকে, ভিলোঁর একখানা জরাজীর্ণ কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টায় মধ্যে মধ্যে, কখনো কখনো ধ্যানস্থের মতো তাকিয়ে থাকে দেওয়ালে টাঙানো জে-পি গাঙ্গুলীর একটা বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে। আর বিরক্তি বোধ করলে সামনে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চায়ের ডিশ, জলের গ্লাস—হিংস্রভাবে গর্জন করে খাব না—আমি কিছুতেই খাব না!—অথচ খাবার দিতে একটু দেরী হলে খাঁচায় বন্দী বুনো জানোয়ারের মতো একটানা আর্তনাদ করতে থাকে।

সত্যজিতের পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালো ইন্দ্রজিৎ। পুরনো দিনের মতো ঘোলাটে নীল চোখের রঙ। এক সময় জর্মানদের মতো ব্লু-আইজ ছিল তার।

—কেমন আছ দাদা?

—চমৎকার!—ইন্দ্রজিৎ তিক্ত হাসি হাসল। দু চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ল ঘৃণা—ঠিকরে পড়ল অসহ্য ঈর্ষা। যদি শক্তি থাকত, তা হলে ওই চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে সুস্থ সবল সত্যজিতের সর্বাঙ্গ যেন শুষে খেত। পক্ষাঘাতে অসাড় মুখের ডান দিকটা সে হাসিতে রাক্ষসের মতো দেখাল।

সত্যজিৎ বেরিয়ে যাচ্ছিল—ইন্দ্রজিৎ ডাকল।

—তুই আনিস নি?

—কী?—সত্যজিৎ ফিরে দাঁড়াল।

—সেই যে বলেছিলাম? তোমাদের কলেজ ল্যাবোরেটরী থেকে?

সত্যজিতের মনে পড়েছিল আগেই। প্রায়ই ইন্দ্রজিৎ বলে কথাটা। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

নিজে খাবে? না। যে মানুষ যত জীবন্মৃত—জীবনকে যত বেশি ঘৃণা করে—সে-ই তত বেশি করে বাঁচতে চায়। একটা আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব।

ইন্দ্রজিৎ ফিস ফিস করে বললে, বুড়োটাকে আর বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। যত বাঁচবে ততই সর্বনাশ করবে। দিবি বুড়োর জলের গ্লাসে মিশিয়ে। শুনেছি ওর কোনো টেস্ট নেই—টেরও পাবে না।

ঘৃণা। শিবশঙ্করের ওপরে বীভৎস সরীসৃপ ঘৃণা। প্যারালিসিসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ফিক্সেশন দেখা দিয়েছে ইন্দ্রজিতের। তার ধারণা, এই রোগের জন্যে দায়ী শিবশঙ্কর—দায়ী তাঁর বিষাক্ত রক্তের ধারা। অথচ ডাক্তারী শাস্ত্রের মতে এ শুধু ওর নিজস্ব অলস কল্পনা—এর কোন ভিত্তিই নেই।

—চেষ্টা করে দেখব—সত্যজিৎ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

—সেই কতদিন থেকে বলছি, অথচ এখনো জোগাড় করতে পারলি না! আসলে তোরা সবাই বুড়োর দলে—ইন্দ্রজিৎ বিড় বিড় করতে লাগল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সত্যজিৎ। কিন্তু ভেতর থেকে আবার ডাক এল: আর শোন্?

সত্যজিৎ আর ভেতরে ঢুকল না। দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, বলো।

—কাল একটা ইন্টারেস্টিং স্বপ্ন দেখলাম—জানিস?

—ওঃ!

ইন্দ্রজিতের বিকট মুখে আবার একটা রাক্ষসের হাসি ফুটে উঠল: স্বপ্ন দেখলাম,

প্রীতি গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করছে। গলাটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে—জিভ বেরিয়ে এসেছে—

সত্যজিৎ আর দাঁড়াতে পারল না—যেন পেছন থেকে প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে সরে গেল সিঁড়ির দিকে। শুধু শিবশঙ্কর নয়—এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষের ভয়ঙ্কর অপমৃত্যুর কথা কল্পনা করছে ইন্দ্রজিৎ! মুখার্জি ভিলার মূর্তিমন্ত অভিসম্পাত যেন।

শিবশঙ্করের জন্য নয়—ইন্দ্রজিতের জন্যেই সায়ানাইড্ দরকার। আচ্ছা, কেউ যদি হত্যা করে ইন্দ্রজিৎকে? খুব কি অপরাধ হয় আইনের চোখে?

দ্রুতপায়ে সত্যজিৎ নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

টকাস্ টকাস্ করে পুরনো ঘোড়ার গাড়িটা পোর্টিকোর তলায় এসে দাঁড়ালো। নিঃশব্দ পায়ে কোথা থেকে ছায়ামূর্তির মতো ছুটে এল রঘু, খুলে ধরল দরজা। প্রকাণ্ড লাল শরীরটা নিয়ে রক্তচক্ষু শিবশঙ্কর নেমে এলেন গাড়ি থেকে।

একবারের জন্যে নীরবে সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—দুটো আরক্তিম চোখে তাঁর নির্বিকার উদাসীনতা। দশ বছর ধরে প্রায় মূক হয়ে গেছেন শিবশঙ্কর—প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না এবং যা বলেন তা-ও রঘুর সঙ্গেই। সত্যজিতের সন্দেহ হয়—এক প্রীতি ছাড়া আর সব ছেলেমেয়ের নামও প্রায় ভুলেই গেছেন—হয়তো কিছুদিন পরে আর চিনতেই পারবেন না। শুধু কখনো কখনো গান শোনবার জন্যে প্রীতিকে তিনি ডেকে পাঠান—একটার পর একটা গান গেয়ে যায় প্রীতি, আর হুইস্কির গ্লাস সামনে নিয়ে চোখ বুজে বসে থাকেন শিবশঙ্কর। গান আদৌ শোনেন কিনা—তিনিই জানেন।

কয়েক মুহূর্ত সত্যজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল একটু সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছেন শিবশঙ্কর। হয়তো স্প্রেন হয়েছে—হয়তো বাতের ব্যথাটা একটু বেড়েছে আবার।

চকিতের মধ্যে মনে পড়ে গেল ইন্দ্রজিৎকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎ বেরিয়ে এল রাস্তায়। এখন প্রায় আটটা বাজে—অথচ ঠিক আটটার মধ্যেই পৌঁছুতে হবে হীরেনের কাছে।

দ্রুত পায়ে সত্যজিৎ ট্রাম-স্টপের দিকে এগিয়ে চলল।

ছুই

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ট্রাম এল। একখানার পিছনে একখানা, তার পেছনে আরো একখানা।

কলকাতার ট্রামের এই এক আশ্চর্য রহস্য। হঠাৎ কেন সে থমকে দাঁড়ায় তা কেউ জানে না—আবার সার বেঁধে কেন যে আসতে আরম্ভ করে সেটা আরও দুর্বোধ্য। ভেতরে খালি জায়গা থাকতেও লোকে ফুটবোর্ডে ভিড় করে—বোধ হয় এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিশ্চিন্তে বসতে গেলে অস্বস্তি লাগে। রবীন্দ্রনাথের সেই 'জন-সংঘাত-মদিরা'। ট্রামের গায়ে লেখা থাকে—"গাড়ি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।" কী বলতে চায়? গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে তার পরে উঠে পড়ুন? খুব সম্ভব তাই—কারণ, ট্রাম কোম্পানীর অলিখিত আইন হল, একদল লোককে হুড়মুড় করে নামবার সুযোগটুকু কোনোমতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যারা উঠতে চায় তাদের জন্য এক সেকেণ্ডও দাঁড়ানো চলবে না।

বাস্তবিক, কলকাতার ট্রামের গতিবিধি একটা গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার সামগ্রী।

ফার্স্ট ক্লাসের পেছন দিকে সকলের স্পর্শ-বাঁচানো যে অভিজাত একক আসনটি থাকে. সেইখানে বসে এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মগ্ন ছিল সত্যজিৎ। শেয়ালদা স্টেশন আর বৈঠক-খানা বাজারের অবিচ্ছিন্ন কদর্যতা আর ভিড়ের ভেতর দিয়ে ঘণ্টি বাজিয়ে ট্রাম চলেছে। চোখে ভেসে উঠেছে সিনেমার একরাশ হোর্ডিং—কটকটে রঙের রুচিহীন বিজ্ঞাপন। পরলোকতত্ত্বের কী একখানা ভয়াল-ভীষণ ছবি আগতপ্রায়। পরলোকতত্ত্ব থিয়োসফি! ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি। একবার 'সিয়াসেঁ' বসে চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না!

কিন্তু থিয়োসফি মিলিয়ে গেল। একটা ছোট মিছিল। কয়েকটি লাল পতাকা—কয়েকটি কণ্ঠের মিলিত উৎক্ষেপ :

'বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।'

ছোট মিছিল—কয়েকটি লাল পতাকা। বীথি দেখলে বলত, গোটা কয়েক আগুনের ফুলকি। ওর আশা আছে। ওর কণ্ঠস্বর কলকাতা রাজা-বাজারের বস্তি আর কানা-গলির নোনাধরা দেওয়ালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েনি; ওর কলকাতার কণ্ঠস্বর মনুমেন্টের চুড়ো ছাপিয়ে আকাশের তারায় তারায় ছড়িয়ে যায়—ওর কলকাতার বজ্রবাহুর পেশী কাঁপতে থাকে কামারহাটি-খড়দহ-টিটাগড়ের রক্ত-বিদ্যুতের তরঙ্গে তরঙ্গে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল সত্যজিৎ। মাথার মধ্যে কেমন যেন কুয়াশার মতো ঘিরে আছে মনে হয়। মুখার্জি-ভিলা। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা। জীবন একটা গোলোকধামের

গুটি। দু পা এগোয়—সাত পা পিছিয়ে পড়ে। সমস্ত আশাবাদকে কেমন পুঁথিগত বলে মনে হতে থাকে। বড়দা ইন্দ্রজিৎ। বীথির গভীর আর উজ্জ্বল চোখ—সে চোখে দূর আকাশের সপ্তর্ষির ছায়া কাঁপে। কেমন ভয় করে সত্যজিতের। থেকে থেকে এক-একটা অব্যক্ত আতঙ্ক, এক-একটা শক্ত ধারালো সুতোর মতো পাক দিয়ে বসতে চায় হৃৎপিণ্ডে। ভিলোঁর কবিতা পড়ে ইন্দ্রজিৎ। আশ্চর্য ভালো কবিতা লিখত ভিলোঁ—আর ছিল আশ্চর্য রকমের স্কাউণ্ড্রেল। ওই কবিতা পড়তে পড়তে একদিন হয় তো ইন্দ্রজিৎ বীথির চোখে এক শিশি নাইট্রিক য়্যাসিড ঢেলে দিতে পারে—

নিজের ডান পা দিয়ে বাঁ পা-টাকে মাড়িয়ে ফেলল সত্যজিৎ। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমক একটা। কী ভাবছে এসব? ইন্দ্রজিতের ব্যাধিটা কি সঞ্চারিত হচ্ছে তার নিজের মধ্যেও? বিলম্বিত বিষক্রিয়ার মতো তার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে মুখার্জি-ভিলার অপঘাতের অভিশাপ?

কথাটাকে জোর করে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে বাইরের দিকে তাকালো। বাঁ দিকে পরিত্যক্ত ধাপার রেল লাইনের ওপর খোয়ার স্তূপ। ট্রাম লাইনের পাশে ওল্টানো একটা ডাস্ট্‌বিন—হাসপাতাল থেকে ফেলে দেওয়া একটা ময়লা প্ল্যাস্‌টার নিয়ে দুটো কুকুর কী যেন খুঁজছে। কুশ্রী বীভৎস প্রতীক একটা।

কিসের প্রতীক?

নিজের মনের মধ্যে কিছু একটা হাতড়াতে লাগল এলোমেলো ভাবে। কিন্তু মুখার্জি-ভিলা কিছুতেই সরে যাবে না। মনের ভেতর যতই খুঁজে বেড়াও একটুকরো গানকে, কোনো বর্ষাসন্ধ্যায় নটমল্লারের একটি ঝঙ্কারকে, বিকেলের সোনা-মাখানো আলোয় পেরাম্বুলেটারে আধো-ঘুমন্ত কোনো সোনালী চুলের শিশুকে—পাবে না, একটিকেও পাবে না তাদের। শুধু মুখার্জি-ভিলার পুরনো দিনের কোনো গিলটির ফ্রেমওয়ালা বিরাট আয়নার একরাশ ভাঙা কাচ পড়ে আছে—হাতের আঙুলগুলো কেটে কেটে রক্তাক্ত হয়ে যাবে।

একটা হাসির কথা ভাবা যাক। কোনো স্থূল রসিকতা। কলেজের কমনরুমে কোনো ঘোলাটে চোখ, চোয়াল ঝোলা, সেরিব্রাল্ হেমোরেজের পথে পা বাড়ানো অধ্যাপকের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের ঘোষণা। বলতে বলতে প্রায় হাঁপানি টানের মতো উত্তেজনা: ফিফ্‌থ পেপার দেখেছিলেন ডক্টর ঘোষ। আমার খাতা দেখে বলে-ছিলেন—

নিশ্চয়ই বলেছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন ব্রিলিয়াণ্ট্ লেখা কখনো দেখেন-নি। কিন্তু ডক্টর ঘোষের সেই ঐতিহাসিক বাণী না বলাই রয়ে গেল আপাতত। বেয়ারার হাতে প্রিন্সিপ্যালের স্লিপ এল একটা। এক্‌স্ট্রা ক্লাসের নিমন্ত্রণ।

ডক্টর ঘোষের কথাটা রূপান্তরিত হল একটা অর্ধ-উচ্চারিত প্রাকৃত স্বগতোক্তিতে : দূর…

প্রায় হাসতে যাচ্ছিল সত্যজিৎ, কিন্তু বাধা পড়ল। ভাবতে ভাবতেই একজন অধ্যাপক আবির্ভূত হলেন ট্রামে। অন্য কলেজের লোক—তা হলেও পরিচয় আছে।

—ভালো তো সত্যজিৎবাবু?

হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন পাশের সীটে। বগলে খবরের কাগজমোড়া প্রকাণ্ড বাণ্ডিল একটা।

—হ্যাঁ, ভালোই আছি।—পাল্টা কুশল প্রশ্ন করতে হল সত্যজিৎকে : আপনি?

—এখন আর থাকা-থাকি কী মশাই। খাতার চাপে প্রাণ গেল। এই তো সেকেণ্ড ব্যাচ নিয়ে যাচ্ছি হেড এগ্‌জামিনারের ওখানে। আরো আড়াইশো বাকী। আপনার কত?

—আমি এখন এগ্‌জামিনার নেই।

—বলেন কী? কী হয়েছিল?—চশমার আড়ালে ভদ্রলোকের চোখ মিটমিট করতে লাগল।

—যোগে ভুল হয়েছিল।—সত্যজিৎ হাসল।

—অ! কেটে দিয়েছে!—ভদ্রলোক সহানুভূতি জানাতে চাইলেন, কিন্তু আত্ম-প্রসাদের একটা আভা ফুটে বেরুল চোখমুখ দিয়ে এক-একজন হেড্ এগজামিনার আছে মশাই—ভয়ানক মিস্‌চিভাস। রিপোর্ট করবার জন্যেই যেন মুখিয়ে রয়েছে। তা আমিও খুব হুঁসিয়ার—এই সাত বছরে মশাই—

কণ্ডাক্‌টার এল। ভদ্রলোক পকেট থেকে মান্থলি বের করলেন একখানা। আচমকা চোখ পড়ে গেল সত্যজিতের। মান্থলির ওপরে লেখা নামটা ওঁর নয়।

কণ্ডাক্টার চলে গেলে আবার শুরু করলেন, তা কাটা গেছে, আপদ গেছে মশাই। ও এক জ্বালা। ছাড়তে পারলে বাঁচি—পাশে সরে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন : নাম আর করব না মশাই—আপনাদের কলেজের ওই উনি—গতবার পঞ্চাশখানা খাতা বাগালেন রি-এগজামিনেশনের, অথচ দেখুন, আমি সিনিয়ার, আমাকে দিলে না। অয়েলিং—বুঝলেন অয়েলিং। একটা প্রোফেসারের এরকম মনোবৃত্তি দেখলে গোটা এডুকেশন্যাল লাইনের ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়।

ট্রাম জোড়া-গীর্জার কাছে এসে পড়েছে। সত্যজিৎ উঠে দাঁড়ালো।

—নমস্কার, আমি নামব।

আলোচনার আবেগটা সবে গলা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল, মাঝপথে ছেদ পড়তে ভদ্রলোক দমে গেলেন।

—এখানেই ?

—এখানেই।

ডানদিকের রাস্তা। একটা গলি। একটা বাঁক। সতেরো নম্বর।

অঞ্চলটা আন্তর্জাতিক, বাড়িটাও। একতলার ছেঁড়া ফ্রকপরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ীটা ইংরেজি-হিন্দী মিলিয়ে কাকে যেন তারস্বরে গাল দিয়ে চলেছে।

—রাস্কেল! সোয়াইন! কুত্তাকা বাচ্চা!

একজন একসঙ্গে সোয়াইন আর কুকুরের বাচ্চা হয় কী করে, এমনি একটা জিজ্ঞাসা মনে এসেছিল সত্যজিতের। কিন্তু কথা না বলে বুড়ীর পাশ কাটিয়ে সে আধা-অন্ধকার সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে আরম্ভ করে দিলে। স্যুটপরা একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক প্রায় ধাক্কা দিয়ে হুড়্মুড়িয়ে নেমে গেল, কোথা থেকে শুঁট্কি মাছ রান্নার একটা উগ্র গন্ধ এসে প্রায় শ্বাস আটকে আনল।

হীরেনের ঘর দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই।

ভাঙা একটা চামড়ার স্যুটকেশের ওপর গোল আয়নাটা রেখে মেজেতে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে দাড়ি কামাচ্ছিল হীরেন। পাশের ভাঙা পেয়ালাটায় একরাশ ফেনিল জল। ডানদিকের গালে কয়েকটা রক্তবিন্দু। কড়া দাড়ি হীরেনের। একদিন না কামালেই মুখের ওপর সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে যায়।

না দেখেই হীরেন বললে, আয়।

—এলাম।—সত্যজিৎ বসে পড়ল।

—মেজেয় বসলি কেন ? খাটে উঠে বোস্।

—তোমার ছারপোকাদের খুশি করতে আমি এখানে আসিনি। মেজেই ভালো।

গালে ক্ষুর লাগিয়ে, মুখের মাংসপেশী বাঁচিয়ে যতখানি হাসা যায়—ঠিক ততখানিই পরিমাপ করা হাসি হাসল হীরেন।

—এখন বোধ হয় কিছু কমেছে। গ্যামাক্সিনে।

—তোমার গ্যামাক্সিন ওরা হজম করে ফেলেছে—সত্যজিৎ পকেটের চামড়ার কেস্ থেকে চুরুট বের করল।

—যা বলেছিস।—থুতনির ওপর শেষবার পরম যত্নে ক্ষুর বুলিয়ে নিয়ে হীরেন সেটাকে পেয়ালার মধ্যে ছেড়ে দিলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা ময়লা তোয়ালেতে মুখ মুছে বললে, এবার খবর বল্।

সত্যজিৎ চুরুট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল। দেশলাইয়ের জলন্ত কাঠিটা পেয়ালার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, খবর তো তোর কাছেই। ওরা টাকা দেয়নি ?

হীরেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। একটা আধ-ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে চড়িয়ে বললে, ইয়ে—একটু অসুবিধে হয়েছে। মানে ষাট টাকা ফর্মা ওরা দিতে রাজী হচ্ছে না।

—বা-রে, আমার সঙ্গে যে কথা হয়ে গেল।

—হলে কী হয়—দিনকাল জানিস তো?—সত্যজিতের কেস থেকে একটা চুরুট বের করে নিলে হীরেন: পাকিস্তান থেকে দলে দলে প্রফেসার এসে পড়েছে—। বেচারারা বেকার—যা পায়, কিছুতেই আপত্তি নেই। শুনলাম, তাদেরই কে চল্লিশ টাকা করে ফর্মা লিখে দিতে রাজী হয়েছে।

—তবে তাই দিক—সত্যজিৎ উঠে দাঁড়ালো।

—আহা যাচ্ছিস কেন? বোস্ না একটু—হীরেন ব্যস্ত হয়ে বললে, ওরা, মানে—কম্প্রোমাইজ—মানে পঞ্চাশ টাকা—

—দরকার নেই—বলেও সত্যজিৎ বসে পড়ল দ্বিধার সঙ্গে। টাকা সত্যিই দরকার। কিছুতেই কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। মুখার্জি-ভিলার হাঁস আর সোনার ডিম পাড়ে না আজকাল। পৃথিবীর সঙ্গে রফা করেই চলতে হবে এখন। মিথ্যার সঙ্গে—অসত্যের সঙ্গে। কোনো পথ নেই।

—জানিস তো—হীরেন আবার আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, বাধা দিলে সত্যজিৎ।

—থাক, আর বলতে হবে না। সস্তায় পেলে বেশি আর কে দিতে চায়—তাই না? কিন্তু সস্তায় যে কাজ করে তার কাজও সস্তা হয়—এটা ওদের বোঝা উচিত।

—তোর প্রোফেসারী নীতিকথা ছেড়ে দে।—হীরেন দার্শনিক হাসি হাসল: আরে নোট বইয়ের বাজারে গুড-উইলটাই হল আসল কথা। কী ভালো কী মন্দ—এ নিয়ে মাথা ঘামাতে লোকের বয়ে গেছে। পি. সান্ন্যালের নাম আছে—ওতেই চলবে! ভেতরে কী আছে স্টুডেন্টরা তা বোঝে না, টীচাররাও তা নিয়ে কোনকালে মাথা ঘামায় না।

সত্যজিৎ ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রইল। সামনের দেওয়ালটার দিকে। একটা দড়ির ওপর হীরেনের কতগুলো অপরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা ঝুলছে। দেওয়ালের গায়ে এলোমেলো পেন্সিলের আঁকিবুকি—আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা একটা ইংরেজি নাম: হিল্ডা। আগে যারা ভাড়াটে ছিল, তাদেরই কোন ছোট মেয়ে নিজের নামের স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছে এখানে। বাইরে থেকে আরো তীব্র হয়ে আসছে শুঁটকি মাছের গন্ধটা।

অধ্যাপনা—সততা—জাতির ভবিষ্যৎ। ঘোলা চোখ, ভাঙা চোয়াল, চার শিফট চাকরি, সেরিব্রাল হেমোরেজ। কলেজ ম্যাগাজিনে একটা ফোটো—কালো বর্ডারে শোক-সংবাদ। তার আগে পর্যন্ত টিউশন, নোট লেখা, পরীক্ষার খাতা—পরের মাদুলি।

কার সঙ্গে তফাত! কিসের আভিজাত্য? বিদ্যার? সংস্কৃতির? মনুষ্যত্বের?

—কী ভাবছিস?

হীরেন ধ্যান ভাঙালো। শুকনো হাসি হেসে সত্যজিৎ বললে, কিছু না।

—সত্যিই ভেবে কোন লাভ নেই।—হীরেন তেমনি দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে চলল, আমাকেই ছাখ্। এম. এ.টাও তো দেওয়া হল না তোদের সঙ্গে—জেলে চলে গেলাম। এখন 'বাই এ গোল্ড মেডালিস্ট' নাম দিয়ে যে শর্টকাটগুলো চালাচ্ছি—তার সেল্ কত জানিস?

—নিশ্চয় অনেক—সত্যজিৎ আবার শীর্ণ হাসি হাসল। হীরেনের 'শর্টকাট্' যে বাজারে মুড়ি-মুড়কির মতো চলে তার অজস্র প্রমাণ আছে পরীক্ষার খাতায়। অশুদ্ধ ভাষা—অজস্র গুরুচণ্ডালী, ভুল উদ্ধৃতি, ভুল ব্যাখ্যা। তারই বিকৃত আর পঙ্গু উদ্গীরণ চলে ছাত্রদের কলমে। স্টাফ-রুমের পরিচিত হিউমার মনে পড়ে: "আমরা বলি এক্স, ওরা শোনে ওয়াই, লেখে জেড্। আসলে জিনিসটা হবে ডাবলিউ।"

মোট কথা, টাকার দরকার। এক্স্ কেন—ইউ, ভি যা লেখা যাবে সব সমান। টাকার দরকার।

সত্যজিৎ কী বলতে যাচ্ছিল, দরজায় ছায়া পড়ল। একটি মেয়ের গলা শোনা গেল: হীরেন আছে?

সত্যজিৎ তাকালো। তাকিয়েই কুঁকড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এক ঝলক রক্ত আছড়ে পড়ল মাথার মধ্যে।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে বনশ্রী রায়।

তিন

কোনো কাজ নেই। কিছুই করবার নেই। সকালে গানের পালা শেষ হল—বিকেল না আসা পর্যন্ত প্রীতির অফুরন্ত অবসর। তখন আর একবার তানপুরা নিয়ে বসা। আবার দু'ঘণ্টা গানের চর্চা। তারপর রাতের খাওয়ার পাট মিটে গেলে ঘুম না আসা পর্যন্ত একটা উলের বুনুনি নিয়ে সময় কাটানো। আজ এক বছর ধরে স্কার্ফের মতো কী একটা জিনিস বুনছে প্রীতি। কেন বুনছে জানে না—কী কাজে লাগবে তাও জানা নেই। খানিকটা বোনার পরে খুলে ফেলা—আবার শুরু করা।

নিজের জীবনের সঙ্গেও স্কার্ফটার মিল আছে।

আট বছর আগে দু-বার ফেল করে স্কুল ছেড়ে দেবার পর থেকে প্রীতি নিজেকে নিয়েও অমনি ভাবে বুনছে আর খুলে ফেলছে। অর্থহীন কল্পনা, আর অলস শ্রান্তি।

বীথি বলে, কেন রাতদিন অমন ভাবে বসে থাকিস দিদি? বইটই পড়লে তো পারিস?

কী বই পড়বে? পড়তে প্রীতির ভালো লাগে না। তিন-চার বছর আগেও দু-একখানা উপন্যাসের পাতা উল্টে দেখত। প্রথমেই খুলত শেষের পাতা—যদি দেখত নায়ক-নায়িকার মিলন হয়েছে, তা হলে পড়া আরম্ভ করত। আর যদি দেখত মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদের কোনো শোকাবহ ঘটনা, তা হলে বন্ধ করে রাখত তৎক্ষণাৎ।

মানুষে কেন যে এমন করে কান্নাকাটির গল্প লেখে? জীবনে দুঃখ আছেই—প্রতি মুহূর্তেই তো আছে। উপন্যাসের কয়েকশো পাতায় সে-কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে নতুন করে বলে লাভ কী? দুঃখকে ভোলবার জন্যেই তো মানুষে বই পড়ে—যা সে কখনো পায়নি —কোনোদিন পাবে না, তাকে পাওয়ার জন্যেই তো বই পড়া। দুঃখের বিবরণ শুনিয়ে কী সুখ পায় লেখকেরা?

আজকালকার উপন্যাস আরো গোলমেলে। শেষ পাতা পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শেষ পাতা কেন—অনেক সময় আগাগোড়াই অকারণ মনে হয়। হয়তো নায়ক আছে—নায়িকা আছে, প্রেম আছে—সবই ঠিক আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় না। কী কারণ করে নায়িকা একটা চাকরী নিয়ে দিল্লীতে চলে যায়—নায়ক হয় ছবি আঁকে, নইলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—নইলে ছেঁড়া চটি টানতে টানতে শ্যামবাজারের একটা গলি দিয়ে হাঁটতে থাকে। অদ্ভুত সমস্ত অসম্ভব ভাবনা। এমনও হয়—শেষ পরিচ্ছেদে নায়িকা আর নায়ক মুখোমুখি বসে কুড়ি পাতা ভাববার পরে—রাত ন'টা বাজলে নায়িকা উঠে পড়ে বলে, 'সুজয়, আমি চললাম।' সুজয় বাধা দেয় না—সেই ফাঁকে তার জুতোর শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে মিলিয়ে যায়। সেই যে গেল, গেলই। সঙ্গে বইও শেষ।

[illegible]থি একদিন বলেছিল, ও সব সাইকোলজী।

[illegible]ইকোলজী? তা হতে পারে। কিন্তু প্রীতি তো জ্ঞানলাভ করবার জন্যে উপন্যাস [illegible] বসেনি। আর বিদ্যাচর্চা যদি করতেই হয়—তা হলে অঙ্ক কষা যায়, ভূগোল পড়া [illegible] ইতিহাস মুখস্থ করা চলে। উপন্যাস পড়বার মিথ্যে পরিশ্রম করে কী হবে?

দু-একটা বইতে অবশ্য এমন কয়েকটা পাতা থাকে যা পড়তে পড়তে রক্ত ঝন্‌ঝন্ করে [illegible] একেবারে খোলাখুলি ভাষায় কী যে সব লেখে! কোনো কিছুই বাদ দেয় না। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নাক মুখ দিয়ে যেন রক্ত ছুটে বেরুতে চায়, গলা শুকিয়ে [illegible] বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ে। কখনো কখনো ওই রকম দু-চার পাতা পড়বার [illegible] প্রীতির মন লোলুপ হয়ে ওঠে—কোনো নতুন বই এলে দ্রুত সন্ধানী চোখে পাতার [illegible] উল্টে যায়। পেলে কথা নেই—বেছে বেছে ওই জায়গা কটাই পড়ে! আর [illegible] কিছুই নেই—তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ও-রকম বই ক্বচিৎ কখনো হাতে আসে। বাকী সমস্তই কথার পর কথা—

ভাবনার পর ভাবনা। কী যে হয় খালি খালি রাশি রাশি কথায়—চিন্তার পর চিন্তার কুয়াশা ছড়িয়ে ?

প্রীতির ওসব পড়তে ভালো লাগে না।

বীথির সঙ্গে আগে মাঝে মাঝে সিনেমায় যেত। আজকাল আর বীথি সিনেমায় যায় না—বছরে দু-একদিন হয়তো বা ছোড়দার সঙ্গে ইংরেজি ছবি দেখতে যায়। ইংরেজি ছবি প্রীতি বুঝতে পারে না—সঙ্গে গেলে নিজেকে ভারী বোকা বলে মনে হয়।

প্রীতির ভালো লাগে না। কোন কাজ নেই—কিছুই করবার নেই।

বাইরের জগৎ বলতে দু-তিন মাসে একবার রেডিয়োর প্রোগ্রাম। ওইখানেই একটা আলাদা জীবনের বিদ্যুৎঝলক কখনো কখনো দেখতে পায় প্রীতি। আরো মেয়েরা আসে ওখানে—গল্প করে, হেসে ওঠে কলকণ্ঠে, সহজ ভাবে মেলামেশা করে। কিন্তু প্রীতি পারে না। নিজের ভিতরে অসাড় আর আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। আর একটা চাপা ঈর্ষায় জ্বলে যায়।

সেও যেন আলাপ করতে পারে না সহজভাবে—কেন ওদের মতো উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠতে পারে না ? কেন অমন করে বলতে পারে না : মিস্টার সেন—আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে ? দু-একজন যারা উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে চায়, কেন তাদের সে বলতে পারে না—বসুন না, গল্প করি একটু ?

প্রীতি পারে না। আরো পারে না রঘুর দিকে তাকিয়ে। রেডিয়ো স্টেশনে রঘু তার সঙ্গে যায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সতর্ক প্রহরীর মতো। স্টুডিয়োর ভেতরে ঢোকা আর বেরিয়ে আসার সময়টুকু বাদ দিয়ে—সারাক্ষণ ওর চোখ দুটো পড়ে থাকে তার ওপর—প্রীতি ক'বার রুমাল দিয়ে মুখ মুছল, তাও বোধ হয় দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

এক-একদিন মনে হয়—একটা অসহ্য বিরক্তির সঙ্গে মনে হয়, রঘুকে সে আনবে ন—ট্যাক্সি নিয়ে নিজেই চলে আসবে রেডিয়ো স্টেশনে। ও তার গার্জিয়ান নয় যে অমন করে তাকে পাহারা দেবে—দুটো অদ্ভুত শীতল দৃষ্টি মেলে একটানা শাসন করে চলবে। একাই আসবে প্রীতি—গল্প করবে সকলের সঙ্গে—আলাপ করে নেবে, কাউকে ডেকে বলবে, চলুন না—চা খাই এক পেয়ালা।

কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই। রঘুকে সে এড়াতে পারে না। ঠিক নির্দিষ্ট দিনটিতে—নির্দিষ্ট সময়ে রঘু এসে দাঁড়ায়। বলে, বড়দি, ট্যাক্সি এসেছে—চলো।

আবার সেই পাহারা—সেই শাসন। সেই আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা। ঈর্ষায় জর্জরিত মন নিয়ে ভাবা : তার চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে চলেছে এক আশ্চর্য জীবন—তাতে আলো আছে, উজ্জ্বলতা আছে, নেশা আছে। সে জীবনের সম্পর্কে তার লোভের অন্ত নেই—অথচ তার ভেতরে যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—সে শক্তি কোথায় তার—সে সাহস

কই ? একটা লোহার কবাটের মতো রঘু তার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আর শুধু রঘুই বা কেন ? সে কবাট তার নিজের মধ্যেও। তার চারদিকে ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলে মুখার্জি-ভিলা—তার পুরু পুরু ঠাণ্ডা দেওয়াল। সেই দেওয়ালের বাইরে পা বাড়ানো তার নিজের পক্ষেও সম্ভব নয়।

প্রীতির কোনো কাজ নেই।

এক গান আছে। তবু গান গাইতে গিয়েও থেকে থেকে কে যেন বুকের ভেতরটা মুচড়ে ধরে। বাইরে বৃষ্টি নামে, পর্দা দুলিয়ে ঘরের মধ্যে ছাট আসে, মুখার্জি-ভিলার 'গারগয়েলের' মুখ দিয়ে ঝর্ণার মতো শব্দ করে জল পড়ে, ঘরের ভেতরে একটা বিষণ্ণ নীলিম ছায়া জমে ওঠে. প্রীতি গান গায় :

"ক্যায়সে আওয়ে পিয়া হো মেরি সৈঁইয়া—!
ভরা ভাদরিয়ামে দাদুর বোলে—
মোর বোলে আরে মধুবনমে রে—"

মনের মধুবন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভরা ভাদরিয়ায় কে যেন তার কাছে কবে আসবে বলেছিল—সে আসেনি। কলকাতার বর্ণহীন, অর্থহীন, স্বপ্নহীন বৃষ্টির ভেতরেও দাদুরীর কান্না শোনা যায়—ময়ূর ডাকে। আর তখন—

প্রীতি তানপুরা নামিয়ে রাখে। ন' বছর আগেকার একটা দিন ফিরে আসে।

সেই পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া। নির্জন হাজারীবাগ রোড। ছায়াভরা পথটার ওপর বিকেলেই সন্ধ্যা নেমেছে। কোথায় একটা নীলকণ্ঠ পাখি ডাকছিল। সেই সুযোগে পাশের বাংলোর কলেজে-পড়া ছেলেটি তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল।

এক ঝাপটায় প্রীতি তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

—ছিঃ ছিঃ—লজ্জা করে না আপনার ?

—আমি—আমি তোমাকে—

—খবর্দার, ও সব বলবেন না। আমি বাবাকে বলে দেব। আপনাকে ভালো ছেলে বলে জানতাম—ছিঃ ছিঃ !

কলেজে-পড়া ছেলেটি মাথা নিচু করে পেছনে পেছনে হেঁটে এসেছিল।

প্রীতির থেকে তিন হাত দূরত্ব বাঁচিয়ে।

সেই একবার। তারপরে ওস্তাদজী—যিনি তাকে গান শেখাতেন।

—তোমাকে ভালোবাসি প্রীতি।

প্রীতি কঠিন মুখে বলেছিল, আপনি গান শেখাতেই এসেছেন—ভালোবাসতে নয়।

—কিন্তু আমি—

—গানের ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোই কি আপনার পেশা? তাই যদি হয়, তা হলে কাল থেকে আপনি আর আসবেন না এখানে।

ওস্তাদজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলেছিলেন, মাপ কোরো। আমি তা হলে চলি।

চলে গেলেন ভদ্রলোক। আর ফিরে আসেননি। বাবাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁর টিউশনের পরিমাণ সম্প্রতি এত বেশী বেড়ে গেছে যে প্রীতিকে গান শেখানো আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

তার পর ছোড়দার কলেজের এক বন্ধু।

—প্রীতি দেবী, আপনার গান শুনতে এলাম।

সত্যজিৎ একটু চোখের আড়াল হলেই গোলাপী খামের চিঠি গুঁজে দিত তার হাতে।

কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবার আগে সে চিঠি প্রীতি লুকিয়ে পড়েছে। রক্তে দোল জেগেছে—মনে হয়েছে, সে-ও অমনি করে জবাব দেয়: ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি।

তারপরেই পিঠের ওপর একটা চাবুক এসে পড়েছে কোথা থেকে। সে শিবশঙ্কর মুখুজ্জের মেয়ে। তার আত্মসম্মান আছে—পারিবারিক মর্যাদা আছে। রূঢ়ভাবে সামনাসামনি কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু দেখা করাই বন্ধ করে দিয়েছে তার সঙ্গে। আর নিজের ঘরে বসে, তীব্র অস্বস্তিতে অনুভব করেছে ছোড়দার বন্ধুটির সন্ধানী দৃষ্টি, নিরাশ দীর্ঘশ্বাস, শুনেছে তার ক্ষুব্ধ গলার স্বর: আজ আমি আসি ভাই সত্য, একটু কাজ আছে।

কষ্ট হয়েছিল সেদিন—যেদিন ছোড়দা এসে বলেছিল, আজ অপরেশের বিয়ে—বরযাত্রী যেতে হবে।

নিজের ঘরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল প্রীতি। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় জ্বলে গিয়েছিল তারপর কয়েকদিন। অপরেশ বিয়ে করেছে। ঠকিয়েছে তাকে। মিথ্যা অভিনয় করেছে তার সঙ্গে।

কিন্তু কী দোষ অপরেশের? সে তো কোনোদিন তাকে প্রশ্রয় দেয়নি—একটা আশার কথাও শোনায়নি কখনো। অপরেশ বিয়ে করতে পারে—স্বচ্ছন্দেই করতে পারে। সে তাকে কিছুই দেবে না, অথচ দিনের পর দিন অপরেশ তার জন্যে মিথ্যে আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকবে—এমন অসঙ্গত অন্যায় দাবির কোনো অর্থই হয় না।

তবু প্রীতি কেঁদেছিল। না কেঁদে থাকতে পারেনি।

মনে হয়েছিল অপরেশ তাকে ঠকিয়েছে, গোলাপী কাগজে সাজিয়েছে মিথ্যের পর মিথ্যে: 'পৃথিবীতে তোমার মতো আর কেউ সৃষ্টি হয়নি—কেউ না। তোমাকে দেখবার পরে মনে হয়েছে—তুমি ছাড়া জীবনে আর কাউকেই আমি কখনো চাইতে পারব না।

আমাদের জাত এক নয় বলে তুমি কি আমায় ফিরিয়ে দেবে? জানোই তো—এ যুগে জাতের মিলের চাইতেও মনের মিল অনেক বড়ো। তুমি যদি রাজি হও—এ বাড়ি থেকে আমি নিজের দায়িত্বেই তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব। তারপর—'

তারপর! আর কাউকে চাইতে পারব না—তাই বটে! তাই এক বছর পার না হতেই সে আর একজনকে বিয়ে করতে চলে গেল। সে আবিষ্কার করতে পারল, সংসারে প্রীতির মতো আরো একজন অন্তর সৃষ্টি হয়েছে এবং তাকে অসংকোচেই চাওয়া যেতে পারে!

"ক্যায়সে আওয়ে পিয়া হো মেরি সেঁইয়া—"

আসবে না—কেউ আসবে না।

বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল কয়েকটা। অপরেশকে ভুলে গিয়ে আবার সূর্যমুখীর মতো উন্মুখ হয়ে উঠেছিল প্রীতি। এতদিনে সে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে—প্রতীক্ষা করে আছে মানুষটির জন্যে—যে তাকে নিঃশেষে গ্রহণ করবে—যার কাছে সব গান, সব স্বপ্ন, সব ব্যথা দু-হাতে উজাড় করে দেবে সে।

কিন্তু বিয়ে হয়নি আজ পর্যন্ত। বাধা পেয়েছে রূপে—প্রীতির মতো রূপবতী মেয়েকে কোনো কদাকার পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারেন না শিবশঙ্কর, হোঁচট খেয়েছে বংশ-মর্যাদায়—মুখুজ্জে-পরিবারের সমান সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলে যে-কোনো ঘরে মেয়ে পাঠানো চলে না। আর দুটো যদি একসঙ্গে মিলেছে—তা হলে পথ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে টাকা। শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের আভিজাত্যের পটভূমিতে দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ফাঁকা চেক—রূপবান বংশধ্বজ নিজেই পেছিয়ে গেছে সসম্মানে।

এখন বয়স পঁচিশ বছর। প্রত্যেকটা জন্মদিনে প্রীতি নতুন করে টের পায়—তার সময় ফুরিয়ে আসছে। আজ দু'বছর ধরে মেয়ে দেখাও বন্ধ হয়ে গেছে। দেনা বাড়ছে দিনের পর দিন—সন্ধ্যার পরে হুইস্কির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন শিবশঙ্কর। এখন আর প্রীতির বিয়ের কথা ভাবেন না—ভাববার মতো মনের অবস্থা তাঁর নেই।

প্রীতি প্রায় মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আবার কোথা থেকে একটা ঢেউ এসে লেগেছে।

মুখার্জি-ভিলার পেছনেই নতুন তেতলা বাড়ি উঠেছে একটা। সেদিনও রাত্রির খাওয়া শেষ হলে প্রীতি ছাতে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারের মধ্যে। কেমন মাথা ধরেছিল—ছাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছিল সেটা। এমন সময় তার চোখ দুটো চমকে উঠল হঠাৎ—চকিতের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে।

তেতলার ঘরে নীল আলো জ্বলছে। জানালা খোলা। ঘরে নব বিবাহিত দম্পতি। ছেলেটি বিছানায় বসে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরেছে। মেয়েটি মেজেয় দাঁড়িয়ে।

—আঃ—ছাড়ো—। একরাশ কাজ আছে এখন।

—থাকুক কাজ। তুমি বোসো আমার কাছে। সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও —দেখতেই পাই না।

—একটু পরেই তো আসব। এখন ছেড়ে দাও। কী ভাববে সবাই ?

—ভাবুক গে। তুমি একটু বোসো এখানে। ভারী সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে—

—সত্যি, দুষ্টুমি কোরো না এখন। ওই শোনো, মা ডাকছেন—

—তা হলে যাওয়ার আগে অন্তত একটুখানি সান্ত্বনা দিয়ে যাও—

প্রীতি পা টিপে টিপে পালিয়ে গিয়েছিল ছাত থেকে। সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন—প্রেম, আনন্দ আর সংসার। শুধু প্রীতিই রইল এক পাশে—এই ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর, মুখার্জি-ভিলার প্রাচীরের আড়ালে তিলে তিলে হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে আর বুড়িয়ে যাবে বলে। সেদিন রাত্রে আবার অনেকক্ষণ কেঁদেছিল প্রীতি—কেঁদেছিল অপরেশের জন্যে।

—আর শুধু অপরেশই নয়। সার বেঁধে এসে দাঁড়ালো একে একে। হাজারীবাগ রোডের ছায়াঘন রাস্তায় সেই কলেজে পড়া ছেলেটি। সুন্দর মিষ্টি চেহারাটি ছিল তার। আর ওস্তাদজী। কী আর্ত করুণ চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে—একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু অপরেশের জন্যে নয়। সবাই। সকলে মিলে একসঙ্গে যেন মোচড় দিয়ে ধরছিল তার হৃৎপিণ্ড। পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে—আরো ত্রিশ, আরো চল্লিশ বছর এমনি করে পার হয়ে যাবে। কেউ আসবে না জীবনে—কেউ না!

—বড়দি!

প্রীতি চমকে উঠল। রঘু এসে দাঁড়িয়েছে।

—বাবু ডেকেছেন।

শিবশঙ্কর ডাকছেন—গান শুনবেন। কখনো কখনো সকালে তাঁকে শোনাতে হয় ভজন—বিশেষ করে যেদিন কোনো কারণে তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে থাকে। অসহ্য ভারগ্রস্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে প্রীতি উঠে দাঁড়ালো।

আর তখন সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিতের অস্বাভাবিক বিকৃত চিৎকার শোনা গেল : খুন করা উচিত। I hate—I hate everybody—

চার

হীরেন বললে, এসো এসো।

বলেই বিব্রতভাবে তাকালো ইতস্ততঃ। সত্যজিতের জন্যে কুণ্ঠা নেই, কিন্তু বনশ্রী পা দেবে এই ঘরে? তক্তপোশের ওপর ময়লা বিছানা, দেওয়ালের দড়িতে নোংরা গেঞ্জী, ভাঙা পেয়ালাটার ভেতরে একরাশ দাড়ি কামাবার ফেনা—সমস্ত মিলিয়ে ভারী লজ্জিত হল হীরেন। বনশ্রীকে সে ঠিকানা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সে যে বিনা খবরে এমন ভাবে এসে পৌঁছুবে, এ সম্ভাবনা হীরেনের মনে দেখা দেয়নি।

আর সত্যজিতের বুকের ভেতরে একটার পর একটা ঢেউ উঠে ভেঙে পড়তে লাগল।

জুতো খুলে বনশ্রী ঘরে ঢুকল। তারপর হীরেন হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই সে-ও সত্যজিতের মতোই বসে পড়ল মেজের ওপর।

—ও কি—ও কি মেজেতে কেন?

তখন সেই হাসি হাসল বনশ্রী রায়। সে হাসি ছাত্র-জীবনের অনেকগুলো দিনকে নেশা দিয়ে আচ্ছন্ন করেছে সত্যজিতের, যে হাসিতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের সেই একান্ত চায়ের দোকানেই বর্ষার সন্ধ্যায় নট-মল্লারের সুর শুনেছে, একটু বেশি রাতে যে হাসি গড়ের মাঠের হালকা অন্ধকারে বেহাগের আলাপের মতো হিল্লোলিত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি ছায়া ছায়া ক্লাসের ভেতর অধ্যাপকের রোমান্টিক কাব্যের বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে যে হাসি ঠোঁটের কোণায় মৃদুতম রেখায় ফুটিয়ে একবার চকিত চোখে সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে দেখেছে বনশ্রী রায়।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। একটা মোটা ছাইয়ের স্তূপ ভাঙা পেয়ালাটার মধ্যে টোকা দিয়ে ঝরিয়ে দিল সত্যজিৎ। আর একবার দেশলাই জ্বালাল চুরুট ধরাতে।

তবু আশ্চর্য সহজভাবে বনশ্রী বললে, অধ্যাপক সত্যজিৎ যদি মেজেয় বসতে পারে, তাহলে আমি স্কুল মিস্ট্রেস—আমিও পারব।

হীরেন হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে উঠল: যাক, সত্যকে চিনেছ তুমি।

আমি ভেবেছিলাম, সাত বছর পরে আবার নতুন ভাবে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

বনশ্রী সোজা সত্যজিতের মুখের দিকে চাইল। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ। আজ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেলেও সবটুকু নিভে যায়নি ; নট্ ডেড্ বাট্ নট্ ডেড্লি।

—আমি তো চিনেছি। কিন্তু সত্য? মাস্টারি করতে করতে ওর চশমার পাওয়ার বেড়েছে নিশ্চয়। আমাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অতএব হীরেন—তুমি সত্যকে আমার পরিচয়টা বাত্‌লে দাও।

এতক্ষণে সত্যজিৎ কথা বলতে পারল। বনশ্রীর স্বাভাবিক জোরটা সঞ্চারিত হল ওর মধ্যেও।

—চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও তোমাকে দেখা যায় বনশ্রী। অন্ধকারেও তুমি ঝলকে উঠতে পারো।

—সত্যি না কি ?—বনশ্রী তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল : এতদিন পরে তোমার মুখে একটা ভালো কম্‌প্লিমেণ্ট শোনা গেল সত্য। অধ্যাপনা করে আজকাল তুমি কথা বলতে শিখেছ।

একটু খোঁচা দিল। সেটা গায়ে লাগল। কিন্তু হীরেনের একটা বেয়াড়া অট্টহাসি দুজনকেই চমকে দিলে তৎক্ষণাৎ।

হীরেন বললে, একেই বলে মাস্টারির মহিমা। মূকং করোতি বাচালং!—বলেই সে দেওয়ালের দড়িতে ঝোলানো একটা ময়লা শার্ট টেনে নিয়ে গায়ে চাপাতে লাগল।

বনশ্রী বললে—জামা পরছ কেন ? তুমি আবার কোথায় চললে ?

—একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি।

—সে তো এইখানেই হতে পারে।—এর মধ্যে বনশ্রীর নারীসুলভ অভিজ্ঞ দৃষ্টি ঘরটা ভালো করে দেখে নিয়েছিল : ওই তো তোমার স্টোভ রয়েছে—চিনি, চায়ের প্যাকেট সবই দেখছি। অনুমতি করো তো চা-টা আমিই করে দিতে পারি।

হীরেন বললে, চায়ের প্যাকেট আছে ঠিকই কিন্তু ওতে চা নেই।

—তাহলে চায়েরও দরকার নেই। তুমি বোসো।

—না-না, আলাপ একটু ঝালিয়ে নাও—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।

ঘরের একপাশ থেকে বিবর্ণ বিদ্যাসাগরী চটিটা পায়ে টেনে গেল হীরেন।

দুজনে বসে রইল চুপ করে। যতক্ষণ শোনা যায়, কান পেতে শুনতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে হীরেনের চটির আওয়াজ ক্রমশ রাস্তার দিকে নেমে যাচ্ছে।

এতক্ষণ হীরেন ছিল মাঝপথে। যেন দু'জনের সমস্ত সংকোচ, সব কিছু কুণ্ঠার ভেতরে একটা পর্দার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সে। তার আড়ালে থেকে ওরা কথা কইতে পারছিল সহজ ভাবে। ওদের যা কিছু অপ্রস্তুত অপ্রতিভতা, হীরেন তাদের ঢেকে রেখেছিল। এইবারে মাঝখান থেকে সরে গেছে হীরেন—কেমন একটা অদ্ভুত নগ্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুজন।

কী বলবার আছে ?

কিছুই বলবার নেই। অনেককাল আগেই সব কথা ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে প্রায় অপরিচয়ের ভূমিকা। যদি হীরেনের ঘরে না হয়ে আর কোথাও দেখা হত : চলতি ট্রামে, পথে মুখোমুখি, কোনো সিনেমার লবীতে, অথবা হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে—তা

হলে? দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে সরে যেত—যেন কেউ কাউকে কখনো দেখেনি—কোনোদিন তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্রও পরিচয় ছিল না।

কিন্তু এখন?

ঘরের একটা কুলুঙ্গিতে হীরেনের টাইমপিস্‌টা একঁটানা টিক টিক করছিল। নীচে থেকে সমানে ভেসে আসছিল কড়া রসুন দিয়ে শুঁটকি-মাছ রান্নার উগ্র গন্ধ। তেতলায় কেউ একটা ব্যাঞ্জো বাজাতে শুরু করেছিল এতক্ষণে। কোথায় একটা কল খুলে কেউ স্নান করছিল—গায়ে জল চাপড়ানোর সঙ্গে মোটা গলায় ইংরেজি গানের সুর শোনা যাচ্ছিল—বিং ক্রস্‌বির পরিচিত গানের নকল। সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বুড়ীটা গলা চড়িয়ে আবার গালাগাল শুরু করেছিল রাস্তায়।

কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। এভাবে বসে থাকা চলে না।

—তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম বনশ্রী।

বনশ্রী চোখ তুলল। একটু আগেই দৃষ্টিটা দপ দপ করছিল—এখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা সুদূরতা ঘনিয়ে এসেছে কোথা থেকে। ছায়া নেমেছে।

সত্যজিতের কেমন অনুতাপ হল। ধ্যান না ভাঙালেই ভালো হত ওর। ও নিজের মধ্যেই একা মগ্ন হয়ে থাকত—আর সত্যজিৎ চুপ করে বসে বসে ভাবত, ওর নিজের থিয়োরীটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কতবার তো গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে নিজেই ও আশ্চর্য কৌতুকে হেসে উঠেছে। ওর কাছে জীবনের উপমা বৃত্ত নয়—যে একবার সরে যায় সে আর ঘুরে ফিরে কোনোদিন একই জায়গায় ফিরে আসে না; জীবন নদীর মতো বাঁকে বাঁকে চলে—সেই বাঁকের মুখে হয়তো দেখা হয় দু-একবার—কিন্তু তখন আর পুরনোর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। একদিন চিনতাম—এখন আর চিনি না। সেদিনের তুমি নেই আমিও না। তুমি বদলে গেছ অনেক—আমারও বা কতটুকু আছে পুরনো দিনের মতো।

: খবর ভালো?

: চলছে এক রকম। তোমার?

: আমারও চলে যাচ্ছে।

কিংবা একটু বৈচিত্র্য থাকতে পারে। কোনো শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে হয়তো এর মধ্যে—তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী শোনা যেতে পারে, হয়তো একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসও ফেলে যায়! অথবা, আর একটু বেশী সময় যদি পাওয়া যায়—হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কোনো স্টেশনের ওয়েটিংরুমে; আর ট্রেন আসতে যদি তখনো কিছু দেরি থাকে—তা হলে কিছুক্ষণ চা খাওয়া চলে এক সঙ্গে, আরো বিস্তৃতভাবে গল্পগুজব করা যায়। নিজের কথা যথাসম্ভব এড়িয়ে দু'জনের চেনা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির প্রসঙ্গ টেনে আনা যায়—

তার কিছু সমস্যা নিয়ে নকল দুশ্চিন্তার বিলাস করা যায় কিছুক্ষণ। তারপর ট্রেনের ঘণ্টি বাজলে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ানো।

: আচ্ছা, যাব একদিন তোমাদের ওখানে।

: আমিও যাব সময় পেলেই।

কিন্তু কেউ কাউকে ঠিকানা দেয় না—কেউ চায়ও না একজনের আর একজন কাছে। ওটা গৌণ।

জীবনে বৃত্ত নেই—নদীর বাঁক আছে। এক বাঁকে দেখা, আর এক বাঁকে হারানো। তবু বহুকাল পরে বনশ্রীকে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ হল সত্যজিতের। কী বলা যায়। কী বলি।

সেদিনের সেই ঘুমন্ত আবেগেরা মনের মধ্যে যেন আবার নতুন করে নাড়া দিয়ে উঠল।

সত্যজিতের এই দ্রুত ভাবনার মধ্যে এতক্ষণ কোনো জবাব দেয়নি বনশ্রী। সেই উদাস আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে ছিল। এইবার বললে, তোমাকেও দেখলাম অনেকদিন পরে। বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

সত্যজিৎ হাসল।

—এক বছর কলেজে পড়ালে দশ বছর পরমায়ু কমে যায়।

—তাই নাকি ?—বনশ্রী সহজ হতে চাইল : আর স্কুলে ?

—ঠিক জানি না। আরো খারাপ নিশ্চয়ই।

বনশ্রী হাতব্যাগের প্ল্যাস্‌টিকের ফিতেটা নিয়ে আঙুলে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে বললে, নিজের দুঃখটা সবাই বড করেই দেখে, অতএব সে কথা বরং থাক। কিন্তু তুমি হীরেনের এখানে যে হঠাৎ ?

—ব্যবসায়িক প্রয়োজনে।

—ব্যবসা ? অধ্যাপকদের ওটাও দরকার নাকি ?

—অধ্যাপকদেরই তো সব চেয়ে বেশি দরকার। কলকাতার কলেজগুলোর 'শিফ্‌ট্‌ সিস্টেম' সম্পর্কে কোনো খবর রাখো না বুঝি ?

সত্যজিৎ আবার টের পেলো চুরুটটা নিভে গেছে। মাটিতে সেটা নামিয়ে রেখে বললে, এক একজন আছেন যাঁরা চার পাঁচটা কলেজে সপ্তাহে পঞ্চাশ পিরিয়ড পর্যন্ত পড়ান। অর্থাৎ পাইকিরি হারে সরস্বতী পুজোর ব্যবস্থা। বিচক্ষণ পুরুতের মতো এখানে একটা ওখানে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে আসা। নামাবলীর বদলে আছে চাদর—

—হীরেনও কি একটা কলেজ খুলবে ? তুমি কি সেখানে উমেদার ?

সত্যজিৎ হাসল : না—তা নয়। অধ্যাপকের আরো একটা ব্যবসা আছে—নোট বই। সেই দরকারেই এসেছি। কিন্তু তুমি কেন এখানে?

—এক ঝাঁকের পাখি!—বনশ্রী খানিকটা সহজ আর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল : আমারও একই উদ্দেশ্য। স্কুলফাইন্যাল মেড্ ইজি। বার্ডস্ আই ভিউ।

দু'জনে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। জীবন বৃত্তাকার নয়, বাঁকে বাঁকে চলে—এই কথাটাই নিজের মনের কাছে জোর করে বলতে চাইল সত্যজিৎ। আর নয়—আর সম্ভব নয় কিছুতেই। এখন পূরবী এসেছে। শান্ত, অন্তর্মুখ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। পড়াতে পড়াতে নির্বিশেষ তত্ত্ব কখন বিশেষ হয়ে ওঠে—একটা কবিতার লাইন টেক্‌স্‌ট বইয়ের অর্থ ছাড়িয়ে জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এখন পূরবীর গালের রঙ বদলায়, চোখের পাতা কেমন ভিজে ভিজে আর ভারী হয়ে ওঠে—বই থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিচের দিকে তাকায় পূরবী।

আর সম্ভব নয়। বনশ্রীও কি পারে? হারিয়ে গেছে—তা তবু বনশ্রীর ভাবটা আবার পেয়ে বসছে তাকে; মনে হচ্ছে—যা হওয়া উচিত নয় তা হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়ে—কোনো অকারণ অস্বাভাবিক প্রকৃতির খেয়ালে নদীর বাঁক শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিলে যেতে পারে বৃত্ত-রেখায়।

মনের সেই ভাবটাকেই নতুন করে নাড়া দিয়ে বনশ্রী বললে, তা হলে সেলিং ইন দি সেম বোট। হীরেনের এখানেই দেখা হতে পারে বার বার।

অসীম অস্বস্তিতে সত্যজিৎ বললে, সম্ভব।

—কিন্তু সম্ভাবনার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কী?—বনশ্রী বললে, এসো না আমাদের ওখানে। যে কোনো রবিবারে। সকালে বিকেলে যখন খুশি। আমরা সেই কবির রোডেই আছি।

সত্যজিৎ বলতে চাইছিল, তা হয় না। তবু শুকনো ঠোঁটটা একবার লেহন করে নিয়ে বললে, আচ্ছা যাব।

—সামনের রবিবার?

বলা উচিত ছিল, না—এ রবিবারে নয়, এন্‌গেজমেন্ট্ আছে। বলা যেতে পারত—ওদিন সময় পাব না—আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। কিন্তু বলতে পারল না। সেই বনশ্রী। গড়ের মাঠের তরল অন্ধকারে যার হাসি বেহাগের সুরের মতো ঝঙ্কৃত হত—ছড়িয়ে যেত মাথার ওপরের অসংখ্য তারায় তারায়।

—আচ্ছা আসব।

—বেলা ন'টা নাগাদ?

—ন'টা নাগাদ।—যান্ত্রিক প্রতিধ্বনি করল সত্যজিৎ। আর তখনি একটা নিরুপায়

যন্ত্রণার মতো মনে হল—আগামী রবিবার সকালে সে পূরবীকে পড়াবে বলে কথা দিয়েছিল।

এখনো কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু বনশ্রীর চোখ জ্বলছে। জ্বলে উঠছে দশ বছর আগেকার সেই পুরনো আলোয়। আজো তা সম্মোহনের শক্তি হারায়নি। নট্ ডেড্—বাট্ নট্ ডেড্লি?

হীরেন ফিরে এল। সঙ্গে একটা খাবারের ঠোঙা। পেছনে পেছনে এসেছে একটা চায়ের দোকানের ছোকরা—হাতে তার কেটলি আর পেয়ালা পিরিচ।

পুলকিত হাসি হেসে হীরেন বললে, এসো বনশ্রী—এবার তোমার উয়োম্যান্‌স ডিউটি। খাবার পরিবেশন করো আমাদের।

পাঁচ

প্রীতি আস্তে আস্তে শিবশঙ্করের ঘরে এসে পা দিলে।

এ ঘরের বড় ডেকচেয়ারটা অনেকদিন আগে সরে গেছে ইন্দ্রজিতের ঘরে। তার জায়গা দখল করেছে একটা ইজিচেয়ার। মাথার দিকের কাপড়টা কালো হয়ে গেছে—বিশ্রী নোংরা লাগে দেখতে। মধ্যে মধ্যে রঘু তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিয়ে যায়। আপাতত তোয়ালেটা মেজেয় খসে পড়েছে, আর শিবশঙ্করের মাথার চারপাশে বিচ্ছুরিত খানিক কলঙ্কের মতো দেখা যাচ্ছে কালো দাগটাকে।

প্রীতিকে দেখে শিবশঙ্কর সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

পাশে টিপয়। তার ওপরে গ্লাস, মদের বোতল। আজকে সাত সকালেই মদ নিয়ে বসেছেন। যে-কারণেই হোক, তাঁর মন আজ অসংযত হয়ে আছে—বিরক্তির দোলা উঠেছে নিজের ভেতরে। প্রীতি যখন ঢুকল, তখন সবে গ্লাসটা তিনি নামিয়ে রেখেছেন টেবিলে। অ্যাল্‌কোহলের চাপা মিষ্টি গন্ধ থমকে আছে ঘরময়।

চোখে লালের রঙ ধরেছিল। প্রীতিকে বললেন, বোস্।

জীর্ণ ভেলভেটমোড়া একটা ছোট আসনের ওপর প্রীতি বসে পড়ল নিঃশব্দে।

অদ্ভুত এই ঘরটা। পুব-দক্ষিণে দুটো করে বড় বড় জানালা—খুলে দিলে আলো হাওয়ার বন্যা বয়ে যেত। কিন্তু প্রীতি ওদের কখনো খোলা দেখেছে বলে মনে পড়ে না। প্রীতির জন্মের আগে থেকেও বোধ হয় ওরা অমনি ভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। আজ হয়তো চেষ্টা করেও আর খোলা যাবে না ওদের—দেওয়ালের চুণ-সুরকির সঙ্গে ওরা নিশ্চল ভাবে জমাট বেঁধে গেছে।

চারটে জানালাই ফুলকাটা রঙিন কাচের সার্শী দিয়ে আঁটা। ফিকে গোলাপী রঙ

আরো ফিকে হয়ে গেছে কাচের ওপর—তার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে খানিক ভুতুড়ে আলো এসে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। ওই আলোয় ঘরটার সব কিছুকে অচেনা আর অবাস্তব দেখাচ্ছে। পুরনো আমলের ভারী খাট—তার কালো বার্নিশের ওপর যেন বহু-কালের অন্ধকার এসে এক পোঁচড়া বাড়তি রঙ বুলিয়েছে ; দেওয়াল-জোড়া আয়নায় ময়লা পড়েছে—কতগুলো ছায়ামূর্তি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে তার ভেতরে ফ্রেমের পাশ দিয়ে—ভেতরের পারা উঠে গিয়ে উঁকি মারছে তাদের ব্রন-চিহ্নিত মুখ ; দেওয়ালে গাঁথা একটা লোহার সিন্দুকের হাতল ছায়ার ভেতর থেকে খানিকটা কুৎসিত হাসির মতো চিক চিক করছে। অতীতের একটা রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-মুষ্টি যেন কতগুলো হাড়ের আঙুলে গলা টিপে রেখেছে সমস্ত ঘরটার।

শিবশঙ্করের ঠিক মুখোমুখি অচেনা ইংরেজ শিল্পীর আঁকা একখানা বিরাট ছবি—নগ্ন লালসার আলিঙ্গনে বাঁধা ভেনাস আর মার্সের মিলন-মূর্তি। শিবশঙ্কর ছাড়া এ ঘরে ঢুকে ও ছবির দিকে কেউ কখনো চোখ তুলে তাকায় না—তাকানো সম্ভবও নয়। ছবিটি আঁকাই হয়েছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—কুণ্ঠাহীন নির্লজ্জতায় শিল্পী সে উদ্দেশ্য টানে টানে ফুটিয়ে তুলেছে। বারো বছর আগে—মা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন ওই ছবির ওপর একটা রেশমী পর্দা টানা থাকত। কিন্তু মা মারা যাবার পর থেকে—এ বাড়ির সব কিছুর মতো ওরও আবরণ সরে গেছে !

সত্যজিৎকে একবার বলতে শুনেছিল, ও ছবির দিকে এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখ পড়লেও তিনবার গঙ্গাস্নান করতে হয়। কিন্তু শিবশঙ্কর সমস্ত সামাজিক প্রথা-নিয়মের বাইরে। তথাকথিত কোনো শালীনতার জগতে তিনি বাস করেন না। ছেলেমেয়ের সামনে মদ খেতে যেমন তাঁর কোনো বাধা নেই—তেমনি বাধা নেই চোখের সামনে দুঃসহ অশ্লীল ছবিটাকে অমন ভাবে টাঙিয়ে রাখতে। মুখ তুললেই ছবিটা চোখে পড়বে—তাই প্রাণপণে মাথা নিচু করে প্রীতি বসে রইল।

শিবশঙ্কর বললে, গ্রামোফোনটা বাজা।

দরজার পাশেই পুরনো একটা গ্রামোফোন—ছড়ানো একরাশ রেকর্ড। নেশা চড়তে থাকলেই শিবশঙ্কর কিছুক্ষণ ধরে গ্রামোফোন শোনেন। তারপর গ্রামোফোনে ক্লান্তি এলে আসে প্রীতির গানের পালা। যে গান খুশি—যতক্ষণ খুশি। শুনতে শুনতে নেশার ঘুমে তলিয়ে যান শিবশঙ্কর।

প্রীতি উঠল। গ্রামোফোনের ঢাকা খুলল, বের করে নিল রেকর্ডের বাক্স। দম দিয়ে মৃদু গলায় বললে, পিন তো ফুরিয়ে গেছে বাবা।

—ঠিক আছে—পুরনো পিনেই চলবে।

পিন্-কেসের ভেতর একরাশ ব্যবহৃত পিন। কোনো কোনোটা মরচে পড়ে গেছে

—কতকগুলো একেবারেই ভোঁতা। তবু ওর মধ্য থেকেই দুটো একটা বেছে নিলে প্রীতি।

—কী বাজাবো ?

—যা খুশি।

প্রীতি একটা শ্যামা-সঙ্গীত চাপিয়ে দিলে। ক্ষয়ে যাওয়া পিন, আর হাজারবার বাজানো রেকর্ডের যোগাযোগে একটা বিকৃত-বীভৎস সুর বেরিয়ে আসতে লাগল। তাও বেশিক্ষণ চলল না। একটা ফাটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে সাউণ্ড-বক্সটা ক্রমাগত লাফাতে লাগল : জবা—জবা—জবা—জবা—

প্রীতি দ্রুত হাতে জায়গাটা পার করে দিলে। আবার চলল মোটা অস্বাভাবিক গলায় সেই বিকৃত দুর্বোধ্য গানের পালা। শিবশঙ্কর গ্লাসে মদ ঢাললেন।

প্রীতি বসে রইল চুপ করে। গান নয়—নিজের সমস্ত সুরবোধের ওপর অসহ্য উৎপীড়ন। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকতে হয়। এক একদিন মনে হয়, পুরনো রেকর্ডের এই সমস্ত উৎকট গানের যন্ত্রণায় প্রীতিও হয়তো বড়দা ইন্দ্রজিতের মতো একেবারে পাগল হয়ে যাবে।

রেকর্ড শেষ হল। পিন বদলে আর একটা রেকর্ড চাপালো মেশিনে।

কুড়ি বছর আগেকার খ্যামটা জাতীয় গান। সঙ্গে সঙ্গে নাচের তালে ঘুঙুরের আওয়াজ : "এসো এসো ফুলমালী মোর যৌবন ফুলবনে।" এখন খানিকটা পেত্নীর কান্না বলে মনে হয়।

প্রীতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। এ ঘর থেকে ছুটে পালাতে পারলে রক্ষা পায় সে।

কিন্তু বেশিক্ষণ এ যন্ত্রণা সইতে হল না। হঠাৎ শিবশঙ্কর বললেন, থাক্—বন্ধ করে দে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রীতি গানটা বন্ধ করে দিলে।

—তবে কী বাজাবো ?

—কিছু দরকার নেই। তুই বোস্ এসে।

নিজের আসনে ফিরে এসে প্রীতি আবার নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। সমস্ত ঘরটায় দুলতে লাগল প্রেতলোকের সেই অদ্ভুত আলো—নিঃশব্দ ঘরটাকে কঠিন শীতল কঙ্কাল-মুঠিতে আঁকড়ে রইল মৃত অতীতের স্পর্শ—দেওয়ালজোড়া আয়না থেকে ব্রণের চিহ্ন আঁকা একটা মুখ প্রীতিকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

খানিক পরে শিবশঙ্কর বললেন, তোর বিয়ে দেব।

প্রীতি চমকে উঠল। যেন কোথা থেকে এক টুকরো আগুনের ছোঁয়া লাগল গায়ে।

শিবশঙ্কর গ্লাস নিঃশেষ করলেন। বললেন, ভেবে দেখলাম আর দেরি করা উচিত নয়।

রক্তের মধ্যে তুফান নিয়ে প্রীতি মোড়াটার ওপর নিথর রইল। আজ তিন বছর আগে যে আলোচনাটা থমকে থেমে গেছে—প্রীতি যখন নিশ্চিত করে জেনেছে কোনোদিন তার বিয়ে হবে না—এই মুখার্জি ভিলার বদ্ধ দেওয়ালের ভেতরে তিলে তিলে ফুরিয়ে মরে যেতে হবে তাকে—তখন আবার নতুন করে এ আলোচনা কেন? শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না—কিছুই না—। আর নতুন একটা অপমানের যন্ত্রণায় আবার কিছুদিন ধরে জর্জর হবে প্রীতি, আবার কে যেন হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করবে, আর পরাভবের লজ্জায় বিছানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে কেঁদে চলবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত! কদর্য পুনরাবৃত্তি প্রীতির আর সহ্য হয় না—এবার এই খেলার হাত থেকে এরা তাকে মুক্তি দিক।

সামনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে শিবশঙ্কর একটা ভ্রূকুটি করলেন। কিছু একটা ভাবছেন, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না।

—চাঁদগঞ্জ রায়দীঘির নাম শুনেছিস কখনো?

অকারণ অসঙ্গত প্রশ্ন একটা। আশ্চর্য হয়ে প্রীতি মাথা তুলল।

—নাম শুনেছিস? চাঁদগঞ্জ রায়দীঘি?—শিবশঙ্কর প্রশ্ন করলেন আবার।

—না।

—ওখানকার চাটুজ্জেরা। উপাধি রায়চৌধুরী। এককালে রাজা ছিল, এখন বংশের ছেলেরা নামের আগে লেখে কুমার বাহাদুর। সেই বাড়ির ছেলে।

অসঙ্গত জিজ্ঞাসার অর্থ-তাৎপর্য ধরা পড়ল এতক্ষণে। প্রীতির মুখে এক ঝলক রক্ত এসে জমল বিদ্যুৎকণার মতো, সিঁদুরে হয়ে গেল গাল। চোখ আবার নেমে এল মাটির দিকে। কোলের ওপারে জড়ো করা হাত দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

একটা বর্মা চুরুট নিয়ে ধরাতে ধরাতে শিবশঙ্কর বললেন, সেই বাড়িরই ছেলে। কুমার নীলমাধব রায়চৌধুরী। ইন্‌সিয়োরেন্সে চাকরি করে—গ্র্যাজুয়েট। দেশের জমিদারী এখন আর নেই বটে, তবে খানকয়েক বাড়ি আছে কলকাতায়। নিজেরা থাকে বালিগঞ্জে

প্রীতির মুখে রক্ত খেলতে লাগল। এ-ও নতুন খবর নয়। এর আগে এমন অনেক—অনেক আলোচনা শুনতে হয়েছে তাকে। মনের পর্দায় চকিত উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে গেছে কত রাজকুমার, ব্যারিস্টার, সরকারি-চাকুরে, ডাক্তার, মিলিটারী অফিসার। তাদের কাউকে কখনো দেখেনি প্রীতি—শুধু বুক-দুরু-দুরু-করা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য সব ছায়ামূর্তির মিছিল বয়ে গেছে—, অলস কল্পনায় ভরে উঠেছে সন্ধ্যা-দুপুর, রাত্রির অন্ধকারে তাদের কণ্ঠস্বর বেহাগের সুর হয়ে এসে বুকের নাড়ীতে নাড়ীতে ঝঙ্কার বাজিয়েছে। তারপর—

তারপর কেউ নেই। হাজারীবাগ রোডের বিকেলটাকে সে নিজেই ভেঙে দিয়েছে। শুধু কয়েকখানা নীল খাম একদল নীলপাখির মতো উড়ে এসেছিল। কিন্তু তারাও রইল না। এখন আর আশা নেই, বিশ্বাসও হয় না। তবু অভ্যাস যায় না—তবু এখনো রক্তে ঢেউ ওঠে।

—অবশ্য নীলমাধবের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। আর তোর বয়েসও তো নেহাত কম হল না। সেদিক থেকে খুব বেমানান হবে না। পনেরো ষোল বছরের তফাত—এমন আর কি বেশি? প্রায়ই অমন হয়, তবে আগের পক্ষের দু-তিনটে ছেলেমেয়ে আছে—এই যা।

আগের পক্ষ—চল্লিশ বছর—দু-তিনটে ছেলেমেয়ে। একটা রঙিন বেলুন আকাশে উড়ে যাচ্ছিল হাওয়ায়—টলতে টলতে নামতে লাগল নিচের দিকে। প্রীতি মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল।

—তাতে আর কী হয়েছে!—চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, তার কথা ভুলে গিয়ে, দু'-আঙুলের মাঝখানে সেটাকে আঁকড়ে রেখে শিবশঙ্কর ছবিটার দিকে তাকিয়ে আর একবার ভ্রূকুটি করলেন। তারপর বললেন, তা হলেও নামী ঘর। রাজা ছিল এককালে, এখনো লেখে কুমার নীলমাধব চৌধুরী। আমাদের ঘরের সঙ্গে ঠিক মানাবে। আমি কথাই দিয়েছি একরকম।

প্রীতি সেই ভাবেই বসে রইল। খুশি হবে কিনা বুঝতে পারল না।

কিন্তু কথা বললে বীথি। একটু আগেই সে ঘরে এসেছিল। শিবশঙ্কর তাকে দেখেও দেখেননি, প্রীতি লক্ষ্য করেনি।

বীথি হঠাৎ বলে বসল: সেই কুমার নীলমাধব চৌধুরী তো? যাকে নিয়ে মস্ত কেস্ হয়েছিল বছর দেড়েক আগে?

শিবশঙ্কর উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। নেশার ঘোরে চমৎকার একটি পরিকল্পনার মসৃণ পথ দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন, হঠাৎ যেন হোঁচট খেলেন একটা।

লালচে বড় বড় চোখ দুটো চকচক করে উঠল শিবশঙ্করের।

—হ্যাঁ, কেস্ হয়েছিল। কিন্তু কী হয়েছে তাতে?

—না, কিছুই হয়নি।—বীথির ঠোঁটের কোণা কুঁচকে গেল একটুখানি: আমার যতদূর মনে পড়ছে বাবা—কেস্টা অনেকদিন চলেছিল। তাঁর স্ত্রী দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। পুলিসের সন্দেহ হয়েছিল ওই বিষটা তিনি স্বেচ্ছায় খাননি—তাঁকে খাওয়ানো হয়েছে।

নেশা ভুলে গিয়ে শিবশঙ্কর চেয়ারটার ওপর সোজা হয়ে বসলেন। এবার চোখ আর চকচক করল না—একেবারে ধক ধক করে উঠল। তবু আশ্চর্য সংযত হয়ে শিবশঙ্কর

বললেন, হুঁ, তারপর ?

প্রীতি হলে ওই দৃষ্টি আর ওই গলার স্বর শুনলেই ছুটে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। এমন কি সত্যজিৎও হয়তো এক পা এক পা করে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াত। কিন্তু বীথি পালালো না। ঠোঁটের কোণটাকে তেমনি ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে রেখে, সোজা চোখে শিবশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, নীলমাধব চৌধুরী বেনিফিট্ অব ডাউটে খালাস পেয়েছিলেন। সসম্মানে কিন্তু নয়।

ঠিক এই ধরনের আঘাত হয়তো শিবশঙ্করের জীবনে এই প্রথম। নিজের কোনো সন্তানের কাছ থেকে এমন ঔদ্ধত্য এর আগে তিনি হয়তো কোনদিন পাননি। কিছুক্ষণ একটা কথাও খুঁজে পেলেন না তিনি, বিস্তৃত চোখে প্রীতিকে দেখতে লাগলেন।

—বাংলা দেশে কুপাত্রের অভাব নেই বাবা। কিন্তু দিদিকে একটা খুনের হাতে না তুলে দিলেও চলে। বিয়ে যখন এতদিন হয়নি—তখন না-ই হল।

অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়ে তার বদলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিবশঙ্কর।

—এসব ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কেউ চায়নি বীথি। ইউ মাইণ্ড্ ইয়োর ওন্ বিজনেস্!

—দিদি আমার আপন বোন বাবা।—বীথি হাসল: তার সম্বন্ধে আমি যদি কিছু ভাবতেই চাই, তা হলে সেটা এমন কিছু অপরাধ হয় না।

—শাট্ আপ!—শিবশঙ্কর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বিকৃত জান্তব গলায় বললেন, গেট আউট—বেরিয়ে যা এখান থেকে।

প্রীতি কাঠ হয়ে গেল। বীথিকে নিষেধ করে কী একটা বলতে চাইল, পারল না।

বীথি বললে, আমি যাচ্ছি বাবা। কিন্তু দিদিকে যদি মেরে ফেলতেই চান—সেজন্যে আপনার নিজেরই তো রিভলবার আছে। অনর্থক আর পরকে সে ভার দিচ্ছেন কেন ? আর পুরনো রাজবাড়ির কথা এখন ভুলে যান বাবা। তার রক্তে রক্তে অনেক বছরের পাপের বিষ জমেছে—দিদিকে যদি ওরা খুন না-ও করে, সে বিষে দিদি আপনিই জ্বলে শেষ হয়ে যাবে।

নেশার টানটা কাটিয়ে শিবশঙ্কর উঠতে যাচ্ছিলেন, হয়তো এগিয়ে গিয়ে বীথির গায়ে তিনি হাত তুলে বসতেন। কিন্তু তার আগেই বীথি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিরুপায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষলেন শিবশঙ্কর—হাতের মধ্যে চুরুটটাকে পিষে ফেললেন নির্মম-ভাবে।

আর ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল রঘু।

ঢুকেই টের পেলো ঘরের আবহাওয়ায় কালো মেঘে বজ্র থমথম করছে। এ বাড়িতে ওর অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, বহুকাল ধরে শিবশঙ্করকে তিলে তিলে চেনার সুযোগ

পেয়েছে। শিকারী কুকুর যেমন দূর থেকে বাঘের গন্ধ পায়—তেমনি ভাবে মুহূর্তে অনুভব করলে রঘু। আর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল ঘর থেকে।

যে গর্জনটা বীথির জন্য সঞ্চিত ছিল, সেটা ফেটে পড়ল রঘুর ওপর।

—এই, চলে যাচ্ছিস কেন?

রঘু দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কী বলতে এসেছিলি?

রঘু একবার ইতস্তত করলে, এখন থাক।

—না, থাকবে না।—শিবশঙ্কর আবার গর্জন করলেন: কী বলতে এসেছিলি বলে যা।

—সরকার মশাই এসে নিচে বসে আছেন। খুব কান্নাকাটি করছেন।

—কান্নাকাটি? কেন?

—ছাদ দিয়ে জলপড়া নিয়ে কী সব গণ্ডগোল হয়েছিল—রঘু একটা ঢোঁক গিলল: তাই বাগবাজারের ভাড়াটেরা নাকি ওঁর গায়ে হাত—

রঘু কথাটা শেষ করতে পারল না। থাবা দিয়ে কথাটা ছিনিয়ে নিলেন শিবশঙ্কর: মেরেছে?

—তাই তো বলছিলেন।

শিবশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। একেবারে সোজা। দুটো আরক্তিম চোখ ছাড়া নেশার আর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

—গাড়ি জুড়তে বল্।

প্রীতির সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। রঘুর চোখে আতঙ্কের ছায়া দুলে উঠল।

—আপনি কোথায় যাবেন?

দাঁতে দাঁতে ঘষলেন শিবশঙ্কর: আমাকেই যেতে হবে।

—কিন্তু থানায় একটা খবর দিলে—

—না, থানার দরকার নেই।—শিবশঙ্কর আর একবার খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিলেন গেলাসে। রুদ্ধশ্বাসে সবটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমাকেই দেখতে হবে। গাড়ি জুড়তে বল্। সেই সঙ্গে আমার ঘোড়ার চাবুকটাও সঙ্গে নিস। হয়তো দরকার হতে পারে।

ছয়

বনশ্রী বেশিক্ষণ বসল না। চা খাওয়া শেষ হতে হীরেনকে একবার বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট কী আলোচনা করল নীচু গলায়। তারপর দরজার সামনে ফিরে এসে সত্যজিৎকে বললে, আজ আসি। স্কুল আছে।

।

—আমাদের বাড়ির ঠিকানাটা মনে আছে তো ?

—আছে।

তারও পরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে বনশ্রী। যেন আরো কিছু বলবার আছে, কিংবা আরো কোনো কথা তার শোনবার আছে সত্যজিতের কাছে। কিন্তু বনশ্রী কোনো কথা বলল না—সত্যজিৎও না। সত্যজিৎ নিঃশব্দে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে চেষ্টা করতে লাগল; আর বনশ্রী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

জুতোর ক্লান্ত শব্দ ধীরে ধীরে নীচে নেমে যেতে লাগল।

হীরেন আপ্যায়িত ভঙ্গিতে গাল চুলকোতে চুলকোতে ঘরে এসে ঢুকল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বেশ করে বসে পড়ল পা ছড়িয়ে। সত্যজিতের মুখোমুখি।

—বনশ্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ দু'বছর ধরে—হীরেন তথ্য পরিবেশন করল।

—ওঃ।

খবরটায় সত্যজিৎকে যথোচিত বিস্মিত হতে না দেখে হীরেন ক্ষুণ্ণ হল। বললে, পিয়োর বিজ্‌নেস্‌। মানে খাঁটি ব্যবসা।

—বঙ্গানুবাদ না করলেও বুঝতে পারব।—সত্যজিৎ হাসল : ব্যবসার কথাটা তো তুই আগেও বলছিলি। বনশ্রী কি তোকে ফিনান্স করছে নাকি ?

—হুঁঃ, ফিনান্স করবে!—একটা দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে হীরেন কানের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করলে। বিকৃত মুখে বললে, সেদিন আর ওর নেই—বুঝলি ? বাপ রিটায়ার করেছে—পেন্‌শনের টাকায় চাল বজায় রাখা তো দূরের কথা, এখন সংসার চালানোই শক্ত।

—কেন—বনশ্রীর বড়দা ? বনশ্রী যাকে বলত, 'এশিয়ার ব্রাইটেস্ট্‌ বয়'—সে কোথায় ? কী করছে ?

—সেই গ্রেট্ হিতেন রায় ? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো অদ্ভুত ধরনে ইংরেজি বলত, আর বাঁ-হাতে টেবিল টেনিস খেলত ? ওদের বাপই তার মাথাটি খেয়েছেন। এশিয়ার ব্রাইটেস্ট্‌ বয়কে কী একটা ট্রেনিং নেবার জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন—ভেবেছিলেন যুদ্ধের পরে এই দু নম্বর 'লাইট অব্‌ এশিয়া'টি আমেরিকা আলো করে ফিরে আসবে। আমেরিকা আলো হয়েছে কিনা কে জানে—কিন্তু সে আর দেশে ফেরেনি।

—ফেরেনি ?

—না।—হীরেন ধূর্ত ভাবে হাসল : কান্‌সাস্‌ না কোথায় একটা ফার্মে চাকরি জুটিয়েছে, সেখানেই বিয়ে করে ঘর-সংসার পেতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না। বনশ্রীর ছোট ভাই রীতেন কলেজ ডিবেটে তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—কিন্তু তিনবারেও

বি. এ. পাস করতে পারেনি। সে বলে, তার ইংরেজি পেপার বুঝতে পারে এমন কেউ ভারতবর্ষে নেই। ছিতেন যদি গ্রেট্ হয়—রীতেন গ্রেটার। সে একটা মোটর বাইক কিনে তাতেই ঘুরে বেড়ায়—আশা আছে দু-এক বছরের মধ্যেই অল্ ইণ্ডিয়া সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ান হবে। তাকে সন্ধ্যেবেলায় প্রায়ই দেখা যায় ওয়াই-এম্-সি-এর সামনে। দেখলেই চিনতে পারবি। ক্যানাডীয়ান ছিটের বুশসার্ট, থুত্‌নিতে আজকালকার বিকট ধরনের দাড়ি, আর সঙ্গে একটা মোটর-সাইকেল। মুখে একটা পাইপও থাকে—সেটা প্রায় হুঁকোর মতো প্রকাণ্ড।

—চমৎকার।—সত্যজিৎ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। দড়ির আলনায় হীরেনের ময়লা কাপড়-জামাগুলো হাওয়ায় দুলছে। তার মুখার্জি ভিলাকে মনে পড়ছে। এক ইতিহাস। একই অবক্ষয়ের অনুবর্তন। রিটায়ার্ড সেশন জজ আর বনেদী জমিদারের বংশধারায় একই জীবাণুর অনিবার্য বিস্তার!

হীরেন বলে চলল—আরে আমিই কি এত সব খবর জানতাম? আমাদের ছাত্র জীবনের 'হার ম্যাজেস্টি'—যিনি আমাদের কারো সঙ্গে হেসে একটা কথা কইলে বাকী সকলের বকে আগুন জ্বলত—ভেবেছিলাম তিনি এতদিনে বাইরের কোনো এম্ব্যাসিতে কশ্চিৎ দু-তিন হাজারী মন্‌সবদারের ঘর আলো করছেন। কিন্তু হঠাৎ যখন তাঁকে সাউথের একটা গার্লস্ স্কুলে আবিষ্কার করা গেল, তখন নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

সত্যজিৎ শুনে যেতে লাগল। হীরেনের ময়লা কাপড়-জামা হাওয়ায় দুলছে। অপরিচ্ছন্ন থাকবার একটা আশ্চর্য প্রবণতা আছে লোকটার। দেওয়ালে কতগুলো কালো কালো শুকনো রক্তের দাগ—দেখতে দেখতে গা ঘিনঘিন করে। হীরেন ছারপোকা মেরেছে।

হীরেন বললে, একটা হাইস্কুল গ্রামার আর ট্র্যান্স্লেশন করেছিলাম—বাই এ গোল্ড মেডালিস্ট্। সেইটে নিয়েই গিয়েছিলাম তদ্বির করতে। গিয়ে দেখি হেড্ মিস্ট্রেস্ আর কেউ নয়—আমাদের 'হার ম্যাজেস্টি' স্বয়ং। একটা ময়লা দাগধরা পেয়ালায় নিম্‌কি বিস্কুট দিয়ে চা খাচ্ছেন।—হীরেন হেসে উঠল।

সেই জন্যেই এ ঘরের মেজেতে এত সহজে বসে পড়তে পেরেছে বনশ্রী—সত্যজিৎ ভাবল। সেই জন্যেই অবলীলাক্রমে অপরিচ্ছন্ন কেটলিতে রাস্তার দোকানের চা আনিয়েছে হীরেন, ঠোঙায় করে আনিয়েছে খাবার। এর মধ্যে শুধু আতিথেয়তা নেই—একটা অবচেতন প্রতিশোধস্পৃহা লুকিয়ে আছে কোথাও—আছে খানিকটা হিংস্র আত্মপ্রসাদ।

ছারপোকার কালো কালো রক্তচিহ্নের দিকে তাকিয়ে সত্যজিতের মনে পড়ল বহুদিন

আগে দেখা বিলিতী কোনো চলচ্চিত্রের মতো কতগুলো দ্রুত ছবি।

গঙ্গার ধারে 'বুফে'তে সেই স্নিগ্ধ নীল আলো। এক কোণে মুখোমুখি দুজন। নীচের কালো গঙ্গার ওপর নানা রঙের অসংখ্য আলো। একটা স্টীমারের সার্চ লাইট চকিতে বহুদূর পর্যন্ত লেহন করে গেল। ক্ষণিকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বনশ্রী।

রূপোর টি-পট আর কাঁটা-চামচেগুলো ঝিকমিক করে উঠল। বনশ্রীর আঙুলের একটা হীরের আংটিও সেই সঙ্গে। জেটির গায়ে গঙ্গার সেতারের ঝঙ্কার বাজছে।

সব কিছুকে আশ্চর্য অবাস্তব বলে মনে হয়।

অবাস্তব বইকি। কোনো সন্দেহ নেই। হীরেনের ঘরে আর এক বনশ্রী। একটা অপরিচ্ছন্ন মেজের ওপর বসে পড়ল অসঙ্কোচে—স্বচ্ছন্দে রাস্তার দোকানের সিঙাড়া হাতে তুলে নিলে। চোখে মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির দাগ। বনশ্রীর দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারা যায় ওর বয়েস বাড়ছে।

কত বয়েস হবে বনশ্রীর? ছাব্বিশ সাতাশ? এর মধ্যেই কেন এমন করে ফুরিয়ে যাচ্ছে বনশ্রী?

হীরেন প্রসন্নভাবে বলে চলেছিল, তার পর আস্তে আস্তে সবই শুনলাম। বনশ্রীর ওই দুশো টাকার চাকরিটাও আজকে পরিবারের একটা অ্যাসেট। কিন্তু তাতেও কুলিয়ে ওঠে না—আরো কিছু হলে ভালো হয়।—হীরেন গাল চুলকোতে লাগল: আমিও দেখলাম এই চান্স। বললাম, 'টেক্স্‌ট বই লিখুন।' বনশ্রী বললে, 'আমার আসে না।' আমি বললাম, 'ভাবনা কী—লেখার লোক আছে, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু নামটা লেণ্ড্ করবেন—তাতেই ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।' বনশ্রী বললে, 'ছিঃ ছিঃ, সে ভারী অন্যায়।' আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন। আপনি আমি কোন্ ছার—নামের পাশে হাতখানেক ডিগ্রিওলা অনেক প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত এ কাজ করে থাকেন। তবে তাঁদের দামী নামের খেসারৎ আরো বেশি—এইট্টি পার্সেণ্ট পর্যন্ত ওঠে। আপনি ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টিতে রাজী হলে বরং অসাধারণ ঔদার্যের পরিচয় দেবেন।' তবু রাজী হয় না—জানিস তো, মেয়েরা কেমন ফেস্টিডিয়াস হয়। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে ছাড়লাম। তবে ভদ্রমহিলা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেননি—বইগুলো রিভাইজ করেন, কিছু কিছু লিখেও দেন।

বনশ্রী টেক্স্‌ট বুক লেখে। সত্যজিৎ জিনিসটাকে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। ইউনিভার্সিটির পত্রিকায় একবার একটা উজ্জ্বল মননতীক্ষ্ণ প্রবন্ধ লিখেছিল বনশ্রী। আজও সত্যজিতের মনে আছে। 'দি আর্ট অব্ জেম্‌স জয়েস।'

হীরেন বললে, যাই বলিস, মেয়েরা এখনো প্রিমিটিভ। বাইরে যতই স্মার্ট হোক—

আর ধারালো ঝকঝকে কথা বলুক, আসলে পুরনো এথিকাল কোডের মায়া ওরা কিছুতেই কাটাতে পারে না। এখনো ওদের মনে জেলাসি আছে, ওরা ভালোবাসাকে বিশ্বাস করে, সাধুতার ওপরে ওদের আস্থা আছে, এখনো ওরা একটুখানি ঘর গড়তে পারলে আর কিছু চায় না, এখনো নিজের দুরন্ত ছেলেকে কোনো প্রতিবেশী একটুখানি শাসন করলেই ওরা ঝগড়া করবার জন্যে তৈরি হয়। আফটার অল্ অ্যাডাম্‌স্ ইভ রিমেন্‌স্ দি সেম্। বনশ্রী রায়ও ব্যতিক্রম নয়।

বনশ্রীর প্রসঙ্গ থেকে একেবারে দার্শনিকতায় চলে এসেছে হীরেন।

সত্যজিৎ হাসল।

—অ্যাডাম্‌রাই কি খুব বদলেছে? এথিকাল কোডকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না বলেই অস্বাভাবিক ভাবে সংস্কার ভাঙবার চেষ্টা করে। চালটা কিছুতেই বদলাতে পারে না বলেই ওপর দিকে পা তুলে হাঁটতে চেষ্টা করছে—তার প্রমাণ আমেরিকা। ওটা চমকপ্রদ বটে—কিন্তু মানুষের মৌলিক পরিবর্তন নয়। বরং ও থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে নিজের কাছে সে যত বেশি হেরে যাচ্ছে-ভাঁড়ামো করে তত বেশি ঢাকতে চেষ্টা করছে তাকে। ইভদের মুখোসটা আজও তত শক্ত হয়ে এঁটে বসেনি —তাই চট করে ওদের এখনো চেনা যায়। তফাতটা এইখানেই।

হীরেন বিব্রত হয়ে বলল, থাম্ থাম্। প্রোফেসারের মুখ একবার খুলে দিলে আর রক্ষে নেই—সঙ্গে সঙ্গে চলল পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ড। বন্ধ কর্ প্লীজ।

—আমার দোষ নেই! কথাটা তুই-ই তুলেছিলি।

—ঘাট হয়েছিল।—হীরেন একটা পুরনো সিগারেটের টিন খুলে বিড়ি বের করলে: এবার নিজের কথা বল্। অনেকদিন পরে তো দেখা হল। নাটকীয় কিছু ঘটল না?

—না।

—হোপলেস্!—হীরেন বিরক্ত হয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলে।

—মেলোড্রামার যুগ চলে গেছে এখন।

হীরেন ট্যারা চোখে তাকালো। একটা বাঁকা হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণায়।

—গেছে নাকি?

সত্যজিৎ এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল: না গিয়ে উপায় কী? এ যুগে মেলোড্রামা লজ্জার কথা। জীবনে হয়তো কখনো কখনো অতি-নাটকীয় এখনো ঘটে—কিন্তু লোককে সে কথা বলবার জো নেই। বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। আগে জীবনকে বিস্তৃত

করাই ছিল আর্ট—এখন জীবনকে সংকুচিত করে বলতে হয়। নইলে কন্‌ভিন্‌সিং হয় না।

—প্লীজ—প্লীজ।—হীরেন দু হাত জোড় করল: আবার সেই বক্তৃতা। ওটা তোর ছাত্রদের জন্যই তোলা থাক। আমার সোজা কথার সোজা বাংলায় জবাব দে। বনশ্রী রায় কিছু বলেনি? নাথিং? হোয়াট অ্যাবাউট দি ওল্ড ফ্লেম্‌?

—ফ্লেম্‌ কোনদিন জ্বলেছিল কিনা তাই জানি না। ও কথা থাক—সত্যজিৎ একটা হাই তুলল: কিন্তু যে-জন্য এই সাত-সকালে ছুটে এলাম তাই যে এখনো ঠিক হল না। তুই একটা অ্যাডভাইস দে। রাজী হয়ে যাব ওই টাকায়?

—হওয়াই তো উচিত। কেন সেধে ছেড়ে দিবি কাজটা?

—কিন্তু প্রেস্‌টিজ—

—প্রেসটিজের বালাই থাকলে এ সব কাজ চলে না ব্রাদার। টাকা ইজ টাকা। একবার নোটবইটা ভালো করে চালু হোক—বাজারে ডিম্যাণ্ড হোক, তারপর আপনিই তোর রেট বেড়ে যাবে।

—তা হলে—

হীরেন একটানে বিড়ির আগুনটাকে একেবারে তলা পর্যন্ত টেনে আনল: কলেজের পরে স্ট্রেট চলে আয় পাব্‌লিশারের ওখানে। ধর্‌ পাঁচটা ছ'টা নাগাদ। আমি ওখানে থাকব, তোর জন্যে আগাম টাকাও তৈরি করে রাখব।

—তবে তাই কথা রইল।—হাতঘড়ির দিকে একবার তাকালো সত্যজিৎ—আল্‌সেমি ভেঙে উঠে পড়ল।

—হ্যাঁ—উঠি এখন। কলেজ আছে।

আবার ট্রাম। বাইরে বেলা সাড়ে নটার চঞ্চল কলকাতা। একদল এর মধ্যেই অফিসে বেরিয়ে পড়েছে, আর একদল এখনো বাজার করে ফিরছে। পরনে লুঙ্গি, হাতে থলের ভিতর পালং শাকের শীষ।

বনশ্রী। ওল্ড্‌ ফ্লেম্‌।

সত্যিই কি কখনো আগুন জ্বলেছিল? এই প্রশ্নটা সত্যজিতের মনের মধ্যেও ঘুরপাক খেতে লাগল।

: ছুটির পরে তোমার কোনো কাজ আছে আজ?

: না।

: যাবে সিনেমা দেখতে?

: ক্ষতি কি।

পাশাপাশি বসে ছবি দেখা। প্রায়ই প্রেমের গল্প।

: আশ্চর্য ড্রামা তৈরি করেছে—না ?

: অদ্ভুত। চলো—চা খাই।

: এখানে ?

: একটু নিরিবিলি হলে ভালো হয়—না ?

: তোমার যদি আপত্তি না থাকে—

: ডোণ্ট্ বী সিলি—

সান্নিধ্য—সাহচর্য। কাছে কাছে থাকতে ভালো লাগা। এক ধরনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। পরস্পরকে একান্তভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। নিয়মিত দেখা না হলে কোথায় কী যেন ফাঁকা ফাঁকা।

বন্ধুমহলে ঈর্ষার তুফান উঠেছিল।

: কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্।

: লাল চিঠি আর কতদূরে ?

আশ্চর্য, লাল চিঠির কথা কখনো মনে হয়নি। শুধু এই কাছে কাছে থাকা। এই বন্ধুত্ব। যে একান্ত বেদনা একেবারে নিজের—সেইটে বলতে পারা। যে ভালো লাগার অর্থ আর কারো কাছে ধরা পড়বে না—সঙ্গিনীর মনে সেটুকু সঞ্চার করে দেওয়া।

তারপরে সুতো কেটে গেল। যেন স্বাভাবিক নিয়মেই কাটল। পরীক্ষার পরে বাইরে চলে গেল বনশ্রী। খান দুই চিঠি লিখল। সত্যজিৎ জবাব দিয়েছিল। কিন্তু আর সাড়া আসেনি বনশ্রীর।

খুব খারাপ লেগেছিল কিছুদিন। বছরখানেক ধরে অসহ্য লাগত বিকেলটাকে। ভারী বিশ্রী সময় এই বিকেল—মৃত আলোয় এই আকাশের ছাড়া-ছাড়া নানা রঙের মেঘকে কতগুলো সমাধিস্তূপের মতো মনে হয়। বিবর্ণ ধূসরতায় নিজেকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় না—আশ্চর্য নিঃসঙ্গতার ভার চেতনার ওপর জমে ওঠে। লক্ষ্যহীন ভাবে ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ানো—তারপর সন্ধ্যা একটু গভীর হলে গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চেতে চুপ করে বসে থাকা।

আজ আবার সেই পুরনো অভ্যাসের যন্ত্রণাকে যেন জাগিয়ে দিতে চায় বনশ্রী। কেন আসতে বলে তাদের বাড়িতে ? সুতো কেটে গেছে। বনশ্রীকে আর সন্ধ্যাগুলো এখন দিতে পারবে না সত্যজিৎ। সেখানে নতুন আর একজনের দাবী এসেছে।

পূরবী।

সত্যজিতের চমক ভাঙল। সামনের স্টপেই তাকে নামতে হবে।

মুখার্জি ভিলার গেট্ পেরিয়ে পা দিতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বীথি। ছাইরঙ

মুখের চেহারা।

—ছোট্দা—শীগগির চল। এখনি একবার যেতে হবে মেডিক্যাল কলেজে।

—মেডিক্যাল কলেজে? কেন?

শীর্ণ ভীত গলায় বীথি বললে, বাবা গিয়েছিলেন বাগবাজারের ভাড়াটের ওখানে। সেখানে খুব চেঁচামেচি করেন—তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ওখান থেকে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সত্যজিতের পায়ের তলায় মাটি দুলতে লাগল।

—কেমন আছেন এখন?

বীথির ঠোঁট কেঁপে উঠল। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, ভালো নয়। দিদি খুব কান্নাকাটি করছে। রঘু বাবার সঙ্গে হাসপাতালেই রয়েছে। চল্ ছোট্দা—

দুটো অসাড় আড়ষ্ট পাকে রাস্তার দিকে এগিয়ে দিলে সত্যজিৎ: চল্—

সাত

বনশ্রীর বাবা জি-কে রায় এখন পেন্‌শনের জীবন যাপন করছেন। তার অর্থ রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে যাওয়া, বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, সম্পূর্ণ অর্থহীন একটা বিদ্বেষে কাচের জানলার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখা: কেমন করে রাত্রির তমসা তরল হয়ে আসছে—ওপারের অবয়বহীন দেবদারু গাছটা একটা আকার নিচ্ছে ধীরে ধীরে। সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া, হাত মুখ ধুয়ে হাফপ্যাণ্ট পরে একটা লাঠি হাতে নিয়ে—লেকের ধারে ঘাসে জুতো ভিজিয়ে ভিজিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানো। তারপর আকাশে সূর্যের রঙ ধরলে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে খানিকটা হাঁপানো। আর মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া: ভাগ্যিস—ভোরে বেড়ানোর এই অভ্যাসটা এখনো রেখেছিলাম, তাই এই বাষট্টি বছরেও শরীরটা ভেঙে পড়েনি।

কিছুক্ষণের জন্য একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় সমস্ত মনটা ভরে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে ইচ্ছে করে—আঃ, ভারী চমৎকার এই ছুটি পাওয়া দিনগুলো—এমনি পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্যেই বুঝি সারা জীবন অপেক্ষা করেছিলেন তিনি।

সামনে লেকের জলে সোনার রোদ পড়ে—নারকেলের পাতা সোনাঝুরি হয়ে কাঁপতে থাকে। জি. কে. রায় সেইদিকে তাকিয়ে বিশ্রামের শান্ত সমাধির মধ্যে তলিয়ে থাকেন। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ধ্যান করছেন তিনি। তারপরেই হয়তো আকস্মিক-ভাবে কোনো সমধর্মীর আবির্ভাব ঘটে সেখানে। আজও তাই হল।

—এই যে—কতক্ষণ?

ড্রেসিং গাউনপরা চুরুটধারী ব্যানার্জী সাহেবের মূর্তি দেখা দিল সামনে। ইনিও

পেন্‌শনভোগী।

—রায় মশাই কখন এলেন ?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—বেড়ালেন ?

—বেশি নয়, দু'পা হেঁটে এলাম।

—আমদের পক্ষে দু'পাই যথেষ্ট। তিন পা ফেলব সেই কেওড়াতলায় যাবার সময়। —বলে চুরুট থেকে একরাশ উগ্র দুর্গন্ধ প্রায় জি-কে রায়ের মুখের ওপরে ছড়িয়ে দিয়েই ধুপ করে পাশে বসে পড়লেন।

আর তখন মনে পড়ল। যে-ভাবনাটাকে সব সময় ভুলে থাকতে চান—সেইটেই হঠাৎ অত্যন্ত বিশ্রী নগ্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হল সামনে। সোনাঝুরি পাতার রঙ বদলে গেছে, লেকের জলে ঝকঝক করছে ধারালো রোদ। সামনের শিশু গাছটায় একপাল কাক চিৎকার জুড়ে দিয়েছে কর্কশ গলায়। জি-কে রায় চকিতের মধ্যে উপলব্ধি করছেন, এই শান্ত ভোরের আলোর ভেতরে ডুবে থাকবার সময় ফুরিয়ে গেছে তাঁর। সামনে একটা দীর্ঘ দিন—দীর্ঘতর রাত। এই দিন রাশি রাশি ভাঙা কাচের মতো বিরক্তি দিয়ে ছড়ানো—মুহূর্তে মুহূর্তে তারা আঘাত করবে, রক্তাক্ত করতে থাকবে। আর চোখের ওপর ঘুমের একটা ক্ষীণ আবরণ নেমে না আসা পর্যন্ত রাত্রিটা দুর্ভাবনার শয্যা-কণ্টকীর মতো সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে চলবে। বাড়িটার বন্ধকী দশা, শোধ করবার যা উপায় নেই সেই দেনার বিভীষিকা, হিতেন, রীতেন—

—কী ভাবছেন রায় মশাই ?—ব্যানার্জি সাহেবের প্রশ্ন।

—কী আর ভাবব ?

ব্যানার্জি শীর্ণ আঙুলের টোকা দিয়ে চুরুট থেকে মোটা খানিক ছাই ঝেড়ে ফেললেন। উদাস ভঙ্গিতে বললেন, তাই বটে। এতদিন তো অনেক ভেবেছেন, দিন কয়েক নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিন।

এ-কথা ব্যানার্জি বলতে পারেন—বলবার জোর তাঁর আছে। তাঁর প্রত্যেকটি ছেলে কৃতী, মেয়েদের তিনি ভালো ঘরে বরে বিয়ে দিয়েছেন। চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন জীবনের বাকী দিনগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। এখন মৃত্যুকেও প্রসন্ন মুখে স্বীকার করে নিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই।

জি-কে রায় বিমর্ষ হাসি হাসলেন, নির্ভাবনায় থাকতে চেষ্টা তো করছিই। কিন্তু জানেনই তো, আমি ঠিক আপনার মতো ভাগ্যবান নই।

ব্যানার্জি সংকুচিত হলেন।

—তা বটে। হিতেন রীতেন—একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, হিতেনের নতুন খবর

আছে কিছু ?

—না। চিঠিপত্র সে আর লেখে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জি-কে রায়ের মনের বিষণ্নতা ব্যানার্জির মনেও ছায়া ফেলতে লাগল। তিন-চারটি ছোট ছোট মাদ্রাজী ছেলেমেয়ে খানিক দূরে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছিল, সেদিকে বিষাদ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দুজনেই। বোধ হয় একটা দুর্বোধ্য ঈর্ষার ছোঁয়া এসে লেগেছিল কোথাও।

—আপনার মেয়েটি কিন্তু ভালো হয়েছে।—ব্যানার্জি সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

—হুঁ।

আবার নীরবতা। আধপোড়া চুরুটটাকে এবার বেয়াড়া তেতো মনে হল ব্যানার্জির। ফেলে দিতে গিয়েও পারলেন না, বেঞ্চের গায়ে তার জলন্ত মুখটাকে ঘষে নিভিয়ে নিয়ে ধরে রাখলেন হাতের মুঠোয়।

প্রসঙ্গ বদলে দিতে চেষ্টা করলেন তারপর।

—এবার ইলেকশনের অবস্থা কেমন বুঝছেন ?

জি-কে রায় একটু নড়ে উঠলেন—নিজের ভেতরে উত্তেজনা সঞ্চার করে নিতে চাইলেন খানিকটা। এই দুশ্চিন্তা আর কটু বিরক্তির ভারটা তিনিও সইতে পারছেন না।

—এ সীটটা কংগ্রেস লুজ করবে।

—যা বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়।—ব্যানার্জি বললেন, আরে মশাই, শুধু কি আর প্ল্যানে কুলোবে ? কয়েকটা প্ল্যাণ্ট্ আর প্রোজেক্টেই বা কতখানি এগোবে—বলুন ? রিফিউজি প্রব্লেম রয়েছে, স্কার্সিটি চারদিকে—লেবার মুভ্মেণ্টও থামছে না। লেফ্ট্-ইউনিটি যদি তেমনভাবে হয়—

—হুঁঃ—লেফ্ট্-ইউনিটি !—জি কে রায় মুখভঙ্গি করলেন : বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি ! নিজেদের ভেতরে সীট্ নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে না কন্টেস্ট্ করবে ? ওদের কথা ছেড়ে দিন। এদের পলিসিও তো খুব খারাপ নয়। আমাদের এখানেও ঠিক জিতে যেত মশাই—তা নয়, বাজে একটা লোককে নমিনেশন দিয়ে বসল। কে চেনে বলুন তো আপনাদের ওই ঘোষ-মল্লিককে ? শিপিং এজেন্টের কাজে দু-পয়সা করে নিয়েছে—বেশ কথা। কিন্তু পিপ্লের জন্মে কী করেছে ? কেন লোকে ওকে ভোট দেবে ?

—যা বলেছেন।—ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন : ঘোষ-মল্লিককে নমিনেশন দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে। মহা ঘুঘু লোক মশাই। মনে নেই সেবারে কর্পোরেশনের ব্যাপারটা ? ওঃ—সে কি মেজাজী কথাবার্তা। তখনই বুঝেছিলুম

লোকটার আর মাথার ঠিক নেই। কর্তাদের নেকনজরে পড়ার পর থেকে—

আলোচনা এগিয়ে চলল। কর্পোরেশন থেকে এগোল ঘোষ-মল্লিকের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে। সেখান থেকে আরো এগিয়ে এ-কালের দুর্মতি ও দুর্নীতি, আই-এ-এস্ পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের ব্যর্থতার মূল কারণ, এখনকার রেলের ফার্স্ট ক্লাস কামরার দুর্গতি, গতবার পুজোর ছুটিতে ব্যানার্জি যখন হরিদ্বার যাচ্ছিলেন তখন পথে বৃষ্টি হয়ে ট্রেনের ছাত দিয়ে ঝাঁঝরির মতো জলপড়া, এবারের অকালবৃষ্টি, তারপর—

তারপর একসঙ্গেই চায়ের তৃষ্ণা। ডেক চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়বার প্রলোভন।

ব্যানার্জি বললেন, চলুন, ওঠা যাক।

জি-কে রায় উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গেই। আলোচনার মধ্য দিয়ে যে তিক্ততাটাকে কাটিয়ে তুলতে চাইছিলেন, সেটা দ্বিগুণ হয়ে মনের ওপর চেপে বসেছে। একটা চাপা আক্রোশ ফুঁসে উঠছে ব্যানার্জির ওপর। অকারণে অনর্থক ধরে তাঁকে বকিয়েছে লোকটা। এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে এতক্ষণ তাঁর চেঁচামেচি করবার দরকার ছিল না। অনেক বেশি ভাববার ছিল—অনেক কথা ভাববার ছিল।

অনেক কথা ভাববার আছে। মনের সেই বোঝাটা নিয়ে জি-কে রায় বাড়ির লনে পা দিতেই একটা হিংস্রতার খানিক উত্তপ্ত বাষ্প ফেটে পড়ল মাথার ভেতরে।

সামনে রীতেন। ভবিষ্যৎ 'গ্লোব-ট্রটার'দের একজন। সশব্দে তার মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে।

ছেলের মূর্তি দেখলেই তাঁর গা-জ্বালা করে। মুখের ওই অদ্ভুত দাড়িটা দেখলেই মনে হয়—ওটা ওর রূপসজ্জা নয়, সারা পৃথিবীর সঙ্গতি আর সৌন্দর্যবোধকে ভেংচি কেটে ঠাট্টা করার আয়োজন। গায়ে জিপ্-লাগানো জ্যাকেট—তার দু'পাশে কোমরের কাছে দুটো এভারব্রাইট্ স্টিলের টুকরো ঝিকমিক করছে। হিপ-পকেটওয়ালা ট্রাউজার আর ডোরা-কাটা মোটা মোটা মোজা দুটো দেখলে একেবারে মার্কিনী ছবির নিখুঁত একটি গ্যাংস্টার বলে সন্দেহ হয়।

মোটর সাইকেলে স্টার্ট এবং মুখটাকে ছুঁচলো করে শিস্ দেওয়া একসঙ্গেই চলছিল রীতেনের। কাল রাত্রে একখানা দুর্ধর্ষ 'হিলিরিয়াস্' ছবি দেখেছে রীতেন—মনের মধ্যে তারই গানের সুর গুনগুন্ করছে। রীতেন যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে শিস্ দিচ্ছিল:

"That lucky guy gave a lift—gave a lift to the blonde lassie—"

তারপরেই ঠিক যখন "Ola-la—" বলতে যাবে, তখনি গেটের সামনে জি-কে রায় এসে দাঁড়ালেন।

—হেলো পপ্!

রীতেন সুর থামিয়ে একগাল হেসে বাপকে অভ্যর্থনা করলে। ঠিক মার্কিনী রীতিতে। জি-কে রায়ের আবার মনে হল, ওই বিশ্রী দাড়িগুলো আর আরো বিশ্রী হাসি দিয়ে রীতেন তাঁকে ভেংচি কাটছে।

জি-কে রায় রুক্ষ গলায় বললেন, চলেছিস কোথায়?

সব বেসুরো হয়ে গেল। রীতেনের তনুমন যখন সমস্বরে বলছিল, সে নিজেই একটি "lucky guy" এবং একটি 'হাইকার' "blonde lassie"কে মিচিগানের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে সাক্ষাৎ ড্যানি কে-র মতো অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে, তখন জি-কে রায়ের সম্ভাষণের ভঙ্গিটা তার অত্যন্ত খারাপ লাগল।

—এনিথিং রং—হে পপ্?

এই আমেরিকান ইংরেজী অত্যন্ত কদর্য মনে হয় জি-কে রায়ের। এমন সুন্দর, ভদ্র, জোরালো ইংরেজি ভাষাটাকেই কুৎসিত আর কুশ্রাব্য করে তুলেছে। একালের অর্ধেক মার্কিন শব্দই তাঁর দুর্বোধ্য ঠেকে—একদা ইংরেজীর এম. এ. জি-কে রায় ভাবেন একদল আউট-ল আর র‍্যাঙ্কম্যানই এখন ওদেশের লেখক হয়ে বসেছে!

জি-কে রায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

—অমন গাড়োয়ানি ইংরেজি বলতে হবে না—তুই বাঙালীর ছেলে!

রীতেন বললে, Golly!

—শাট্ আপ!—জি-কে রায় বললেন, একটা হনুমান হচ্ছিস দিনের পর দিন। কোথায় বেরুচ্ছিস এই সাতসকালে অকর্মার ঢেঁকি কোথাকার?

রীতেন চোখ কপালে তুলে একবার সবিস্ময়ে বললে, My—! তোমার কী হল পপ্? সকালবেলাতেই যে রেগে একেবারে আগুন হয়ে রয়েছ!—মুখের দাড়ির ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, তুমি কি জানো না যে আজ আমার সাইকেল রেস আছে? অ্যাণ্ড আই হোপ টু গেট্ দি লরেল?

—সাইকেল রেস? থামা আছিস—না? কিন্তু এই ফিরিঙ্গি বাবুয়ানি আর বাপের গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে খাওয়া আর বেশিদিন চলবে না বলে দিচ্ছি। যদি রোজগার না করতো পারো, তা হলে এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না তা পরিষ্কার জেনে রাখো। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্?

—ও-কে—ও-কে—অধৈর্যভাবে একবার হাত নাড়ল রীতেন। এসব কথা শুনে শুনে পুরনো হয়ে গেছে—ও আর গায়ে বাজে না। আই নো মাই ওল্ড্ ম্যান—হি'জ্ লাইক দ্যাট্!—মোটর সাইকেল স্টার্ট নিলে, তারপর জি-কে রায়ের মুখের ওপর একরাশ দুর্গন্ধ নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

জি-কে রায় বাংলা মতে সগর্জনে বললেন, হতচ্ছাড়া ধর্মের ষাঁড় কোথাকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জি-কে রায় ভাবতে লাগলেন, সত্যিই তো—কি দোষ রীতেনের ? দিনের পর দিন তিনিই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন—যা খুশি করে বেড়িয়েছে, কখনো বাধা দেননি। বাঙালীর কাছে ইংরেজি শিখতে পারবে না ভেবে কালিম্পঙের একটা স্কুলে রেখে পড়িয়েছেন, তখন একথা ভাবেননি—চোখের বাইরে রেখে এবং প্রচুর টাকা হাত-খরচ দিয়ে ও ভাবে পড়ালে ছেলে অন্য রকম ইংরেজিও শিখতে পারে। তাঁর সিগারেটের টিন থেকে রীতেন যখন তার মার্কিনী ইংরেজিতে নিয়মিত 'বাট্‌স্' সরিয়েছে, তখন দেখেও দেখেননি জি-কে রায়। মোটর সাইকেল কেনবার টাকাও তিনিই দিয়েছিলেন।

বসবার ঘরে ঢুকে সোফার ওপর নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন জি-কে রায়। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এখন। এই বাড়ি করিয়েছিলেন অনেক সখ করে—আজ দুটো মর্টগেজ পড়েছে। ছাড়াবার কোনো আশাই নেই। পেন্‌শনের টাকার অর্ধেক আজকাল যায় দেনা শোধ করতে। শুধু বনশ্রী শ' দুই টাকা মাইনে পায় বলে কোনোমতে চলছে। না হলে—

পেন্‌শন নেবার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবীর চেহারাটা এমন করে বদলে যাবে—একথা কি কখনো কল্পনাও করেছিলেন জি-কে রায়। নিজেকে তাঁর হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয় এখন। কিছুদিন আগেও আকাশ আলো করে জ্বলছিলেন, মুঠো মুঠো ছাইয়ের মতো ঝরে পড়ছেন এখন।

বনশ্রী এল।

—বাবা, চা—

—তুই কেন ? অযোধ্যা কোথায় ?

চা-রুটি টেবিলে রেখে বনশ্রী বললে, অযোধ্যা বাজারে গেছে।

—আবার অযোধ্যা কেন ? আমিও একবার ঘুরে আসতাম।

—রোজ রোজ তুমি আর কেন যাবে বাজারের গণ্ডগোলের মধ্যে ? একটু বিশ্রাম নাও।

বিশ্রাম ! সবাই-ই ওকথা বলে জি-কে রায়কে—সবাই বলে, এখন আপনার বিশ্রাম নেওয়া দরকার। তাই বটে। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে নিতে জি-কে রায় ভাবলেন : ওটা শুধু ভদ্রতা করে জানিয়ে দেওয়া, সংসারে তাঁকে দিয়ে আর কারো কোনো প্রয়োজন নেই—তিনি ফুরিয়ে গেলেন।

বাজার তিনি বরাবর নিজের হাতেই করেছেন। ওটা তাঁর বিলাস ছিল। তখন অফিসের আর্দালী যেত সঙ্গে সঙ্গে (আজ অবশ্য পুরনো অফিসে ফিরে গেলে সে আর্দালী তাঁকে দেখে টুল ছেড়ে দাঁড়াবে কিনা সন্দেহ)। বনশ্রী জানে, বাজারে যেতে তাঁর কষ্ট

হয় না, আজও তা ভালো লাগে। তবু সে অযোধ্যাকেই পাঠায়। কেন পাঠায়? জি-কে রায় বাজারে গেলে যে খরচ করে আসবেন, সে খরচের সামর্থ্য এ পরিবারের আর নেই। বনশ্রীকে অনেক সাবধানে সংসার চালাতে হয়।

শুধু যা কিছু অপব্যয় রীতেনের জন্যে। ওইখানেই বনশ্রীর মুঠো একটু শিথিল। সবচেয়ে ছোট ভাই। হিতেনকে হারানোর পর একটা যুক্তিহীন ভয়ে রীতেনকে আগলে রেখেছে বনশ্রী। সে জানে, হিতেনকে হারিয়ে বুকের ভেতর একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন জি-কে রায়। রীতেন চলে গেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

জি-কে রায় গালাগালি করতে যাচ্ছিলেন রীতেনকে। বনশ্রীর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন।

—কী হয়েছে তোর? চোখ অমন কেন?

—রাতে ভালো ঘুম হয়নি বাবা।

চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামিয়ে জি-কে রায় বললেন, তার মানে রাত জেগে আবার ওই সব নোট বই লিখেছিস? বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করলে তোর ঘুম হয় না—তবুও কেন করিস ও-সব?

কেন করতে হয়, সে-কথার জবাব বনশ্রী দিল না। জি-কে রায় নিজেও জানেন। কিন্তু যে-জ্বালা থেকে বনশ্রী বাবাকে বাজারে যেতে দেয় না, সেই একই যন্ত্রণায় তাকে রাত জেগে ফর্মার পর ফর্মা নোট লিখতে হয়। জানাশুনো ছলনার আড়াল ভেদ করেও মধ্যে মধ্যে সে যন্ত্রণাটা ফুটে বেরিয়ে আসে।

বনশ্রী জবাব দিল না। জানালা দিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। ট্রামের তারে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি দুলছে। তার ওপারে তেতলার বাড়িটার মাথায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে—আজ বিয়ে আছে ওখানে। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল বনশ্রী। দিনগুলো একটার পর একটা শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ছে। কালকের বনশ্রী আজ আর একদিনের পুরনো হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল আরো খানিকটা।

কাল রাতে নোট লিখতে বসেছিল বনশ্রী। বেশিদূর লিখতে পারেনি। খালি মনে পড়েছে সত্যজিৎকে। সামনের বাড়িটায় শানাইয়ের সুর উঠেছিল। অকারণে চোখে জল আসছিল তার।

আজও চোখে তারই রেশ জড়িয়ে আছে। অনিদ্রার নয়—কান্নার।

সামিয়ানাটা থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে বনশ্রী।

আর তখন অযোধ্যা এল বাজার থেকে। বাজারের ঝুড়ি নিচে নামিয়ে ওপরে এসে খবর দিলে, হীরেনবাবু দেখা করতে এসেছেন।

হীরেন! রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে এল: 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।'

আট

ডাক্তারেরা বললেন, ফার্স্ট স্ট্রোক। কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে এর পর থেকে।

আরক্তিম চোখ দুটোকে আরো রক্তাভ করে শিবশঙ্কর কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এখনো চৈতন্যের স্বাভাবিক সীমায় উত্তীর্ণ হননি। আশ-পাশের সমস্ত মুখ-গুলো তখনো ছায়া-ছায়া ঠেকছে তাঁর কাছে।

প্রীতি ডাকল, বাবা ?

আস্তে পাশ ফিরে শিবশঙ্কর বললেন, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।

সেই ভালো। আজ ওঁকে বিরক্ত করে দরকার নেই।

সত্যজিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাসপাতাল। বাতাসে অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। নার্সদের সতর্ক চলাফেরা—ডাক্তারের ভারী জুতোর শব্দ। অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি থেকে নামিয়ে একজনকে স্ট্রেচারে করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রুগ্ন কালো একখানা হাত ঝুলে পড়েছে স্ট্রেচার থেকে—দুলতে দুলতে চলেছে সেটা। সামনের পথ দিয়ে একজন জমাদার একটা বালতি নিয়ে চলেছে—সেদিকে চোখ পড়তেই সত্যজিৎ চমকে উঠল। বাল্‌তি-ভরা লাল রঙের কী ও ? রক্ত ? অত রক্ত ?

একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সত্যজিৎ। হাসপাতাল। সমস্ত জীবনটাই হাসপাতাল। প্রত্যেকেই বিকৃত ব্যাধির শিকার। ইন্দ্রজিৎ—শিবশঙ্কর—প্রীতি—বনশ্রী—সে নিজেও। মৃত্যু আর ওষুধের গন্ধভরা একটা প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা হলঘরে পাশাপাশি খাটে তারা প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যেকের চোখের তারা স্থির হয়ে আছে ওই হলঘরের একধারে একটা কালো দরজার দিকে। সেই দরজার ওপাশে মর্গ। সেখানে আরো গভীর ছায়া—আরো কঠিন শীতলতার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে তারা। তারা প্রত্যেকেই।

সত্যজিৎ শিউরে উঠল একবার। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে বাজল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। 'ওগো মরণ হে মোর মরণ।' না—তা নয়। জীবনানন্দ দাশের 'লাশকাটা ঘর।'

প্রাণবন্ত এক ঝলক উচ্ছ্বসিত হাসি। খানিকটা উত্তপ্ত আলো যেন তীরের মতো এসে বিদ্ধ করল লাশকাটা ঘরের মৃত্যুশীতল অন্ধকারকে। দুটি নার্স। তাদের একজন খুশির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মেয়েটির বয়েসে অল্প মুখখানি সুন্দর, হাসিটি আরো সুন্দর।

সত্যজিতের পূরবীকে মনে পড়ল।

আর পূরবীর মনে পড়ল 'দি ইনভিটেশন'। সত্যজিৎ পড়াচ্ছিল।

"Away, away from men and towns,
To the wild wood and the downs—
To the silent wilderness—"

Silent wilderness! কোথায় সে? গলির ভেতরে এই দোতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে ভাড়াটে। সামনেই বারান্দায় পাশের ঘরে দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মুড়ির বাটি সামনে নিয়ে সমানে চিৎকার করছে—কলতলায় ঝনঝন করে বাসন আছড়াতে তাদের মা গর্জন করছে: খা—খা—এবারে আমাকে খা। চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন পুলিস কোর্টের মোক্তার খগেনবাবু। দোতলার বারান্দা থেকে রগচটা ভদ্রমহিলা সমানে গাল দিচ্ছেন কয়লাওলাকে—কয়লা দেয়নি, কতগুলো পাথর দিয়ে গেছে। যার গলায় কোনোদিন গান নেই, তেমনি একটি মেয়ে তীক্ষ্ণস্বরের হার্মোনিয়াম বাজিয়ে এই সকালে দরবারী কানাড়া অভ্যাস করছে।

Silent wilderness। বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল পূরবী। কোথাও সে নেই—তবু পূরবী তাকে অনুভব করে। মনে পড়ে যায়—ক্লাসে পড়াচ্ছে সত্যজিৎ। সমস্ত ক্লাস ঘরটা এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। মাথার ওপর পাখা ঘোরার শব্দ নেই—তার দু-পাশে বসে দ্রুত হাতে কেউ নোট নিচ্ছে না, পড়াতে পড়াতে বাঁ-হাতের রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলছে না সত্যজিৎ। শুধু নীল সমুদ্রের ধারে থরে থরে লাল বালিয়াড়ী দাঁড়িয়ে আছে—শীতের বর্ষণে ভরে ওঠা ছোট ছোট জলাধারের মধ্যে সবুজ পাতার ছায়া দুলছে, ভায়োলেটের বর্ণলীলায় দিক হারিয়েছে অরণ্য, আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে একটানা একটা সুরের মতো সত্যজিতের গলা ভেসে আসছে: "Away, away from men and towns—"

সত্যজিৎকে সে ভালোবাসে।

বাবা ওদের চিনতেন অনেক দিন থেকে। তখন বাবার ব্যবসার অবস্থা ভালো ছিল, শেয়ার মার্কেটে বড়লোক হতে গিয়ে তখনো তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যাননি। শিবশঙ্কর মুখুজ্জের সঙ্গে তখন থেকে তাঁর পরিচয়। তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেমেয়েদের তখন থেকেই তিনি জানতেন।

তার পরে অনেক জল গড়িয়ে গেল। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটিয়ে সেই লোকসানের ফলে বাবা ব্যবসা নষ্ট করে ফেললেন। প্রায় পথে দাঁড়াতে হল। মুখুজ্জে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গেল কেটে। ব্রোকারির কয়েকটা কাঠকুটো আশ্রয় করে সেই থেকে আজও বাঁচবার চেষ্টা করেছেন বাবা—বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন তাদের সবাইকে। এরই মধ্যে স্কুল ফাইন্যাল পাস করে বসল পূরবী। ফার্স্ট ডিভিশনে।

মা বললেন, মেয়েটাকে কলেজে পড়ালে হয় না ?

দাদা অনেক কষ্টে সেবার বড় একটা জুতোর দোকানের সেল্‌সম্যান হয়েছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, থাক, অত সখে আর কাজ নেই। আমরা মুখে রক্ত তুলে টাকা আনব, আর উনি বিনুনি দুলিয়ে কলেজে যাবেন। কর্পোরেশনের স্কুলে একটু চেষ্টা করে দেখুক না—ওরা তো প্রায়ই মাস্টারনী নেয়।

পূরবী কেঁদে ফেলেছিল।

বাবা দাদাকে ধমক দিয়ে বললেন, যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন অন্তত তোমায় মুরুব্বিয়ানা করতে হবে না। আমি মরবার পরে যা খুশি কোরো। ও কলেজে পড়বে কি পড়বে না সে আমি বুঝব—তুমি নও।

দাদা গজগজ করতে করতে বললে, তা হলে আমাকে কেন কলেজে ভর্তি না করে লোকের পায়ে জুতো পরানোর চাকুরীতে ভর্তি করে দিলে।

বাবা বললেন, লজ্জা করে না ? দু'বার ফেল করে থার্ড ডিভিশনে পাস করেছিলি তুই। কলেজে ভর্তি হলে বছর বছর তোমার ফেলের খরচ জোগাত কে ?

দুম দুম করে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার পূরবীর দিকে, তাকে বাবা কটুকণ্ঠে আর একটা ধমক দিয়ে উঠলেন।

—পনেরো-ষোলো বছরের ধাড়ী মেয়ে—ভ্যান ভ্যান করে কাঁদতে বসেছিস আবার ? যা—এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আয়। আমি দেখছি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

সেই দিনই খোঁজ করলেন বাবা। সোজা চলে গেলেন সত্যজিতের কলেজে। কলেজ ছুটি হওয়া পর্যন্ত বসে থেকে বিকেল পাঁচটায় ধরে নিয়ে এলেন সত্যজিৎকে। বাড়িতে পা দিয়ে বিজয়গর্বে ঘোষণা করলেন, এই ঢাখো, কাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।

মা একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে কলতলায় বাসন মাজছিলেন। দাদা হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল : বুঝলে—সেল্‌স্‌ম্যানের কাজ অত সহজ নয়। সব সময়ে মুখে হাসিটি বজায় রাখা চাই, আর মেজাজ একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। একটু বিরক্তি ধরেছে কি —হয়ে গেল! ধর—মেয়েরা কেউ জুতো কিনতে এসেছে। কুড়ি জোড়া নামিয়ে সাজিয়ে দিলাম, কিছুতেই আর পছন্দ হয় না! 'এটার স্ট্র্যাপ ভালো—কিন্তু হিলটা একটু ছোট মনে হচ্ছে।' 'এটার হিল ঠিক আছে, কিন্তু চামড়াটা'—, উঃ মেয়েদের জুতো বিক্রী করার চাইতে কুকুরের ল্যাজ সোজা করতে যাওয়াও ভালো। খুন চেপে যায়—বুঝলে ? বলতে ইচ্ছে করে—দোহাই ঠাকরুণ, মুচিকে ফরমাস দাও—আমাদের আর জ্বালিয়ো না। কিন্তু সেল্‌স্‌ম্যানের কাজে, মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে—

ঠিক এই সময় সত্যজিৎকে সঙ্গে নিয়ে বাবা নাটকীয় ভাবে বাড়িতে এসে ঢুকলেন। দাদার বক্তৃতা মাঝপথে থেমে গেল। মা ছেঁড়া শাড়ি সামলাতে পথ পান না।

—আরে আরে, লজ্জা কী ? এ আমাদের শিবশঙ্কর মুখুজ্জের ছোট ছেলে—সতু। আমি যখন দেখেছি তখন স্কুলে পড়ত। আজ না হয় একটা ভারভাত্তিক প্রফেসারই হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে এখনো ও সতুই আছে—হা-হা-হা !……

…পূরবী বইয়ের দিকে তাকালো। 'দি ইনভিটেশন'। 'Away, away from'—

একটা কথাও সে ভোলেনি সেদিনকার—সব স্পষ্ট মনে আছে। দাদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গলির মোড়ের দোকান থেকে সিঙাড়া আর রসগোল্লা আনতে গেল। মা চায়ের জল চাপালেন উনুনে কাঠ দিয়ে। তারই ধোঁয়ায় ভরা ছোট ঘরটার ভেতরে ময়লা চেয়ারে একটানা ঘামতে লাগল সত্যজিৎ—ফর্সা মুখের ওপর দিয়ে ঘামের বিন্দু গড়িয়ে নামতে লাগল।

বাবা বললেন, পাখা নেই—তাই কষ্ট হচ্ছে। যা তো টুনু—একখানা হাতপাখা নিয়ে এসে ওকে বাতাস কর।

টুনু পূরবীর ডাক নাম।

সত্যজিৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, পাখার দরকার নেই, আমি বেশ আছি।

পূরবী তবু বেরিয়ে যাচ্ছিল। সত্যজিৎ আবার ডাক দিয়ে বললে, দেখুন—আপনাকে পাখা আনতে হবে না—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

পূরবী দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবা বললেন, ওকে আবার আপনি কেন ? তোমার চাইতে ও যে সাত-আট বছরের ছোট। ওর জন্যই তো তোমাকে ডেকে নিয়ে এলাম।

সত্যজিৎ সমস্ত মুখে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমি কী করতে পারি বলুন।

—ও এবার ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল-ফাইন্যাল পাস করেছে বৌবাজার গার্লস স্কুল থেকে।

—বাঃ, ভারী খুশি হলাম।—সত্যজিতের উজ্জ্বল চোখ একবার পূরবীর মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাঙা মুখে দাঁড়িয়ে রইল পূরবী।

—ওকে কলেজে পড়াতে চাই।

—পড়ানোই তো উচিত।

—কিন্তু—একটা বিড়ি ধরিয়ে বাবা সতর্ক ভঙ্গিতে সত্যজিতের দিকে তাকালেন : কিন্তু আমার অবস্থা তো এখন দেখতেই পাচ্ছ। আগেকার সে সব দিন তো আর নেই যে—একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, সে কথা থাক। এখন তুমি যদি একটু সাহায্য করো তা হলে মেয়েটার পড়া হয়।

—বলুন।

—তোমাদের কলেজে ভর্তি করা যায় না ?

—বেশ তো, দিন ভর্তি করে।—ঘরের মধ্যে কাঠের ধোঁয়া আসছিল, সত্যজিতের অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছিল পূরবীর। মনে হচ্ছিল, এ কথাগুলো বলবার জন্যে এই বাড়িতে ওকে টেনে এনে বাবা এমনভাবে কষ্ট না দিলেও পারতেন।

—ভর্তি করলেই তো হয় না বাবা। মাইনের ব্যাপারে—

সত্যজিৎ মৃদু হাসল: বুঝেছি। সেজন্য ভাববেন না। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে—এমনিতেই একটা ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া একটা স্টাইপেণ্ডের চেষ্টাও করে দেখতে পারি।

পূরবীর চোখে জল এল।

সত্যজিৎ আবার বললে, আর্টস্ পড়বে তো?

—হাঁ—হাঁ, আর্টস্ পড়বে বইকি। জানো, সংস্কৃতে একটা লেটার ও পাবে। তা ছাড়া ইংরেজি, বাংলা—সবেতেই—

একগলা ঘোমটা টেনে মা চা আর খাবার নিয়ে এলেন।

—আরে ওর সামনে অত লজ্জা কিসের? ও তো ঘরের ছেলে। অত বড় ঘোমটা দিয়েছ কাকে দেখে?

সত্যজিৎ বললে, তা বটে। আমার সামনে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু এত কেন? খেতে পারব না।

মা ফিসফিস করে বললেন, এত কোথায়? দুটো মিষ্টি আর দুটো সিঙাড়া দিয়েছি কেবল।

বাবা বললেন, হাঁ, হাঁ—খেয়ে নাও। কলেজ থেকে টেনে আনলাম—বাড়িতে গিয়ে তো নিশ্চয়ই খেতে।

—তা হোক—এত চলবে না।—চামচে করে একটা রসগোল্লা তুলে পূরবীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সত্যজিৎ বললে, তুমি নাও একটা।

—না—না—পূরবী ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে!...

'Away away form men and towns'—

সেই আরম্ভ। তারপর কেমন করে পরিচয় হয়েছে—কেমন করে দিনের পর দিন এ বাড়িতে এসেছে সত্যজিৎ, শান্ত গভীর চোখ তুলে পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যে দেখেছে অনেকক্ষণ ধরে—সে সব এখন আর ভালো করে ভাবতেও পারে না। সব যেন একমুঠো আলো—একরাশ রঙের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

শুধু একটা কথা মনে হয় বার বার। কাছের মানুষ সত্যজিৎ ক্লাস রুমে এত দূরে সরে যায় কী করে? কেন মনে হয়—পড়াতে পড়াতে সত্যজিৎ এমন একটা জায়গায় চলে গেছে—যেখানে সে তাকে ভালো করে দেখতেও পায় না? বহু দূরের একটা পাহাড়ের

চুড়ো থেকে অশরীরী কণ্ঠস্বরের মতো তার গলা ভেসে আসে : 'To the wild wood and the downs—'

কে এই সত্যজিৎ ? এই অদৃশ্য মূর্তি—এই সুরের তরঙ্গ ? পাহাড়ের ওই উঁচু চুড়োটার উপরে কোনোদিন কি পৌঁছুতে পারে পূরবী—ওই আলোকিত সুর-তরঙ্গকে কোনোদিন কি সে ধরতে পারে মুঠোর মধ্যে ?

পূরবী চমকে উঠল। পাশের ঘরে বচসা শুরু হয়েছে।

দাদা তীব্র গলায় বললে, স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছি—হাঙ্গার স্ট্রাইক করব।

—মারা যাবি—মারা যাবি হারামজাদা।—থন্‌থনে গলায় বাবা বললেন, পিঁপড়ের পাখা উঠেছে—মরবার জন্যে—না ?

—মরি তো মরব। তাই বলে এই অন্যায় জুলুম কিছুতেই সইব না।

—চোপরাও শুয়োর।—বাবার হুঙ্কারটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল।

বুকের ভেতরে ধ্বক্ করে উঠল পূরবীর। একটা লোহার হাতুড়ির মতো কিসের কঠিন আঘাতে "Silent wilderness" চারদিকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে

নয়

ইন্দ্রজিৎ দরজার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ভিলোঁর কবিতা পড়ছিল। বারান্দা দিয়ে চলে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ালো সত্যজিৎ। আর তখনই বই বন্ধ করে ইন্দ্রজিৎ ডাকল : সতু ?

—কী বলছিলে ?

—বুড়োটা কেমন আছে আজ ?

—অনেক ভালো।

—অনেক ভালো!—দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো খানিকটা হিসহিসিয়ে উঠল ইন্দ্রজিৎ : মরল না ? কিছুতেই মরল না ? আর প্রীতি ? সেটাও বেঁচে আছে ? গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েনি এখনো ?

—কী পাগলামি হচ্ছে দাদা।

—পাগলামি!—ইন্দ্রজিৎ করকর করে দাঁত ঘষল : ইংল্যাণ্ডের সেই লোকটা—হেগ্, না কী নাম—তার কথা তোর মনে আছে ? সেই যে মানুষ খুন করে করে রক্ত খেত, মনে আছে তাকে ?

—না।—সত্যজিৎ চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

পেছন থেকে আবার সচিৎকার আবৃত্তি শোনা গেল ইন্দ্রজিতের। এবার ভিলোঁ

নয়—বোদ্‌লেয়ার।

"Un cadavre Sans te'te e'panche,
comme un fleuve,
Sur l'oreiller de'salte're',
Un sang ruge et vivant, dont la
toile s'abreuve
Avec l'adivite' d'un pre'—"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল—শক্ত হয়ে গেল স্নায়ুগুলো। ফরাসী সে জানে না—কিন্তু ওই লাইনগুলোর অর্থ তার জানা—ইন্দ্রজিৎ তাকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছে এর আগে। একটি ছিন্নমুণ্ড নারীর শব পড়ে আছে বিছানার ওপর—তার টকটকে তাজা লাল রক্ত বিছানাটা শুষে নিচ্ছে তৃষ্ণার্ত মাটির মতো। "Une Martyre"—

কী অদ্ভুত—কী বীভৎস একটা মন নিজের মধ্যে বয়ে চলেছে ইন্দ্রজিৎ। থেকে থেকে সত্যজিৎ ভাবে ও যেন এই মুখার্জি ভিলারই গুহানিহিত সত্তা—এই বাড়ির, এই পরিবারের মূল তত্ত্ব। অথবা এই সত্যের বাকী আধখানা আছে শিবশঙ্করের শোবার ঘরের সেই বড় ছবিটায়—পারতপক্ষে ওরা কেউ সেটার দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। রক্ত আর কাম। শুধু এই বাড়িই বা কেন? এই হল আদিম তত্ত্ব—প্রথম মানুষের প্রথম দর্শন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবরণটা সরে গেল, সামাজিকতার নীতি-নিয়মের বাঁধনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করবার মতো ইচ্ছাশক্তি না থাকলে—ওই আদিম তত্ত্বটাই আত্মপ্রকাশ করে বার বার। ইন্দ্রজিতের খ্যাপামিতে—শিবশঙ্করের বিকারে।

মনে আছে, রাঁচীর পাগলা গারদ দেখতে গিয়ে তার এক সঙ্গী একটা মন্তব্য করেছিল। বলেছিল, পাগলকে দেখলেই মানুষের আসল উপাদানগুলোকে চেনা যায়। যতক্ষণ স্যানিটি আছে, ততক্ষণ সেটার পেছনে খাঁটি মানুষটা থাকে লুকিয়ে। সেটা যেই সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখতে পেলে কত কিলোগ্রাম ব্রুটালিটি আর কতখানি মনুষ্যত্ব। অথবা ইন্‌স্যানিটি হল একটা কেমিক্যাল প্রসেস—যার সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ হিউম্যান কম্পাউণ্ড থেকে তুমি এলিমেন্টগুলোকে আলাদা করে নিতে পারো।

শিবশঙ্কর ইন্দ্রজিৎ হয়তো সত্যজিৎ নিজেও খানিকটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে পড়ে সত্যজিৎ ভাবতে লাগল, আজকে চারদিকেই যেন যৌগিক থেকে মৌলিক উপকরণগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যে নীতি, যে ধর্ম, যে সমস্ত প্রাথমিক সমাজবোধ এই যৌগিকতা সৃষ্টি করেছিল—আজকের আকাশে বাতাসে নিষ্ঠুর আণবশক্তির বিচ্ছুরণে সেগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর বেশিদিন বাকী নেই। এর পরে আবার মানুষ তার মূল উপাদানগুলোর মধ্যেই ফিরে যাবে—তার নির্বাধা নগ্নলোকে, তার

নিঃসংকোচ লালসায়, তার নির্লজ্জ রক্তপাতে।

চলতি বাসের ঝাঁকানিতে চমকে উঠল সত্যজিৎ। কী ভাবছে সে এ সমস্ত। নিছক মেণ্টাল এনার্কি। ওপাশের সীটেই তো তরুণ দম্পতি বসে আছে একটি। মেয়েটি থেকে থেকে হাসিতে কলধ্বনিত হয়ে উঠছে। সুন্দরী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে চলবার প্রসন্ন গৌরবে ছেলেটি তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। বীথি থাকলে বলত: লাইফ্‌ ইজ্‌ ফর্‌ লিভিং—ছোড়দা।

বীথির আশা আছে, স্বপ্ন আছে, বিশ্বাস আছে। শুধু সত্যজিৎই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে নাকি নৈরাশ্যের মধ্যে? শিবশঙ্কর আর ইন্দ্রজিতের শৃঙ্খল কি প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যেও?

একটা চুরুট ধরাতে পারলে হত। কিন্তু হালের আইনে ট্রাম বাস যাত্রীর ওই নিরীহ আরামটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। এলাচ বা লবঙ্গের আশায় সত্যজিৎ পকেটে হাত পুরল—যদিও থাকবার কোনো কথা ছিল না, তবু অসম্ভব আশায় একবার খুঁজে দেখল। এলাচ লবঙ্গ মিলল না—চামড়ার সিগার কেসটাই হাতে ঠেকল। আর একটুকরো ভাঁজকরা কাগজ।

কাগজটা খুলে সত্যজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করল। অধ্যাপক সমিতির মীটিঙের একটা নোটিশ।

কলেজের গেটের সামনে পৌঁছেই সে থমকে দাঁড়ালো।

চারিদিকে ছাত্রীদের ভিড়, চিৎকার, গণ্ডগোল। গেট আটকে দাঁড়িয়ে আট-দশটি মেয়ে। ধর্মঘট।

কিসের ধর্মঘট?

উত্তর পাওয়া গেল সামনের দেওয়ালের কয়েকটা পোস্টারে।

"শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে—"

শিক্ষক আন্দোলন! তা বটে। এই তিনদিন শিবশঙ্করকে নিয়ে টানা-পোড়েনের মধ্যে সে কথা তার মনেই ছিল না। রাজভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ করেছেন বাংলার শিক্ষকেরা। ন্যায্য বেতন আর ভাতার দাবিতে। আত্মতৃপ্ত 'বুনো রামনাথ-দের'ও এবার সাধন-নিষ্ঠা টলে উঠেছে। এখন আর তেঁতুল পাতার ঝোল পাওয়াও সম্ভব নয়—হয়তো বাজারে তেঁতুলপাতা পাঁচসিকে সেরে বিক্রী হয়!

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে সুরেলা তীক্ষ্ণ গলায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

"আজ ভেবে দেখুন তাঁদের কথা যাঁরা চিরদিন বঞ্চনা আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেও দেশের বুকের ভেতরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন। আর ভেবে দেখুন—যাঁদের হাতে জাতি গঠনের দায়িত্ব—আমরা তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য কতখানি পালন করতে

পেয়েছি। যাঁরা চিরদিন ধরে শান্ত প্রসন্নমুখে সমস্ত অন্যায়-অবিচারকে মেনে এসেছেন, কোনো দিন কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেননি, কতখানি অসহ্য হলে তাঁরা—"

বীথি বক্তৃতা করছে। সত্যজিতের ওপর তার চোখ পড়ল একবার, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলো না। তার চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে ছড়িয়ে আছে; কপালের ওপর এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে—যেন কোনো নতুন আকাশের আলো এসে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে তাকে।

"শুধু কলকাতা নয়—বাংলার দূর দূর গ্রামান্ত থেকে তাঁরা এসেছেন। আশী বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত আছেন তাঁদের মধ্যে। এই জ্ঞানতপস্বী আচার্যের দল আজ যে প্রকাশ্যে পথের ওপর খররৌদ্রে বসে নিজেদের দাবী আদায় করতে চেষ্টা করছেন, এ লজ্জা—এত বড় গ্লানি আমরা কোথায় রাখব?"

চমৎকার বলতে শিখেছে বীথি। কতদিনে আয়ত্ত করেছে ক্ষমতাটা? সত্যজিতের আশ্চর্য লাগল। বীথির যে চোখ দুটো তার ছায়া ছায়া মনে হত এতদিন—সে চোখ কবে থেকে এমন করে জ্বলতে আরম্ভ করল?

ছাত্রদের পাশ কাটিয়ে সত্যজিৎ দোতলার স্টাফ রুমে উঠে গেল। যারা পথ আটকে রেখেছিল, মৃদু হেসে রাস্তা ছেড়ে দিলে তারা। ছাত্র ধর্মঘটে অধ্যাপকদের বাধা দেওয়া হয় না।

সত্যজিৎ স্টাফ রুমে এসে ঢুকল।

অধ্যাপকদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হয়ে গেছে।

—শিক্ষকদের আন্দোলনে কলেজের ছেলেমেয়েদের মাথাব্যথা কেন?

—শিক্ষক আন্দোলন বুঝি দেশের সমস্যার চাইতে আলাদা? তাদের সম্পর্কে বুঝি আমাদের কোনো কর্তব্যই নেই?

—আমার তো মনে হয়, আমাদেরও একদিন সিমপ্যাথেটিক স্ট্রাইক্ করা উচিত।

—ভালো, ভালো!—একজন বিকৃত মুখে বললেন, শুধু স্ট্রাইক কেন? আপনারাও ঝাণ্ডা নিয়ে লেবারদের মতো পথে পথে শ্লোগান দিতে বেরিয়ে পড়ুন না! খুব স্যাংটিটি থাকবে আপনাদের!

—স্যাংটিটি!—উত্তেজিত হয়ে আর একজন টেবিলে একটা কিল বসালেন, একটা দোয়াত থেকে খানিক কালি ছিটকে পড়ল, কয়েকটা খড়ির টুকরো গড়িয়ে পড়ল নীচে: স্যাংটিটি। লেবারারের সঙ্গে আপনার তফাত কিসে মশাই? তিন শিফ্‌টে এই যে ধোপার গাধার মতো খাটেন আর নমিনাল্ অ্যালাউয়েন্স পান—সাধারণ শ্রমিকের চাইতে আপনি কিসে আলাদা? সম্পত্তির মধ্যে ডিগ্রির ভ্যানিটি, পেটি বুর্জোয়া আত্মবিলাস—

ঠং ঠং করে প্রবল শব্দে ঘণ্টা বাজল। কথার বাকী অংশটা সত্যজিৎ শুনতে পেলো না।

প্রিন্সিপ্যাল এসে ঘরে ঢুকলেন। উত্তেজিত হয়েই এসেছেন।

—এভাবে চেঁচামেচি করবার কি মানে হয়? এটা কলেজের প্রফেসারস্ রুম, না মেছোহাটা?

উত্তেজনাটা থমকে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিনীত বিগলিতভাবে হাসলেন স্যাংটিটির প্রবক্তা অধ্যাপকটি।

—আমরা আজকের স্ট্রাইকটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল্ বললেন, এটা রাজনীতি আলোচনা করবার জায়গা নয়।

একজন অল্পবয়েসী অধ্যাপকের তীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা গেল: স্টাফ রুমে আমরা কী আলোচনা করব বা করব না—আশা করি, য়ুনিভার্সিটি সে-সম্বন্ধে কোনো স্পেশ্যাল্ রেগুলেশস্ তৈরী করে দেয়নি।

প্রিন্সিপ্যাল্ ভ্রুকুটি করলেন।

—তা দেয়নি। তবে আন্‌রিট্‌ন ল আছে একটা।

তরুণ অধ্যাপকের ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল: যদি তা থাকে, তা হলে আপনিই সেটাকে ভুল ইণ্টারপ্রিট করছেন। য়ুনিভার্সিটি কোনো ডেমোক্রেটিক অধিকারে বাধা দেয় না।

প্রিন্সিপ্যালের কালো মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

—বেশ, আপনাদের ডেমোক্রেটিক রাইটের চর্চা আপনারা করুন। তবে অত চ্যাঁচাবেন না দয়া করে। আর তা ছাড়া ঘণ্টা পড়ে গেছে—আপনারা রেজিস্টার নিয়ে ক্লাসে যান।

যিনি বিগলিত বিনীত হাসি হেসেছিলেন, তিনি বললেন, ক্লাসে তো কেউ নেই স্যার —শুধু গিয়ে—

কড়া গলায় প্রিন্সিপ্যাল্ বললেন, তবু যেতে হবে। একটি স্টুডেণ্ট থাকলেও পড়াবেন। যদি কেউ না থাকে, তবে প্রত্যেককে অ্যাবসেণ্ট মার্ক করে চলে আসবেন।

প্রিন্সিপ্যাল্ জুতোর শব্দ করে বেরিয়ে গেলেন।

—কেন ওঁকে চটিয়ে দিলেন প্রফেসার সেন?

—সত্যি কথাই বলেছি।—তরুণ অধ্যাপকটি সামনে থেকে খাতা তুলে নিলেন: উনি নিজের জুরিস্‌ডিকশন মেনে চললেই আমাদের এ-সব অপ্রিয় কথা বলবার দরকার হয় না।

—হাজার হোক, বয়েসে বড়—

—যিনি বয়েসে বড়, তাঁরও এ-কথা মনে রাখা উচিত যে ছোটদেরও আত্মসম্মান আছে।

—থামুন মশাই—থামুন।—সংস্কৃতের শান্তিবাদী অধ্যাপক 'রঘুবংশে'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, মিথ্যে চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট করে কী লাভ? ক্লাসে চলুন।

—তাই চলুন। যত সমস্ত ফার্স—একজন পা বাড়ালেন।

—সেই ফার্সে আপনারা ক্লাউন—আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

রেজিস্টার নিয়ে বেরুলেন সকলেই। আইন।

বাংলার নতুন নার্ভাস অধ্যাপক পাশাপাশি চললেন।

—আপনার কত নম্বর রুম প্রফেসার ঘুখার্জি?

—বারো।

—আমার দশ।—একটু চুপ করে থেকে বাংলার অধ্যাপক বললেন, আপনার বোনই দেখছি আজকের পাণ্ডা।

সত্যজিৎ মৃদু হাসল: হওয়াই তো স্বাভাবিক। ও বোধ হয় এবার ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

—আপনার কিন্তু ওকে বারণ করা উচিত।

—কেন?—সত্যজিৎ চোখ তুলে তাকালো: আমি ওকে বারণ করতে যাব কেন? আর করলেই বা শুনবে কেন?

—তা ঠিক, তা ঠিক।—বাংলার অধ্যাপক থেমে গেলেন।

দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন করিডোর দিয়ে। বাইরে বীথির বক্তৃতা থেমে গেছে। সমুচ্চরবে শ্লোগ্যান উঠছে এখন।

—শিক্ষকদের দাবি—

—মানতে হবে!

—ছাত্র ঐক্য—

—জিন্দাবাদ!

—ইন্‌কিলাব—

- জিন্দাবাদ।

দশ নম্বর ঘরের সামনে এসে বাংলার অধ্যাপকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কেউ নেই! আঃ—বাঁচা গেল!

খাতা বগলে নিয়ে তিনি স্টাফরুমের দিকে যাত্রা করলেন। সত্যজিৎ জানত—তাকেও ফিরে যেতে হবে। ক্লাসরুম পর্যন্ত যাওয়া নিয়মরক্ষা মাত্র। তারপর স্টাফরুমে এসে সবসুদ্ধ অ্যাব্‌সেণ্ট করে রাখা।

কিন্তু বারো নম্বর ঘরের সামনে এসেও সত্যজিৎ ফিরে যেতে পারল না। ক্লাসে একটিমাত্র মেয়ে বসে আছে মাথা নীচু করে। পূরবী।

এক মুহূর্তে সত্যজিতের মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ঠেলে উঠল গলার ভেতরে।

তার মানে, এক ঘণ্টা বসে বসে তাকে পূরবীকে পড়াতে হবে।

বাড়িতে সে পূরবীকে পড়িয়েছে কয়েকদিন। কিন্তু সে পড়ানোর আলাদা স্বাদ ছিল। সে পূরবীর আর এক রূপ, তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার মন মগ্ন হয়ে যেত। পাশের জানালা দিয়ে বয়ে আসত সুরের হাওয়া, ঘরের আলোটায় স্বপ্নের রঙ লাগত—সমস্ত কথা যেন কবিতা হয়ে উঠত।

আর আজ? এই ক্লাসে?

বাইরে থেকে আবার চিৎকার উঠল: ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

হঠাৎ সত্যজিতের সমস্তই অত্যন্ত কুৎসিত মনে হল। এই কলেজকে, ক্লাস রুমকে, আর পূরবীকেও।

ক্লাসে ঢুকে সত্যজিৎ চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর সামনে পুরো ক্লাসটাই যেন তার রয়েছে, এমনিভাবেই রেজিস্টার খুলে নাম ডাকতে আরম্ভ করল: রোল নাম্বার ওয়ান?

মাথা নিচু করে বসে রইল পূরবী। তার হাতের পেন্‌সিলটা কাঁপতে লাগল। সারা শরীরে খানিক ক্লেদাক্ত অনুভূতি আর মুখের মধ্যে একরাশ তিক্ত স্বাদ নিয়ে সত্যজিৎ রোল-কল করে চলল: থ্রী, ফোর, ফাইভ, সিক্স—

দশ

তিনখানা ডিক্‌শনারী টেবিল ভর্তি রেফারেন্সের বই, একরাশ মোটা বই। তারই মধ্যে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বনশ্রী লিখে চলেছিল। "বার্ডস্‌ আই ভিউ"। অনেকখানি ওপর থেকে পাখি যেমন চারদিকের সব দেখতে পায়—আপাতত বনশ্রী যে বইটি লিখছে সেটিতেও ছাত্রছাত্রীরাও পাখির মতো ওইরকম অবলীলাক্রমে স্কুল-ফাইন্যালের সমস্ত প্রশ্নোত্তরমালা দেখতে পাবে। হীরেন বইয়ের বিজ্ঞাপনে দিয়েছে "বাই এ গোল্‌ড্‌ মেডালিস্ট্‌"। এই গোল্‌ড্‌ মেডালিস্টটি যে কে—হীরেন তা নিজেই জানে না, বনশ্রীর তো কথাই নেই। তবু আপাতত এই লোকটির বকলমেই বনশ্রীকে লিখে যেতে হচ্ছে।

লেখাপড়া শেখানো নয়—ফাঁকির রাস্তা। প্রথম প্রথম বিবেকে বাধত বই কি। ক্লাসে নীতি উপদেশ শুনিয়ে আড়াল থেকে ফাঁকি শেখানো—ভারী গ্লানি বোধ হত মনের মধ্যে। কিন্তু ক্রমেই বনশ্রী বুঝতে পেরেছে, ফাঁকি দেবার জন্যে সমস্ত দেশটাই যখন তৈরি হয়ে আছে—তখন সে না থাকলেও সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। "বার্ডস্‌ আই ভিউ" যারা পড়ে তারা পড়বেই—বনশ্রী না লিখলেও গোল্‌ড্‌ মেডালিস্টের জন্যে ভাড়াটে লেখক এসে জুটবে দলে দলে। মাঝখান থেকে ফাঁকি ঠেকাতে গিয়ে সে নিজেই

ফাঁকি পড়বে। আরো বিশেষ করে যেখানে নিজের হাতে তাকে সংসার চালাতে হয়—জি-কে রায়ের সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে দু'বেলা দু'মুঠোর নিয়মিত ব্যবস্থা করতে হয়, চাকরের মাইনে দিতে হয়—রীতেনের খরচ চালাতে হয়।

এখন সব সহজ হয়ে গেছে। কে নোট লেখে না? স্কুলের নগণ্য নিম্নবিত্ত শিক্ষক থেকে নামের পেছনে তিনটে ডিগ্রিওয়ালা দিক্‌পালেরা পর্যন্ত ব্যবসাতে নেমে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই তো পাঁচ-সাতখানা বিলিতি বই সামনে খুলে "মৌলিক" গ্রন্থ রচনা করে থাকেন—কুলীন প্রকাশকেরা ছাপেন—অনেক দামে ছাত্রদের তা কিনতে হয়—তারা জানে সেগুলোই 'ভবার্ণব তরণে নৌকা'। "আমার বইটা পড়লেই সব পাবে"—অনেক ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণই সে-কথা ক্লাসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকেন।

সুতরাং বার্ড্‌স্ আই ভিউতে কোনো দোষ নেই। বরং দিকপালদের কীর্তির চাইতে এ ঢের ভালো। কখনো কখনো তাঁরা নিজেরা এক ছত্রও লেখেন না—মোটা কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে "নেম্ লেণ্ড্" করেন। বই লেখে আট-দশজন "নেমলেস্"—তারা পায় খুদ কুঁড়ো—নামী ব্যক্তিটি বিনা পরিশ্রমে আদায় করেন সিংহ ভাগ। শিক্ষা বিভাগের কোনো কোনো বিচক্ষণ কর্মচারীও সম্প্রতি রাস্তা চিনে নিয়েছেন—অথবা হিসেবী প্রকাশকেরা রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছে তাঁদের। জেলার ইন্‌স্‌পেক্‌টার অব্ স্কুলস্ যদি কোনো টেক্‌সট বই তৈরি করেন—এমন কোন্ দুঃসাহসী হেড-মাস্টার আছেন যে সে বই তিনি তাঁর স্কুলে পাঠ্য হিসেবে মনোনীত করবেন না?

অতএব বনশ্রীর চিন্তা করবার কিছু নেই। যে-পথে মহাজনেরা চলেন তাকেই 'শিবপথ' বলে। বনশ্রীও সেই পথ ধরেই চলেছে। প্রত্যেকেরই বাঁচা দরকার। আর বাড়া দরকার।

টিউশন। নোট লেখা। বই চালানো। প্রকাশকের দুয়ারে টাকার জন্যে ধর্ণা দেওয়া। আর বাঁচবার চেষ্টা করা। সবই হয়। হয় না পড়া আর পড়ানো।

কিন্তু কী আসে যায় তাতে? এই তো নিয়ম। একেবারে নিচের ক্লাস থেকে ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত। বনশ্রী ছেলেমানুষি বিবেকের দংশন অনুভব করতে যায় কোন্ দুঃখে? 'বার্ডস আই ভিউ'। 'সিয়োরেস্ট সাক্‌সেস্ ইন্—'

বনশ্রী লেখবার জন্যে আবার কলম তুলে নিলে।

সকাল থেকে একটানা লিখে আঙুল টনটন করছে। কিন্তু উপায় নেই। আজকে অন্তত দু ফর্মা ম্যাটার তাকে তৈরি করে দিতেই হবে।

অযোধ্যা এসে হাজির হল। হাতে একটুক্‌রো ছোট কাগজ।

—দেখা করতে এসেছে।

বনশ্রী ভ্রূকুটি করল।

—তোকে বলিনি, এখন ব্যস্ত আছি ? পাঁচটার আগে দেখা করতে পারব না কারুর সঙ্গে ?

অযোধ্যা মুখ নিচু করল।

—বলেছিলাম। কান্নাকাটি করছেন। দেখা না করে যেতে চাইছেন না।

কান্নাকাটি করছেন ! কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে দেখল বনশ্রী। যা অনুমান করেছিল তাই। মিনতি দে।

বনশ্রীর কপালে ভ্রূকুটিটা আরো ঘন হয়ে এল। হাতের কলমটা একবার হিংস্রভাবে কামড়ে ধরল দাঁতে। তারপর অসহায় গলায় বললে, আচ্ছা, নিয়ে আয় এখানে।

টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বনশ্রীর মন একরাশ বিস্বাদ চিন্তায় ভরে উঠল। আবার খানিকটা অপ্রীতি—কতগুলো নিষ্ঠুর কথা বলবার দায়। তার যে কিছুই করবার নেই—সে কথা কোনোমতেই বোঝানো যাবে না। শুধু অভিশাপ কুড়ানো—দীর্ঘশ্বাসের বিষ সঞ্চয় করা। ইচ্ছে করে চাকরি ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপর ?

ঘরের বাইরে ভীরু পায়ের শব্দ শোনা গেল। মাথা ঘুরিয়ে বনশ্রী দেখল পর্দার ওপাশে মিনতি দে এসে দাঁড়িয়েছে। বকের মতো শীর্ণ একজোড়া পা—তাতে মলিন জুতো।

—আসতে পারি ?—কাঁপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

—এসো।

মিনতি দে ঘরে ঢুকল।

বনশ্রী টেবিলের ওপর মাথা নামালো। শক্ত হতে হবে—অপ্রীতিকর কথা বলতে হবে। আর্ত মানুষের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সেগুলো বলা যায় না—এখনো চক্ষুলজ্জায় বাধে।

—কী চাই তোমার ?—ব্লটিং প্যাডের ওপর হিজিবিজি কালির রেখাগুলো দেখতে দেখতে বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল।

—আমার সেই ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা—

—হবে না !—একটা লাল পেন্‌সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর আঁচড় টানতে টানতে বনশ্রী বললে, আর একদিনও তোমাকে এক্সটেন্‌শান দেওয়া সম্ভব নয়। হয় পয়লা তারিখ থেকে কাজে জয়েন করো, নইলে রেজিগনেশন দাও।

মিনতির গলায় কান্না ঝরে পড়ল : বড়দি—

না, কিছুতেই চোখ তুলে তাকাবে না বনশ্রী।

কিছুতেই সে সইতে পারবে না মিনতির দৃষ্টিকে। এখনো তার চক্ষুলজ্জা আছে। মানুষের দুঃখের শেষ নেই—দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। সে দুঃখ কতখানি মোচন করতে পারে বনশ্রী—কতটা সমাধান করতে পারে সংখ্যাতীত সমস্যার ? তার চাইতে চোখ বুজে

থাকা ভালো। শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের মধ্যে দিয়ে যেমন করে নিজেকে অন্ধ বানিয়ে চলে আসতে হয়—একটা অতলান্ত অন্ধকার গর্তের মধ্যে পা দিয়ে আছড়ে পড়বার আগে যেমন ভাবতে চেষ্টা করতে হয়—কী সুন্দর পৃথিবী, কী আশ্চর্য আকাশ, অপরাজিতার মতো নীল সন্ধ্যায় কী অপরূপ চন্দ্রমল্লিকা রঙের আলো!

ব্লটিং প্যাডের ওপর পেন্‌সিল দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা বৃত্ত আঁকতে চেষ্টা করতে করতে বনশ্রী বললে, আমার কোনো হাত নেই মিনতি। ছ'মাস সিক্‌লীভ নিয়েছো। আরো ছ'মাস এক্‌স্‌টেন্‌শন অসম্ভব। গত বছরও পাঁচ মাস তুমি মেটার্নিটিতে ছিলে। এভাবে স্কুল চলতে পারে না।

—কিন্তু আমার যে উপায় নেই বড়দি।

মিনতি কাঁদছে। চোখ না তুলেও টের পেল বনশ্রী। কিন্তু চারদিকে কান্না দেখতে দেখতে এখন চোখের জলের ওপরে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ও আর নয়। সামথিং নিউ। দুঃখ প্রকাশ করবার যন্ত্রণাকে জানাবার ওই পুরনো পদ্ধতিটা মানুষ ছেড়ে দিক এবার। আর কিছু না পারে বুক থাবড়ে হাহাকার করুক অন্তত। চারদিকে কান্না—সকলের কান্না—যুগের কান্না। এই অগণিত চাপা কান্না যেন এখন পাথরের ভার হয়ে হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরে—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

বনশ্রী পেন্‌সিলটাকে টেবিলের ওপর দিয়ে অনেকখানি গড়িয়ে দিলে। তারপর বললে, তুমি বরং সেক্রেটারির কাছে যাও মিনতি। কিছু করবার থাকলে তিনিই করতে পারবেন। আমি দুঃখিত।

—একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন বড়দি—

ভেবেছিল চোখ তুলে চাইবে না, কিন্তু চাইতেই হল এবার। আর তৎক্ষণাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো কী একটা এসে আছড়ে পড়ল তার গলা থেকে।

—এ কি, আবার!

এবারে মিনতি মাথা নামালো। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল তার।

—আমি কী করতে পারি বড়দি?

—তুমি কি পারো?—বনশ্রী বিকৃত মুখে বললে, আর কিছু না পারো—সুইসাইড করতে পারো অন্তত। এমন তিল তিল করে স্লো-পয়জনে মরবার কোন অর্থ হয় না!

স্লো-পয়জন। তা ছাড়া কী। আবার মা হতে চলেছে মিনতি। কিন্তু শীর্ণ নিরন্ন শরীরে সে মাতৃত্ব মহিমায় ভরে ওঠেনি। অর্থহীন, সঙ্গতিহীন এমন অসহ্য কুশ্রীতার রূপ সে ধরেছে যে সেদিকে চোখ মেলে থাকা যায় না বেশিক্ষণ—গা বমি বমি করে ওঠে।

—প্রত্যেক বছর এই কাণ্ড করছ! অথচ গত বছর মরতে মরতে বেঁচে উঠেছিলে। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠলে পনেরো মিনিট ধরে তোমাকে

হাঁপাতে হয়!

মিনতি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। জবাব দিলে না।

সেই চাপা কান্না। যে কান্নায় দম আটকে যায়। যে কান্না চারিদিক থেকে মৃত্যু বলয়ের মতো ঘিরে আসছে।

—কলেজে পড়েছো তুমি। তোমার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। একটু সাধারণ মনুষ্যত্ব নেই তোমাদের? নিজে যদি বা মরতে মরতে বেঁচে থাকো, কী খাওয়াবে তোমার ছেলে-মেয়েদের?—বনশ্রীর গলা চড়তে লাগল: দুধ দিতে পারবে এক ফোঁটা? প্রপার এডুকেশন দিতে পারবে? বলতে পারো এভাবে একরাশ বেড়ালছানা বাড়িয়ে কী লাভ?

মিনতি মাথা তুলল। অপমানে লজ্জায় একবারের জন্যে চকমক করে উঠল তার চোখ। হয়তো প্রতিবাদও করতে চাইল। কিন্তু বিদ্রোহটা মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই সে নিভে গেল।

আর সেই মুহূর্তে বনশ্রীও লজ্জিত হল। তার এ-সব নৈতিক উপদেশ দেবার কী দরকার? মিনতি তার ছেলে-মেয়েদের কিভাবে মানুষ করবে সে নিয়ে তার কেন অনধিকার চর্চা? তা ছাড়া ওই কটু কথাগুলো উচ্চারণ করবার রুচিহীনতা তার নিজের কাছেই এখন অত্যন্ত লজ্জাকর বলে মনে হতে লাগল।

বনশ্রী আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমি চেষ্টা করে দেখব।

মিনতি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। পর্দার ওপারে বকের মতো দুটো শীর্ণ পা আর এক-জোড়া বিবর্ণ জুতো অদৃশ্য হল।

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসহায়। কলেজে লেখাপড়া শিখলেই কি মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয়? মিনতি আই. এ. পাস করেছে, তার স্বামী গ্র্যাজুয়েট। অথচ, তবু এক বিন্দু বিচার নেই, এতটুকু সতর্ক হওয়ার চেষ্টা নেই। শুধু নিজেরা আত্মহত্যা করছে তাই নয়, সেই সঙ্গে এমন একদল মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে—যারা শিক্ষাদীক্ষা হয়তো পাবে না —হয়তো ক্রিমিন্যাল হবে, হয়তো নিজেদের অসুস্থ অস্তিত্ব নিয়ে আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলবে।

পৃথিবী ভারাক্রান্ত। পৃথিবীতে ভিড়। মানুষের নয়। কতগুলো বিকৃত বিকলাঙ্গ জীবসত্তা।

বনশ্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। রাশিয়াতে যে যত সন্তানের মা তার তত সম্মান। সে মাদার হিরোইন। তাকে রাষ্ট্র থেকে পদক দিয়ে তার সার্থক মাতৃত্বকে সম্বর্ধনা জানানো হয়—বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। পৃথিবীতে অনেক মাটি পড়ে আছে—সে মাটি আবাদ করবার জন্ত এখনো কোটি কোটি মানুষ চাই; খনির তলায় এখনো অনেক ঐশ্বর্য লুকিয়ে—কত কয়লা, কত ইস্পাত, কত পেট্রোলিয়াম—তা উদ্ধার করবার জন্তে দলে দলে

শ্রমিক চাই। জগতের প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্তে লাখে লাখে কর্মীর সহায়তা চাই। মাদার্স অব্ দি কান্ট্রি—গিভ্ আস চিলড্রেন্! গিভ্ আস্ মেন!—রাশিয়া পারে। ওরা অনেক কিছুই করতে পারে যা পৃথিবীর আর কেউ পারে না। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু এদেশের মিনতিকে অতবড় আশ্বাস দেবার শক্তি কার আছে? কে বলতে পারে: আরো সন্তান চাই, আরো মানুষ চাই—আরো কর্মী চাই: যারা মাটিকে দেবে ঐশ্বর্য, জীবনকে দেবে গৌরব, ভবিষ্যৎকে দেবে উত্তরাধিকার?

ক্যাট্স্ অ্যাণ্ড ডগস্।

আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বনশ্রী লেখায় মন দেবে ভাবছিল, এমন সময় সশব্দে রীতেন এসে হাজির। রীতেন দি গ্রেটার।

—ত্রিশটা টাকা দিবি দিদি? বিশেষ দরকার।

—এখন টাকা একদম হাতে নেই রীতেন।

—ওয়েল—ওয়েল! রীতেনের চোয়াল ঝুলে পড়ল: হোয়াট্ অ্যাম আই টু ডু উইথ মাই হিপ্?

—হিপ্? তার মানে?

—মানে, আমার গাড়িটা। মোটর সাইকেলটা। রিপেয়ার করতে দিয়েছি—আজকেই ডেলিভারি পাওয়ার কথা।

—ও:!

—ও ডিয়ার সিস্—প্লীজ একটা ব্যবস্থা করে দে।

বনশ্রী বিষণ্ণভাবে চুপ করে রইল। রীতেনকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই ওকে শাসন করতে পারে না। হিতেন চলে গেছে। রীতেনও যদি তার মতো—

—গোটা কুড়িক দিতে পারি বোধ হয়!

—কুড়ি? ওয়েল—তাই দে। দেখি, বাকীটা ম্যানেজ করতে পারি কিনা।

—এক্ষুণি চাই? বিকেলে হলে ভালো হত।

—অল্‌ওয়েজ কণ্ডিশন্যাল?—রীতেনের চোয়াল আবার ঝুলে পড়ল: নাঃ—হোপলেস্! আচ্ছা, বিকেলেই হবে এখন। একটা সিগারেট ধরিয়ে রীতেন উঠে পড়ল: আমি একটু বেরুচ্ছি শ্যামবাজারের দিকে।

—তুই কি চাকরি-বাকরি কিছুই করবি না রীতেন?—অত্যন্ত সাবধানে জিজ্ঞাসা করল বনশ্রী।

—চাকরি? পেলেই করব। কিন্তু আমার যোগ্য চাকরি হওয়া চাই তো; আমি চেষ্টায় আছি—বুঝলি দিদি! বাট্ ইউ নো—আই অ্যাম এ টাফ্ গাই! যা-তা একটা

হলে আমার চলবে না।

রীতেন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল, বনশ্রী ডাকল।

—শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিস ?

—ইয়া!

—আমার একটা চিঠি এক জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারবি ?

—শুট্!

—মুখার্জি ভিলা চিনিস তো ? সেই যে দু-তিনবার গিয়েছিলি—মনে আছে ?

—অফকোর্স—হোয়াই নট্ ?—রীতেনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল : সেই সত্যজিৎ মুখার্জির বাড়ি তো ? ইয়োর ওল্ড কম্প্যানিয়ান ?

—তোকে বেশি বখামো করতে হবে না।—বনশ্রীর মুখে লালের আভাস লাগল : একটা চিঠি দেব—পারিস তো দিয়ে দেখা করে আসবি—।

—ও-কে সিস্!—বলে রীতেন একটা শিস টানল।

বনশ্রী সামনে লেখবার প্যাড্ আর কলম টেনে নিলে। আর রীতেন ক্লার্ক গেব্লের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ড্যানী কে-র মতো শিস্ দিতে দিতে চার্লস্ বয়ারের মতো উদাস হয়ে গেল।

এগারো

ক্লাসটা বেশিক্ষণ চলল না। সত্যজিৎ সোজা সামনের শাদা দেওয়ালটার ওপরে চোখ আটকে রাখল, তারপর যেন ক্লাসসুদ্ধ মেয়েকে পড়াচ্ছে এমনিভাবে গ্রামোফোন রেকর্ডের ভঙ্গিতে বলে চলল। পূরবীর দিকে একবারও সে চাইতে পারল না।

পূরবীর দিকে এমনিতেই সচরাচর তাকায় না সত্যজিৎ। হঠাৎ চোখের দৃষ্টি কখনো গিয়ে পড়লে দেখতে পায় মাথা নিচু করে এক মনে সে বই দেখছে, অথবা নোট করছে। তবু সত্যজিৎ জানত, তাকে না দেখেও পূরবী তার প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করছে, তার হাতের প্রতিটি ভঙ্গি, রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছে ফেলা—সব। তার একটি কথাও কান এড়িয়ে যাচ্ছে না। সকলের মাঝখানে বিশেষ একজন যে মুগ্ধ হয়ে তার পড়ানো শুনছে—সে অনুভূতির রোমাঞ্চ থেকে থেকে তাকে স্পর্শ করত।

কিন্তু আজ—

যান্ত্রিক ভাবে পড়িয়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে সত্যজিৎ ক্লান্তভাবে চিন্তা করতে লাগল, ক্লাসসুদ্ধ সবাই যখন আজ বাইরের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তখন একমাত্র পূরবী এমন করে পড়তে এসেছে কেন ? ফ্রীতে পড়ে বলে কলেজ অথরিটির সুনজরে থাকতে চায় ? কিন্তু আরো অনেকেই তো ফ্রীশিপ্ পায়। তাহলে কি একমাত্র তার ক্লাস করবে বলেই সকলের

ঠাট্টা-তামাসার ভেতর দিয়েও—

ভাবতে ভালো লাগা উচিত ছিল, কিন্তু ভালো লাগল না। কোথা থেকে যেন এক-রাশ গ্লানি এসে মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। অনাবশ্যকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নিজের ভেতরের ফাঁকি আর ফাঁকাটা ভুলতে পারল না কোনো-মতেই।

শেষ পর্যন্ত পূরবীরই অসহ্য হয়ে উঠল। পড়ানোর মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা ক্ষীণ-প্রায় নিঃশব্দ স্বর সত্যজিতের কানে এল : স্যার, আজকে থাক।

—অল্ রাইট্, লেট্স্ স্টপ হিয়ার—বৈষয়িক ভঙ্গিতে কথাটা ছেড়ে দিয়ে খাতা তুলে নিয়ে সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল। বাঁচল।

স্টাফ রুমে তর্কের ঝড় বইছে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের কথার তলোয়ার খেলা। ওসব অনেক শুনেছে সত্যজিৎ—নিজেও অনেক বলেছে অনেকদিন। আজ সব কেমন প্রলাপের মতো মনে হল। এ যেন কেবল কথার বিলাস, মস্তিষ্কে শাণ দিয়ে চলা; হয়তো একদিন এরা হৃদয়ের অনুভূতির মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছিল—সেই ছাত্রজীবনে মেসে বাস করার সময়, তারুণ্যের আগ্রহে 'লেটেস্ট্ বুক' গলাধঃকরণ করবার রয়েছে, ইউনিভার্সিটির লনে উদ্দীপ্ত হয়ে বক্তৃতা করার দিনগুলোতে। তারপরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। জীবন আর জীবিকা। দু-চারজন সদ্য কলেজ-ফেরত ছাড়া সকলের চোখে মুখে একই ক্লান্তি—একই জোয়াল টেনে চলার শিথিল অবসাদ। আজ কেবল অভ্যাসের চর্বণ। বয়সের অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধির চর্চায় কথার ধার বেড়েছে, তির্যক ইঙ্গিত এসেছে—কিন্তু হৃদয়-সম্ভব অনুভবের শিকড়গুলো শুকিয়ে গেছে অনেক দিন। কখনো কখনো এমনও মনে হয়—আসলে সবাই নৈরাজ্যবাদী—সবাই 'সিনিক্'—সকলেই এক শূন্যতার মধ্যে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে; এখন কেবল পুরনো অভ্যাসের জের টানা—খালি কথার বিলাস।

কিন্তু সবাই? কেউ বাদ নেই?

এত বড় অন্যায় অভিযোগ নিশ্চয় করা যায় না। হয়তো নিজের মনটাই সকলের ওপরে আরোপ করছে সে।

সত্যজিৎ কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। বীথি কোথায় কে জানে। বাড়িতে ফেরেনি সেটা নিঃসন্দেহ।

বাড়ি ফিরতে সত্যজিতেরও উৎসাহ হল না। প্রায় নির্জন ফুটপাথের ওপর একটা শ্রীহীন শিরিষ গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। পর পর চারটে বাস ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ রাস্তা পার হল, তার পর উল্টো দিকের একটা গাড়িতে চেপে বসল।

পথের মানুষ, গাড়ি বাড়ি, রোদের টুকরো, ট্রামের ঘন্টি, ভারী ঠেলা গাড়ি টানতে টানতে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়া একটা বুড়ো। দূরের বাড়িটার কার্নিশে চিল উড়ে এসে বসল—তার নখের নিচে চেপ্‌টে যাওয়া মরা ইঁদুরের নাড়ী ঝুলছে। সত্যজিৎ গাড়ির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মোটা এক ভদ্রলোক তার পাশে এসে আসন নিয়েছেন—অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস ফেলছেন—বুকের ভেতর থেকে তাঁর হাপর টানার মতো আওয়াজ উঠছে। হাঁপানি। গাড়ির ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে—পোড়া তেলের এক একটা শ্বাসরোধ করা ঝলক আসছে থেকে থেকে।

এস্‌প্ল্যানেড্‌।

সত্যজিৎ নেমে পড়ল। ট্রামের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় মুমূর্ষু সংকীর্ণ কার্জন পার্ক। মরা ঘাস, প্রাণহীন কুঞ্জ। কয়েকটা রেলিং টপকে—কিছু ঘাসের জমি মাড়িয়ে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

শিক্ষক ধর্মঘট। অল্‌-আউট্‌।

পথ জুড়ে মাস্টার মশাইরা অবস্থান ধর্মঘট করছেন। লজ্জায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে দেশের মানুষ। কিন্তু লালদীঘির লাল ফিতের দপ্তরে সে লজ্জা স্পর্শও করেনি; বরং একজন ওপরওয়ালা হুমকি দিয়ে বলেছেন—কিন্তু সে থাক।

মনের দিক থেকে কত নিচে নেমে গেছি আমরা। বিবেকহীন মনুষ্যত্বহীন আমলাতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিদেশী আমলাতন্ত্রকে বিদীর্ণ বক্ষে অভিশাপ দিয়েছিলেন—আজকের এই দৃশ্যটা দেখলে কী বলতেন তিনি? কী বলতেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ? ধিক্কার দিতেও নিজের ওপরে ধিক্কার আসে।

অবস্থান ধর্মঘট।

কতখানি অসহ্য হয়ে উঠলে হিমালয়ের চাইতেও সহিষ্ণু, চিরকালের নির্বিরোধ মানুষগুলোও এমনভাবে চরমপন্থা বেছে নিতে পারেন? ক্ষুধার জ্বালা আর আত্মিক অবমাননার কোন্‌ স্তরে পৌঁছুলে এমন করে পথের ভিখারীর মতো তাঁরা ধুলোয় আসন পাততে পারেন?

লালদীঘির লাল ফিতের নিচে তার জবাব নেই।

—ভালো আছো তো?

সত্যজিৎ চমকে উঠল। সামনে একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথার শাদা চুল রোদে চকচক করছে—ঝিকমিক করছে পুরনো ধরনের নিকেলের ফ্রেমের চশমা।

—স্যার, আপনি?

নিচু হয়ে পা স্পর্শ করল সত্যজিৎ। অনন্তবাবু—অনন্ত সেনগুপ্ত। পনেরো বছর আগে স্কুলে তাঁর কাছে ইংরিজি গ্রামার পড়ত। এর মধ্যে কত বুড়িয়ে গেছেন অনন্তবাবু!

—স্যার, আপনি ?—প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলে সত্যজিৎ।

—কী করি, আসতেই হল।—অনন্তবাবু হাসলেন। সত্যজিৎ তাকিয়ে দেখল, এখন পর্যন্ত তাঁর স্নান হয়নি, খাওয়াও হয়নি খুব সম্ভব। অপরিচ্ছন্ন ধূলিমলিন জামা-কাপড়। চোখের দৃষ্টি প্রায় নিভে গেছে।

তবু অনন্তবাবু হাসলেন। সেই পুরনো সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি। চল্লিশ বছর না খেয়ে, আধ পেটা খেয়ে আর উদয়াস্ত টিউশন করেও যে হাসি কোনোদিন এতটুকুও ম্লান হয়নি।

—কী করি বাবা—সবাইকেই তো আসতে হবে।

—কিন্তু স্যার, এত বয়েসে—দ্বিধাজড়িত ভাবে বলতে গিয়ে সত্যজিৎ থামল।

—আমার চাইতেও বয়েসে বড় অনেকে আছেন। ওই ওঁকে দেখছ ?—আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে অনন্তবাবু বললেন, ওই কোণায় বসে রয়েছেন রোদের মধ্যে। ওঁর বয়েস প্রায় আশী—পোষ্য জনপনেরো, মাইনে পান পঁয়তাল্লিশ টাকা। আমার তো তবু দশজন লোক—মাইনে একশো বাইশ।

অনন্তবাবু আবার হাসলেন।

এবারে সে হাসিটা চাবুকের মতো মনে হল।

অনন্তবাবু বলে চললেন, ওঁকে একটা ছাতা দিতে চেয়েছিল সবাই—উনি রাজী হলেন না। বললেন, সকলের জন্যে যদি ব্যবস্থা না হয়—আমার একার কোনো দরকার নেই।

অনন্তবাবু এখনো হাসছেন। সেই গ্রামার পড়াতে গিয়ে যেমন করে হাসতেন—ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সত্যজিৎ ইংরেজিতে লেটার পেয়েছে জেনে যেমন করে হেসেছিলেন—সেই একই রকম। হাসিটা বদলায়নি—কিন্তু অর্থ বদলে গেছে। সত্যজিৎ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকক্ষণ গড়ের মাঠে লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে তারপর বাড়ি ফিরল।

সিঁড়ির দিকে ওপরে ওঠবার আগেই নিচের ড্রয়িংরুমের দিকে চোখ পড়ল তার। কে যেন এসেছে ওঘরে—গল্প জমিয়েছে—তার একটা উৎকট হাসির আওয়াজ কানে এসে আঘাত করল সত্যজিতের।

মুখার্জি ভিলার এই বসবার ঘরে অনেকদিন এমন হাসির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়নি ; মাঝে মাঝে তেতলা থেকে বিকৃত-মন ইন্দ্রজিতের অশ্লীল হাসি ছাড়া কোনো প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়েনি এ বাড়িতে। আশ্চর্য হয়ে গেল সত্যজিৎ।

প্রীতি বললে, ছোড়দা—আয়। ইনি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

ইনি ?

অদ্ভুত মূর্তি। থুতনির নিচে দু পাশ কামানো দাড়ি। গায়ে ছাপমারা ক্যানাডীয়ান বুশশার্ট। ট্রাউজারের বেলট্ থেকে একটা চাবির চেন পকেটে গিয়ে নেমেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললে, সত্যদা—চিনতে পারছেন?

সত্যজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করল। মনে পড়ল না।

—চিনতে পারছেন না? ছাট্‌স্ স্ট্রেঞ্জ! ছেলেবেলায় কতবার এসেছি গেছি। আমি রীতেন রায়।—চোখে একটা স্মার্ট ইঙ্গিত ফুটিয়ে রীতেন বললে, বনশ্রী রায় আমার দিদি।

শেষ কথাটা না বললেও চলত—অন্তত ওই ভাবে। সত্যজিতের মুখে চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতা ফুটে বেরুল। হীরেনের কথা মনে পড়ল—হিতেন যদি গ্রেট হয়—রীতেন গ্রেটার।

—বুঝেছি, বোসো।

—বসেছি অনেকক্ষণ। প্রীতি দেবীর সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলাম।

—চা খেয়েছ?

জবাব দিলে প্রীতি। তার মুখে প্রচ্ছন্ন খুশির উল্লাস।

—চা দিয়েছি দাদা।—উচ্ছ্বসিতভাবে প্রীতি বললে, উঃ—কী গল্পই যে বলতে পারেন রীতেনবাবু! জানো দাদা, এতক্ষণ এমন হাসাচ্ছিলেন যে দম আটকে যাওয়ার জো!

প্রীতি হাসছিল—রীতেন হাসছিল। এই মুখার্জি ভিলায়—এই অন্ধকার সর্পিলতার ভেতরে। এখানে শিবশঙ্কর তাঁর পঙ্গু চেহারা নিয়ে দেওয়ালের সেই ভেনাস-মার্সের বীভৎস ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন—এখানে ইন্দ্রজিতের বিকৃত কল্পনার সম্মুখে অপমৃত্যু আর অপচ্ছায়ারা শোভাযাত্রা করে চলেছে।

রীতেন বললে, রিয়্যালি—উই ওয়ার হ্যাভিং এ গ্যালা টাইম! অ্যাণ্ড্ শি ইজ্ সিম্‌প্লি চারমিং।

সত্যজিতের কপাল কুঁচকে এল আর একবার।

—তুমি আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করছিলে সে তো বললে না।

—ওঃ—হিয়ার ইট্ ইজ।—ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে একটা চিঠি বের করলে রীতেন: দিদি দিয়েছে। বলেছে, একটা জবাব নিয়ে যেতে।

—দিচ্ছি জবাব। একটু অপেক্ষা করো।

—ও-কে—ও-কে!—প্রসন্ন মুখে রীতেন বললে, আমার কোনো তাড়া নেই। সিম্‌প্লি আই অ্যাম ইন্ এ হলিডে মুড্ টু-ডে। তাছাড়া—আই অ্যাম্ হ্যাভিং এ ভেরি নাইস কোম্পানি অলসো!

রীতেনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সত্যজিৎ একবার প্রীতির দিকে তাকালো। কী

একটা কথা যেন প্রীতিকে বলা দরকার বলে তার মনে হল—কিন্তু কথাটা ঠিক যে কী, কী ভাবে তা বলা উচিত, সেইটেই ভেবে পেল না। কয়েক সেকেণ্ড অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চিঠিটা নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেই সময়ে ওপরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছিল। একটি মেয়ে খবর দিতে চেষ্টা করছিল যে বীথিকে অ্যারেস্ট্ করা হয়েছে।

বারো

বিবর্ণ মুখে রঘু ছুটে এল।

—ছোটদা—একবার এসো। সর্বনাশ হয়েছে।

সত্যজিৎ বনশ্রীর চিঠিখানা খুলতে যাচ্ছিল, হাত থেকে খামখানা টুপ করে টেবিলের ওপরে খসে পড়ল। উত্তেজিত আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে? বাবার কোনো বাড়াবাড়ি হল নাকি?

—না, বাবার কিছু হয়নি!—রঘু প্রায় কেঁদে ফেলল: তুমি—তুমি একবার টেলিফোনে এসো।

ছুটে এসে সত্যজিৎ ফোন ধরল।

—স্যার, আপনি? আমি জয়া কথা বলছি। বীথি অ্যারেস্টেড্ হয়েছে। অনেককেই ধরেছে আজ। আমাদের এখান থেকেই জামিনের ব্যবস্থা হবে। আপনারা ভাববেন না—খবরটা দিয়ে রাখলাম।

সত্যজিৎ ফোন ছেড়ে দিয়ে, টেবিলের কোণায় হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মুখার্জি ভিলার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। বীথির ছায়া-ছায়া চোখে যে আলো সে জ্বলে উঠতে দেখেছিল, তারই একটা ঝলক এসে পড়েছে এই বাড়ির বিষাক্ত অন্ধকারের ভেতর। এই সবে শুরু। এখন কেবল আলোই জ্বলেছে, এর পরে যখন কয়েকবিন্দু আগুন এসে পড়বে তখন ওই স্তব্ধ-পুঞ্জিত বিষাক্ত গ্যাসগুলো একটা বিকট বিস্ফোরণের রূপ নেবে—এই মুখার্জি ভিলার জগদ্দল আবর্জনাগুলো দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

বীথি তারই সূচনা করে দিয়েছে।

রঘু ধরা গলায় বললে, কী হবে ছোটদা?

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ বললে, কিছুই হবে না। ভাবিসনি।

—তুমি একবার থানায় যাবে না?

—দরকার নেই। ওরাই বন্দোবস্ত করবে এখন।

রঘু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারল না। মিনিটখানেক দ্বিধাগ্রস্তের মতো অপেক্ষা করে

বললে, তুমি একটিবার থানায় গেলেই পারতে কিন্তু।

সত্যজিৎ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বিরক্তভাবে বললে, বললাম তো কিছু ভাবতে হবে না। বীথি কালকেই ছাড়া পাবে—আজও আসতে পারে। তুই শুধু চুপ করে থাকিস রঘুদা। বাবা যেন জানতে না পারেন। প্রীতিকে আমিই বলব এখন।

সত্যজিৎ চলে এল। রঘু দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেবেলায় বীথির মরণাপন্ন অসুখের সময় রঘু নবদ্বীপে ছুটে গিয়ে কোন্ এক ভৈরবীর কাছ থেকে মাদুলী নিয়ে এসেছিল—একদিন উপোস করে থেকে সেই মাদুলী বেঁধে দিয়েছিল বীথির হাতে।

ঘরে এসে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সত্যজিৎ। চেয়ে রইল বারান্দাটার দিকে। অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল ঝোলানো অর্কিড্গুলো কেমন পাংশুটে আর শীর্ণ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন বোধ হয় জল পড়েনি। নিচে দুটো চড়ুই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল —কী খাচ্ছিল ওরাই জানে। সত্যজিৎ বসে রইল। আর তার কনুইয়ের তলায় চাপা পড়ে রইল বনশ্রীর সেই নীল খামখানা।

তারপরে তার চমক ভাঙল। নীচ থেকে হাসির আওয়াজ এল। রীতেন হা-হা করে হাসছে বাড়ি ফাটিয়ে। তার সঙ্গে প্রীতির মিষ্টি তীক্ষ্ণ হাসির ঝঙ্কারও শোনা গেল।

তখন বনশ্রীর চিঠিটার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রীতেন এসে জবাব নেবার জন্য বসে আছে। নীল রঙের খামখানা তুলে নিয়ে একবার ভ্রূকুটি করল সত্যজিৎ। প্রীতির হাসিটা তার কিছুতেই ভালো লাগল না। অনেককাল আগে রীতেনের এ বাড়িতে যাওয়া আসা, প্রীতি তার একেবারে অচেনা তা-ও নয়, তবু আজ মনে হল এতটা না হলেও চলত। প্রীতির হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঙালপনা আছে—সেইটেই তার কানে যেন ঘা দিতে লাগল বারবার।

আর ওদিকে ইন্দ্রজিৎ আচমকা চিৎকার করে উঠল: "Mountains and hills, come, come and fall on me and hide me from the eyes of heaven, Lucifer, curse thyself—"

মার্লো? মনে পড়ল না।

প্রিস্ট্লির না কার একটা উপন্যাস সে পড়েছিল অনেককাল আগে। সে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর গল্প। দুর্যোগের এক বীভৎস রাত্রে তিন-চারটি মানুষ পথ ভুলে আশ্রয় নিয়েছিল নির্জন পাহাড়ের কোলে এক রহস্যময় বাড়িতে। পাগলামি, হত্যা আর অপঘাত দিয়ে ছাওয়া সেই বাড়ি বাইরের বৃষ্টি বজ্র আর ধ্বংসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন এক বিভীষিকায়

সৃষ্টি করেছিল যে রাত বারোটায় বই শেষ হওয়ার পরে সে আর চোখের পাতা বুজতে পারেনি। তার মনে হতে লাগল—ওই রকম শুধু একটিমাত্র রাতই নয়—অমনি রাতের পর রাত এই বাড়িতে আসন্ন হয়ে আসছে। সেই পরম দুঃস্বপ্নের লগ্নে এ বাড়িতেও আর কেউ ঘুমুতে পারবে না; কেবল প্রিস্ট্লির উপন্যাসের মতো বুকের স্পন্দন বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকবে: কখন ধ্বস আর বন্যা নেমে সব কিছুকে ঠেলে নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে:

"Have you seen her grinding teeth

Tinged with the blood of my son— my generation—"

সত্যজিৎ দাঁতে দাঁত চাপল। এ আবার কার কবিতা? কোথা থেকে এ-সব পায় ইন্দ্রজিৎ? কারা লিখেছিল? চেঙ্গিস? সাইরাস? ক্যালিগুলা?

মানুষের চিন্তা-চেতনার যৌগিক অবস্থাটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারপরে কোন্ মৌলিক উপকরণটা সব চেয়ে প্রধান আর প্রবল হয়ে ওঠে? ক্যানিবালিজম্? ভালোবাসার অধর-সঙ্গমে কি সেই আদিম ইচ্ছাই প্রতীকিত হয়ে ওঠে?

সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করে নিলে। এ কোন্ জাতের উৎকট ফ্রয়েডীয় তত্ত্বচিন্তা আরম্ভ করেছে সে? মনটাকে যথাসম্ভব সংযত করে নিয়ে সে বনশ্রীর চিঠিটা খুলল।

সংক্ষিপ্ত কয়েক ছত্র চিঠি। দু পয়সার একখানা পোস্টকার্ডেই লেখা চলত। এর জন্য নীল খামের কোনো দরকার ছিল না, রীতেনকে পাঠানোরও না।

বনশ্রী লিখেছিল:

"কাল বিকেলে, ধরো সাড়ে-পাঁচটা-ছটা নাগাদ, তুমি কি ঘণ্টাখানেক সময় পাবে? এসে যদি আমাদের এখানে চা খাও তা হলে খুশি হবো। তোমার কোনো ভয় নেই, বিব্রত করব না। শুধু কয়েকটা কাজের কথা বলব—একেবারে বৈষয়িক কথা। যদি আসতে পারো, রীতেনের হাতে খবরটা জানিয়ে দিয়ো।"

কাজের কথা—বৈষয়িক কথা। কত জোর দিয়ে লিখেছে বনশ্রী। লাল কালিতে আণ্ডার লাইন করে দিলেও ক্ষতি ছিল না। মনের এই বিরক্ত আর বিশৃঙ্খলার ভেতরেও এক ধরনের কৌতুক অনুভব করল সত্যজিৎ। বৈষয়িক কথার উল্লেখটা এমন বিশেষ করে করবার দরকার কী ছিল? ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলোর পরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সত্যজিতের স্মৃতি থেকে কবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল বনশ্রীর নীল রুমাল, তার আঙুলের পোখরাজের আংটিটা, তার সর্বাঙ্গের একটা বিশেষ সুগন্ধ। আর বনশ্রীও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিল তাকে—অন্তত এতদিন তার প্রয়োজন তাকে বিন্দুমাত্রও অনুভব করতে হয়নি।

আজ বৈষয়িক ছাড়া কি কথাই বা হতে পারে তাদের মধ্যে? কোনো চলতি ট্রামে যদি কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা হত, কোনো নীলচে বিকেলের আলোয় পার্কের কোনো পাম গাছের তলায় হঠাৎ দেখা হয়ে যেত যদি—তা হলে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য মনে গুনগুনানি জেগে উঠত, হয়তো কয়েকটা এলোমেলো রঙের ছাপ তুলে যেত চোখের সামনে দিয়ে। কিন্তু তা তো হয়নি। হীরেনের বাসায় দু'জনের দেখা হয়েছিল। সেখানে একটা পুরনো রং-জ্বলা লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জি পরে একটা ভাঙা চায়ের পেয়ালা নিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল হীরেন, দেওয়ালে ছারপোকার রক্তের দাগ যেন বীভৎসভাবে সমস্ত রুচি-বোধকে ব্যঙ্গ করেছিল, হীরেন একটানা বলে যাচ্ছিল বাজারে ফর্মা প্রতি রেট কত আর মেজেয় বসে পড়ে জিলিপি আর প্রায় ঠাণ্ডা চা খেয়েছিল বনশ্রী। জীবিকার রেশনের লাইনে পর পর দাঁড়িয়েছিল দুজন—স্থূল স্বার্থের তাগিদ ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধই ছিল না দুজনের মধ্যে।

স্বার্থ ছাড়া আজকে আর কোন্ নতুন বন্ধন সে গড়ে তুলবে বনশ্রীর সঙ্গে? বনশ্রীই কি ভাবতে পারে আর কিছু? সেই বয়েসের সেই চোখ নিয়ে সে তো কোনোদিন বনশ্রীকে দেখতে পায়নি। সেদিন বনশ্রীর সমস্ত সত্তাই ছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর; শালবনে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, আউটরাম ঘাটের বুকের জ্যোৎস্না। সেদিন চোখ বুজে সত্যজিৎ বনশ্রীর মুখখানা মনে আনতে পারেনি, তার শরীরী রূপটা যেন কোথাও কোনোদিন ছিল না; আজ তো তা নয়। এখন হীরেনের ওখানে দেখা বনশ্রীর ক্লান্ত মুখের প্রায় প্রত্যেকটা রেখা সে ভাবতে পারে—এমন কি তার নাকে চশমার যে শাদা দাগটা পড়েছে—তার অসঙ্গতিও সত্যজিতের চোখ এড়িয়ে যায়নি। এখন বনশ্রী তার কাছে একটা শারীরিক আর সামাজিক অস্তিত্ব—যার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা চলে আর চলে ভদ্রতার বিনিময়।

কেন ডেকেছে বনশ্রী? 'জএণ্ট্ অথরশিপে' বই লিখবে বলে? 'বাই এক্সপিরিয়েন্সড্ প্রোফেসারস্'—এই নামে নতুন কোনো বই বের করবে বলে? কিংবা কোনো কোচিং ক্লাস খোলবার মতলব আছে? টিউশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর টানাটানির বাজারে 'কোচিং ক্লাস'ই তো এখন একমাত্র পন্থা।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে সত্যজিৎ ইতস্তত করল মুহূর্তের জন্যে। তারপর লিখল:

"চায়ের নেমন্তন্নের জন্যে ধন্যবাদ। কাল আসব।" তার সঙ্গে চিঠির বৈষয়িকতাটাকে আরো স্পষ্ট করবার জন্যে জুড়ে দিলে: "আশা করি ভালোই আছো।"

চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে আবার রঘুর আবির্ভাব।

—আবার কি হল রঘুদা?

এবার রঘু আর চোখের জল সামলাতে পারল না।

—ঠিক বলছ ছোড়দা ? ছোড়দিকে আজই ছেড়ে দেবে ?

রাগ করতে গিয়েও সত্যজিৎ কোমল হয়ে এল। আস্তে আস্তে রঘুর কাঁধে হাত রাখল।

—ঠিকই বলছি রঘুদা। ওরাই ব্যবস্থা করবে।

স্নেহের ছোঁয়ায় রঘুর শোক উথলে উঠল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মেয়েদের মতো।

—এই বাড়ির মেয়েকে শেষে পুলিসে ধরল ছোড়দা ? এই বাড়ির মেয়ে শেষে হাজতে গেল ?

এই বাড়ির মেয়ে। কটু একটা মন্তব্য সত্যজিতের ঠোঁটে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু রঘুর দিকে তাকিয়ে এবারেও সে সামলে নিলে। যে-কথা সে বলতে চাইছিল রঘু তা বুঝবে না। মুখার্জি ভিলার এই প্রায়শ্চিত্তে রঘুর কোনো সান্ত্বনা নেই। রঘুর স্বপ্নসত্তা এখনো চাপরাশ পরে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো ব্রুহাম গাড়ির পিছনে, ওয়েলারের ক্ষুরের তলায় এখনো খোয়া ওঠা রাস্তার খট্ খট্ খর্ খর্ করে আওয়াজ উঠছে, রঘু এখনো ঝিল আর ঝাউ গাছের ভেতরে সেই বাগান-বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে—যেখানে একশো বছরের পুরনো মদের বোতল খুলে নিয়ে শিবশঙ্কর মুখুজ্জে বসে আছেন সম্রাটের মহিমায়।

এতগুলো কথা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভাবল সত্যজিৎ। তারপর রঘুর উচ্ছ্বসিত শোককে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ড্রয়িং রুমে রীতেন তখন প্রায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

—মিউজিক ? সেণ্ট্রাল ইউরোপের জিপসী মিউজিক শুনেছেন কখনো ? অরিয়েণ্টের সঙ্গে অক্সিডেণ্টের যে কী ব্লেনডিং তাতে ঘটেছে—আপনি ভাবতেই পারবেন না।

নিজের চিৎকারই শুনছিল রীতেন, সত্যজিতের পায়ের আওয়াজ সে পেলো না। সত্যজিৎ একবারের জন্যে ড্রয়িং রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। রীতেনের চাইতেও তার বেশি দ্রষ্টব্য মনে হল প্রীতিকে। মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে প্রীতি রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। জিপসী, অরিয়েণ্ট্ অক্সিডেণ্টের একটি বর্ণও সে বুঝছে না—কিন্তু অভিভূত ভক্ত যেমন স্তব্ধভাবে পুরুতের দুর্বোধ্য মন্ত্র শ্রদ্ধা-ভরে শুনতে থাকে, তেমনি করেই রীতেনের কথা শুনছে প্রীতি।

প্রীতিকে বারণ করা উচিত। সত্যজিৎ ভাবল। এ ঠিক হচ্ছে না। এমন ভাবে তার রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু প্রীতিকে বারণ করা গেল না।

সত্যজিৎই সাড়া দিলে।

—চিঠিটা নাও।

প্রীতি সামান্য একটু চমকে উঠল—যেন সুর কেটে গেল কোথাও। রাতেন দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

—ও-কে সত্যদা—আমি চলি তবে।—প্রীতির দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে রাতেন বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভালো লাগল মিস্ মুখার্জি। আবার দেখা হবে। আসি আজ। টা-টা—

হাতের একটা বিচিত্র মুদ্রা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রীতি তখনও কেমন আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল চুপ করে। সত্যজিৎ একবার বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে চাইল তার দিকে। হঠাৎ তার ইচ্ছে হল এখুনি প্রীতিকে তার একটা আঘাত করা উচিত—এই আচ্ছন্নতার ঘোর তার কাটিয়ে দেওয়া দরকার।

নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাষায় সত্যজিৎ বললে, তুই বোধ হয় জানিস না প্রীতি। আজকে বেলা তিনটের সময় বীথিকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে।

—কী বললে!

ঠিক বন্দুকের একটা গুলি খেয়ে প্রীতি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ল অ্যাশ্‌ট্রেটা, একটা জলন্ত সিগারেটের শেষ অংশ গড়িয়ে গেল কার্পেটের ওপরে, আর প্রীতির মুখের রং দেখতে দেখতে ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল।

তেরো

ঠিক সামনে ভেনাস আর মার্সের বড় ছবিটা। চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সকালে ঘুম ভেঙে ইষ্টদেবতার মতো ওই ছবিখানাকে দেখেছেন শিবশঙ্কর। ওর যে একটা বিশেষ অর্থ ছিল, সেটা ফিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এখন ওটা দেওয়ালের পুরনো ক্যালেণ্ডারের মতোই একখানা নির্বিশেষ ছবি মাত্র—যেমন কলকাতা শহরের অন্যান্য বাড়ির পাশে 'মুখার্জি ভিলা' নিছক একখানা বাড়ি হয়ে গেছে।

আর শিবশঙ্কর মুখুজ্জেও আরো দশজনের একজন। আলাদা করে কেউ আর তাঁকে চেনে না। ব্যাধি-জর্জরিত জীর্ণ দেহে আজ আরো অনেকের মতো তিনিও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেছেন—আর কুড়ি বছর আগে তাঁর মৃত্যু ঘটলে এই কলকাতা শহরে উল্কাপাত ঘটত।

আজকের ইতিহাস শিবশঙ্করের জন্যে নয়। সামনের নতুন চারতলা বাড়িটার মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর খাতায় একালের কাহিনী লেখা হয়ে চলেছে।

বালিশে হেলান দিয়ে শিবশঙ্কর উঠে বসলেন। পাশের ছোট টেবিলটার ওপরে সকালের খবরের কাগজ ভাঁজ করা অবস্থাতেই পড়ে আছে। সারাটা দিনের ভেতরে কাগজখানাকে খুলে পড়বার মতো উৎসাহও তিনি পাননি। শিবশঙ্কর ক্লান্ত শিথিল হাত বাড়িয়ে কাগজ টেনে নিলেন।

ভারী ভারী পর্দা আর ফার্নিচারে ছায়াচ্ছন্ন ঘরে এরই মধ্যে অকালসন্ধ্যা ছড়িয়েছে। বেড্-স্যুইচ্ টিপে শিবশঙ্কর মাথার ধারে ছোট আলোটা জ্বাললেন।

প্রথম পাতাগুলো চোখ বুলিয়েই ওল্টালেন। রাজনীতি, নাগা বিদ্রোহ, শিক্ষক ধর্মঘট, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা, পৃথিবীর দুই প্রধান রাষ্ট্রনায়কের সাক্ষাৎকার। এ-সবের কোনোটাতেই শিবশঙ্করের আপত্তি নেই। এ-যুগের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তিনি সরে গেছেন, এ-কালের খবরের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নেই আর। এগুলো তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, অর্থহীন।

শিবশঙ্কর চলে এলেন শেষের দিকে। 'রেস'। এই অংশটুকু তাঁর চেনা। এই পালাটারই অদল-বদল হয়নি। সেই মাইসোর প্লেট্, সেই জুবিলি গোল্ড্ কাপ। এখন আর 'রেসে' যান না শিবশঙ্কর—সে অর্থসামর্থ্য নেই, সে উদ্যমও নেই। তবু খবরের কাগজের এই পাতাটাতে এসেই শিবশঙ্কর এ-কালের সঙ্গে তাঁর যোগ অনুভব করেন। এইখানে এসেই তাঁর মনে হয় পৃথিবীটা এখনো পুরোপুরি বদলে যায়নি।

কিন্তু রেসেরই কি সে-সব দিন আর আছে! সে সমারোহ—সে উত্তেজনা এখনো যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। একালের সংক্ষিপ্ত এই বৈচিত্র্যহীন টার্ফ নিউজটুকুর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ বুজলেন শিবশঙ্কর। সেই বড়দিনের রঙ ঝলমল কলকাতা। চৌরঙ্গীতে বিচিত্র পোশাক পরা সাহেব মেমের দল—যেন মরশুমী ফুল ফুটেছে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর। ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড্স্ট্যাণ্ডে গোরার বাজনা বাজছে। আর রেসের মাঠ ঝমঝম গমগম করছে।

দিল্লী থেকে বড়লাট এসেছেন। মাঠে সব বাছা বাছা ঘোড়া—যেন পক্ষীরাজের বংশধর। ছোটে না—তীরের মতো উড়ে যায়। তাদের পা মাঠে মাটি ছোঁয় কিনা বোঝাই যায় না। আর সেই সব জকি। যেন রাজপুত্রের মতো চেহারা। আর কি তাদের ঘোড়া-দৌড়নোর কায়দা!

এখন? এখন সব চলনসই। সে সব ঘোড়াই বোধ হয় আর জন্মায় না—সে-রকম জকিও না। আর খেলাও কি তেমন হয়? এখন ব্যবসায়ীর দিন—সাবধানীর কাল। বেনেটোলায় শীলেরা একদিন মাঠে তিনখানা বাড়িই ঘোড়ার ক্ষুরে গুঁড়িয়ে দিলে—সে-রকম মেজাজী লোকই কি এ-কালে কোথাও আছে!

সব সাধারণ। সব চলনসই।

রঘু এসে ঘরে ঢুকল।

—বাবু—

শিবশঙ্কর চোখ মেললেন।

—কি রে? কী চাই?

রঘু দরজার পাশে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে শিবশঙ্করের ছোট ল্যাম্পটার আলো পড়ে না। শিবশঙ্কর রঘুর মুখ দেখতে পেলেন না।

—কি চাই তোর?—আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—অক্ষয়বাবু এসেছেন দেখা করতে।

অক্ষয়? শিবশঙ্কর খুশি হয়ে উঠলেন: নিয়ে আয় এখানে।

পটুয়াটোলার ঘোষচৌধুরী বংশের অক্ষয় ঘোষ শিবশঙ্করের বন্ধু। একমাত্র বন্ধু। অক্ষয়ের জীবন তাঁর চাইতেও উদ্দাম। শিবশঙ্কর একসময় ঈর্ষা করতেন তাঁকে। ভাবতেন—অক্ষয়ের মতো যোগ্যতা যদি তাঁর থাকত, তাহলে তিনি মানুষ হতে পারতেন। কতদিন মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে তিনি অক্ষয়ের পা ধরতে গেছেন—বলেছেন, দাদা, আমায় পায়ের ধুলো দাও।—আর অক্ষয় কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, ভাই রে, তোকে পায়ের ধুলো দিতে কি আমার অপরাধ? কিন্তু কী করব বল্—তুই হতচ্ছাড়া বামুনের ঘরে জন্মেই সব মাটি করে ফেলেছিস। আমি কায়েতের ছেলে হয়ে কী করে তোকে পদধূলি দিই বল্ দিকি? সোজা কুম্ভীপাক নরকে চলে যাব যে!

পায়ের ধুলো না-ই পান—অক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে ভক্তির সত্যিই অন্ত ছিল না শিবশঙ্করের। শুধু ঘোড়ার রেসেই শানাত না অক্ষয়ের—আরো বড় জুয়াড়ী ছিল সে। সে জুয়ার নাম ব্যবসা। অক্ষয় কয়লার খনি কিনেছে—গিরিডিতে অভ্রের খনি তৈরী করেছে। কিছু করতে পারেনি—কেবল ক্ষতির খেসারত দিয়েছে। তবু অক্ষয় বলেছে ঘাবড়াসনি শিবু, ঘাবড়াসনি। দেখবি, লেগে যাবেই একবার।

লাগেনি। রেসে আর ব্যবসায়ে অক্ষয় সর্বস্বান্ত হয়েছে।

তবু নেবার আগে দেখিয়ে দিয়েছে প্রদীপ কী করে জ্বালাতে হয়। নিতান্তই পৈতৃক বাড়ি দেবত্র করা আর অক্ষয় তার সেবায়েৎ—তাই সেটাকে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু বাকী বাড়ি জমিগুলোকে কেমন অবলীলায় একমুঠো ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। শেষ বাড়িখানা যখন বিক্রী হল, সেদিন রাত্রেও—সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক বর্ষার রাত্রে—থিয়েটারের এক সেরা অভিনেত্রীকে বাগানে নিয়ে গিয়ে অক্ষয় যে উদ্দাম আনন্দের বান ডাকিয়ে দিয়েছিল, আজও তার কথা ভুলতে পারেনি শিবশঙ্কর।

সত্যি—অক্ষয় আশ্চর্য।

হাজারীবাগে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে একটা চিতাবাঘের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই

অক্ষয়। রিভলভারের গুলিতে রামবাগানের এক রক্ষিতাকে খুন করে আইনের ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল এই অক্ষয় ঘোষ চৌধুরী। আজ পেট পুরে খেতে পায় না—তবু একবিন্দু টোল খায়নি।

—কেমন আছো অক্ষয়দা?

—খাসা আছি।

—শীতে কাঁপছ যে? এই ঠাণ্ডায় একটা গরম জামা পর্যন্ত পরোনি?

—জীবনে তো অনেক শাল বালাপোষই পরলাম ব্রাদার। এখন একটু অন্যরকম করে দেখি—কেমন লাগে। তা ছাড়া বুড়ো বয়েসে কৃচ্ছ্রসাধনও করা ভালো হে—পুণ্যি হবে।

একখানা গরম চাদর অক্ষয়কে দেওয়া অসম্ভব নয় শিবশঙ্করের পক্ষে। অক্ষয় তা নেবে না। আর নিলেও বিলিয়ে দেবে। শিবশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বাইরে অক্ষয়ের চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—এসো অক্ষয়দা, এসো।

অক্ষয় ঢুকল। পাকা গোঁফ—বাব্‌রী-করা শাদা চুল। কালো অবস্থায় তার চুল যেমন ছিল, আজও ঠিক সেই রকমই আছে। এক ইঞ্চিও টাক পড়েনি। ফর্সা লালচে রঙ বয়েসের প্রভাবে আজ পুরনো হাতির দাঁতের মতো ময়লা আর হলদে হয়ে গেছে, কিন্তু আজও বুঝতে পারা যায় এককালে কী রূপবান ছিল সে! লোকে বলত, কন্দর্প। থিয়েটারের মেয়েরা কেবল তার টাকার আকর্ষণেই ছুটে আসত না- রূপের টানেও সেদিন অনেক পতঙ্গ এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

অক্ষয় ঢুকে শিবশঙ্করের মুখোমুখি জীর্ণ সোফাটায় বসল। কয়েকটা ভাঙা স্প্রীঙের চকিত আর্তনাদ শোনা গেল।

—কেমন আছো অক্ষয়দা?

—খাসা আছি।—বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক ছড়িয়ে অক্ষয় হাসল: দিব্যি কেটে যাচ্ছে। তবে এতদিন একা একা ছিলুম—ভারী ফাঁকা ঠেকত। এখন সঙ্গী জুটেছে একটি।

—সঙ্গী? সঙ্গী পেলে কোথায়?

—বাত। পরশু থেকে ডান পায়ে জানান দিচ্ছে। রাত্রে আর ঘুমুতে দেয় না হে! আমার নেহাত মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে উঃ আঃ করি—একটা কবরেজী তেল আছে তাই মাখি, আর সারারাত পাশের বাড়ির ছাতে দুটো হুলো বেড়ালের ঝগড়া শুনি। ব্যাটারা ভারী অপদার্থ বুঝলে! এই দু'রাত ধরে সমানে চেঁচাচ্ছে, অথচ এ পর্যন্ত একবারও

জুৎসই গোছের একটা মারামারি অবধি করতে পারলে না।

শিবশঙ্কর তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর দিকে। অক্ষয় ঘোষরা ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। ফুরিয়ে যাচ্ছে শিবশঙ্করের কাল। অক্ষয়েরা আর জন্মাবে না—সে কালও আর ফিরে আসবে না।

—তারপর, তুমি কেমন আছো আজকে?—অক্ষয়ের জিজ্ঞাসা।

শিবশঙ্কর অক্ষয়ের মতো বলতে পারলেন না, খাসা আছি। সে জোর তাঁর নেই। বললেন, আছি একরকম।

—তুমি বড্ড বুড়িয়ে গেছো হে!—অক্ষয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ল: চাবুক মারতে গেলে ভাড়াটেকে—অথচ নিজেই পড়লে অজ্ঞান হয়ে! তুমি তো আমার চাইতে আরও পাঁচ-ছ' বছরের ছোট!

শিবশঙ্কর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই তিন-চারটে তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠে মুখার্জি-ভিলাকে যেন খান খান করে দিলে।

সেই সঙ্গে শোনা গেল প্রীতির ডুক্‌রানো কান্না।

—কী হল?—শিবশঙ্কর সবেগে বিছানার উপর উঠে বসলেন: কী হল?

রঘু—রঘু—

রঘুর সাড়া এল না। আবার প্রীতির কান্নার শব্দ ঝোড়ো হাওয়ার মতো বাড়িটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। শিবশঙ্কর থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

—রঘু—রঘু—প্রীতি—বেসুরো গলায়, বিকৃত মুখে আর্তনাদ করতে লাগলেন শিব-শঙ্কর।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমি দেখছি—

পরিচিত বাড়িতে অভ্যস্ত আগন্তুক অক্ষয় খবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। টেবিলের ওপর কী করে একখানা দাড়ি কামানোর ব্লেড পেয়ে তাই দিয়ে নিজের গলার শ্বাসনলী কেটে ফেলতে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। রঘু তাই দেখে ছুটে গিয়ে সেটা কেড়ে নিয়েছে—কিন্তু রঘুর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আধখানা হয়ে ঝুলছে, তীরের মতো ছুটছে রক্ত—আর তাই দেখে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়েছে প্রীতি।

চোদ্দ

এই মাত্র ভবিষ্যৎ 'গ্লোব-ট্রটার' রীতেন দি গ্রেটার তার মোটর সাইকেলে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন জি-কে রায়। না—একটা ছেলেও মানুষ হল না।

রীতেনকে প্রশ্রয় অবশ্য অল্প-বিস্তর বরাবরই দিয়ে এসেছেন, কিন্তু হিতেন? সে যে এমন হয়ে যাবে সে কথা কোনোদিনই কি ভেবেছিলেন? টেকনিশিয়ান হতে গিয়ে বাঁদর হবে, তারপর সস্তা একটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরের টোবাকো শপে সেলস্ম্যানের চাকরি করবে—এমন আশঙ্কা কে কবে করেছিল?

গেটের গায়ে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে জি-কে রায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কী ক্লান্তি—কী ক্লান্তি সারা শরীরে! রিটায়ার করবার আগে কোনোদিন বুঝতে পারেননি, শরীরে মনে তিনি এমন করে ফুরিয়ে গেছেন। অফিস থেকে ফুলের মালা গলায় পরে পথে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন আজ থেকে কোথাও তাঁর কোনো দাম রইল না; দু'দিন আগেও মনে হত—পৃথিবীতে অনেকগুলো কাজের জন্যে তিনি অপরিহার্য, এখন থেকে মনে হল, মিথ্যেই ভার সৃষ্টি করেছেন এতকাল। এখন আর তিনি কোথাও নেই।

নাঃ—রিটায়ার করার পরে মানুষের আর বাঁচা উচিত নয়।

কিছুই রেখে যেতে পারলেন না এই বাড়ি ছাড়া। তাঁর মৃত্যুর পরে বনশ্রী নিজের চাকরি-বাকরি দিয়ে একরকম চালিয়ে নেবে, কিন্তু কী দশা হবে রীতেনের? এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাবুয়ানার খরচ তার জোগাবে কে? রীতেনের ভবিষ্যৎ পরিণাম চোখের সামনে প্রায় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন জি-কে রায়। বাড়িটা বিক্রী করে দেবে, নগদ টাকা হাতে পেয়ে পরমানন্দে সেগুলো ওড়াবে কিছুদিন, তারপর নেমে পড়বে রাস্তায়। চুরি জুয়াচুরি ঠকামো করে বেড়াবে, হয়তো জেলও খাটবে। চমৎকার!

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে জি-কে রায়ের মনে পড়তে লাগল, ঠাকুর্দা মধ্যে মধ্যে যজমানী করতেন। তাঁর বাবা তখন ওকালতীতে পশার করছেন; রাগ করে বলতেন, 'কেন ওসব আর করে বেড়াও বাবা—আমাদের মান থাকে না।' ঠাকুর্দা হেসে জবাব দিতেন, 'বলিস কি, বামুনের ছেলে হয়ে যজমানী করতে অপমান হবে! এ যে আমাদের কত বড় অধিকার সেটা ভাবছিস না?'

জি-কে রায় ভাবলেন, ছেলে দুটোকে কলেজে ভর্তি না করে যদি পুরুতগিরি শেখাতেন তা হলেও এর চাইতে ভালো হত। এই বালিগঞ্জেই পুরুতের টানাটানি—পুজো-পার্বণের সময় একজনকে নাকি জোগাড় করাই শক্ত। এরাও বেশ করে খেতে

পারত। আর ঠাকুর্দার কথাই তো ঠিক। বামুনের ছেলের যজমানীতে লজ্জা কিসের!

কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। জি-কে রায় চমকে উঠলেন।

—কে?

—আমাকে চিনতে পারলেন না?

ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন জি-কে রায়। মনটাকে গুছিয়ে আনতে একটু সময় লাগল।

—তুমি সত্যজিৎ না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অনেকদিন পরে এলে এদিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার বাবা কেমন আছেন আজকাল?

সত্যজিতের মুখে ছায়া পড়ল: বিশেষ ভালো নেই, একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে দিন-কয়েক আগে।

—স্ট্রোক?—মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন জি-কে রায়। ছুটির বাঁশি বাজছে। তাঁদের সকলেরই। দু'দিন আগে পরে। তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু একটা ছেলেও যদি মানুষ হত!

নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, ভেতরে যাও—বনশ্রী আছে।

—আপনি বেরুচ্ছেন?

—হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি লেকের দিক থেকে।—শান্ত বিষণ্ণ গলায় বললেন, জানোই তো, বয়েস হয়েছে। বিকেলে দু-এক পা হেঁটে না এলে রাতে আবার খিদে হয় না। যাও—ভেতরে যাও—

তারপর নিজেই রাস্তায় নামলেন। ক্লান্তভাবে হেঁটে চললেন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল সত্যজিৎ। জি-কে রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। গালে প্রকাণ্ড বর্মা চুরুট ঠাসা সেই টিপিক্যাল্ ব্যুরোক্রাট,—সেই ইংরিজি ধরনে বাংলা উচ্চারণ, সেই 'ওয়েল মাই ডিয়ার বয়', সেই জামা-কাপড়ের কড়া ক্রীজ। জি-কে রায় বদলে গেছেন। যেমন বদলে গেছেন বাবা—বদলে গেছেন অক্ষয় ঘোষচৌধুরী।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বসবার ঘরে এসে ঢুকল। কেউ নেই।

একদিন এ ঘরে পা দিতে তার বুক দুরু দুরু করত, গালে বর্মা চুরুট চড়ানো জি-কে রায়কে দেখে তার ভয় করত, টেনিস্ র‍্যাকেট হাতে করে ছিতেন যখন লাফাতে লাফাতে

বেরিয়ে যেত, নিজেকে ভারী গ্রাম্য আর অমার্জিত বলে মনে হত তখন। তা ছাড়াও একটু পরেই আসবে বনশ্রী, যে তার চোখে রঙ লাগিয়েছে আর মনে ধরিয়েছে নেশা—যে সেদিন তার ইন্টেলেক্‌চুয়াল কম্প্যানিয়ন। সেই বনশ্রী সামনে এসে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাতেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যেত, শিরশির্‌ করত শরীর।

আজ আর সে সব কিছুই নেই। জি-কে রায় বুড়িয়ে গেছেন; বনশ্রীর বয়েস বেড়েছে—সে আরো অসংখ্য চাকুরে মেয়েদের একজন মাত্র। এখন আর রাত জেগে সে কাব্য পড়ে না—নিশ্চয় পরীক্ষার খাতা দেখে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতেই একটা সোফায় বসে পড়ল সত্যজিৎ। সামনে একটা কাচের আলমারিতে সারি সারি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' —সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই তার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতা:

"সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়ত বসে "ওড্‌স্‌ টু নাইটিঙ্গেল"—
বরষ কয়েক যেতেই
...চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকার পাগল হরিণীর।
ছেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির—"

অযোধ্যা এসে হাজির হল।

—এই যে সত্যবাবু—কেমন আছেন?—এক মুখ হেসে আপ্যায়ন করল অযোধ্যা। এর মাথার চুলও শাদা হয়ে গেছে,—সত্যজিতের চোখ এড়ালো না।

—আছি একরকম, তোমাদের খবর ভালো?

—আমাদের খবর আর কী থাকবে—বড় দাদাবাবুর খবর সবই তো জানেন। বাবুর শরীর মেজাজ দুই-ই খারাপ। মা মরে যাওয়ার পরেই সংসারে কী যে হয়ে গেল!—অযোধ্যা অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যজিৎ ভাবল, এইখানে তার সঙ্গে বনশ্রীর মিল আছে। তারও মা নেই কিন্তু মা-র কথা যতটুকু মনে পড়ে—তাতে বাবার সংসারে তাঁর কোনো ভূমিকাই ছিল না। একান্ত স্বল্পভাষিণী ছায়ামূর্তির মতো মা কখন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছেন নিঃশব্দে।

অযোধ্যা বললে, আপনি একটু বসুন। দিদিমণি স্নান করছে, এখনি আসবে।

—আমি বসছি, তুমি যাও।

বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। আলোটা জেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল অযোধ্যা। আর সেই আলোয় বহু-দিনের পুরনো পরিচিত ঘরটাকে চোখ মেলে দেখতে লাগল

সত্যজিৎ। যতদূর মনে পড়ে, দু-একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র ছাড়া সবই সেই রকমই আছে। পরিবর্তনের ভেতরে সোফার আবরণ জীর্ণ হয়েছে, আলমারীর কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে, দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথার ওপর ধুলো জমেছে, জি-কে রায়ের চাকরি-জীবনের কোনো সুখস্মৃতি একখানা গ্রুপ ফোটোগ্রাফের কাচে ফাট ধরেছে। আর ওপাশে একটা জাপানী ফুলদানিতে সব সময়েই কিছু ফুল থাকত—সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

বয়েস হয়েছে—ঘরটারও বয়েস হয়েছে। জীর্ণতার ছাপ। সত্যজিৎ ভাবল, তারও বয়েস বেড়ে গেছে। তাই এ ঘরের ভেতরে বসেও সেদিনের কোনো অনুষঙ্গ তার মনকে চঞ্চল করে তুলছে না। কিন্তু পূরবী—

ওদিকের পর্দাটা যেন হাওয়ায় একটুখানি সয়ে গেল। ঢুকল বনশ্রী।

—তুমি এসে গেছ?—প্রসন্ন হাসিতে সুন্দর হল বনশ্রী।

—তুমি তো পাঁচটাতেই আসতে বলেছিলে।

—তা বলেছিলুম। তাই বলে তুমি এত পাংচুয়াল হবে সে ভাবিনি।—বনশ্রী এসে মুখোমুখি বসল।

—অধ্যাপনা করে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করে ফেলেছি—হাসিমুখে সত্যজিৎ জবাব দিলে। সত্যি, এই মুহূর্তে ঘরটা যেন তার বহুদিনের জীর্ণ বিষণ্ণতাকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠেছে। জি-কে রায়ের মেয়ে হয়েও বনশ্রী চুল ছেঁটে এখনো ফাঁপিয়ে তোলেনি—বোধ হয় স্কুলে মাস্টারি করে বলেই। কিন্তু ভিজে চুল মেলে দিয়ে এই যে সামনে এসে বসেছে—কী যে আশ্চর্য লাগছে ওকে দেখতে। এখনো এত চুল আছে বনশ্রীর—এত রাশি রাশি নিবিড় কোঁকড়ানো চুল। গায়ের অতিরিক্ত ফর্সা রঙের জন্যে চুলটা লালচে—কিন্তু সেই লালের ছোঁয়াটুকু যেন আভার মতোই জড়িয়ে আছে। এই মাত্র স্নান করা শরীরের সুগন্ধ, চুলের অরণ্য, পরনের নীলাম্বরী শাড়ি—এরা সব মিলিয়ে শান্ত, সুরভিত একটা শীতল গভীরতায় সত্যজিৎকে মগ্ন করতে লাগল।

বনশ্রীর সঙ্গে সেদিন এত সহজে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল কেন? কেন দুজনে দু-জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল? কোনো কারণ ছিল না, ভুল বোঝবার অবকাশও ঘটেনি—তবু ওরা আলাদা হয়ে গেল। অন্তত নিজের দিক থেকে সে বলতে পারে, এর মধ্যে বনশ্রীর জন্যে কোনো আকুলতা সে বোধ করেইনি—মনেও করেনি বনশ্রীকে। আর বনশ্রীও যে তার কথা কখনো ভেবেছে, তেমন অনুমান করারও কোনো কারণ নেই। হয়তো সে যেমন পূরবীকে চেয়েছে, বনশ্রীও তেমনি ভাবেই—

সম্ভাবনাটা তাকে খোঁচা মারল। অকারণ 'জেলাসি'।

বনশ্রী অনুভব করছিল, অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে আছে। কেমন অপ্রতিভ লাগল।

—তোমার কাজের ক্ষতি করিনি বোধ হয় ?

—না।—সত্যজিৎও সহজ হতে চাইল : আজ বিকেলে সে-রকম কিছু কাজের দায় ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কী ? হঠাৎ ডেকে পাঠালে যে ?

—কেন, তোমাকে ডাকতে পারি না আমি ?—বনশ্রী নিজের মধ্যে সংহত হয়ে এল।

—নিশ্চয়ই পারো।—সত্যজিৎ হাসল : তা বলিনি। যেভাবে দূত পাঠিয়েছিলে তাতে মনে হল কোনো জরুরি কাজ কিছু আছে।

কয়েক বছর আগে হলে বনশ্রী বলত, কোনো কাজ না থাকলেই যখন কেউ কাউকে ডেকে পাঠায়—তখন সে ডাকের যে কত বড় অর্থ আছে, তা কি তোমার জানা নেই ? কিন্তু স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ বনশ্রী সে-কথা বলতে পারল না। কেবল বললে, বিনা কাজেও আমি তোমাকে বিরক্ত করতে পারি। জরুরি তাগিদ পাঠাতে পারি।

—সবই পারো। কিন্তু তুমি নিজে তো এখন সিরিয়াস মানুষ। এ সব লঘুতা তোমার নিজেরই ভালো লাগবে না। তোমার এখন সব রুটিনে বাঁধা—নিজের রসিকতায় সত্যজিৎ পুলকিত হল।

কিন্তু বনশ্রীকে কেমন আঘাত করল কথাটা। তখনই নিজের সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল সে। স্নানের পরে আজ সে যেন একটু বেশি মাত্রায় প্রসাধন করেছে, কপালে পরেছে কুম্‌কুমের টিপ, বেছে নিয়েছে নীল শাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই বনশ্রীর মনে হল, আজ সে সত্যিই সিরিয়াস মানুষ—এসব লঘুতা আর তাকে মানায় না। বহুদিন পরে এই বাড়িতে সত্যজিৎ আসবে—এই কথাটাই তাকে যেন নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, বিভ্রম ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্যে, অনেক দিন আগে যা ছিল তাই হতে চেয়েছিল আর একবার। কিন্তু বনশ্রী ভুলে গিয়েছিল, নিজেকে কখনো নকল করা যায় না ; সেটা সংসারের সব চাইতে বিশ্রী প্যারডি—সব চেয়ে বীভৎস আত্মাবমাননা।

ঠিক বলেছে সত্যজিৎ। আজ আর কোনো বাহুল্য শোভা পায় না তাকে—কোনো রঙই তাকে মানায় না। অদ্ভুত এক বর্ণহীনতার প্রশান্তিতে সে এখন পৌঁছে গেছে ; এখন এই ঘর নিতান্তই বসবার ঘর, এখন জানলা বেয়ে ওঠা ওই ফুলের লতাটা আর কোনো অর্থ বহন করে না, এখন বাইরে বর্ষার নটমল্লার বাজলে বনশ্রী হয়তো সত্যজিৎকেই বলবে : জানলাটা বন্ধ করে দাও—ঠাণ্ডা আসছে, আমার আবার সর্দির ধাত।

নিজের নীল শাড়ি আর প্রসাধন তাকে লজ্জা দিতে লাগল। সম্ভব হলে, উঠে গিয়ে মুছে ফেলত মুখের মৃদু পাউডারের প্রলেপন, বদলে আসত শাড়িখানা। কিন্তু সে উপায় আর নেই।

বনশ্রী বললে, হ্যাঁ, একটু কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। একটু সাহায্য করতে —গলার স্বরে বিন্দুমাত্র জড়তা সে আর রাখল না, আকস্মিক মোহভঙ্গের ফলেই যেন

হ

সেটা কেমন রুক্ষ শোনালো। অল্প একটু বিস্মিত হল সত্যজিৎ, কী যেন একটা সন্দেহও করল অস্পষ্টভাবে—ঠিক বুঝতে পারল না।

—কী কাজ ?

—বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।—নিজের লজ্জার ওপর সৌজন্যের আবরণ টেনে বনশ্রী বললে, এত তাড়াহুড়ো কেন ? চা খেতে ডেকেছি, আগে চা-টা খাও।

অযোধ্যা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এল। চায়ের সঙ্গে রাশীকৃত খাবার।

সত্যজিৎ বললে, এমন তো কথা ছিল না।

—মানে ?

—আমি চা খেতে এসেছি। ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে তা জানতুম না।

মুহূর্তের জন্যে নিজের অস্বস্তি ভুলে গেল বনশ্রী। হেসে ফেলল।

—তুমি সেই রকমই আছো দেখছি। কিছুই বদলাওনি ?

—তুমিই বুঝি বদলেছো ?—সত্যজিৎ বনশ্রীর চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে: তোমারও তো তেমনি পাগলামি এখনো আছে। মানুষকে খাওয়াতে গেলেই তাকে রাক্ষস ঠাউরে বসে থাকো।

তুমিও বদলাওনি। রক্তে আবার ঢেউ উঠল বনশ্রীর। আবার একটুখানি লজ্জা এসে তার মুখকে রাঙিয়ে দিলে। কিন্তু এবারে অন্য কারণ ছিল।

বনশ্রী বললে, হয়েছে, বাজে কথা বন্ধ করো। খাও এখন।

—তথাস্তু।—সত্যজিৎ খাবারের প্লেট টেনে নিলে নিজের দিকে।

পনেরো

চা খাওয়া শেষ হলে সত্যজিৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে ছটা।

একটু আগেই দুজনে চুপ করে গিয়েছিল। হয়তো একই কথা ভাবছিল একসঙ্গে। এই ঘরে এমনি ভাবেই কতদিন মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে ওরা। কিন্তু সেদিন চোখের রঙ ছিল আলাদা—জীবনের অন্য একটা অর্থ ছিল। সেদিন সত্যজিৎ মুখার্জি কিংবা বনশ্রী রায়ের কোনো ব্যক্তিরূপ কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। ভাব সেদিন ব্যক্তিত্বকে আড়াল করে রাখত, রেখার চাইতেও বেশি ছিল রঙ। সে বিগত জন্মের কথা।

তখন দেওয়ালে টাঙানো ওই হরিণের মাথাটার ওপর আলো পড়লে—ডালমেলা শিঙের ছায়া দেওয়ালের ওপর বিকীর্ণ হয়ে গেলে, কেমন যেন রহস্যময় মনে হত ; ঘড়ির পেণ্ডুলামের সোনালি রঙটা আরো উজ্জ্বল ছিল—ওর মুহূর্ত গণনা এই ঘরটার হৃৎস্পন্দনের মতো বাজতে থাকত ; ম্যাডোনা-ডেল্-গ্র্যাণ্ডুকার নকল ছবিটা কৌতূহলভরা জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। আর—

কিন্তু সে অতীত জন্ম। একদিন সহজ ভাবেই বনশ্রী নিজের হাতে সুতো কেটে দিয়েছিল। কেন কেটে দিয়েছিল বনশ্রীই তা জানে। সেদিন সে-কথা নিয়ে সত্যজিৎ ভাবতে চায়নি—আর আজকে তা জিজ্ঞাসা করবার অর্থই হয় না। এমন কি বনশ্রীর সঙ্গে দেখা না হলে যে শান্ত অনাসক্তিতে মন তলিয়ে থাকত, দেখা হওয়ার পরেও তার বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে বলে অনুভব করে না সত্যজিৎ। কেবল এক এক টুকরো স্মৃতি। কিন্তু তারা তো বুদ্‌বুদ।

সন্দেহ নেই এ ঘরটা পুরনো হয়ে গেছে। হরিণের শিঙে মাকড়সার জাল। পেণ্ডুলামের শব্দ যান্ত্রিক। মেজের ছেঁড়া কার্পেট চোখে আঘাত দেয়—একটা নেপথ্য দৈন্যের আভাস বয়ে আনে। জি-কে রায় এখন আরো দশজন পেন্‌সন্‌-পাওয়া মানুষের মতোই সাধারণ ভগ্নোত্তম ব্যক্তিত্ব। বনশ্রী ক্লান্ত হেডমিস্ট্রেস্‌। সত্যজিৎ বিরক্ত মোহমুক্ত অধ্যাপক। অবশ্য কখনো কখনো অলস মুহূর্তে দক্ষিণের জানলা খুলে দেয় পূরবী—কিন্তু সেও কিছুক্ষণের আত্মবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। আর দেড় বছর পরেই পূরবীও কোথাও থাকবে না—জীবনের কোনোখানেই নয়, অসংখ্য নতুন মুখের ভিড়ে নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। আরো কিছুদিন পরে পথে-ঘাটে পূরবীকে হঠাৎ দেখলে চিনতেও পারবে না, হয়তো চশমার পাওয়ার বাড়তে বাড়তে চোখের দৃষ্টি তার আরো ম্লান হয়ে যাবে।

কে থাকবে?

সত্যজিৎ শিউরে উঠল একটুখানি। একটা অশুভ ভবিষ্যতের ছাপ। কে থাকবে? সে আর বনশ্রী। এই পুরনো হয়ে যাওয়া ঘরটার মতো দুটো পুরনো মন। বৈষয়িক, ব্যবহারিক, সন্দিগ্ধ, স্বার্থপর।

যেন এই মুহূর্তে তারা দুজনেই সেই ভবিষ্যতের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যজিৎ আবার ঘড়ি দেখল।

ঠাণ্ডা চায়ের শেষ অংশটুকুতে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিলে বনশ্রী। তারপর সরিয়ে দিলে পেয়ালা।

—ঘন ঘন ঘড়ি দেখছ কেন অমন করে?

সত্যজিৎ হাসল।

—এমন কিছু না। তবে—

—তবে? টিউশন?—বনশ্রী চোখ তুলে ধরল।

—ওটা তো মাস্টারির অ্যাপেন্‌ডিক্স—নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করল সত্যজিৎ: অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ও বলা যায়। কিন্তু ও পাট আজ নেই। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব ভাবছি।

—বাড়ি সম্পর্কে আজকাল তুমি খুব ডিউটিফুল হয়ে উঠেছ।—বনশ্রীও এবার শান্ত-ভাবে হাসল। আর একটা বুদ্বুদ স্মৃতি। ছাত্রজীবনে বাড়ি ফেরার জন্যে অনেকদিনই শেষ বাস ধরতে হয়েছে সত্যজিৎকে। তখন হাতখরচার জন্যে দরাজভাবে টাকা দিতেন শিবশঙ্কর। বই কিনে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকত—লাস্ট্ বাস মিস করেও ট্যাক্সি চাপতে অসুবিধে হত না।

বান্ধব জগতে সত্যজিৎ এখন প্রায় নিঃসঙ্গ। সামাজিক পরিচিতির অভাব নেই—কিন্তু চিৎকার করে আড্ডা দেবার মতো অন্তরঙ্গকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সিনেমা এখন বিরক্তিকর। অভ্যাসে বই কেনে—কিন্তু তর্ক করবার লোক নেই বলে নতুন কেনা সব বই পড়াও হয় না। বাড়ি সম্পর্কে ডিউটিফুল হয়ে নয়—বাইরের আকর্ষণ নেই বলেই নটার মধ্যেই সে বাড়ি ফেরে আজকাল। বাইরের নিঃসঙ্গতার চাইতে ঘরের নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি সহনীয়।

আজ অবশ্য তাড়াতাড়ি ফেরবার মানসিক তাগিদটা অন্য কারণে। বীথি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে বলে নয়—খবরটা বাবার কানে গেলে অন্যরকম একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রীতির বুদ্ধির ওপর সত্যজিতের আস্থা নেই। মনে হচ্ছে আজ তার বাড়িতে একটুখানি পাহারা দেওয়া দরকার। বীথি যদি জামিন পেয়ে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে তা হলে আলাদা কথা, আর তা যদি না হয়—

কিন্তু ও-সব বনশ্রীকে বলে লাভ নেই।

একটু আগেই নিজের অসতর্ক প্রসাধনের জন্যে যে-লজ্জাটা বনশ্রীকে পীড়ন করছিল, সেটা ক্রমশ অর্থহীন বিরক্তির রূপ নিচ্ছিল। বনশ্রী তেমনি দু'চোখ মেলেই তাকিয়ে রইল সত্যজিতের মুখের দিকে—কেবল আস্তে আস্তে ভ্রূ দুটো কুঁচকে এল একটুখানি।

—কথা বলছ না যে?

সত্যজিৎ আচ্ছন্নতা থেকে জাগল।

—কী বলব?

বনশ্রীর স্বরে চাপা ঝাঁঝ মিশল।

—সোজাসুজি বলবে, আমি কাজের লোক, খামোকা এ-ভাবে ডেকে আমার সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না। ভারী বিরক্তি বোধ করছি।

সত্যজিৎ সচকিত হয়ে উঠল।

—কি ছেলেমানুষি হচ্ছে বনি।

বনি! মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই দুজনে চমকে উঠল একসঙ্গে—বিদ্যুৎ খেলল ঘরের ভেতর। কোন্খান থেকে কথাটা এমনভাবে ফিরে এল! বনশ্রীর সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে একটা ইংরেজী শব্দের অর্থ যোগ করে নিয়ে ওই নামে মধ্যে মধ্যে ডাকত

সত্যজিৎ—যেদিন ইডেন্ গার্ডেনের আলো-অন্ধকারে হঠাৎ হাতে হাত মিশে যেত—আর ব্যাণ্ড্স্ট্যাণ্ড থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের মতো গর্জে উঠত মিলিটারী অর্কেস্ট্রা।

বনশ্রী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি আসছি এখুনি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। বোকার মতো তাকিয়ে রইল দেওয়ালের হরিণের মাথাটার দিকে। ভালমেলা শিশুটার ছায়া আবার সেই পুরনো তাৎপর্যে ভরে উঠতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না মাকড়সার জাল জমেছে তার গায়ে। 'বনি'। কথাটা হঠাৎ অমন করে এসে না পড়লেও পারত। বুদ্বুদ। একটু পরেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু বনশ্রী কি রাগ করল? সে এখন হেডমিস্ট্রেস্—রাগ করা হয়তো অন্যায় নয়।

অস্বস্তিভরে সত্যজিৎ ভাবতে লাগল: কী করা উচিত এখন? উঠে চলে যাবে? অপমান বোধ করল নাকি বনশ্রী? বিদায় না নিয়ে চলে যাওয়াটাই কি এখন সৌজন্যসম্মত?

ঘড়িটা সমানে মুহূর্ত গুণছে। ক্লান্ত—কী আশ্চর্য ক্লান্ত! বনি ডাকটা বড় বেমানান এখন। এখানে।

বনশ্রী ফিরে এল। তার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা নতুন অনুভূতি এল সত্যজিতের। যেন এতক্ষণ একটা মুখোস পরে তার সামনে বসে ছিল বনশ্রী—এই মুহূর্তে সেটাকে সে খুলে রেখে এসেছে। একটা সুকঠিন গাম্ভীর্যের বলয় ঘিরে ধরেছে তাকে। ঠিক এমনি আবরণ নিয়েই বোধ হয় সে ক্লাসে গ্রামার পড়ায়।

এবার খুব সহজভাবেই বনশ্রী বললে, যে জন্যে ডেকেছিলাম তোমাকে। খুব সংক্ষেপেই সেরে নেব। বেশিক্ষণ আর আটকে রাখব না।

সত্যজিৎও সহজ হতে চেষ্টা করল। তাদের দুজনেরই বয়স বেড়েছে। জীবনকে তারা দেখেছে, চিনেছে জীবিকাকে। দাঁড়িয়েছে সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের সীমান্তে।

—যত তাড়া আমার ভাবছ, ঠিক ততটা ব্যস্ত আমি নই। তুমিও ব্যস্ত হয়ো না।

—না না, এমনিতেই তোমার দেরি হয়ে গেছে।—এবার বনশ্রীই দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালো: তোমাকে তো যেতেও হবে অনেক দূরে।—নিরুত্তাপ বৈষয়িকভাবে বনশ্রী বললে, একটু স্বার্থের খাতিরেই ডেকেছি।

—বলো।

—একটা গ্রামার আর কম্পোজিশনের বই লিখেছি। তোমাকে একবার রিভিশন করে দিতে হবে।

—তোমার বই আমি রিভিশন করব?—প্রগল্‌ভ ভদ্রতার চেষ্টা করল সত্যজিৎ: এত বিনয় কেন?

—বিনয় নয় সে তুমি নিজেই জানো।—তেমনি বৈষয়িক স্বরেই বনশ্রী বললে,

আসছে মাসেই বই প্রেসে যাবে। তুমি দেখে দিতে পারবে দশ-বারোদিনের মধ্যে? সময় হবে?

তোমার জন্যে আজও আমার সময়ের অভাব হয় না—এমনি একটা কথা মুখের কাছে এসেও থমকে গেল সত্যজিতের। না—আর ও-সব বলা যায় না।

—সময় করে নেব। দাও।

—আজ নয়। কাল বরং পাঠিয়ে দেব রীতেনের হাতে। আর শোন। দুশো টাকা পাবে রিভিশন ফী। আপত্তি আছে তোমার?

কোনো কারণ ছিল না। আজ যেখানে দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে, যে ব্যবসায়িকতার পটভূমিতে, যে বৈষয়িকতার মাঝখানে—সেখানে এ-ই স্বাভাবিক। তবু কোথায় একটা খোঁচা লাগল সত্যজিতের।

—সে কি কথা! টাকা দেবে নাকি তুমি?

—বাঃ, বিনা টাকায় খাটিয়ে নেব তোমাকে? তোমার সময়ের, পরিশ্রমের দাম নেই?—বনশ্রীর মুখের কাঠিন্য কোমল হল মুহূর্তের জন্যে—একটুখানি হাসির আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অবশ্য আমাকে নিজে থেকে দিতে হলে হয়তো তোমায় খানিকটা কনসেশন করতে বলতাম। কিন্তু টাকা আমি দেব না—দেবে পাব্‌লিশার। তা হলে কালই তোমায় একটা একশো টাকার চেক আর কপি পাঠিয়ে দেব।

—টাকার জন্যে এত তাড়া নেই। পরে হলেও চলবে।

বনশ্রী এবার স্পষ্ট করেই হাসল। ব্যবসার জগতে নেমে এসে আবার যেন অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে সে। বললে, টাকাটা পাব্‌লিশারের। একটু সাবধান থাকাই ভালো।

সত্যজিৎও হাসল।

—ঠেকে শিখেছ?

—ঠিক তাই।

কাজের কথা শেষ। এবার ওঠা যেতে পারে। সত্যজিৎ দাঁড়ালো।

—আজ আসি তা হলে।

—এসো।

পেছনে আর একবার ফিরে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এল সত্যজিৎ। এখন আর ফিরে তাকানোর কোনো অর্থ হয় না। সেদিন আর নেই।

পথে ঝলমল করছে সন্ধ্যা। কলকাতার চোখে নেশার রঙ। চলতে চলতে সত্যজিতের মনে হল, বনশ্রী একবার তাকে ভদ্রতা করেও জিজ্ঞাসা করতে পারত—সে আবার কবে আসবে।

আর ঠিক তখনি চোখে পড়ল দেওয়ালে একটা পোস্টার। সন্ধ্যার আলোয় রক্ত জ্বলছে তাতে। শিক্ষক ধর্মঘট। লাটভবনের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষটির মাথার চুলগুলো দুপুরের রোদে রূপোর মতো চিকমিক করছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অনন্ত সেনগুপ্ত।

আর বীথি।

একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে সত্যজিৎ সামনের ট্রাম-স্টপটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

* * *

তাসের আড্ডায় বার বার হেরে যাচ্ছে রীতেন। কিছুতেই মন বসছে না।

সঙ্গী বিরক্ত হয়ে উঠল।

—কী কাণ্ড করছ বলো তো? কী লীড্ দিলে? মাটি করে দিলে শিয়োর গেমটা? হোয়াট্'স্ রং উইথ্ ইউ?

ইয়েস, সাম্থিং রং—অপ্রতিভ ভাবে হাসল রীতেন। হাতের তাসগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে বললে, ওয়েল নাই, দ্যাট্‌স্ এনাফ্!

—তার মানে? আর খেলবে না?

—নাঃ, মুড্ নেই।

সংক্ষেপে উঠে পড়ল রীতেন। পথে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিজের মোটরবাইকটার সামনে।

গ্রামোফোনে কোথায় বিলিতী প্রেমের গান বাজছে। রীতেনের চেনা। গিল্‌বার্ট। বেস্ট্ লাভ্‌ড্ গিলবার্ট।

গ্লোব ট্রটার রীতেন সম্প্রতি মুখার্জি ভিলার ছোট গণ্ডির মধ্যে পাক খাচ্ছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না প্রীতিকে। রিয়্যালি শি ওয়াজ—

আবার কবে যাওয়া যায় মুখার্জি ভিলায়? কী উপায়ে? কিংবা কোনো উপায়েরই দরকার নেই। খুব সহজেই যাওয়া যেতে পারে। গেলে হয়তো কেউ কিছু মনে করবে না।

দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে চলে গেল তার পাশ দিয়ে। একজন যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার, কী বললে তার সঙ্গিনীকে, তারপর দুজনেই হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের থুত্‌নিতে হাত দিলে রীতেন।

—এর জন্যে? এই দাড়ির জন্যে? রাস্তার ওপারে ময়দানের অন্ধকার-মাখা গাছ-গুলোর দিকে তাকিয়ে রীতেন ভাবল: ডু আই লুক কমিক্যাল্? রিয়্যালি কমিক্যাল্?

ষোলো

বনশ্রী 'কপি' পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে একটা একশো টাকার চেক। কথা রেখেছে। ব্যবসার ব্যাপার যখন, ব্যবসায়ীভাবে হওয়াই ভালো।

দু'দিন একেবারে সময় পায়নি সত্যজিৎ। ইন্দ্রজিৎ বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল—বাড়িতে এক লাইনও লেখাপড়া করবার জো ছিল না। কাটা আঙুল নিয়েও রঘুকে কড়া নজর রাখতে হয়েছে ওর ওপর। আজ সকাল থেকে ইন্দ্রজিৎ নিঝুম মেরেছে। ওর নিয়মই এই। দিন কয়েক অবিশ্রান্ত ক্ষ্যাপামির পরে আবার চার-পাঁচদিনের জন্যে একেবারে শান্ত হয়ে যায়—সতেরো-আঠারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, জোর করে নাওয়াতে খাওয়াতে হয়। যেন অসহ্য শ্রান্তির পরে ওইটুকু তার বিশ্রাম।

বাবার মেজাজও খুব স্বাভাবিক ছিল না। দিন দুই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছেন। শরীরের এই রকম অবস্থায় এভাবে মদ খাওয়া যে ঠিক নয়—সেকথা সত্যজিৎ তাঁকে বোঝাতে পারেনি। জীবনে কেউ-ই কোনোদিন বোঝাতে পারেনি শিবশঙ্করকে। পারলে মুখার্জি-ভিলার ইতিহাস অন্যরকম হত।

কিছুই করবার নেই—সত্যজিৎ জানে। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুখার্জি ভিলা। কেবল তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা মুখার্জি ভিলা দখল করবে—সত্যজিতের অধ্যাপনার সামান্য টাকা আর দুখানা ভাড়াটে বাড়ির সাধ্য নেই চারটে মর্টগেজের হাত থেকে একে বাঁচায়। শুধু মুখার্জি ভিলাই নয়—ওই বাড়ি দুটো বেচেও দেনা শোধ হবে কিনা সন্দেহ। তারপর—তারপর কলকাতার অসংখ্য অসংখ্য মধ্যবিত্তের সঙ্গে একই ইতিহাসের পথ দিয়ে যাত্রা করতে হবে।

কিন্তু ভেনাস আর মার্সের ছবিটা? কী গতি হবে ওটার? একটা অর্থহীন কৌতূহলে ভাবতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ। খুব সম্ভব কোনো নতুন কোটিপতির নতুন মজলিশ আলো করে শোভা পাবে। যতদিন পৃথিবীতে বিকৃত মন বেঁচে থাকবে, তত্দিন বিকৃত কালের মৃত্যু নেই।

বারান্দায় অর্কিড কাঁপিয়ে এক ঝলক পুবের হাওয়া ঘরে এল—বনশ্রীর পাণ্ডুলিপি খস খস করে উঠে সত্যজিৎকে কাজের কথা মনে করিয়ে দিল। অনর্থক দুর্ভাবনা ছেড়ে সত্যজিৎ চোখ নামালো লেখার ওপর। গালিভার্স্-এর নোট লিখেছে বনশ্রী। 'গালিভার্স্ ট্র্যাভেল্স্'! নিতান্ত শিশুভোলানো গল্পের আড়ালে মানুষের সম্পর্কে কী ঘৃণাই ঘোষণা করে গেছেন জোনাথান সুইফ্‌ট্! কী যন্ত্রণা—কী ক্রোধ! লোকটা না পারল ভালোবাসা নিতে—না পারল ভালোবাসতে। মিথ্যেই সারাজীবন কাটল। অপেক্ষার মধ্যে কাটিয়ে গেল। ভ্যানেসার চোখের জলের দাম দিতে পারলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এমনভাবে পাগল

হয়ে যেত না। কে জানে!

"He gave the little wealth he had
To build a house for foods and mad
And show'd by one satiric touch—"

নাঃ—জোনাথান সুইফ্‌ট্ থাকুক। বনশ্রী কী লিখেছে তাই দেখা যাক।

মিনিট কয়েকের জন্যে কাজে ডুবে রইল সত্যজিৎ। দু-একটা লাইন এদিক-ওদিক করে দেওয়া, এক-আধটা শব্দের সামান্য অদল-বদল করা। বনশ্রী সত্যিই বিনয় করেছিল। বিশেষ কিছু তার করবার নেই। সুন্দর ইংরিজি লিখত একদিন। জেমস্ জয়েসের ওপর সেই প্রবন্ধটা—

বীথি এল।

—খুব ব্যস্ত আছেন স্যার?

সত্যজিৎ চোখ তুলল।

—ইয়ার্কি হচ্ছে?

—যাঃ, ইয়ার্কি কেন? ক্লাসে তো স্যার বলতেই হয়। কোন্ দিন ফস্ করে কলেজেও ছোড়দা বলে ডেকে ফেলি তাই বাড়িতেও অভ্যাস রাখছি।

বীথি হেসে উঠল, চক্‌চক্ করে উঠল চোখ।

—খুব হয়েছে, তোকে আর পাকামো করতে হবে না। তোদের কেস্ কবে? বারোই?

—তাই তো শুনেছি। কী আর হবে! দিন কয়েক জেল খাটতে হবে হয় তো। —সামনের চেয়ারটায় বীথি বসে পড়ল, আর তখনই চোখ পড়ল সত্যজিতের।

—বাঁ হাতটা ও-ভাবে রেখেছিস কেন রে?

বীথি একটু হাসল।

—ও কিছু না। একটু চোট লেগেছিল।

—কী করে লাগল?

—ভ্যানে তোলবার সময়।

—ওঃ!—সত্যজিৎ চুপ করল। কিছু নয়, সত্যিই ও কিছু নয়। এখনো অনেক দাম দিতে হবে। অনন্ত সেনগুপ্তকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে সেই মানুষটাকে —রোদে যাঁর মাথায় শাদা চুলগুলো রুপোর মতো ঝিকমিক করছিল—আর নিকেলের চশমা দুটো জলন্ত অগ্নিনেত্রের মতো তাকিয়ে ছিল ড্যাল্‌হাউসি স্কোয়ারের দিকে।

—আচ্ছা ছোড়দা?—বীথি প্রশ্ন করল।

—কী বলছিস?

—তোমরা কিছু করবে না? তোমাদের প্রফেসার অ্যাসোসিয়েশন?

অস্বস্তিতে নড়ে উঠল সত্যজিৎ।

—আমরা আবার কী করব?

—বাঃ, তোমরাও তো এডুকেশননিস্ট্। তোমাদের কোনো কর্তব্য নেই?

সত্যজিৎ বিষাদ ভাবে হাসল: আমরা এডুকেশনিস্ট্ বটে—কিন্তু অনেক ওপর-তলায় আমাদের বাস। আমরা জনকয়েক সামান্য টীচারের জন্যে মাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারি, তার বেশি আর কিছু করতে পারি না।

—চারদিকে যখন আগুন ঘিরে আসছে, তখন নিজেদের ভ্যানিটি নিয়ে তোমরা কী করে বাঁচবে ছোড়দা?—বীথির স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে এল, জ্বলে উঠল চোখ: সত্যি ঠাট্টা নয়। তোমরাও টোকেন স্ট্রাইক করো না একদিন, অনেক জোরদার হবে আন্দোলন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। টোকেন স্ট্রাইক! দু বছর আগেও হয়তো চেষ্টা করা যেত। কিন্তু আপাতত সে-কথা আর ভাবাই চলে না। অনেক ঝড় বয়ে গেছে এর ভেতর—অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। বছরে একটা কনফারেন্স—গোটা কয়েক সাধু প্রস্তাব—নানা বিশ্ববিদ্যালয় আর সরকারের কাছে প্রস্তাবের খসড়া পাঠানো। ঝানু অধ্যাপকদের বাঘা বাঘা বক্তৃতা, তারপরেই সব শেষ। মাঝখানে যে শক্তি নিয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় মাথা তুলেছিল অ্যাসোসিয়েশন, বুদ্ধিজীবীর অহমিকায়, ভ্রান্তির পাপ-চক্রে, স্বার্থের তুচ্ছতায়, আর শ্রেণীসুলভ নির্বিকার ঔদাসীন্যে তার সমাধি রচিত হয়ে গেছে অনেকদিন।

—সত্যি, তোমরা একদিন টোকেন স্ট্রাইক করলে—

—থাম্ থাম্, খুব হয়েছে।—আলগাভাবে একটা ধমক দিলে সত্যজিৎ: নিজের তো পড়াশুনো চুলোয় দিয়েছিস, আমরা স্ট্রাইক করলে আরো সুবিধে হয়—না?

বীথি এবার উচ্ছলিতভাবে হেসে উঠল।

—এ একেবারে হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্—প্রিন্সিপ্যালের প্রতিধ্বনি—স্যারের মতো কথা। আমি কিন্তু স্যারের মতামত চাইনি—ছোড়দার কথা শুনতে চেয়েছিলুম।

সত্যজিৎ হাত বাড়িয়ে বললে, ছোড়্দা এবার তোমার কান টেনে ধরবে। যা, এখন পালা এখান থেকে, বিরক্ত করিসনি।

বীথি হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালো।

—কথাটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে।

—পালা বলছি। সারাটা বিকেল আড্ডা দিয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা ফাজলামো করতে এসেছে। পড়াশুনো নেই?

—যাচ্ছি পড়তে। গিয়ে বসছি তপস্যায়। পার্সিভ্যালের এই মার্চেন্ট-অব-ভেনিস্‌টা

নিলুম তোমার টেবিল থেকে।

—পার্সিভ্যালের সৌভাগ্য।

—আর ইউনিভার্সিটিরও—বলে বই নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বীথি।

মুখার্জি ভিলায় এই একটি আলো। একটি মাত্র আলো। কতক্ষণ জ্বলবে? হঠাৎ নিবে যাবে একদিন? না জ্বালিয়ে তুলতে পারবে সকলকে?

'গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স'-এ আবার মন দিতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ, কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। তারও ছাত্রজীবন ছিল, ইউনিয়ন ছিল, উত্তেজনা ছিল, কলকাতার পথে পথে অনেক ঝড়ের ডাকে সে-ও সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সে-ও কি কোনোদিন ভেবেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই এমন একটা মানসিক শূন্যতায় সে পৌঁছুবে—কোনো কিছু করবার উদ্যম থাকবে না—যেমন চলেছে তাকে মেনে নিয়ে কাটিয়ে যাবে দিনের পর দিন? কেবল স্টাফ্‌রুমের বদ্ধ আবহাওয়ায়, হাজিরা বই, ডাস্টার, ভাঙা খড়ির টুকরো, চায়ের পেয়ালা, সিগার আর সিগারেটের গন্ধের ভেতরে কথার বুদ্‌বুদ তৈরি করে মানসিক আভিজাত্যকে ঘোষণা করতে হবে?

সত্যজিৎ একটা চুরুট ধরালো। কেন এমন হয়? আজকের অগ্নিগর্ভ ছাত্র কাল অধ্যাপকের চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে মিইয়ে যায় কী করে? কেন তার মনে হতে থাকে—তাদের যুগটাই ছিল ভালো, এ যুগের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার?

যাঁদের চুলে পাক ধরেছে, তাঁরা অনেকে আরো নিশ্চিন্ত। স্টাফ্‌রুমের কোণায় ডেক-চেয়ারে ঘুমোতে ঘুমোতে তাঁদের কেউ কেউ তর্কের আওয়াজে চমকে জেগে ওঠেন। বিরক্ত হয়ে হাই তুলে পাশের প্রৌঢ়কে বলেন, খাওয়াটা আজ বড্ড বেশি হয়ে গেছে—বুঝলেন। সস্তায় একটা বড় ইলিশ এনেছিলুম—

আরো একটু বয়েস বাড়লে হাঁপানি আর ডায়াবেটিস তত্ত্ব; সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলীর রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী।

'For Thine is the Kingdom—'

ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবু এই হচ্ছে মহাজনপন্থা! সত্যজিৎ সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকেই চলেছে। তান্ত্রিক সাধু। তাবিজ। বাত। 'এরা গোল্লায় গেছে —এদের কিচ্ছু হবে না।' হেড্‌এগ্‌জামিনারশিপ্‌। বড়বাজারের শাঁসালো প্রাইভেট টিউশন। কলেজ কমিটি। ভবিষ্যৎ ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা। পোর্টকমিশনারে জানাশোনা কেউ আছে মশাই? আমার ছেলেটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করছি—'

একটা অঙ্কের যোগফল। সত্যজিৎ আপাতত ধাপে ধাপে সেই অঙ্কটাকেই সাজিয়ে

চলেছে। নিজের জন্যেও।

বীথি ফিরে এল।

—ছোড়দা ?

—আবার কী চাই ?

বীথি একটু ইতস্তত করল।

—কী বলছিলি ?

—দিদিকে বোধ হয় রীতেনবাবুর সঙ্গে ছেড়ে না দেওয়াই উচিত। একে ক্লাউনের মতো চেহারা—দেখে মনে হয় যেন সার্কাসের দল থেকে পালিয়ে এসেছে। লোকটাও বোধ হয় ভালো টাইপের নয়।

রীতেন ? হ্যাঁ—ঠিক কথা। রীতেন দি গ্রেট ! সত্যজিৎ আশ্চর্য হয়ে বললে, রীতেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল নাকি প্রীতি ?

—হ্যাঁ, রেডিয়োতে গেছে। সন্ধ্যায় দুটো প্রোগ্রাম আছে ওর।

—হঠাৎ রীতেন কেন ? রঘুই তো যায় বরাবর।

—রীতেনবাবু কাল বিকেলে এসে গল্প করে গেছে অনেকক্ষণ। বাবার কাছে গিয়ে খুব জমিয়ে নিয়েছিল। কী থার্ডক্লাস রসিকতা আর হাউ হাউ করে হাসবার কী বিকট ভঙ্গী ! বাবাকে দারুণ ইম্প্রেস করেছে।

চুরুটের গোড়াটা কামড়ে ধরল সত্যজিৎ।

—ওঃ !

—আমার কাছে বিশেষ পাত্তা পায়নি। বীথি বলে চলল : কিন্তু বাবা দেখলুম খুব হাসছেন ওর কথায়। আর দিদি তো একেবারে মুগ্ধ। বাবাই নিশ্চয় দিদিকে ওর সঙ্গে রেডিয়োতে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছেন।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল।

—তোমার কিন্তু দিদিকে বারণ করা উচিত ছোড়দা। রীতেনবাবু লোক ভালো নয়।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব। ক্লান্ত গলায় জবাব দিলে সত্যজিৎ। তার আর ভালো লাগছে না। মুখার্জি-ভিলা নিজের হাতে নিজের ইতিহাস রচনা করে চলেছে। সেখানে কারো আর কিছু করবার নেই।

বাবার ঘরে রেডিয়ো বেজে উঠল। প্রীতির প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

"আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না—"

সতেরো

পাশের বাড়িতে নতুন রেডিয়ো কেনা হয়েছে একটা। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সেটা বাজে। গান-বাজনা-বক্তৃতা-ইংরেজী-বাংলা-হিন্দী-তামিল। ভল্যুম একেবারে শেষ পর্দায় তোলা। নতুন রেডিয়ো কেনবার আনন্দে বাড়িসুদ্ধ সবাই ভুলে গেছে—ওটা কেবল নিজেদেরই শোনবার জন্যে, সমস্ত পাড়াকে শোনাবার জন্যে নয়।

পূরবীর যন্ত্রণাই হয়েছে সব চাইতে বেশি। রেডিয়োটা রাখা হয়েছে একতলার ঘরে—প্রায় তার জানলাটার মুখোমুখি। দিনরাত ওই ধ্বনি-তরঙ্গ এসে সোজাসুজি তাকেই আক্রমণ করে। জানলা বন্ধ করেও নিস্তার নেই।

আজও বই খুলে চুপ করে বসেছিল পূরবী। সামনে বইয়ের পাতা খোলা—একটা লাইনও পড়া যাচ্ছে না। পুরনো বাল্‌বটার আলোর রঙ হলদে হয়ে গেছে—ছোট ছোট হরফ পড়তে এমনিতেই কষ্ট হয়, মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জড়িয়ে যেতে চায় অক্ষরগুলো। তার উপরে এই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের তরঙ্গ—নাঃ, অসম্ভব।

সুরটা বসন্ত—পরজ-বসন্ত। অসীম বিরক্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে গানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল মনটা। আঃ—আর একটু কমিয়ে দেয় না কেন—আরো ভালো লাগত। বেশ গাইছে মেয়েটি—চমৎকার সঙ্গত হচ্ছে তবলায়। বাবার এক সময়ে তবলা-বাজিয়ে হিসেবে বেশ নাম ছিল, ছেলেবেলা থেকেই তবলার ভালো-মন্দ অল্প-বিস্তর সে বোঝে। গানের চর্চাও কিছু কিছু সে শুরু করেছিল, কিন্তু পড়ার তাগিদে তানপুরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বাবা সংসার চালাতে পারছেন না, দাদার কাছ থেকেও বিশেষ কোনো ভরসা নেই। সে যদি পাস করে একটা চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে, তা হলে সবাই অন্তত দু'বেলার দু'মুঠোর জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

মনে গান ছিল—গলাও খুব খারাপ ছিল না। তবু গানকে তার বিদায় দিতে হয়েছে। এই জন্যেই কখনো কোনো ভালো গান শুনলে কেমন যন্ত্রণা বোধ করে সে—সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, তারই জিনিস কেড়ে নিয়ে কারা যেন সেটাই তার চোখের সামনে এনে তুলে ধরছে বার বার।

তার ক্লাসের হাসি দুখানা রেকর্ড করেছে—রেডিয়োতে গানও করে মধ্যে মধ্যে। হাসির বাবা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে চাকরি করেন—অনেক টাকা মাইনে পান। বাইরে থেকে বড় বড় ওস্তাদেরা কলকাতায় এলে অনেক সময় তাদের বাড়িতে জলসা বসান। হাসি সগর্বে নিমন্ত্রণ করে তার বন্ধুদের। অবশ্য পূরবীকে কখনও বলে না—আর বললেও সে যেত না।

পরজ-বসন্ত জমে উঠেছে। তবলার সঙ্গে সঙ্গে পূরবীর আঙুলগুলো নিজের অজান্তেই

বেজে চলেছে টেবিলের ওপর। হঠাৎ কে মাঝখানে রেডিয়োটাকে বন্ধ করে দিলে। চমকে উঠল পূরবী। ঠিক যেন কে একটি সুন্দরী মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলল।

পয়সা আছে—দামী রেডিও কিনেছে। ইচ্ছেমতো যখন খুশি বাজবে। তাই বলে গান বুঝতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। পূরবী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

এখন শান্তি। এবার পড়ায় মন দেওয়া যেতে পারে।

তবু মন বসল না। বাল্‌বটার হলদে আলো আরো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন। বইয়ের হরফগুলো গায়ে-গায়ে এসে মিশেছে, প্রত্যেকটা লাইন যেন এক-একটা সরল রেখায় পরিণত হয়ে গেছে। আবার নিঃশ্বাস ফেলল পূরবী। চশমা খুলে শাড়ির আঁচলে পরিষ্কার করতে লাগল কাচ দুটো।

মা এলেন।

—পাশের বাড়ির মাসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। ডালটা চাপিয়ে দিয়েছি, যদি আসতে দেরী হয় একটু দেখিস।

—আচ্ছা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মা আবার থেমে দাঁড়ালেন।

—সতুর তো এই সপ্তাহে একবার আসবার কথা ছিল। কই, এলো না তো!

—ব্যস্ত লোক মা—বোধ হয় সময় পাননি। তা ছাড়া ওঁকেও টিউশন করতে হয়।

—টিউশন করতে হবে কেন? এত বড় বাড়ির ছেলে—ওদের টাকার অভাব কী? —মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

পূরবী জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই। তা ছাড়া এ কথা কোনোদিন সে ভাবেওনি।

মা চলে গেলেন।

সত্যজিৎ। ওই আর একটা অস্বস্তিকর চিন্তা। সেই একা ক্লাস করতে যাওয়া। ক্লাসের—শুধু ক্লাসেরই নয়, গোটা কলেজেরই সব মেয়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। বীথি বক্তৃতা দিচ্ছে পুবদিকের সিঁড়ির তলায়।

: একটা দিন ক্লাসে না গেলে আপনাদের পড়াশুনার কোনো মারাত্মক ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর ফলে শিক্ষকেরা তাঁদের সংগ্রামে জোর পাবেন, তাঁদের দাবি আরো জোরালো হয়ে উঠবে—তাঁরা…

তবু ক্লাসে গিয়েছিল পূরবী।

কলেজ-স্টাইপেণ্ড পায় বলে? কিন্তু তার মতো আরো অনেকেই তো স্টাইপেণ্ড

পায়। তারা তো আসেনি। তবু একা সে ক্লাসে কেন গিয়েছিল?

ক্লাসের জন্যে নয়—সত্যজিতের জন্যে?

পূরবীর হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। এ কী হচ্ছে তার—কেন এমন হচ্ছে? এমন অসম্ভব কল্পনা তার কেন আসে—কোথা থেকেই বা আসে? জাতে মেলে না, অবস্থায় মেলে না, বয়েসের দূরত্বও কম নয়। তা ছাড়া সে নিজে যা খুশি ভাবুক—এমন অসম্ভব কথা শুনলে সত্যজিৎ—

লজ্জায় মরে গেল পূরবী। কেন এমন হল? এ-সব চিন্তাকে সে নিজেও তো কখনো প্রশ্রয় দিতে চায়নি। অথচ এরা কখন নিঃশব্দে এসেছে একটা ছোট্ট সরু লতার মতো, আস্তে আস্তে জড়াতে জড়াতে বজ্র-বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। যখন সজাগ হয়ে উঠেছে, তখন আর মুক্তির উপায় নেই।

ক্লাসের মেয়েরা বোধ হয় সবাই বোঝে। তাই যত রাগ করেছে, ঠাট্টা করেছে তার চাইতেও বেশি।

একজন তো স্পষ্টই বলেছে ওর কথা ছেড়ে দাও। প্রোফেসার মুখার্জির ক্লাসের জন্যে ওর আলাদা রকমের আকর্ষণ আছে।

পূরবী কোনো জবাব দেয়নি। এমনিতেই সে বেশি কথা বলতে জানে না, শুধু মুখ লাল করে উঠে গেছে সামনে থেকে।

তারপর বীথি যখন জামিন নিয়ে কলেজে এল—সেদিন কমনরুমে তার কী অভ্যর্থনা! একজন আবার প্রস্তাব করেছিল, এই উপলক্ষে থার্ড ইয়ারের পূরবী দত্তের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আমরা।

বীথিই রক্ষা করেছিল অবশ্য। বলেছিল, এ-সব তোমাদের ভারি অন্যায়। কেন মিথ্যে ডিস্টার্ব করছ ওকে?

কিন্তু অপমান নিশ্চয় করতে পারে ওরা—সে অধিকার ওদের আছে। কিন্তু পূরবী কী করে অস্বীকার করবে—অধ্যাপক সত্যজিৎ সম্পর্কে যে-কথা সে ভাবে, সে-সব ভাবা উচিত নয়? তার নিজের চাইতে কে আর বেশি জানে, সত্যজিতের পড়ানোর চাইতেও সে তার গলার আওয়াজ বেশি করে শোনে—চোখ তুললেই দেখতে পায়, সত্যজিতের হাতে লাল পাথরের আংটিটা একটা আশ্চর্য সংকেতের মতো জ্বলজ্বল করছে?

একটা কান্নার মতো কী যেন উঠে আসতে চাইল তার বুকের ভেতর। এভাবে চললে আসছে পরীক্ষায় সে ফেল করবে। হয়তো সত্যজিতের পেপারেই ফেল করবে।

পাশের বাড়িতে আবার রেডিয়োটা খুলে দিয়েছে। বীভৎস মোটা গলায় কে যেন বক্তৃতা শুরু করেছে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধে কতগুলো কটমটে কথা এক-একটা করে হাতুড়ির ঘায়ের মতো কানে লাগছে এসে।

সত্যজিৎ এ-সপ্তাহে আসবে বলেছিল, আসেনি। সেদিন সে একা ক্লাসে গিয়েছিল বলেই কি ঘৃণা হয়েছে তার ওপর ? ভেবেছে, মেয়েটা কী নির্লজ্জ আর হৃদয়হীন।

পূরবী নিষ্ঠুরভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যেমন করে হোক—থার্ড ইয়ার শেষ হলেই এ কলেজ থেকে সে ট্রান্‌স্‌ফার নেবে। এখানে আর তার পড়া চলে না।

রান্নাঘর থেকে একটা তীব্র পোড়া গন্ধ ভেসে এল। ডালের জল উথ্‌লে বোধ হয় উনুনে পড়েছে। চমকে উঠে পড়ল পূরবী। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেও তার মনে হল, সত্যজিৎ আসতে পারে। আজ, এখনই এসে পড়তে পারে হয়তো।

সত্যজিৎ দাঁড়িয়েছিল কার্জন পার্কের পাশে। রেলিঙে হেলান দিয়ে।

দূরে ধর্মঘটী শিক্ষকেরা বসে আছেন পথের ওপর। স্থির, শান্ত, নির্বিকার কয়েকটি মানুষ। স্পষ্ট করে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। হয়তো অনন্ত সেনগুপ্ত আছেন—সেই মানুষটিও আছেন: আধপেটা খেয়ে যিনি এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত ছাত্র পড়িয়ে চলেছেন। এখান থেকে কাউকে চিনতে পারছে না সত্যজিৎ—মনে হচ্ছে কয়েকটা পাথরের মূর্তিকে পথের ওপর কেউ সাজিয়ে রেখেছে। পুজো-পার্বণের মুখে যেমনভাবে কুমারটুলীর দাওয়ায় শাদা রঙের একমেটে মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে উদ্দীপনা যেন আর নেই। ধর্মঘটীদের সংখ্যাও কমে আসছে। সাধারণ মানুষের মনেও আন্দোলনটা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে—সব মিলে একটা অভ্যস্ত ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে যেন। বিষণ্ণ ব্যথিত চোখ মেলে সত্যজিৎ তাকিয়ে রইল। একটা মীমাংসার কথাবার্তা চলছে বলেই কি ? অথবা—

—হ্যালো মুখার্জি!

পরিতোষ মৈত্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একদা সহকর্মী ছিল। বছর তিনেক আগে বড় গোছের একটা সরকারী চাকরি পেয়েছে। চুলের ধাঁচ থেকে পায়ের জুতোর পালিস পর্যন্ত বদলে গেছে পরিতোষের। যে কাজের যা ধরন। সত্যজিতের একটা আকস্মিক খেয়ালের মতো মনে হল, পরিতোষের হাতে টার্কিশ সিগারেটের একটা টিন নেই কেন।

পরিতোষ বললে, কী মনে হচ্ছে স্ট্রাইকের অবস্থা ?

—দেখতেই পাচ্ছ।—সত্যজিৎ মৃদু হাসল।

—ব্যাদার ডিজ্‌য়্যাপয়েন্টিং—এ ?—কলেজ জীবনে একটা ছাত্র-আন্দোলনের পাণ্ডা পরিতোষ বললে, এরকম হেস্টি স্ট্রাইক-ডিশিসন নেওয়া খুব অন্যায়। একটা অল্‌আউট কিছু করবার আগে নিজেদের শক্তি—স্ট্যামিনা—সব ভালো করে যাচাই করা দরকার। না হলে শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়ায়।

—কত অসহ্য হলে এ মানুষগুলোকে এমন করে পথে নামতে হয়, সে-কথা ভেবে দেখো পরিতোষ।

—এগ্‌জাক্‌ট্‌লি। কিন্তু 'মোরেল্‌' যদি ঠিক না থাকে—তা হলে কী মানে হয় এ-সবের?—পরিতোষ বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল: আরে—সবাই কি আর লেবার যে কথায়-কথায় অল্‌আউট স্ট্রাইক চালিয়ে যেতে পারে? মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট—সেন্স অব প্রেসটিজ—এসব যাবে কোথায়? খাঁটি হ্যাভ্‌-নট্‌ না হতে পারলে মরীয়া হওয়া যায় না। আমার কী মনে হয়, জানো? মিড্‌ল-ক্লাসের পক্ষে একটা পীস্‌ফুল সেটলমেন্টই হচ্ছে সব চাইতে ভালো উপায়। সংগ্রামে নামবার আগে আমাদের অন্তত দশবার ভেবে দেখা উচিত।

—কিন্তু তুমি তো জানো, পীস্‌ফুল সেট্‌লমেন্টের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

—বাট্‌ ইউ শুড্‌ ট্রাই এগেন। তা ছাড়া—এইবার বড় দরের সরকারী চাকুরে পরিতোষ মৈত্র কথা কইল: প্রেশার দেওয়ার আগে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে গবর্ণমেণ্টের হাতে এখন অনেক বড় বড় প্ল্যান—বিস্তর টাকা সে জন্যে খরচ করতে হবে। টীচারদের যখন এতদিন সহ্য হচ্ছিল, তখন আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরলে কোনো ক্ষতি ছিল না।

সত্যজিৎ হাসল। তর্ক করা যায়। কিন্তু কার সঙ্গে? পরিতোষ বদলে গেছে—মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত তার অন্যরকম হয়ে গেছে। একেবারে আলাদা দৃষ্টি, আলাদা মন নিয়ে সব কিছু দেখছে সে।

পরিতোষ বললে, আচ্ছা, আসি তবে। অনেকদিন পরে দেখা হল। সো গ্লাড্‌ টু মীট্‌ ইউ।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল। এগিয়ে গেল পরিতোষ।

হয়তো কিছু সত্যি থাকতে পারে ওর কথায়। হয়তো নিজেদের শক্তিকে ঠিকমতো যাচাই করে দেখা হয়নি। কিন্তু কেবল তত্ত্ব আর তর্কটাই কি আসল কথা? অভাবটা তো মিথ্যে নয়। প্রতিদিনের ক্ষুধাকে তো তর্ক দিয়ে মিথ্যে করা চলে না। এই দুঃসময়ের বাজারে যখন অন্তত তিনশো টাকার কমে একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার চলতে চায় না—তখন এই সব নিচের তলার শিক্ষকেরা কেমন করে বেঁচে আছেন—কী করে যে তাঁদের দু-বেলার সংস্থান হচ্ছে—সে রহস্যের কোনো মীমাংসা তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

একেবারে সর্বনাশের মুখে পা না দিলে কি এঁরা এমন ভাবে এসে এই পথের ওপর আশ্রয় নিতেন? আধপেটা খেয়েও যাঁরা এতদিন নিজেদের মনকে আঁকড়ে রেখেছিলেন—একেবারে অনাহারের বিভীষিকা না দেখলে তাঁরা কি আসন পাততেন ধুলোর ওপর?

হায় বুনো রামনাথ! তাঁকে সম্ভবত পঁয়ত্রিশ টাকা মণের চাল কিনতে হত না।

আর এ-কথাও তিনি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিলেন, তেঁতুল পাতা কিনতেও পয়সা খরচ করতে হয়?

ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সত্যজিৎ। বনশ্রীর বইটা দেখে রাখতে হবে। কালকেই অন্তত তার কিছুটা অংশ নেবার জন্যে লোক এসে হানা দেবে।

শ্রান্ত গতিতে দক্ষিণের দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ সত্যজিৎ থমকে গেল। একটু দূরেই একটা ট্যাক্সি বাঁক নিচ্ছে ময়দানের দিকে। সেই গাড়িতে রীতেন দি গ্রেট্। সেই বিচিত্র হাওয়াই সার্ট।

আর রীতেনের পাশে যে বসে আছে সে প্রীতি। প্রীতি ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রীতির সন্ধ্যায় রেডিয়ো প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু গার্স্টিন প্লেস্ থেকে মুখার্জি ভিলায় ফিরে যাওয়ার রাস্তাটা ময়দানের ভেতর দিয়ে নয়।

মাঠের অন্ধকারে গাড়ির পেছনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনো। সত্যজিৎ ভুরু কুঁচকে ওই আলোটার দিকেই তাকিয়ে রইল। রাত্রির ময়দান থেকে এক ঝলক অন্ধকার এসে তারও মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। বীথির জন্যে তার কোনোদিন কোনো দুর্ভাবনা হয় না—কিন্তু প্রীতিকে বিশ্বাস নেই।

মুখার্জি ভিলাকে এখনো অনেক ঋণ শোধ করতে হবে। এখনো তার অনেক দেনা বাকি। কিন্তু তাই বলে রীতেন?

অন্ধকারমাখা মন নিয়ে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সত্যজিৎ। তারপর নিয়নের কুশ্রী আত্ম-ঘোষণাগুলো যখন তার চোখে পিনের মতো খোঁচা দিতে লাগল, তখন সামনে যে বাসটা সে পেলো, লাফিয়ে উঠল তারই ওপরে।

আঠারো

"I cried for madder music and for stronger wine.

But when the feast is finished and the lamps expire.

Then falls thy shadow, Cynara—"

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করছে। ডিলোঁ নয়—ডাউসন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের জীবনে কি কোনোদিন এসেছিল সাইনারা? সত্যজিতের জানা নেই। মত্ততর সঙ্গীত আর তীব্রতর সুরার উৎসবে—দুটি চুম্বনবিহ্বল ওষ্ঠের মাঝখানে কোনোদিন কি কারো অপচ্ছায়া নেমেছিল? আদর্শ ভালো ছেলে ইন্দ্রজিৎ যা কোনদিন পায়নি—আজকে বিকৃত বুদ্ধি আর বিশৃঙ্খল চেতনা নিয়ে সেই অবদমনেরই দরজা সে খুলে দিয়েছে। নিজের ওপরে আজ তার শাসন নেই, তাই শিবশঙ্করের রক্ত কথা কইছে তার মধ্যে।

কয়েক মিনিটের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে সত্যজিৎ আবার সামনের কাগজগুলোর মধ্যে চোখ নামালো। সকালে বনশ্রী ফোন করেছিল। একটু পরেই রীতেন আসবে—নোট বইটার যতটা দেখা হয়েছে সে যেন রীতেনের হাতে পাঠিয়ে দেয়। আরো জানতে চেয়েছিল, আজ রবিবার—বিকেলে একবার তার আসবার সময় হবে কিনা। সত্যজিৎ বলেছিল, না। বনশ্রী রাগ করল কিনা কে জানে, টেলিফোনে মুখ দেখতে পাওয়া যায় না।

ব্যবসায়িক সম্পর্কই থাক।

"And I am desolate and sick of an old passion"—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইনটা বারবার আবৃত্তি করছে ইন্দ্রজিৎ—একটা 'ফিক্সেশন'-এর মতো ওটা যেন তার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে। কিন্তু বনশ্রী সম্বন্ধে সত্যজিতের "old passion"-এর শিখা আর জ্বলবে না। তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো উৎসাহ আর অবশিষ্ট নেই—বনশ্রীরও কি আছে? এখন স্মৃতি কেবল খানিকটা অস্বস্তি বয়ে আনে। দেওয়ালের গায়ে সেই পুরনো হরিণের শিং, সেই বুড়ো ওয়ালক্লকটা, হলদে হয়ে আসা সেই বহু চেনা ছবিগুলো এখন কেবল সাময়িক বিভ্রান্তি জাগায়—একটা অর্থহীন পিছুটানে মনকে ক্লান্ত করে তোলে। ওই বাড়িটা থেকে দূরে থাকাই ভালো। এখন হীরেনের ওখানে দেখা হওয়াই সব চাইতে নিরাপদ। দেওয়ালে ছারপোকার রক্তচিহ্ন, দড়িতে ঝোলানো ময়লা গেঞ্জী আর রং-চটা লুঙ্গি, একঠোঙা জিলিপি আর ঠাণ্ডা হয়ে আসা ধুতরোর মতো গন্ধওলা কালো রঙের চা—এরই মধ্যে বসে বনশ্রীর সঙ্গে সে স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারে! রেট—ফর্মা—পার্সেন্টেজ—রয়্যালটি—

বীথি এল।

—আমার এই লেখাটা একটু দেখে দেবে ছোড়্দা?

—কী লিখেছিস? সাব্সট্যান্স্ না এসে?—বনশ্রীর একটা দীর্ঘ প্যারাগ্রাফকে সংক্ষিপ্ত করতে করতে চোখ না তুলেই সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করল।

—খালি মাস্টারি ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসে না ছোড়্দা?

ব্লটিং প্যাডের উপর কলমটা ঝেড়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, কী করে মনে আসবে? বি. এ. পড়ছিস, তবু লিখবি টু পেয়ারস্ অব আইজ্—

—আমরা তো আর ইংরেজির প্রোফেসার হতে যাচ্ছি না—ভাব প্রকাশ করতে পারলেই হল। আর দিক্পাল প্রফেসাররাই সবাই বুঝি নির্ভুল লেখে? নামের আগে ডক্টর লিখে পরে যখন পি. এইচ্-ডি লেখে তখন সেটা বুঝি শুদ্ধ ইংরেজি হয় দাদা? নাকি ওকে আর্ষ প্রয়োগ বলে?

—পাকামো করতে হবে না তোকে—সত্যজিৎ হেসে ফেলল: এখন কাজ করছি,

পরে আসিস। দেখে দেব সাব্‌স্ট্যান্‌স্।

—সাব্‌স্ট্যান্‌স্ নয়—একটা অ্যাপীল। ঠিক করে দাও না একটু। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

—আচ্ছা ঠিক আধঘণ্টা পরে আসিস। এটা এক্ষুণি না দেখে রাখলেই নয়। রীতেন নিতে আসবে ন'টার পর।

—ওঃ—রীতেনবাবু।—মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বীথি বললে, তোমাকে ডিস্‌টার্ব করতে চাই না ছোড়্‌দা—কিন্তু একটা কথা বোধ করি বলা দরকার। রীতেন-বাবুর সঙ্গে দিদির মেলামেশা একটু কন্‌ট্রোল করা দরকার।

পরশু সন্ধ্যায় রীতেনের সঙ্গে প্রীতিকে ট্যাক্সি করে গড়ের মাঠের দিকে যেতে দেখার পর থেকেই এই কথাটা সত্যজিৎকেও পীড়ন করছিল। সেদিন যখন প্রোগ্রাম হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্রীতি বাড়িতে ফিরল, সেদিন প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে পারেনি—কেমন একটা সংকোচ এসে বাধা দিলে। আজ বীথি আবার সেইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বীথির সামনে জিনিসটা সে হালকা করে দিতে চাইল। মুখার্জি ভিলার প্রতিটি ফাটলে যে-সাপেরা এসে বাসা বেঁধেছে তাদের কাছ থেকে বীথি দূরেই থাক। এই বাড়িতে ও-ই সব চাইতে সতেজ, সব চেয়ে সুস্থ—ওরই কপালে সূর্যের আলো পড়েছে। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বীথি যখন বক্তৃতা করছিল, তখনই সে আলোটা দেখতে পেয়েছে সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ হাসল।

—তুই তো প্রোগ্রেসিভ। এ সব ব্যাপারে তোর এমন ছোঁয়াচে ভাব কেন?

—প্রোগ্রেসিভ কথাটার অন্য মানে আছে ছোড়্‌দা। রীতেনবাবু—মানে, লোকটা এক নম্বরের বাঁদর।

—টু স্ট্রং ল্যাংগুয়েজ।—সত্যজিৎ হাসতে চেষ্টা করল: তা ছাড়া প্রীতি ছেলেমানুষ নয়। নিজের ভালোমন্দ সে বোঝে।

—না ছোড়্‌দা—বোঝে না। গান ছাড়া আর কিছুই ও বুঝতে পারে না। একটু স্টেপ নেওয়া উচিত বোধ হয়।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই এখন যা দেখি, আমাকে হাতের কাজটা শেষ করতে দে।

বীথি ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথা বোধ হয় তার দরকার নেই। মুখার্জী ভিলার বিষাক্ত ফাটলগুলোর মধ্যে একটি ফুলের মতো ফুটেছে বীথি। ও ওর মতো করেই থাকুক—এখানকার কোনো গ্লানি যেন ওকে স্পর্শ না করে।

সংশয় সত্যজিতের নিজের।

বাইরে আলোর খবর সেও যে জানে না তা নয়। যখন কলেজে পড়ত, তখন অনেক শোভাযাত্রায় তাকেও আগে আগে চলতে হয়েছে, আকাশে মুঠো তুলে ধরে সে-ও গর্জন করেছে নতুন জীবনের স্লোগ্যান। তারপর চাকরি হল কলেজে। তখন মনে হল, পুরনো ধরনের মহাজন পথ দিয়ে চলবে না। নতুন কথা বলবে, নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করবে সাহিত্যকে—ম্যাথ্যু আর্নল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নয়—রোম্যান্টিক্‌ আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য—শ্রমিকের সংগ্রামে শেলী-কীট্‌স্‌-বায়রনের আসল ভূমিকা সে এনে ধরবে ছাত্র-ছাত্রীর সামনে।

কিন্তু—

কিন্তু আশ্চর্য একটা নিয়ম আছে জীবনের। ঠিক নিবে আসে সমস্ত। আকাশ-পৃথিবী-সমাজ—সব কিছু মিলে যেন একটা বিরাট পাকস্থলী। নিঃশব্দে জীর্ণ করে নিচ্ছে সব। সকলকেই। কেউ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়—কারো দেরি হয় একটু। এর বেশি তফাত নেই।

পেসিমিজম্‌? হয়তো তাই। এই যুগটাই পেসিমিজমের। পৌরাণিক গল্পের অভিশপ্ত আত্মা। একটা ভারী পাথরকে ঠেলে ঠেলে তুলছে পাহাড়ের চুড়োয়। কিন্তু পাথরটা সেখানে দাঁড়াবে না—গড়িয়ে নেমে আসবে আবার ঠেলে তুলতে হবে। এই চলছে, এ-ই চলবে। সব স্বপ্ন, সব দর্শনের এই-ই পরিণাম। সেই কতকাল আগে পড়া রাসেলের 'আইভারান' বইখানা তার মনে পড়ল।

কিন্তু এ-সব কী ভাবছে সত্যজিৎ? এ তার নিজের কথা নয়। তার মধ্যে লুকোনো মুখার্জি ভিলার আত্মার কণ্ঠস্বর শুনছে সে। যে আত্মা ক্লান্ত, যে আত্মা নিজের জীর্ণতার ভার আর বইতে পারছে না, এই বাড়ির ঘরে ঘরে জমানো ছায়ায় আর বারান্দার অর্কিডের কাঁপা কাঁপা কঙ্কাল আঙুলে যে আত্মার অন্তিম আর্তি।

যে ফুরিয়ে গেছে, সে নিশ্চিন্ত; যে বাঁচতে চলেছে তার পথ পুবের দিকে। একজন নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে তিল-তিল করে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, আর একজনের আকাশ আশায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যজিতের মতো যারা দাঁড়িয়ে আছে সীমান্ত রেখায়—যাদের দিনের আকর্ষণ আছে অথচ রাত্রির মোহ কাটেনি—তারাই সব চেয়ে বিপন্ন; আজ পৃথিবীতে কেবল সত্যজিৎই নয়—তার মতো অসংখ্য মানুষ এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রহর গুণছে। মোহ ভেঙেছে অথচ বিশ্বাস আসেনি, অথবা বিশ্বাস করতে গিয়েও জোর পাচ্ছে না।

ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে একা সত্যজিৎ নয়—তার মতো অগণিত বুদ্ধিজীবী। এ যুগ তাদেরই।

সিঁড়ির নিচের ঘড়িটায় বিকৃত শব্দ করে নটা বাজল। সর্বনাশ—কী হচ্ছে সত্যজিতের! এখনই যে রীতেন আসবে!

সত্যজিৎ লেখায় চোখ নামালো। অন্তত আরো চার-পাঁচটা পাতা দেখে দেওয়া দরকার।

রীতেন এল আধ ঘণ্টা পরে।

রঘুর কাছ থেকে খবর পেয়ে সত্যজিৎ কাগজপত্র গুছিয়ে নিচে নামল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সিঁড়িতেই বীথির সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়েছিল চুপ করে।

—দ্যাখো গে যাও। দিদিকে মুগ্ধ করবার জন্যে রীতেনবাবু—

সত্যজিৎ ধমক দিয়ে বললে, তোকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না—নিজের কাজে যা।

বীথির মুখ লাল হয়ে উঠল।

—মিথ্যেই আমায় গাল দিলে ছোড়্দা। ভালো কথাই বলতে চেয়েছিলুম।—শব্দ করে ওপরে উঠে গেল।

নিচের ঘরে প্রীতি তেমনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে—হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে রীতেন।

—ড্যানি কে—হ্যাভ্ নট ইউ সীন ড্যানি কে? আহ্—হি ইজ সাম্‌থিং—

সত্যজিৎ ঘরে পা দিলে। রীতেন থামল।

একটা শক্ত কথা মুখে এসেছিল, সত্যজিৎ নিজেকে সংযত করলে। তারপর রীতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, দাড়ি কামিয়েছ নাকি হে?

রীতেন লজ্জা পেলো।

—ইয়ে, মানে সত্যদা—একটু বোধ হয় কমিক্যাল দেখাচ্ছিল—

—বেটার লেট্ দ্যান নেভার রীতেন—সত্যজিৎ কঠিন ভঙ্গিতে হাসল: কিন্তু কেবল দাড়ি নয়, তোমার আরো অনেক কিছুই কমিক্যাল। যাই হোক—এখন আর ড্যানি কে-র মহিমা বর্ণনা করতে হবে না—এই লেখাটা নিয়ে চটপট চলে যাও। বেলা দশটার মধ্যে প্রেসে পাঠাতে হবে। বনশ্রী বলেছে, এর জন্য আজ প্রেস খোলা থাকবে।

রীতেনের মুখ কালো হয়ে উঠল। শুধু তাড়াতাড়ি লেখাটা নিয়ে যেতে বলাই নয়—সত্যজিতের কথার মধ্যে আরো একটা ইঙ্গিত আছে।

রীতেন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। মুখের রঙ শাদা হয়ে আবার কালো হল। তারপর জোর করে হেসে বললে, অল্‌রাইট সত্যদা, আমি যাচ্ছি।

লেখাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল রীতেন, যাওয়ার আগে পেছন ফিরে আর তাকালো

না। মিনিট খানেকের মধ্যেই বাইরে কট্ কট্ করে আওয়াজ উঠল—গ্লোব্ ট্রটার রীতেন দি গ্রেটের মোটর সাইকেলটা নেমে গেল রাস্তায়।

সত্যজিৎ আবার ফিরে চলল সিঁড়ির দিকে। প্রীতি বসে রইল চুপ করে। সত্যজিতের কথার অর্থ বুঝেছে কি না কে জানে—কিন্তু প্রীতির মুখের দিকে একবার সে তাকিয়েও দেখল না।

মা এসে বললেন, কোথায় বেরুচ্ছিস?

দেওয়ালের পেরেক থেকে পুরনো চামড়ার ব্যাগটা নামাচ্ছিল পূরবী। বললে, টিউশনিতে।

—আজ রবিবারে আবার কিসের টিউশনি?

—সামনে পরীক্ষা আছে মা। বিশেষ করে যেতে বলেছে।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, বিশেষ করে যেতে বললেই যেতে হবে? অত বড়লোক, হপ্তায় পাঁচদিন করে যেতে হয়, অথচ মাইনে দেবে মোটে কুড়ি টাকা! যেতে হবে না আজ।

পূরবী হাসল, জবাব দিল না। ব্যাগটা হাতড়ে পরীক্ষা করতে লাগল, ট্রামে যাওয়ার খুচরো পয়সা আছে কিনা।

—এত কষ্ট করে এ ভাবে তোকে আর পড়াতে হবে না। উনি একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছেন।—মা উল্লসিত গলায় বললেন, ছেলেটি এবার এম. কম. পাস করেছে। বাপের ব্যবসা আছে, অবস্থা ভালো। বলেছে মেয়ে পছন্দ হলে টাকাপয়সা—

পূরবী বিরক্তিতে জ্বলে উঠল হঠাৎ।

—কী বকছ মা পাগলের মতো?

মা বললেন, পাগলের মতো আবার কী হল? ভালো ছেলে—

—চুলোয় যাক ভালো ছেলে। সরো, আমি বেরুব—

কিন্তু মুখ ফিরিয়েই পূরবী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দোরগোড়ায় সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বললে, ওভারহিয়ার করে ফেলেছি। কিন্তু কাকিমার প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবার মতো।

হাতের ব্যাগটা সামনের টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পূরবী পাশের ঘরে পালিয়ে গেল।

উনিশ

অবশ্য পাশের ঘরে পালিয়ে আর কতক্ষণ থাকবে পূরবী—ফিরে আসতে হল একটু পরেই।

মা চা করতে গিয়েছিলেন। পূরবী এসে সত্যজিতের পাশের চেয়ারটা ধরে দাঁড়ালো। কথাটা এখনো জলছে কানের ভেতর। 'কাকিমার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি!' এ-রকম বিশ্রী রসিকতা করবার কী দরকার ছিল ওঁর।

অধ্যাপক সত্যজিৎ অন্য মানুষ হয়ে গেছে এখন। এখন ঘরের ছেলে। পূরবীর গম্ভীর রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

—কী হল তোমার?

—কিচ্ছু হয়নি।

—কোথায় বেরুচ্ছিলে মনে হচ্ছে?

—একটু দরকার ছিল।

সত্যজিৎ আবার ভালো করে চেয়ে দেখল পূরবীর দিকে। চাপা হাসিটা থমকে রইল ঠোঁটের কোনায়।

—তো বেরোও তা হলে। পড়ানো বরং আজ থাক। আমি উঠি।

—থাক, আমার দরকারের জন্যে ভাবতে হবে না। নিজেই যাওয়ার ছুতো খুঁজছেন —এই তো?

—ডাব্‌ল এজ্‌ড্‌ সোর্ড?—সত্যজিৎ আবার সশব্দে হেসে উঠল: আচ্ছা বেশ, বোসো তবে পড়তে। বার করো 'টেম্‌পেস্ট্‌'।

পূরবী বসে পড়ল চুপ করে। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের কালো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কই বই আনো?

তবুও শেল্‌ফের দিকে হাত বাড়ালো না পূরবী। হঠাৎ চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, আসেন না কেন?

—নানা কাজে জড়িয়ে থাকি, সময় পাই না।

—ও সব বাজে কথা। ইচ্ছে করে আসেন না।

পূরবী আজ হঠাৎ বেশি মাত্রায় মুখর হয়ে উঠেছে—সত্যজিৎ ভাবল। কিন্তু একেবারে মিথ্যে বলেনি। কিছুদিন ধরেই এ বাড়িতে আসতে তার দ্বিধা হয় একটা। সে জানে, পূরবী এখন তার পড়ানো আর ভালো করে শোনে না—যে দৃষ্টি তার মুখের দিকে মেলে রাখে, তার অর্থ তার অজানা নয়। কলেজে যে চাপা গুঞ্জনটা উঠেছে, বীথির কল্যাণে

তাও তার কানে গেছে। সত্যজিতের খুব খারাপ লাগেনি। মনে হয়েছে—মন্দ কী! দেখাই যাক না। জীবনে সঙ্গিনী তো ডেকে নিতেই হবে একদিন। পূরবীর মনের কাছ থেকে তেমন সাড়া যদি কোনোদিন পায়—সেও দ্বিধা করবে না। এই যন্ত্রণা—এই অনিশ্চয়ের যুগে এমনি একটি মেয়েই সব চাইতে ভালো। শান্ত, স্থির, আত্মমগ্ন। যে ধরনের মেয়েকে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী' বলে কল্পনা করেছিলেন। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখবে ঘর, সেবা দেবে, স্নেহ দেবে, পায়ের ধুলো মুছিয়ে দেবে চোখের জলে। একটু বয়েস হয়ে এলে, জীবন একটা বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলে, পুরুষমাত্রেই যা চায়।

তারপরেই হঠাৎ যেন কবর ফুঁড়ে দেখা দিল বনশ্রী। ফিরে এল আউটরাম ঘাটের সন্ধ্যা, ফিরে এল দুপুরের নির্জন ইডেন গার্ডেনে ঝিলের কালো জলে রোদের ঝিলিমিলি। সম্পর্কটা এখন একেবারে বৈষয়িক। হীরেন তাই বলে। বনশ্রী তাই বলতে চায়। সত্যজিৎ নিজেই সেই কথাই ভাবতে চেয়েছিল। সোজাসুজি বিজনেস্—আর কিছু নয়। কিন্তু সেদিন—

"Non Sum Qualis Eram Bonae Sub ragno Cynarae"—

সত্যজিৎ চকিত হয়ে উঠল। প্রায় তিন মিনিট চুপ করে বসে আছে সে। পূরবীর কথায় কোন জবাব দেয়নি। আর পূরবী বাইরের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে—কী দেখছে সে-ই জানে!

—চুপচাপ বসে আছো কেন? সত্যিই পড়বে না?

—আপনিই তো চুপ করে আছেন।—পূরবী 'টেম্‌পেস্ট' নামিয়ে আনল শেল্‌ফ থেকে: আর পড়েই বা কী হবে! আমি এবার নিশ্চয় ফেল করব।

বইয়ের পাতা খুলতে যাচ্ছিল সত্যজিৎ, থমকে গেল।

—হঠাৎ নিজের ওপর এত শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কেন? ব্যাপার কী?

—আমি জানি।—পূরবী গোঁজ হয়ে জবাব দিলে।

—তুমি জানো?—বইটার ওপরে হাত রেখে সত্যজিৎ বললে, তোমার ফিলসফির প্রফেসারেরা তো অন্য কথা বলেন। তাঁদের আশা আছে পূরবী দত্ত একটা ফার্স্ট ক্লাস পেলেও পেতে পারে।

পূরবী টেবিল থেকে একটা লাল পেনসিল তুলে নিয়ে এক মনে সেটাকে লক্ষ্য করতে লাগল: ফিলসফির কথা জানি না, কিন্তু ইংরেজিতে ঠিক ফেল করব।

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করে যদি ব্ল্যাঙ্ক-পেপার দিয়ে এলো, তা হলেই।

—ঠাট্টা করবেন না—আমার ভালো লাগছে না।—পূরবী পেন্‌সিলটা দিয়ে একখানা খাতার ওপর হিজিবিজি কাটতে লাগল: একটু হেল্‌প করেন না—কিছুই না—

—আমি সাহায্য না করাতেও আগের পরীক্ষাগুলোতে তোমার কোনো ক্ষতি হয়নি,

কাজেই ও-সব কথা থাক। কিন্তু সত্যিই বলো তো, আমাকে দেখেই এত মেজাজ খারাপ হল কেন? কাকিমা একটা মুখরোচক আলোচনা করছিলেন—সেইটেতে বাধা দিয়েছি বলে?

পূরবী পেন্‌সিলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণায়। চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল।

—আপনিও ওই সব যা-তা বলবেন? আর পড়াশুনো করবই না আমি। ছেড়ে দেব কলেজ।

সত্যজিৎ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

—এ যে সত্যিই টেম্‌পেস্ট্ দেখছি ঘরের ভেতর। একেবারে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা?

—হুঁ।

—তারপর?

—এখান থেকে চলে যাব।

—কোথায়?

—এখনো ঠিক করিনি।

—শুধুই নিরুদ্দেশ-যাত্রা? না কোনো উদ্দেশ্য আছে?

—জানি না।

কিন্তু কী হবে এ-ভাবে কথা বাড়িয়ে? সত্যজিতের ক্লান্তি লাগছে। নিজের মনেই যথেষ্ট ভার জমে আছে। আর একজনের বোঝা লঘু করবার উৎসাহ সে খুঁজে পাচ্ছে না।

কাকিমা চা নিয়ে এলেন। এবার তাকিয়ে দেখলেন দুজনের দিকে। কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করলেন যেন।

—তুমি ক'দিন থেকেই আসছ না বাবা, মন খারাপ করে বসে আছে মেয়েটা।

—হুঁ, বলেছি তোমাকে!—পূরবী জলে উঠল।

—বা রে, একটু আগেই তো—

পূরবী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: কক্ষনো না—আমি কিচ্ছু বলিনি। তুমিই বলছিলে বরং। আমি কেন বলতে যাব ও-সব কথা? ওঁরা কাজের লোক—দয়া করে মাঝে মাঝে আসেন এই ঢের।

সত্যজিৎ কাকিমার দিকে তাকালো: চায়ের পেয়ালায় আজ সত্যিই তুফান উঠেছে কাকিমা। আপনার মেয়ে আজ ঝগড়া করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। আপনি নিজের কাজে যান—ওকে আর ঘাঁটাবেন না।

কাকিমা বললেন, সে কি কথা! ঝগড়া করবে কেন? সত্যিই তো—দয়া করে তুমি পায়ের ধুলো দাও—সে-ই আমাদের কত ভাগ্যি। ঝগড়া করবে তাই নিয়ে? যতই বড় হচ্ছে, ততই বোকা হচ্ছে মেয়েটা।

—দোহাই কাকিমা, আপনি আর ইন্ধন দেবেন না। বিপর্যয় কাণ্ড ঘটবার পক্ষে আমি একাই যথেষ্ট। আপনি বরং সেই যে সুপাত্রটির কথা বলেছিলেন—তারই খোঁজ-খবর করুন।

দুমদাম করে শেল্‌ফ থেকে খানকয়েক বই নিচে পড়ল। একখানা খোঁজবার জন্যে অতগুলো বইকে ফেলে দেবার কোনো দরকার ছিল না পূরবীর।

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, ছেলেটি সত্যিই ভালো। ওঁর এক বন্ধুর বিশেষ জানা-শুনো—পোর্ট কমিশনার্সে ঢুকেছে—

—মা!

কাকিমা চমকে গেলেন: ওই ত্যাখো—বিয়ের নাম শুনলেই ফণা তোলে সঙ্গে সঙ্গে। থাক বাপু, থাক। অমন করে আর তাকাতে হবে না আমার দিকে। আমি যাচ্ছি।

কাকিমা বেরিয়ে গেলেন।

রেগে আগুন হয়ে বসে আছে পূরবী। একটা ডিক্‌শনারী খুলে দ্রুতবেগে পাতা উল্‌টে চলেছে।

সত্যজিৎ ধীরেসুস্থে চায়ে চুমুক দিলে।

—টেম্‌পেস্ট্‌ পড়ানোর নামেই তো টেম্‌পেস্ট্‌ উঠল দেখতে পাচ্ছি। তা অভিধান মুখস্থ করছ নাকি?

পূরবী নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার। একটু পরে ঝাঁঝালো ভাবে জবাব দিলে, চেষ্টা করছি।

—চেষ্টা করে লাভ নেই, পণ্ডশ্রম হবে। তার চাইতে একটা কথার উত্তর দাও। বিয়ের নাম শুনলেই কাকিমার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ফণা তোলো কেন?

—আবার?

সত্যজিৎ তেমনি শান্তভাবেই চায়ে চুমুক দিলে: তোমার চোখের আগুন দেখে কাকিমা ভয় পেতে পারেন, কিন্তু আমাকে পেরে উঠবে না। সত্যি, আপত্তি কেন এত?

—তা দিয়ে দরকার নেই আপনার।

—আছে দরকার।—পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সত্যজিৎ কিছুক্ষণ পূরবীর দিকে তাকিয়ে রইল। শান্ত ভীরু মেয়েটি আজ যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে চোখ দুটো—অল্প অল্প কাঁপছে ঠোঁটের কোনা—মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলেছে

যেন। সত্যজিৎ ভাবল : আজ একটা কিছু ঘটবে। তারই জন্যেও অপেক্ষা করে আসে সে।

সত্যজিৎ বললে, কেন বিয়ে করবে না আমার জানা দরকার। আমি তোমার মাস্টার মশাই।

—আমি কোনদিন বিয়ে করব না।

—কোনদিন না?

—কোনদিনই না।

সত্যজিৎ চা-টা শেষ করল নিঃশব্দে। একটা কিছু আজ ঘটবে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে পূরবীকে। তীব্র মদের মতো আকর্ষণ করছে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা চরম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছে সত্যজিৎ।

তার গলার স্বরে নেশা লাগল : এক বছর পরে?

—তার মানে?—পূরবী রক্তাভ বিস্মিত চোখ তুলল।

—বি. এ. পরীক্ষার পরে?—এইবার সত্যজিতের চোখ দুটোও জলে উঠল : তখন যদি আমি দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াই?—পূরবীর একখানা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললে, তখন যদি আমি এসে প্রার্থনা করি? ফিরিয়ে দেবে আমাকে?

মুহূর্তে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল পূরবী। মুখ থেকে সরে গেল রক্ত। তারপরেই টেবিলের ওপরে নুয়ে পড়ল মাথাটা। নিঃশব্দ কান্নায় কাঁপতে লাগল শরীর।

সত্যজিৎ তখনো তার হাতখানা আঁকড়ে আছে মুঠোর মধ্যে। যা ঘটবার ঘটে গেছে। এখন আর ফেরবার পথ নেই। অনেকদিন, অনেক মুহূর্তের অনিশ্চয়তা এইবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

ইচ্ছে করল, পূরবীর মাথাটা বুকের মধ্যে তুলে নেয়। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি মনে পড়ল ডাউসন। "There falls thy shadow, Cynara—"

বনশ্রী! মুঠো খুলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়ল সত্যজিৎ। বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আজ চলি, পরশু আবার আসব।

নিঃশব্দ কান্নায় পূরবী ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

* * *

গ্লোব-ট্রটার রীতেন দি গ্রেট অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রীতিকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছে না। কী লাভ্‌লি ফেস্! হাউ পারফেক্ট ফিগার! হোয়াট এ গোল্‌ডেন ভয়েস!

অ্যাম আই ইন্ লাভ উইথ হার? সবিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে রীতেন।

অ্যাট লাস্ট ! গ্লোব ট্রটার রীতেন ভেবেছিল, একদিন সে তার 'ল্যাসি'কে খুঁজে পাবে—সাম্ হোয়ার ইন্ কন্টিনেন্ট, তার মোটর-সাইকেলে তাকে তুলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ইন্ দ্য ওয়াইল্ডস্ অব্ আফ্রিকা—

কিন্তু এ কী হল ! শেষকালে এই বাংলাদেশেই ? এ পুয়োর বেঙ্গলি 'গ্যাল্' তার মনোহরণ করল ? হোয়াই—অফ্ কোর্স !

গ্লোব ট্রটারের সাইকেলের স্পীড বাড়ছিল। সেই সঙ্গে টগবগ করে ফুটছিল মনটা। শী'জ্ এ বিউটি !

আচ্ছা, প্রীতি তাকে ঠিক—

সেদিন ট্যাক্সিতে ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা আভাস দিয়েছে রীতেন। ইংরেজী গান শুনিয়েছে, বলেছে তার স্বপ্নের কথা—বলেছে এখানে নয়—সাম্ হোয়ার ফার অ্যাওয়ে—কোনো এক সমুদ্রের ধারে, পপ্লার বনের মাঝখানে সে একটা কটেজ তৈরি করবে, বাজাবে হাওয়াইয়ান গীটার, আর মধ্যে মধ্যে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। কেবল মনের মতো কোনো সঙ্গিনী যদি সে পায়—

প্রীতি জবাব দেয়নি। কেবল রীতেন কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনেছে কয়েকবার। ইজ শী উইলিং ? ডাজ্ শী ?—

চিন্তাটা শেষ হল না। বাই জোভ্ ! হাউ টেরিবল !

প্রাণপণে ব্রেক কষেও রীতেন মোটর-সাইকেলটা থামাতে পারল না। সামনের হিন্দুস্থানী বাচ্চা মেয়েটাকে সোজা চাপা দিয়ে সাইকেলটা লাফিয়ে উঠল ফুটপাথে, তার-পর ধাক্কা খেলো একটা লোহার পোস্টের সঙ্গে। তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল রীতেন। যন্ত্রণাভরা একটা অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর—তার মধ্যে চকিতে তলিয়ে গেল বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন।

কুড়ি

ছিঃ ছিঃ, কী ছেলেমানুষি হয়ে গেল। এতদিন পরে—এই বয়েসে ? এই সাতাশে পা দিয়ে ? তার মানে পূরবীকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল ?

ভাল করেছে না মন্দ করেছে সে কথাটা পর্যন্ত সত্যজিৎ ভাবতে পারল না। এই হঠাৎ দুর্বলতার লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে সে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। অকারণে এ সে কী করে বসল ?

একেবারে আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল সত্যজিৎ। কালো মেঘ উঠে আসছে দক্ষিণ থেকে, ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, পাক খেতে খেতে খানিকটা ধুলো উড়ে এল। পাশেই পার্কটার গাছে গাছে কাকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো।

আঃ—নামুক বৃষ্টি। বিশ্রী গরমের পালা চলছে ক'দিন থেকে। জুড়িয়ে যাক মাটি।

পূরবী সম্পর্কে সত্যজিতের মনটাকে এমন আচমকা জাগিয়ে দিলে কে? পূরবী নিজেই? চশমার ওপর খানিকটা ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে পড়ল, দাঁড়িয়ে পড়ে চশমাটা মুছতে মুছতে তার মনে হল: না—পূরবী নয়। ধরা-না-দেওয়া—ভালো করে না-বোঝার দিনগুলো টুকরো টুকরো সুর জাগিয়ে একদিন নিজের সীমায় এসে ফুরিয়ে যেত, তারপরে থাকত স্মৃতি, একখানা গ্রুপ ফোটো-গ্রাফের একটি বিশেষ মুখ মনে পড়ত—কি পড়ত না। এমনিই হয় —এমনিই হত।

কিন্তু: 'There falls thy shadow Cynara।' এল বনশ্রী। পুরনো আগুন কবে ছাইয়ের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে, কিন্তু তার উত্তাপটা কোথায় যেন জেগে ছিল এতদিন। বনশ্রীর অস্তরাগ প্রথম আলো হয়ে। আর সে ফিরে গেল গড়ের মাঠের কাজল কোমল অন্ধকারে, বুকের চাঁদ-ভাঙা গঙ্গার জলে, সেই সুর-বাঁধা সেতারের মতো একুশ বছর বয়েসে।

তাতে ক্ষতি ছিল না। এই অনিশ্চিত, প্রায় নির্বাপিত জীবন। মুখার্জি ভিলার গ্লানি, আর অনন্ত সেনগুপ্তের চোখের দৃষ্টি। বুদ্ধিবাদী জড় মন যেন একটা কাঁটার বিছানায় নির্বিকল্প সমাধিতে পড়ে আছে। তার মাঝখানে এটুকু স্বপ্ন নেহাত মন্দ ছিল না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছে সত্যজিৎ। সত্যিই কি পূরবীকে গ্রহণ করবার জন্যে মনে মনে তৈরি হতে পেরেছে সে? পূরবী কেন—কোনো মেয়েকেই কি সে নিতে পারে জীবনে?

ওয়ান মোর ইডিয়সি!

আবার একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। পথের ওপরে কালো ছায়া নেমেছে। বাড়ির কার্নিশে কার্নিশে ঠাঁই নিচ্ছে চড়ুইয়েরা। হিমেল ঠোঁটের চুমোর মতো এক ফোঁটা জল পড়ল কপালে। বৃষ্টি এল।

ভালো করে বৃষ্টি নামবার আগেই এক ছুটে সত্যজিৎ ঢুকে পড়ল বত্রিশ নম্বরে।

চেনা বাড়ি। একদা নিয়মিত যাতায়াত ছিল। প্রকাণ্ড এই বিচিত্র বাড়িটার এক-তলায় সারি সারি দোকান, দোতলায় কিছু সিন্ধি আর পাঞ্জাবী পরিবার, চার-তলায় কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আর তেতলায় একটি বড় হলকে কেন্দ্র করে পাঁচ-সাতটি ছোট বড় ঘর। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দীক্ষায় অনুপ্রাণিত কতগুলো মানুষ এখানে নানা রকমের সংঘ ও প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। বিভিন্ন বয়সের নানা ধরনের শিল্পী, তরুণ-অতরুণ সাহিত্যিক, প্রবীণ অধ্যাপক আর অভিজ্ঞ রাজনীতিক—সকলেরই এখানে সমান আসা-যাওয়া।

একসময়ে খুব জমজমাট ছিল। পুলিসের হানা যত বেশি হত—এখানকার মানুষ-

গুলি যেন তত বেশি করে কাজের উৎসাহ পেত। কিন্তু এখন যেন ভাঁটার টান। মাঝখানে দলীয় নীতির কতগুলো বিপর্যয়ের ফলে সব কিছুই খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। গাইয়ে-বাজিয়েরা ছোট ছোট দলে অনেকেই আলাদা হয়ে গেছে, সাহিত্যিকদের আড্ডা হয়েছে চা আর কফিখানায়, অনেকগুলো অফিসও উঠে গেছে এখান থেকে। এখন ভাঙা হাট। সত্যজিৎও বছরে একবারের বেশি পা দেয় কি না সন্দেহ।

তবু মাঝের হলঘরটি ছেঁড়া ফরাস বিছিয়ে এখনো পুরনো বন্ধুত্বে হাতছানি দেয়। দেওয়ালের গায়ে এখনো লেনিনের বড় ছবিটি যেন দুটি জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। বড পোস্টারের গায়ে পিকাসোর স্বপ্নেদেখা সেই সিতপক্ষ কপোতটি এখনো আশা আর বিশ্বাসের বাণী বহন করে।

হলের বাইরে জুতো রেখে ঢুকতে ঢুকতে সত্যজিৎ দেখল, তিন-চারটি মুগ্ধ ছেলের মাঝখানে বসে বক্তৃতা দিচ্ছে সুমিত্র মৌলিক। সত্যজিৎ মৃদু হাসল। সুমিত্রের বক্তৃতা দিয়ে কিছুতেই আশ মেটে না।

পলকের জন্যে তাকিয়ে দেখল সুমিত্র।

—সত্যজিৎ যে? হঠাৎ?

—তোমার বক্তৃতার টানে নয়। বৃষ্টির ভয়ে।

সুমিত্র হাসল। উজ্জ্বল কঠিন চোখে করুণার আভা পড়ল একটুখানি।

—সে তো বুঝতেই পারছি। ব্যাঙ্ক্‌রাপ্ট্‌ ইন্টেলিজেণ্টশিয়া। শামুকের মতো নিজের খোলায় মুখ লুকিয়েছে এখন।

অন্য ছেলেগুলি হেসে উঠল। সত্যজিৎও।

—শামুকের মতো মুখ লুকানো বরং ভালো কিন্তু মুখ-সর্বস্ব পোলিটিশিয়ান তার চাইতে আরো খারাপ।—সত্যজিৎ জবাব দিলে।

—মুখ-সর্বস্ব? মোটেই না।—সুমিত্র প্রায় চটে উঠল: তোমাদের মতো ইন্‌-অ্যাকটিভ্‌ ইন্টেলেকচুয়াল নই। হয়তো শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে পুরোপুরি শামিল হতে পারিনি, কিন্তু তাদের কাছাকাছি অনেকটা—

সত্যজিৎ জুড়ে দিলে: অনেকটা এগিয়েছ চারদিনের দাড়ি রেখে। বিপ্লবী বলেই মনে হচ্ছে বটে!

সুমিত্র এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল: ইয়ার্কির স্বভাবটা তোর আজও গেল না। সত্যি বলছি, ব্লেড ফুরিয়ে গেছে, ক'দিন থেকে কেনা হয় না—তাই এই বৈপ্লবিক দাড়ি গজিয়েছে। সে যাক—চুপ করে বসে থাক এখন। এদের সঙ্গে একটু সীরিয়াস্‌ ডিস্‌কাশন করছি—বিরক্ত করিসনি।

সত্যজিৎ চুপ করেই রইল। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। জানলাটার ওপারে আকাশ,

ঘরবাড়ি সব ঝাপসা। জুড়োক, মাটির পিপাসা জুড়িয়ে যাক। রুক্ষ ধুলোয় ভরা তপ্ত পথগুলো স্নিগ্ধ প্রসন্ন হয়ে উঠুক—বিবর্ণ পাতাগুলো শ্যামল-মসৃণ হোক—মরা মাটিতে অঙ্কুরিত হোক নতুন ঘাস—রৌদ্রে চৌচির মাঠের মাটি চন্দন হয়ে উঠুক, লাঙলের ফলায় ফলায় নব-নীবারের গর্ভাশয় রচিত হোক।

দেওয়ালের একদিকে ঘন নীল আকাশে শ্বেতকপোতের মুক্ত ডানায় রোদ কাঁপছে; আর একদিকে লেনিনের প্রসন্ন ললাট—দুটো চোখ কী আশ্চর্য জীবন্ত! এই বৃষ্টির সঙ্গে—এই নতুন ধানের জন্মগীতির সঙ্গে এদের একটা প্রতীকী সম্পর্ক আছে কোথাও। এই ঘরে, ওই বৃষ্টির শব্দে, দেওয়ালের ছবিগুলোর ব্যঞ্জনায়—পুরনো দিনের মতো আবার যেন নতুন করে নিজের মধ্যে শক্তি ফিরে পাচ্ছে সত্যজিৎ। এ বুদ্ধিবাদী নৈরাশ্য নয়—চিন্তার নৈরাজ্য নয়—আবার, আবার যেন প্রথম জীবনের প্রতীতির মধ্যে নবজন্ম লাভ করছে সে। যখন প্রতিটি মিছিল তার রক্তে সূর্যের কণা ছড়িয়ে দিত—যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট কালপুরুষের মতো মুঠো বাঁধা হাত তুলত আকাশের দিকে।

সুমিত্রের আলোচনার কয়েকটা কথা তার কানে এল। সত্যজিৎ আকৃষ্ট হল।

—তা হলে ইণ্টেলিজেন্সিয়া—অর্থাৎ যাদের 'মেণ্টাল্ লেবারার' বলা যায়—তাদের তিনটি শ্রেণীকে পাওয়া গেল। প্রথম শ্রেণী, যদিও তারা সংখ্যায় বেশী নয়—তারা তাদের ক্যাপিটালিস্ট প্রভুদের নিমকের টানে তাদের সঙ্গেই পড়ে রইল এবং বিধিমত নগদ লাভও তাদের হল। দ্বিতীয় শ্রেণী—সংখ্যায় আরো কম, এরা পুরোপুরি শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হল—'মেণ্টাল্ লেবার' থেকে তারা 'ফিজিক্যাল্ লেবারে'র মধ্যেও পা দিল, নিজেদের ভুয়া সুপিরিয়ারিটি কম্‌প্লেক্স্ ভুলে গিয়ে কদম মেলালো জনসাধারণের সঙ্গে। আর তৃতীয়—

সুমিত্র একবার থামল। একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলে চলল: আর তৃতীয় শ্রেণী—যারা সব চাইতে মেজরিটি, তাদের অবস্থাটাই বিচিত্র। ওপর তলার লোকগুলো সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে—তারা জানে, ক্যাপিটালিজমের আসল চেহারাটা কী। এই শোষকদের তারা ঘৃণাই করে—এই সমাজব্যবস্থার তারা অবসান চায়। আবার অন্য দিকে শ্রমিকদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেও তাদের বাধে—হাতে-কলমে কাজ করাকে ইন্‌ফিরিয়র বলে মনে করে। সেখানে মানসিক আভিজাত্যই তাদের ডিক্লাসড হওয়ার পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা। শেষ পর্যন্ত তারা একটা অদ্ভুত 'নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ডে' পৌঁছে যায়—সাবজেক্‌টিভ্ হতে থাকে—সব কিছু সম্পর্কে অকারণে ক্রিটিক্যাল হয়ে ওঠে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে তাদের মন। সেকেণ্ড ওয়ার্লড-ওয়ারের পর পৃথিবীতে এরাই সংখ্যায় সব চাইতে বেশি হয়ে উঠছে—

সত্যজিতের চমক লাগল। কোনো নতুন কথা বলছে না সুমিত্র: এ ধরনের

আলোচনা সে প্রচুর শুনেছে, পড়েছেও অনেক। কিন্তু আজ যেন এরা একটা আলাদা সত্য বয়ে আনছে তার কাছে। সুমিত্র যেন তাকেই লক্ষ্য করে বলছে সমস্ত—এ যেন তারই মানসিকতার বিশ্লেষণ। সে-ও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে—যারা 'ঘরেও নহে, পারেও নহে'—ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে তটস্থ হয়ে।

দেওয়ালে দুটি জীবন্ত ধিক্কারভরা চোখ—শ্বেত কপোতের পাখায় রোদ জলছে। কী করতে পারে সত্যজিৎ? অ্যাক্‌টিভ্ পলিটিক্সে নামতে পারে? না—তার উপায় নেই। শুধু পারে যে কোনো বলিষ্ঠ আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে, নিজের গণ্ডীর ভেতরে যতটা সম্ভব তার সত্যকে ঘোষণা করতে, আর পারে সেই আশা আর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে—যা পৃথিবীর মানুষকে নবজন্ম এনে দেবে।

কিন্তু তা-ও কি পারে সত্যজিৎ? পারে আশা আর বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে? ওই মুখার্জি ভিলায় বাস করে? শিবশঙ্কর আর ইন্দ্রজিতের বিকৃতিকে নিজের মধ্যে বহন করে? মনের কূট-তার্কিকটাকে এত সহজেই সরিয়ে দেওয়া কি সম্ভব?

পাশের ঘর থেকে বিমল বেরিয়ে এল।

—সত্যদা যে!

—হ্যাঁ, এলাম ঘুরতে ঘুরতে।

—আজকাল তো ভুলেই গেছেন এদিকটা। শনিবার আসবেন একবার?

—কী আছে শনিবার?

—একটা সিম্পোসিয়াম। নিউ ডেমোক্র্যাসি অ্যাণ্ড্ ইণ্ডিয়া। অনেকেই আলোচনা করবেন। আসবেন? এই বিকেল ছ'টা নাগাদ?

—দেখব চেষ্টা করে।

বৃষ্টি থেমেছে। সুমিত্রের বক্তৃতাও।

আর একটা বিড়ি ধরিয়ে সুমিত্র বললে, বেরুবি নাকি অধ্যাপক?

—হ্যাঁ, চল্।

দুজনে পথে নামল। আই. এ. ক্লাস থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত সহপাঠী। হীরেনের মতোই এম. এ. পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত আর দেয়নি সুমিত্র। এখন টিউশন করে, আর রাজনীতি।

বৃষ্টিতে ধোয়া পথ। ছেঁড়া মেঘের কোনায় রোদ উঁকি মারছে। ঝর ঝর করে জল নেমে যাচ্ছে পথের ঝাঁঝরি দিয়ে। সিনেমার পোস্টারে একটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে লজ্জায় যেন জড়োসড়ো হয়ে আছে।

বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে, সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে সুমিত্র বললে, চল্ অধ্যাপক—ওদিকের ওই চায়ের দোকানটাতে। বকে বকে গলাটা শুকিয়ে গেছে। তা ছাড়া অনেকদিন

ভালো করে আড্ডা দেওয়া হয়নি।

বাড়ি ফিরে বনশ্রীর পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসা উচিত ছিল। কাল থেকে আবার সময় পাওয়া যাবে না! কিন্তু নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছে আজ—কোথাও একটুখানি প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। সত্যজিৎ বললে, আচ্ছা—চল্—

সুমিত্রের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া গেল প্রায় একটার সময়। বাড়ি ফিরে খবর পাওয়া গেল হীরেন এসেছিল, আবার আসবে রাত আটটার পর।

হয়তো নতুন কোনো পাব্‌লিশার গেঁথেছে হীরেন। একটা কন্‌ট্রাকট্ জুটিয়ে দেবে নোট লেখার। বিত্তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

সুমিত্রের কথা কানে বাজছে।

—দেখবি, দিন আমাদের আসবেই।

—কিন্তু পার্লামেণ্টারি পলিটিক্সে—

—যে সময়ের যেমন। পুরনো ভুলকে আমরা তো আর রিপীট্ করতে পারি না। ওয়েট্ আপটু নেকস্‌ট ইলেকশ্যন—

রেডিয়োতে খবর বলছে। টিচার্স স্ট্রাইক কল্‌ড অফ। কাগজেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক যা চাওয়া হয়েছিল তা কি পাওয়া গেল? দাবি মিটল কি পুরোপুরি?

কিন্তু নিজেকে আর সংশয়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া নয়। এক কদম এগিয়ে দরকার হলে তিন পা পিছিয়ে যাও। যেটুকুর সূচনা হয়েছে—তাই নতুন ইতিহাসের একটা পাতা খুলে দেবে।

অবিশ্বাস করতে পারে পরিতোষের মতো লোক—যে সরকারী চাকরী পেয়ে এখন মার্কসিজম্‌কে রিভাইজ করেছে। আর অবিশ্বাস করতে পারে সে-ই—বুদ্ধির শূন্য-জগতে যে উদ্‌ভ্রান্ত।

আশা ছাড়বে না সত্যজিৎ।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বনশ্রীর লেখা নিয়ে বসল। মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে ইন্দ্রজিতের চিৎকার। আল্‌জল্‌সনের গান গাইছে সে। এর পরে হয়তো প্রীতির কাছ থেকে শোনা কীর্তন জুড়ে দেবে তারস্বরে। একবার ভ্রূকুটি করল সত্যজিৎ, তারপর তলিয়ে গেল কাজের ভেতর।

বীথি বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছে দুপুরে। শিবশঙ্কর নিজের ঘরে পড়ে আছেন চুপচাপ—রঘু তাঁর কী পরিচর্যা করছে কে জানে। হয়তো মদ ঢেলে দিচ্ছে গ্লাসে—ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও মদ ছাড়বার মানুষ নন শিবশঙ্কর। সব ভাবনাগুলোকে

মন থেকে বিদায় করে দিয়ে সত্যজিৎ এক মনে কাজ করতে লাগল।

চারটের সময় ছুটতে ছুটতে এল প্রীতি। ছাইয়ের মতো মুখ।

—ছোড়দা ?

—কি রে ? অমন কেন মুখের চেহারা ? কী হয়েছে ?

—বনশ্রীদি ফোন করছেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে। রীতেনবাবু সাংঘাতিক অ্যাক্‌সিডেন্ট করেছেন।

সত্যজিৎ চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। আরো বেশি চমকালো প্রীতির দিকে তাকিয়ে। তারপর উঠে পড়ল দ্রুত।

বনশ্রীই বটে। কান্নায় ভেজা গলা।

—আসতে পারো—এক্ষুনি আসতে পারো একবার ? ভীষণ ক্রাইসিস্ যাচ্ছে। বাবা সেন্স্‌লেস্ হয়ে বাড়িতে পড়ে আছেন। আমি একা কী করব এখন ? পারবে আসতে ?

—এক্ষুনি যাচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে সত্যজিৎ তাকালো প্রীতির দিকে। মরা মানুষের মতো তার মুখ। থরথর করে কাঁপছে।

—আমি যাচ্ছি প্রীতি। কোনো ভাবনা নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকে নিয়ে চলো ছোড়দা।—প্রীতির গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল : আমি, আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

সত্যজিৎ আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে প্রীতির মুখের দিকে চেয়ে রইল। যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। যা আশঙ্কা ছিল তা কখন সত্য হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আর ফেরানোর পথ নেই।

প্রীতিকে বাধা সে দেবে না। রীতেন যদি না-ই বাঁচে, তা হলে অন্তত শেষবার কাঁদবার সুযোগ পাক ও। এই মুখার্জি-ভিলায় প্রাণভরে সে কান্না ও কোনোদিনই কাঁদতে পারবে না।

অদৃষ্টের কণ্ঠস্বর সত্যজিৎ শুনতে পেলো নিজের গলায় : বেশ চল্—

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করে গান করছে : "Your love is my death—my death —my death—"

একুশ

ক্রাইসিস্ আপাতত কেটে গেছে বলে মনে হল। জি-কে. রায় কিছুতেই যেতে চান না—শেষে প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিতে হল তাঁকে। বনশ্রীর চাইতে ভয় পেয়েছিলেন

তিনিই বেশি—কাঁদছিলেন ছেলেমানুষের মতো।

পুরুষমানুষের কান্না সত্যজিতের সহ্য হয় না। কেমন একটা কমিক এফেক্টের সৃষ্টি হয়—অনুভূতিটা যেন প্যারডী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া জি-কে. রায়—সেই জি-কে রায় —একদা যিনি কড়া-কড়া জাজ্‌মেণ্ট লিখ্‌তেন, তাঁর কান্নাটা এতই অবিশ্বাস্য যে সত্যজিতের মনে হল: যে অনুভূতি তাঁর কোথাও নেই, সেইটেকেই তিনি অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে চাইছেন। এর সবটাই কৃত্রিম বলেই এত বিসদৃশ।

তা হলে কী চান জি-কে রায়? রীতেনের মৃত্যু? খুব কি অসম্ভব? জীবনে যিনি অনেক ফাঁসির রায় লিখেছেন, সামাজিক আর পারিবারিক সকলের ভেতরে যা কিছু মিথ্যে, যা কিছু বিকৃতি—তাই নিয়ে যিনি কারবার করেছেন দিনের পর দিন, বাৎসল্যের কোনো সেণ্টিমেণ্ট্‌ থাকা কি সম্ভব তাঁর পক্ষে? আরো রীতেনের মতো ছেলে? হিতেন তবু সরে গেছে চোখের সামনে থেকে—রীতেন তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে জর্জরিত করে তুলেছে। আজ যদি রীতেন না-ই বাঁচে, তা হলে ক্ষতির চাইতেও লাভের দিকটাই তাঁর বেশি।

হাসপাতালের বারান্দায়, সেই ফিনাইল-ব্লিচিং পাউডার—আয়োডীন-বেঞ্জিনের ব্যাধি-রক্ত-মৃত্যুর গন্ধের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকতে সত্যজিৎ চকিত হয়ে উঠল। ছি ছি, এ রকম ভাবা উচিত নয়। হাজার হোক নিজের ছেলে, আর বলতে গেলে একমাত্র ছেলে। স্নেহ-ভালোবাসা—বন্ধুত্ব-বিজ্ঞানের বিচারে সবই হয়তো জৈবিক আর সামাজিক স্বার্থের চেতন-অবচেতন শৃঙ্খল দিয়ে জড়ানো, হয়তো ওই শৃঙ্খলগুলো ছিঁড়ে গেলে গ্যাস সিলিণ্ডারে ফাঁপানো বেলুনের মতো ওরা মিলিয়ে যায় শূন্যে। তবু সত্যজিৎ এখনো অতটা যান্ত্রিক হতে পারেনি। এখনো তার ভাবতে ভালো লাগে প্রেম জ্যোতির্ময়—বাৎসল্য অম্লান উৎসার। কুসংস্কার বলতে পার—কিন্তু সংস্কারমুক্ত হিসেবে নিজের ওপর তার দাবি নেই। তা হলে অনেক আগেই সে সুমিত্রের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত—এমনভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সেই ঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না—যার মাথার ওপর ছাদ নেই, পায়ের তলায় ভিত নেই।

প্রেমকে বিশ্বাস করে সত্যজিৎ—পূরবীকে দেখলে সে রোম্যাণ্টিক হয়ে ওঠে; ইন্দ্রজিৎ শিবশঙ্করের একটা বীভৎস অপঘাত কামনা করে—অথচ শিবশঙ্করের চোখে বাৎসল্যের আলো দেখেছে। দেখেছে সে।

গড়ের মাঠের দিক থেকে হাওয়া আসছে, হেমন্তের প্রথম উত্তুর স্পর্শ। সামনের একটা গাছ থেকে ঝর ঝর করে পাতা ঝরল একরাশ। এত তাড়াতাড়ি? আজ দ্বাদশী ত্রয়োদশী কিছু হবে—জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সামনের কম্পাউণ্ডটা। গঙ্গায় জাহাজের বাঁশি। সব মিলিয়ে এক মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বটাকে অত্যন্ত নিরর্থক বলে মনে হল সত্যজিতের।

তোমার সুখ-দুঃখ-ভাবনা-দুর্ভাবনার চাইতেও পৃথিবী অনেক বড়, অনেক বেশি। রীতেন-বনশ্রী-পূরবী-সে আজ এই মুহূর্তে একসঙ্গে মরে গেলেও এই জ্যোৎস্নায় এতটুকু ছায়া পড়বে না, গঙ্গার দিক থেকে আসবে জাহাজের বাঁশি—দূরের রেডিয়োতে বিলিতী অর্কেস্ট্রায় একবারের জন্যেও ছেদ পড়বে না। তুমি থাকলে পৃথিবীর কোনো লাভ নেই, তুমি চলে গেলে কোনো ক্ষতি নেই তার।

ক্ষতি আছে মানুষের। স্বার্থের হোক, জৈবধর্মের হোক, অথবা প্রেম-প্রীতি বাৎসল্যের সংস্কারেরই হোক। রীতেন যদি না বাঁচে—

বনশ্রী কিংবা জি-কে রায়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। তার নিজের রীতেন সম্পর্কে কোনো মনোভাব নেই—রীতেনের মৃত্যু তার কাছে একটা সংবাদ মাত্র। কিন্তু প্রীতি রীতেনকে ভালোবাসে।

জ্যোতির্ময় প্রেম? আদিম জৈবরীতি? যা খুশি বলা যায়। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই ক'দিনের একটা আশ্চর্য সম্পর্ক আর আকর্ষণ গড়ে উঠেছে দুজনের ভেতরে। রীতেন যদি বাঁচে (খুব সম্ভব বাঁচবে) তা হলে হয়তো সত্যজিৎকেই রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে কর্তব্য করে আসতে হবে। শিবশঙ্করের আশীর্বাদ অবশ্য আশা করা বৃথা, ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না।

আর প্রীতি? প্রীতি সুখী হবে উড্-বী গ্লোব ট্রটারের হাতে পড়ে? এই অদ্ভুত দাড়িওলা অপদার্থ ছেলেটা, যে কুৎসিত ইয়াংকী ভাষা শিখেছে আমেরিকান সোলজারদের কাছ থেকে? বাবাকে বলে 'পপ্', সিগারেটকে বলে 'বাট', বন্ধুকে বলে, 'গাই', খুশি হলে বলে 'ও-লা-লা'? প্রীতির ভার নিতে পারবে এই রীতেন? দিতে পারবে সেই মর্যাদা প্রীতিকে —যা প্রত্যেক স্ত্রী পায় তার স্বামীর কাছ থেকে?

কিন্তু রীতেন প্রীতির ভার নিতে পারুক আর না-ই পারুক, প্রীতি নিজেকে তুলে দিয়েছে তার হাতে। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট রক্ত পাওয়া যায়নি—প্রীতি এগিয়ে এসেছে রক্ত দিতে। সত্যজিৎ কিংবা বনশ্রী একটা কথা বলবার আগেই।

হেমন্তের হাওয়ায় আবার একরাশ পাতা ঝরল। এত তাড়াতাড়ি শুরু হয় পত্রঝরার পালা? সত্যজিৎ ঠিক জানে না—বহুদিন সে পাড়াগাঁয়ে যায়নি।

বনশ্রী এসে পাশে দাঁড়াল।

—খুব কষ্ট দিলাম, না?

সত্যজিৎ তাকিয়ে দেখল। বনশ্রীর গলায় এখনো কান্নার রেশ জড়ানো। চিকচিক করছে গাল দুটো। হঠাৎ ভারি ছেলেমানুষ দেখালো তাকে।

—ভদ্রতার কথা থাক। কিন্তু কাঁদছ কেন এখনো? ভয় তো কেটে গেছে।

—কে জানে—কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যজিৎ হাসতে চেষ্টা করল।

—ভবিষ্যতে যে বিশ্ব-ভ্রমণে বেরুবে, এত সহজেই তার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বলেই সে লজ্জিত হল। যেন সিনিকের মতো শোনালো কথাটা। ঠিক এইভাবে, এখানে, ওভাবে বলাটা বোধ হয় উচিত হল না।

বনশ্রী নিজের দুর্ভাবনাতেই তলিয়ে ছিল বেশি, তাই কথাটা লক্ষ্য করল না, বললে, ওই পাগলামির জন্যই একদিন ও বেঘোরে মারা পড়বে। জানো, আমার আর ভালো লাগে না এসব। ইচ্ছে করে, সব ফেলে দিয়ে দূরে কোথাও একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাই।

—সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ?

—সেন্টিমেন্টাল নয়। এই ড্রাজারি আর সহ্য হয় না। এমনি করে জীবনের একটা ব্লাইণ্ড্ লেনের মধ্যে এসে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াব, সে-কথা কে জানত!

বনশ্রীর মুখের ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে। অস্বাভাবিক শাদা দেখাচ্ছে মুখ। কিছু প্রসাধন ব্যবহার করে না কেন বনশ্রী?

হেডমিস্ট্রেস্ হলে কি কেবল আত্মনিগ্রহ আর শুষ্কতার সাধনাই করতে হয়?

পকেট হাতড়ে চামড়ার সিগার-কেসটা বের করে আনল সত্যজিৎ। আস্তে আস্তে চুরুট ধরালো একটা।

—জীবনের সব কিছুই একটা ব্লাইণ্ড্ লেনে গিয়ে থামে বনশ্রী। এমন একটা-না-একটা কানা দেওয়াল আছেই যেখানে গিয়ে সকলকেই থেমে দাঁড়াতে হবে। সে সার্থকতাই হোক আর ব্যর্থতাই হোক। পৃথিবীরও শেষ আছে!

—দর্শনের তত্ত্ব তুলো না। ও শুধু তর্কের জন্যেই তর্ক করা। তুমি বেশ জানো, আমি কী বলতে চাইছি।—বনশ্রী ক্লান্ত গলায় বললে, বাবা মেলাঙ্কলিয়ায় ভুগছেন, রীতেন এই রকম—আর আমি রাতদিন জোয়াল টেনে চলেছি। চাকরি করছি, নোট লিখছি, হয়তো টিউশনও ধরতে হবে এরপর। তুমিই বলো—এর চাইতে বেশি কিছু কি কোথাও ছিল না?

হয়তো ছিল। আউটরাম ঘাটের স্বপ্নবোনা দিনগুলো আকাশের তারায় তারায় সুর বাঁধত—গঙ্গার জল গিয়ে নামত সমুদ্রে—নারিকেল বীথি-মর্মরিত প্রবাল দ্বীপে জ্যোৎস্নায় কী সব ঝকমক করত চুনি-পান্নার মতো 'And then died the swan!'

কারো দোষ নেই। নিজেই সরে গিয়েছিল বনশ্রী, সত্যজিৎও ভুলে গিয়েছিল।

আর একটা সমুদ্রের স্বপ্ন আছে সুমিত্রের চোখে। আর একটা নীল-নির্মল দিগন্তের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে বীথির মন।

কিন্তু সে-কথা বনশ্রীকে বলে লাভ নেই।

—বিয়ে করো না কেন?—আকস্মিকভাবে জিজ্ঞাসা করল সত্যজিৎ।

একবারের জন্যে কি চমকে উঠল বনশ্রী? ঠিক বোঝা গেল না।

—সে হয় না।

—কেন হয় না? কাউকে কি ভালোবাসোনি কখনো?

গঙ্গার দিক থেকে আবার জাহাজের বাঁশি শোনা গেল। আবার কি পুরনো দিন-গুলো ফিরে এল স্মৃতির ভেতরে! বনশ্রী একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, একসময় তোমার সঙ্গ ভালো লাগত। তবু তোমাকেও বিয়ে করার কথা ভাবিনি। এইজন্যেই ভাবিনি যে তখন মনে হত বিস্ময়ের কোথাও শেষ নেই—কোন্‌খানে আমার জন্যে যেন কোন্ পরমাশ্চর্য অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকেই তার পথ বন্ধ করব কেন? কিন্তু তারপর দেখলাম—একবার থেমে গিয়ে বনশ্রী বললে, সেই পরম আশ্চর্য কোথাও নেই। জগতে এখন কোথাও কিছু নেই—যাকে দেখে তুমি বলতে পারো: এ অভাবনীয়, এ আমার সব স্বপ্নকে ছাড়িয়ে গেছে। তোমার কল্পনাই তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু—সে কোনোদিন তোমাকে অভিভূত হতে দেবে না, নত হতে দেবে না কারো কাছে।

বনশ্রী থামল।

এ হয়তো বিশেষ একটি মনের কথা—সাধারণ সত্য হয়তো নয়। কিন্তু কথা বাড়িয়ে ফল নেই। সত্যজিৎ বললে, তবু একজায়গায় তো রফা করে নিতে পারতে।

—হয়তো পারতাম। তুমি তো ছিলেই। কিন্তু—

কিন্তু পর্যন্ত বলেই থামল বনশ্রী। আর অল্প একটু খোঁচা লাগল সত্যজিতের মনে। বনশ্রী তাকে এত সুলভ ভাবল কী করে? সে কি কাঙালের মতো অপেক্ষা করে বসেছিল একমুঠো ভিক্ষের আশাতেই?

সত্যজিৎ খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে—জ্যোৎস্নার মধ্যে একরাশ কুয়াশার মতো ধোঁয়াটা ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল।

—কিন্তু—বনশ্রী বললে, তারপর দেখলাম বাবাকে, রীতেনকে, বুঝলাম সংসারের অবস্থা। বুঝতে পারলাম, নিজের কথা আর আমার ভাবা চলবে না।

—সংসারের কাছে আত্মবলি?

—ঠাট্টা করছ কিনা জানি না। ফিগারেটিভ্ ভাষায় যা-ই বলো, জিনিসটা তা-ই দাঁড়িয়েছে। এদের এমন বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিজের কথা আমি আর ভাবতে পারব না।

স্নেহ, প্রেম, বন্ধুত্ব। সবই কি জৈবিক আর স্বার্থিক সম্বন্ধের শৃঙ্খলে বাঁধা? তা হলে বনশ্রীর মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যাবে কী দিয়ে? কুসংস্কার? ইট্‌স্ ইন্ ইয়োর

ব্লাড্? হয়তো তাই হবে।

সত্যজিৎ বললে, জানো, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।

—সত্যি?

—সত্যি।

বনশ্রী আস্তে আস্তে বললে, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্।

কেবিন থেকে প্রীতি বেরিয়ে এল। এসে দাঁড়ালো দুজনের মাঝখানে।

—দাদা—শান্ত গলায় প্রীতি বললে, দাদা, আজ রাত্রে আমি হাসপাতালেই থাকতে চাই। ওঁকে এ অবস্থায় ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।

সত্যজিৎ আর বনশ্রীর দু-জোড়া চোখ ঘুরে প্রীতির মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

বাইশ

শিবশঙ্কর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন এ ক'দিনে। কেন বলা যায় না—ইন্দ্রজিতের গণ্ডগোলও কমে এসেছে অনেকটা। সেই রঘুর হাত কাটার রক্ত দেখবার পর থেকেই কি একটা ভয় ঢুকেছে ইন্দ্রজিতের মনে। চেঁচায় কম—প্রায়ই টেনিসন খুলে বসে থাকে—বিড়বিড় করে আওড়ায় 'লক্‌স্‌লি হল'।

শুধু কিছুতেই ক্ষমা করেনি শিবশঙ্করকে—কোনোদিন করবে সে আশাও নেই। এ এক বিচিত্র অবস্থা ইন্দ্রজিতের। তার মনের অর্ধেক আলো, অর্ধেকটা অন্ধকার। অর্ধেকে স্বাভাবিক চেতনার ঢেউ উঠছে পড়ছে, বাকী আধখানায় বিশৃঙ্খলার ঝোড়ো হাওয়া। এই আলো-আঁধারে, এই নিস্তরঙ্গতায় আর তুফানে, তার মনটা এক অপূর্ব জগতে বাস করছে। সেখানে থেকে থেকে সে এক-একটা বিকৃত বীভৎস রূপ দেখতে পায়—দেখতে পায় একটা কদাকার মূর্তি। সে মূর্তি শিবশঙ্করের—তার জীবনের দুগ্রহ!

কিছুতেই ক্ষমা করবে না বাপকে। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না তার দুর্ভাগ্যের জন্যে শিবশঙ্করের পাপ দায়ী নয়।

আর শিবশঙ্কর কি ভাবেন ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে? বোঝা যায় না। হয়তো এখন আর কিছুই ভাবেন না। মুখার্জি-ভিলার দেওয়ালে দেওয়ালে ফাটলের মতো, তেতলার পুবের বারান্দার বিপজ্জনক কোনাটার মতো ইন্দ্রজিৎ। এখন তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। যেমন নিজের ঘরের ভেনাস-অ্যাডোনিসের ওই নির্লজ্জ লালসার নগ্ন ছবিটা তাঁর মনে আজ আর কোনো প্রতিক্রিয়া জাগায় না, তেমনি ইন্দ্রজিতের সমস্ত কদর্য চিৎকার আর কল্পনাতীত অভিশাপ তাঁর নিরাসক্তির দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফিরে যায়।

শুধু একটা জিনিস সত্যজিৎকে সব সময়ে সন্তর্পণে আড়াল করতে হয়। প্রীতি আর রীতেনের ব্যাপারটা।

রীতেন যে-কদিন হাসপাতালে ছিল, প্রীতি নিয়মিত দেখতে গেছে তাকে, খবর নিয়েছে। অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়াবার জন্যে মধ্যে-মধ্যে সত্যজিৎ সঙ্গে গেছে, নইলে রঘুকে পাঠিয়েছে। বাধা দিলেও প্রীতিকে ঠেকানো যাবে না—ওই সার্কাসের ক্লাউনটার ভেতরে রূপকথার রাজপুত্রকে আবিষ্কার করেছে সে। সত্যজিৎ জানে—যা অনিবার্য তাই ঘটতে চলেছে।

কিন্তু পরিণাম?

সে-কথা ভেবে আর লাভ নেই। মুখার্জি ভিলার যে নিয়তি আসন্ন হচ্ছে—তাকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই। যে আঘাত শিবশঙ্করের পাওনা—কোনোমতেই তার হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো যাবে না।

মাঝখান থেকে তারও তো ছেলেমানুষী কম হল না। সেই একটা অসম্ভব দুর্বল মুহূর্তে অকারণে সে কথা দিয়ে এসেছে পূরবীকে। পূরবী সরল, পূরবী গভীর। বনশ্রীর সঙ্গে যত সহজে বাঁধনটা কেটে গিয়েছিল, পূরবীর ক্ষেত্রে তা আর সম্ভব নয়। আজ ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে বনশ্রীর সঙ্গে গল্প করা চলে—হীরেন যাকে "ওল্ড-ফ্লেম" বলেছিল, তার শেষ ভস্মকণাটুকুও সময়ের বাতাসে উড়ে গেছে। সে মন আর আজকের মনে অনেক তফাত। এখন আর এত অবলীলায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। সে-ও এখন ক্লান্ত, এখন তারও মনে একটা নিশ্চিত আশ্বাস দরকার—একটা আশ্রয় দরকার। পূরবীর মধ্যে সে নিশ্চয়তা আছে—সেই আশ্বাস পাওয়া। না—বনশ্রীকে আর ভয় নেই। মিথ্যেই সেদিন চমকে উঠেছিল সে—স্মৃতির একটা চকিত উচ্ছ্বাস অকারণে তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। বনশ্রী আর যাই হোক—"সাইনারা" নয়—জীবনের কোনো উন্মাদ লগ্নে দুটি মিলনোৎসুক অধরের মাঝখানে তার প্রেতের মতো ছায়ামূর্তি নেমে আসবে না।

কিন্তু সে নিজে কি সত্যিই পূরবীকে ভালোবেসেছে? স্নেহ, করুণা, মমতা ছাড়িয়ে পূরবী কি তার রক্তে প্রবেশ করেছে সেই অনিবার্যতায়—যা প্রত্যেকটি সন্ধ্যাকে স্বপ্নে ভরে দেয়, দূর থেকে যে-কোনো একটি মেয়েকে দেখে যা বুকের ভেতরে ঢেউ তোলে?

পূরবী প্রতীক্ষা করে আছে। পূরবীর মতো মেয়েরা চিরদিনই প্রতীক্ষা করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে সত্যজিৎ? দূর হোক—দুর্ভাবনার কোথাও শেষ নেই। তার চাইতে পুরনো আড্ডাটায় আবার যাতায়াত আরম্ভ করলে মন্দ হয় না। মনের এই নৈরাশ্যপীড়িত অবস্থা, এই ভাবনার বিলাস—এর কাছ থেকে তার এখন যথা-সম্ভব মুক্তি পাওয়া দরকার। আবার নতুন করে পাঁচ বছর আগেকার দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যাক—আবার তর্ক জুড়ে দেওয়া যাক সুমিত্রের সঙ্গে—আবার চিৎকার করে প্রমাণ করা যাক: ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে আজও মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের

পালা শেষ হয়নি।

বেরুতে গিয়েও কেমন কুঁড়েমি ধরল, ঈজি চেয়ারটায় বসে পড়ে চুরুট ধরালো সত্যজিৎ। বীথি এল এই সময়ে।

জামিনে আছে। ওদের কেস্ এখনো পেণ্ডিং। আর সেই জন্মেই বীথির কাজ-কর্ম এখন ভয়ানক বেড়ে গেছে—সব সময়ে নিদারুণ ব্যস্ত। কলেজে অবশ্য তাকে দেখা যায়, কিন্তু যতটা কমন-রুমে আর করিডোরে—ততটা ক্লাসে নয়। প্রিন্সিপ্যাল্ একদিন বলেছিলেন, প্রফেসার মুখার্জি, আপনার বোনটি যে দুর্দান্ত লীডার হয়ে উঠল, সময় থাকতে ওকে কণ্ট্রোল করুন। সত্যজিৎ হেসে জবাব দিয়েছিল: এখন বড় হয়েছে—ওরা কারো কণ্ট্রোলে আসতে রাজী নয়। শুনে প্রিন্সিপ্যাল্ চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, ইয়েস্ দে আর নাউ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট্। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট্ সিন্স ফিফ্‌টিন্‌থ আগস্ট, নাইন্‌টিন ফর্‌টি সেভেন। দেশের অবস্থা যা হচ্ছে তা চমৎকার।

নিঃশব্দ হাসিতে, দেশের দুর্গতিতে উত্তেজিত প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে একমত হয়ে টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে চোখ নামিয়েছিল সত্যজিৎ। ভেবেছিল পরে বীথিকে কথাটা সে বলবে, কিন্তু মনে ছিল না।

এ হেন বীথি—উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট থেকে যে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই মাননীয়া মেয়েটি এসে সত্যজিতের ঘরে ঢুকল।

—ছোড়দা—

চোখ দুটো আধবোজা করে সত্যজিৎ চুরুটে টান দিয়ে বললে, কী খবর?

—দারুণ দরকার আছে।

—বিপ্লবের খবর কী? এসে পড়ল?

—কাছাকাছি।

—সিগ্‌ন্যাল দিয়েছে?

বীথি হেসে ফেলল।

—সিগ্‌ন্যাল বলছ কি, প্রায় 'ইন্' করেছে।

—প্রায় কেন?—চুরুটের ধোঁয়ায় মুখের সামনে অস্থায়ী মেঘজাল সৃষ্টি করে সত্যজিৎ বললে, আসতে বাধাটা কোথায়?

—লাইন-ক্লিয়ারের জন্মে। তোমাদের মতো পেটি বুর্জোয়া ইণ্টেলেকচুয়ালদের পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান করেই ভুল হয়েছে—গাড়ি আসবার মুখেই তোমরা ঝিমিয়ে পড়েছ!

—রিয়্যালি!—সত্যজিৎ এবার মুগ্ধ চোখ মেলল: বেশ বলেছিস তো। নাঃ—সত্যিই তুই এবার লীডার হয়ে উঠেছিস, কার সাধ্য রোধে তোর গতি—এবং তোদের ট্রেন।

মুখার্জি ভিলা যে হাসি অনেকদিন আগে ভুলে গেছে—সেই শুভ্র উজ্জ্বল হাসির লহরে লহরে বীথি ঘরখানাকে ভরিয়ে ফেলল। সত্যজিৎ আশ্চর্য হয়ে ভাবল: এ হাসি বীথি পেলো কোথা থেকে! এ হাসি শিবশঙ্করের নয়—ইন্দ্রজিতের নয়, প্রীতির নয়—সে নিজেও এই মনের ছোট টুকরোটিকে বোধ হয় যুগান্তরের পেছনে ফেলে এসেছে।

হাসি থামিয়ে বীথি বললে, সত্যি, খুব দরকারী কথা। আচ্ছা ছোড়দা, দিদির কথা কিছু ভাবছ না?

সব ঘোলা হয়ে গেল। এ-সব আলোচনা বীথি কেন করে? ওর মুখে এ যেন মানায় না।

—কী হবে ভেবে? ও যাতে সুখী হয়—তাই করুক।

—তার মানে? তুমি কি চাও—দিদি রীতেনকে বিয়ে করবে?

—ক্ষতি কী?

—ক্ষতি কী!—অকৃত্রিম বিস্ময়ে বীথির ভ্রূ দুটো প্রসারিত হয়ে গেল: রীতেনবাবুকে তো গাব্বে-হাউসের নতুন এক্‌জিবিট ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

—তোর আর প্রীতির চোখ এক নয়।

—অদ্ভুত!—বীথি খানিকক্ষণ বিমর্ষ হয়ে রইল: দিদির কি টেস্ট বলে কিছুই নেই?

—এটা বুর্জোয়া সেন্টিমেণ্ট বীথি।—সত্যজিৎ নিজের মনের ভারটাকেও লঘু করতে চাইল।

বীথি অত সহজে কথাটা ছেড়ে দিলে না। তেমনি ভুরু কুঁচকে বললে, রুচি জিনিসটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—এমন থিয়োরি মার্কস্‌বাদের কোথাও নেই। ঠাট্টা নয় ছোড়দা। ধরা গেল ছোড়দি ওকে ভালোবাসে। কিন্তু রীতেনের টাইপের ছেলেকে কি সত্যিই বিশ্বাস করা চলে? ও যদি ওকে বিট্রে করে শেষ পর্যন্ত?

এই কথাটাকেই সত্যজিৎ কোনোমতে মনে আনতে চায় না—প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। আবার চুরুট থেকে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে বললে, অ্যাণ্ড দেন্ ইট উইল্ বি এ ভেরি ভ্যালুয়েবল্ এক্‌স্‌পিরিয়েন্স ফর প্রীতি। মে বি র‍্যাদার কস্টলি।

বীথি আহত হল।

—সত্যি ছোড়দা—তুমি সিনিক্ হয়ে যাচ্ছ।

—রিয়্যালিটিকে সহজে স্বীকার করাকে কি সিনিক্ হওয়া বলে?—সত্যজিৎ আস্তে আস্তে বললে, আসল কথা হল, এখন সব জিনিসটাই তোর আমার ভাবনার বাইরে চলে গেছে বীথি। উই মাস্ট ওয়েট অ্যাণ্ড সী।

বীথি একটু চুপ করে রইল। হয়তো বুঝতে পারল না কথাটা।

—ঠিকই বলেছ। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। হয়তো মোহভঙ্গ হতেও পারে।

পারে কি? ভাবতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ। বারান্দায় রোদ পড়ে ক্যাক্টাস আর অর্কিডগুলো একরাশ বিকৃত আঙুলের মতো ছায়া ফেলেছে। ওই আঙুলগুলো যেন গলা টিপে ধরতে আসছে মুখার্জি ভিলার। একটা চরম দুর্ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত ফিরতে পারে প্রীতি?

বীথি বললে, আমাকে গোটা ত্রিশেক টাকা দিতে হবে ছোড়দা।

—ত্রিশ টাকা? কী করবি রে?

—কন্‌ফারেন্স যাব। সাউথে। পরশু বেরুতে হবে ম্যাড্রাস্ মেলে।

—সে কি! বাবা—

—সে আর ভাববার উপায় নেই ছোড়দা। যা হওয়ার হবে।

সত্যজিৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যিই ভাববার উপায় নেই তার। অনিবার্য পরিণাম তৈরি হচ্ছে। অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে এ-বাড়ির—অনেক পাওনা জমা হয়ে আছে শিবশঙ্করের জন্যে।

—তোদের অ্যানুয়াল আসছে যে।

—ঠিক প্রমোশন দেবেন প্রিন্সিপ্যাল্। আমাকে যতটা ডিজলাইক করেন—ভয় করেন তার চাইতেও বেশি।

সত্যজিৎ আবার নিঃশব্দে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ।

—ত্রিশ টাকা কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে ছোড়দা। বাকীটা আমি ম্যানেজ করে নেব।

সকালেই বনশ্রীর পাবলিশার দেড়শো টাকার একটা বেয়ারার চেক পাঠিয়েছে—সেটা পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। সেদিকে দেখিয়ে সত্যজিৎ বললে, ওটা ভাঙিয়ে কাল এনে দেব।

খুশিতে উছলে উঠল বীথি, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব ছোড়দা—

—ধন্যবাদের দরকার নেই। বিপ্লব হওয়ার পরে আমাকে একটা ন্যাশানাল প্রফেসার করে দিস—তা হলেই হবে।

—নিশ্চয়। তখন তোমার কেস্ কন্‌সিডার করা হবে বইকি।—বীথি আবার হাসল: আমি বেরুচ্ছি, হাতে অনেক কাজ এখন।

বীথির হাতে অনেক কাজ। কিন্তু সত্যজিতেরই কোনো কাজ নেই। কেবল নিজের মনের মধ্যে মন্থন করা—কেবল অনিশ্চয়তার একটা সীমান্তে দাঁড়িয়ে কালকে লক্ষ্য করে যাওয়া। কিন্তু কোনো অর্থ হয় না এর। একটা কোনো ভূমিকা নিতেই হবে। নিজের মানসিক অসুস্থতা থেকে বাঁচবার জন্যেও তার যা হোক কিছু করা দরকার।

সুমিত্রের বক্তৃতা মনে পড়ল। তৃতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছে সে।

ইন্টেলেক্‌চ্যুয়ালি ডিক্লাসড্‌—অথচ তার বাস্তব রূপটাকে স্বীকার করবার শক্তি নেই; সংগ্রামকে জেনেছি, অথচ হাতে নেবার উদ্যম নেই। অকারণে ক্রিটিক্যাল—অহেতুক-ভাবে সাবজেক্‌টিভ—

ইন্দ্রজিতের চিৎকারে সে চকিত হয়ে উঠল। লীয়ার আউড়ে চলেছে। বায়ুবর্ষণ-তাড়িত হীথের মধ্যে প্রবঞ্চিত অভিশপ্ত লীয়ার বুকফাটা যন্ত্রণায় অভিশাপ দিচ্ছে।

কিন্তু লীয়ারের এই ভূমিকায় সত্যিই অভিনয়টা কে করবে? অকারণে সত্যজিতের মনে হল: এই ভূমিকাটা সত্যিই কার? শিবশঙ্করের না ইন্দ্রজিতের?

সত্যজিৎ উঠে পড়ল। নাঃ—আর নয়। এবার বেরুতেই হবে তাকে। সেই পুরনো আড্ডায়। সুমিত্রের সঙ্গে সেই পুরনো তর্কে। বীথিকে দেখে আজ তার হিংসে হচ্ছে। একদিন ও-রকম জীবন তারও ছিল।

সেই সময় রঘু নিয়ে এল চিঠিটা। বিকেলের ডাকে এসেছে।

খাম খুলেই ঢেউ তুলে উঠল মাথার ভেতর। পূরবী তাকে চিঠি দিয়েছে। সেদিনের পর পূরবীর কাছ থেকে তার প্রথম খবর—পূরবীর হাত থেকে পাওয়া এই তার প্রথম চিঠি।

শ্রীচরণেষু, খুব বিপদে পড়ে ডাকছি। একবার আসতে হবে। কবে আসবেন?

পূরবী

'আসবেন'-এর 'ন'টা পরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো লজ্জায়—হয়তো দাবিটা এখনো সম্পূর্ণ করতে পারছে না বলে।

কিন্তু চিঠির প্রত্যেকটা অক্ষরে একটা গভীর কাতরতা—খানিক ব্যাকুল সজলতা অনুভব করল সত্যজিৎ। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। আজই যাবে সত্যজিৎ। এখুনি।

তেইশ

ডেকেছিলে কেন?

ঘরে বিকেলের নীলাভ ছায়া পড়েছে। বাইরে রোদ ছিল, কিন্তু তার পথ জুড়ে রয়েছে সামনের কানা দেওয়ালটা। ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। পূরবী বসে আছে চুপ করে। চোখের দৃষ্টি টেবিলের উপর—একখানা খাতার শাদা পাতা খোলা সেখানে।

—ডেকেছ কেন? কী হয়েছে?—আবার মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল সত্যজিৎ। সমস্যাটা বাড়ির কিছু নয়। পা দিতেই কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কোনো বিশেষ কিছু হলে তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারত সত্যজিৎ। অতএব জিনিসটা পূরবীরই ব্যক্তিগত।

এইবার টেবিলের ড্রয়ারটা টানল পূরবী। বের করে আনল একখানা চিঠি। বললে, পড়ুন।

খামের উপরে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলা দেশেরই একটি মফঃস্বল শহরের ঠিকানা।

—কী ব্যাপার? সন্ন্যাসিনী হতে যাচ্ছ নাকি?

নীলাভ বিকেলের আলোয় বিবর্ণ হাসি হাসল পূরবী।

—পড়েই দেখুন।

টাইপ করা ছোট একটি চিঠি, একটা ব্যাকরণ ভুল আছে তাতে। আর তার বক্তব্য হল: তোমার দরখাস্ত আমরা পেয়েছি। তুমি স্বচ্ছন্দেই ওখান থেকে ট্রান্স্ফার নিয়ে এখানে এসে ভর্তি হতে পারো। আমরা তোমাকে থাকা খাওয়া ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা স্টাইপেণ্ড্ দেব। আমাদের শর্ত যদি তুমি মেনে চলতে রাজী থাকো, তা হলে তোমার অভিভাবকের চিঠি নিয়ে পত্রপাঠ আমাদের জানাও। চিঠির নিচে সেক্রেটারির দস্তখত।

চোখ তুলে সত্যজিৎ বললে, এর মানে?

—ওদের ওখানে একটা দরখাস্ত করেছিলুম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কারণটা কী? কলকাতা ছেড়ে পালাতে চাও কেন?

—আমার আর ভালো লাগছে না।

মনটা সঙ্গে সঙ্গেই কালো হয়ে উঠল সত্যজিতের। পূরবী চলে যেতে চায়। কেন চায়? সত্যজিৎ তাকে ভালোবেসেছে বলে? তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—সেই ভয়ে? সংকোচেই হোক, আর সত্যজিতের ব্যক্তিত্বের জন্যেই হোক—মুখ ফুটে বলতে পারেনি তুমি দস্যুর মতো আমাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো না? তাই এভাবে আত্মরক্ষা করবার পথ খুঁজছে?

অথচ, সত্যজিৎ ভেবেছিল, পূরবী খুশি হয়েছে। মনে করেছিল, সে যে তাকে চেয়েছে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য পূরবীর কল্পনাতেও ছিল না। সমস্ত জিনিসটাই নিজের দিক থেকে সে বিচার করেছিল, পূরবীর যে একটা আলাদা মন আছে, সত্যজিতের খেয়াল ছাড়া তারও যে একটা আলাদা সত্তা আছে—এই কথাটাই সে ভাবতে পারেনি। আমি ক্লান্ত, অতএব তোমার কাছে এসেছি; বনশ্রীকে নিয়ে পুরনো নাটক আর জমবে না। অতএব এ-বার তোমাকেই নতুন নায়িকা নির্বাচন করা যাক। কিন্তু তার খেলায় পূরবী তৎক্ষণাৎ খেলনা হয়ে সাড়া দেবে—নিজের সম্পর্কে এতখানি শ্রদ্ধা না থাকলেই তার ভালো হত।

পকেট থেকে চুরুট বের করে তার গোড়াটা হিংস্রভাবে দাঁতে চেপে ধরল সত্যজিৎ। বললে, অনার্স পড়ায় ওখানে ?

—জানি না। না থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।

—ওঃ !—চুরুটে দেশলাই ধরিয়ে সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু শর্তের কথা দেখছি চিঠিতে। সেগুলো কী ?

—ওঁদের নার্সারি স্কুলে পড়াতে হবে। সকালে তিন ঘণ্টা করে নিতে হবে ক্লাস। খাওয়া নিরিমিষ। থিয়েটার সিনেমা দেখা চলবে না, বাইরের মেলামেশা চলবে না —ওঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে হবে—

—অর্থাৎ পুরোদস্তুর 'নানারী' ? তার পরের স্টেজটা কী ? ওখানকার সেবিকা ? গৈরিকপরা ভৈরবী ?

পূরবীর ম্লান মুখ পাণ্ডুর হল।

—অনেকে তাও করেন। কেউ কেউ চলেও এসেছেন।

—আর তুমি ?

সত্যজিৎ স্থির দৃষ্টি মেলে ধরল পূরবীর মুখের উপর : তুমি কি করতে চাও ?

—এখনো কিছু ভাবছি না। পরে ভাবব।

—কাকা-কাকিমার আপত্তি হবে না ?

—ওঁদের টাকার দরকার। গোটা ত্রিশেক করে পাঠাতে পারব।

মিনিট দুই ঘরটা স্তব্ধতায় ডুবে রইল। বিকেলের নীল ছায়া আরো গভীর হয়ে সমুদ্রনীল রঙ ধরল। পাশের ঘরে অন্য ভাড়াটেরা দেওয়ালে বোধ হয় পেরেক পুঁতছে—তারই একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল তালে তালে।

—তা হলে আমাকে ডাকলে কেন ? সব তো ঠিকই করে ফেলেছ দেখছি।

এইবারে কথা বলার সময় এসেছিল পূরবীর। বলতে চেয়েছিল, তোমার জন্যেই তো আমি পালাতে চাইছি। কলেজে তোমার আমার সম্পর্কের কথা আর গোপন নেই—মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জনটা এখন সরব হয়ে উঠেছে। সেদিনও ক্লাসে ইতিহাসের প্রফেসার কে-এল-সি একটা কথায় 'মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড প্রফেসার মুখার্জি' বলে যে বাঁকা দৃষ্টি পূরবীর মুখের ওপর ফেলেছিলেন, সে-কথা সে ভুলতে পারেনি—আরো ভুলতে পারেনি, পাশের মেয়েটির রুমাল-চাপা দেওয়া মুখ রুদ্ধ হাসিতে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

পূরবী বলতে চেয়েছিল, আমাকে যদি নিতেই চাও—তা হলে তোমার দাবীটাকে পাকা করে নাও। এমনভাবে—সকলের সামনে, চারদিকের নিষ্ঠুর কৌতুকের কাছে আর মেলে রেখো না। আর যদি এখনো তোমার সময় না হয়ে থাকে—তা হলে কিছু-দিনের জন্যে আমিই দূরে সরে যাই। শুধু কি নিজের লজ্জাতেই আমি সরে যেতে চাইছি ?

ওদের মন লঘু—ওদের রুচি ইতর। ওরা কী করে বুঝবে তোমাকে, কী করে জানবে তুমি কত বড়—কী করে ওরা দেখবে তোমার সম্রাটের মহিমা। সে মন, সে দৃষ্টি ওদের নেই। তাই ওরা তোমাকে লঘু করতে চায়, অশ্রদ্ধার মন্তব্য করে। সে আমি সইতে পারব না। নিজের লজ্জার চাইতেও তোমার অপমান আমার বুকে অনেক বেশি করে বাজে। তাই আমি সেই অপমান থেকে তোমাকে আড়াল করতে চাই। জানি, তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার মতো বেদনা আমার আর নেই, সারাদিনে একটি বারও তোমাকে আমি দেখতে পাব না সে-কথা আমি ভাবতেই পারি না। কত দুঃখে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছি—সে-কথা তুমি বোঝো, ক্ষমা করো আমাকে। আর যদি পারো, এখনই তোমার কাছে আমায় তুলে নাও—আমি তো অপেক্ষাই করে আছি।

কিন্তু এ-সব কথা রাত জেগে ভাবা যায়, সামনের কানা দেওয়ালটার উপর নিশীথ রাত্রের কালো ছায়া ভাসতে থাকলে, রেডিয়োর শেষ প্রোগ্রামে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের করুণ মূর্ছনায় ঘর ভরে গেলে যখন বুকের মধ্যেও বাজতে থাকে :

"পথিক আমি এসেছিলেম
তোমার বকুল তলে
পথ আমারে ডাক দিয়েছে
এখন যাব চলে—"

সেই সময় সব কথা সাজিয়ে বলতে পারে পুরবী। কিংবা অন্যমনস্ক হয়ে চশমা খুলে রেখে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথার ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেলে তখন নিজের একটা কথাও সে আড়াল রাখতে পারে না। কিন্তু এখন ? এই বিকেলে ? সত্যজিতের মুখোমুখি ? না—না।

পুরবী জবাব দিল না।

সত্যজিৎ চুরুটে টান দিলে—আগুন নিবে গেছে। নিজের মনেও কোথাও কী একটা নিবে গেছে তার। কথা বলবার উৎসাহ হচ্ছে না। তবু আস্তে আস্তে বললে, এতে বিপদের কী আছে ? ইচ্ছে হয়—যাও।

যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা ছটফটিয়ে উঠল পুরবীর।

সত্যজিৎ ভুল বুঝেছে ? নাকি এমনই নিষ্ঠুর হয় পুরুষেরা ?

—আপনার আপত্তি নেই ?

—আমি কেন আপত্তি করব ?—চাপা ঠোঁটে হাসল সত্যজিৎ।

পুরবীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। তুমিই তো দূরে সরিয়ে দিচ্ছ আমাকে। তোমার জন্তেই তো আমি নির্বাসনের পথ খুঁজে নিয়েছি। না—নিজের জন্তে নয়।

তোমাকে নিয়ে লজ্জা আমার যতই বড় হোক—তাতেও আমার সুখ আছে। কিন্তু ওরা তোমাকে ছোট করতে চাইছে। ওদের হীনতার পাঁক ছিটিয়ে দিতে চাইছে তোমার গায়ে। সেইটেই যে আমি সইতে পারি না। তুমি একবার জোর করে বলো—'যেতে দেব না'—এক বার হাত বাড়িয়ে বলো—'এসো আমার সঙ্গে।' তা হলে—তা হলে—

গলার শিরায় এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল কথাগুলো। মুখ ফুটে একটা শব্দও বেরুল না।

মাথা নিচু করে প্রায় নিঃশব্দ গলায় পূরবী বললে, তা হলে যেতেই বলছেন?

—এখানে যদি ভালো না লাগে, যাবে বইকি। আর টাকারও তো দরকার।

—হ্যাঁ টাকার খুব দরকার।—পূরবীর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সে হাসিটা দেখতে পেলো না সত্যজিৎ।

—আচ্ছা, আসি তবে—

সত্যজিৎ আর একটা কথাও বলল না—ফিরেও তাকালো না পূরবীর দিকে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল পূরবী—সারা শরীর কান্নায় টলমল করে উঠল।

ভেবেছিল, হেসে উঠবে সত্যজিৎ। সেদিনের মতো তার হাত টেনে নেবে মুঠোর ভিতর। বলবে, এইজন্যে তোমার এত ভয়? এরই জন্যে তুমি পালাতে চাও? আমি? আমি আছি। তাকাও আমার দিকে। তোমার সব ভাবনা—সব লজ্জা আমি তুলে নিলাম।

কিন্তু সত্যজিৎ বুঝল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। পুরুষ এই রকমই। এই ওদের নিয়ম।

টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে কাঁদবার সময়টুকুও পূরবী পেল না। মা এসে পড়েছেন।

—সতু কোথায়? চা খেল না?

—কাজ আছে, চলে গেলেন—

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পূরবী। মার কাছে কান্না লুকোবার মতো এ বাড়িতে কোথাও জায়গা নেই—এক স্নানের ঘরটা ছাড়া।

পথে বেরিয়ে এল সত্যজিৎ। আকাশে কনে-দেখা আলো। আত্মগ্লানিতে জ্বলতে লাগল মন। ঠিকই হয়েছে—তার পাওনাই পেয়েছে সে। নিজের প্রয়োজনে পূরবীকে সে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভালবাসাটা ছিল একতরফা, সবটাই ছিল নিজের স্বার্থে

জড়ানো। তার পুরো জবাবটাই পেয়েছে।

বীথি সামনে থাকলে হেসে উঠত।

—অনুগ্রহের দিন চলে গেছে ছোড়দা। অনুগ্রহ কথাটাই মানুষকে অপমান করা। শ্রদ্ধা করতে জানো না, দয়া করতে গিয়েছিলে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা উলটো দিকে ঘুরছে—সেটা ভুলো না।

ঠিক। কিন্তু সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কোথাও কোনো অবলম্বন নেই। মাঝিহীন নৌকোর মতো ক্লান্ত বিকেলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে সে। আপাতত তার কোনো কাজ নেই—কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তার চোখের সামনে কোনো কিছুর কোনো অর্থ নেই।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চিনে বাদাম চিবুনো যেতে পারে; সামনের উঁচু প্রাচীরটা জুড়ে সিনেমার পোস্টার পড়েছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে সেগুলো। নইলে বাড়ি ফিরে গিয়ে শোনা যেতে পারে ইন্দ্রজিতের বীভৎস চিৎকার—ভিলোঁর কবিতা—

ভিলোঁ! He was a Bohemian! উদ্দাম বেপরোয়া জীবন। লাইফ অ্যাণ্ড ওয়াইন। অ্যাণ্ড লাইফ?

পাশে একটা গাড়ি এসে থামল। একদা ছাত্র-আন্দোলনকারী, অধুনা সরকারী চাকুরে পরিতোষ মৈত্র।

—হ্যালো অধ্যাপক!

—হ্যালো!

—কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।

—জাস্ট স্ট্রলিং?

—হুঁ।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বললে, ছবি দেখতে যাবি? মেরিলিন মুনরোর? যদি অবশ্য অধ্যাপকের নীতিতে না বাধে—

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সত্যজিৎ। তারপর পরিতোষের খুলে দেওয়া গাড়ির দরজায় পা বাড়িয়ে বললে, চল্—

চব্বিশ

সেদিন মেরিলিন মনরোর ছবি দেখল সত্যজিৎ, রেস্তোরাঁয় খেলো পরিতোষের সঙ্গে, বাড়ি ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। খুব সহজভাবে নেওয়া যাক জীবনটাকে। আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই দিনগুলোর ভেতর—যখন কোনো ভার ছিল না মনের মধ্যে—নিজেকে নিয়ে কোথাও কোনো দায় ছিল না। সেদিন সকলের সঙ্গে স্রোতের মধ্য দিয়ে চলা: ক্রিকেটের মাঠে, সিনেমায়, ইউনিভার্সিটিতে, পলিটিক্যাল তর্কে, ছাত্র শোভা-যাত্রায়। আরও অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি পা ফেলে আমিও চলেছি—এইটুকু যথেষ্ট, এর বেশি কিছু ভাববার দরকার ছিল না।

সাড়ে দশটার ট্রামে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সত্যজিৎ ভাবছিল, মানুষের বয়স বাড়ে কখন? যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন নিজেকে সরিয়ে নেয় এক পাশে। আমি—আমি। তখন পৃথিবীর স্রোতে ভেসে চলা নয়, তখন ভাবা: এই স্রোত কতখানি বয়ে আসছে আমার দিকে, আমার প্রয়োজনে। তখন সেই দার্শনিকের ভাষায়: 'আমি আছি তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।' সভ্যতারও বয়স বাড়ে এমনি করে। যত বাড়ে—মানুষ তত আত্মকেন্দ্রিক হয়।

সেই নিজের প্রয়োজনেই সত্যজিৎ মনে করেছিল, পূরবী তারই একটি কথার উপর বিশ্বাস করে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করে থাকবে; বনশ্রী এতদিন পরেও বুঝি সেই গঙ্গার ধারের সন্ধ্যাগুলিকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু পূরবী তার ঘোর ভেঙে দিয়েছে। 'আমিত্বে'র উপর মস্ত একটা ঘা খেয়েছে সত্যজিৎ। তাকে বাদ দিয়েও মানুষের আলাদা মন আছে—আলাদা স্রোত আছে জীবনের।

আবার ফিরে যাওয়া যায় সকলের ভিতর? সেই সুমিত্র—আবার সেই আস্তিন গুটিয়ে রাজনীতির আলোচনা? আবার সেই খেলার মাঠ—মোহনবাগান স্কোর করলে গ্যালারীর ওপরে সেই লাফানো, আনন্দে পায়ের চটি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া? পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে ঘুগ্‌নি আর তেলেভাজা খাওয়া? বন্ধুর করুণ প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া: আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন অত? লেগে থাক—পেশেন্‌স্ পে-জ।

ফিরে যেতে পারে কি সত্যজিৎ? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিটা একটু একটু করে নিজের চারদিকে একটা শক্ত খোলা তৈরি করে দিয়েছে—সেটাকে ভেঙে ফেলা কি এতই সহজ আজকে?

কিন্তু সেই চেষ্টাই করতে হবে—নইলে তার মুক্তি নেই। মুখার্জি ভিলার বিষ তারও রক্তে তিলে তিলে জমে উঠেছে, তার নিজের ব্যক্তিত্বটা গুটিয়ে আসছে নৈরাজ্যের ভেতর

—কিছুদিনের মধ্যেই সে সিনিক হয়ে উঠবে। অথচ এই ত্রিশঙ্কু পরিণতিটাকেই ঘৃণা করে সত্যজিৎ—ঘৃণা করে সব চাইতে বেশি।

বাড়িতে যখন পৌঁছুল, তখন নীচেটা অন্ধকার। আস্তাবলে পা ঠুকছে ঘোড়াটা : বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে শিবশঙ্করকে নিয়ে অনেক রাতে সে কলকাতার ঘুমন্ত পথ বেয়ে কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসত, হয়তো এমনি রাত্রে সেই স্মৃতি আজও ওর পাকে চঞ্চল করে তোলে। একবার উপরের দিকে চোখ তুলে তাকালো। হিংস্র উগ্র খানিকটা আলোয় অস্বাভাবিক ভাবে ঝকঝক করে জ্বলছে শিবশঙ্করের কাচের জানলা। কি করছেন এত রাত্রে? অনুমান করতে পারে সত্যজিৎ। এক দৃষ্টিতে হয়তো তাকিয়ে আছেন ভেনাস্ আর মার্সের সেই কুৎসিত ছবিটার দিকে, ডাক্তারের বারণ সত্বেও বসেছেন এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে—আস্তাবলের ঘোড়াটার মতো তাঁরও উদ্দাম দিনগুলিকে মনে পড়ছে।

আচ্ছা, রেসের ঘোড়া অচল হলে কি তাকে গুলি করে মারে?

ছি ছি, এ কী কূট ভাবনা! এ তো ইন্দ্রজিৎ মুখার্জির।

মার্কারি ক্লকটায় এগারোটা বাজতে আরম্ভ হল। মুখার্জি ভিলায় কালপুরুষের কণ্ঠস্বর। কোনোদিন একটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় এই বাড়িটা যখন বালির স্তূপের মতো এলিয়ে পড়বে (সেই দিনটার কথা প্রায়ই ভাবতে চেষ্টা করে সত্যজিৎ), তখনো সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘড়িটা সমানে প্রহর গুণতে থাকবে। ওর আর মুক্তি নেই।

বারান্দায় উঠে এল সত্যজিৎ। ম্লান আলোয় দেওয়ালে অর্কিডের ছায়া—কতগুলো ভূতুড়ে আঙুলের মতো কাঁপছে। গ্রীক-পিলারের ওপর ঘুমন্ত পায়রার পাখা ঝাপ্টানি। প্রীতি-বীথির ঘরে একটা ফিকে নীল বাতি জ্বলছে, শোয়ার আগে বোধ হয় রাত্রির প্রসাধন করছে প্রীতি, দরজার খড়খড়ির ফাঁকে মৃদু গানের গুঞ্জন: "তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস"—

মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল সত্যজিৎ।

"দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস"—

এ গান কার উদ্দেশ্যে? রীতেন দি গ্রেটার?

ভাবতে ভালো লাগল না। রবীন্দ্রনাথের ওপর মমতা হয়। এই গান লিখবার সময় কার কথা ভেবেছিলেন তিনি? রীতেনের?

ইন্দ্রজিতের ঘর অন্ধকার। বারান্দার সামনে বসে বসে ঘুমুচ্ছে রঘু—হয়তো সত্যজিতের জন্যই অপেক্ষা করছে। মনে হল এ বাড়ির যত শ্রান্তি—যত অবসাদ সব যেন ওরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে।

পা টিপে টিপে সে আবার সিঁড়ি বাইতে লাগল। তেতলায়, নিজের ঘরে।

অন্ধকার। টেবিল, খাট, আয়না, আলনা, বইয়ের আলমারি। অচেনা। স্তব্ধ। মৃত।

সত্যজিৎ দাঁড়ালো। এর মধ্যেই আবছা হয়ে চোখে পড়ছে বড় আয়নাটা। তার ভেতরে আরো আবছা তার ছায়া। ধূমল, নির্নিরীক্ষ্য। ব্যক্তি সত্যজিৎ নয়—তার আত্মার প্রতিবিম্ব।

"And after my death
I enter my dark airless tomb
From where"—

From where?

কবি উত্তর দিতে পারেননি। হয়তো ইন্দ্রজিৎ জানে। আরো অন্ধকারে, আরো নীরন্ধ্র বিষাক্ততার অতলে। কিন্তু সত্যজিৎ কি সেকথা বিশ্বাস করে? জীবনকে কি সে ও-ভাবে দেখতে চেয়েছে কোনোদিন?

সুইচে আঙুল রেখে, সেটাকে টেনে দেবার আগে, আর একবার তমসাচ্ছন্ন আয়নাটায় নিজের আরো তামসী আত্মিক প্রতিবিম্ব দেখল সত্যজিৎ। আর মনে হল, পূরবী অনেক দূরে চলে যাবে—হয়তো কালকেই।

পৃথিবীকে নিজের প্রয়োজনে চাওয়া নয়—নিজেকে পৃথিবীর প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিলে তবেই মুক্তি। তাই কি পারে সত্যজিৎ? এই মুখার্জি ভিলার সমাধিকক্ষে একবার পা দিলে সে বিশ্বাস টলে যেতে চায়।

খুট করে আলো জলে উঠল। টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাবার। "Toothbrush hanging on the wall"—এলিয়টের কবিতা।

জীবন। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি। মুখার্জি ভিলার এই গণ্ডীর মাঝখানে থাকা—নিজেকে ঘিরে ঘিরে শামুকের মতো একটা শক্ত খোলা তৈরি করে যাওয়া। আর মধ্যে মধ্যে মনে হওয়া—পুরবী অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো কালকেই।

তাই তিন দিন পরে একটুও চমকালো না সত্যজিৎ।

একটা বিশেষ রোল নাম্বারের ঘরে লাল কালির লম্বা টান। পরুষ নিরুত্তাপ অক্ষরে লেখা: টেকন ট্রান্সফার।

ক্লাসে মুখ তুলে কারো দিকে তাকালো না সত্যজিৎ। এমন কি বীথির রোল নাম্বারে যখন একটা প্রক্সি পড়ল, তখনও না। তারপর বই খুলে তাকালো সোজা সামনের দেওয়ালের দিকে, পরিষ্কার গলায় পড়াতে আরম্ভ করল: "In Shakespearian tragedies, we always find a strange note of—"

না—ক্লাসের দিকে চোখ সে নামাবে না। পুরবী চলে গেছে। তার ছাত্রীদের দৃষ্টির চাপা সমবেদনার চাইতে অপমান আর কিছুই নেই।

বাড়ি ফিরল তিনটের কাছাকাছি। বারান্দায় একটা ছোট হোল্ড-অল আর স্যুট্‌কেস। বীথি দাঁড়িয়ে।

—কি রে, কী ব্যাপার?

—বাঃ, আমাদের সেই কন্‌ফারেন্স সাউথ ইণ্ডিয়ায়? টাকা নিলাম না তোমার কাছ থেকে? দিন ছয়েক লাগবে ফিরে আসতে।

—বাবাকে বলেছিস?

—বললে যেতে দেবেন নাকি?—বীথি হাসল।

—জানতে তো পারবেন। তখন?

—আমার সম্বন্ধে কোনো ইন্‌টারেস্ট্‌ নেই ছোড়দা। তাঁর কালো মেয়েকে তিনি কোনোদিন দেখতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে গান শোনবার জন্যে দিদিকে ডাক পড়বে—আমায় নয়। অতএব নিশ্চিন্ত থাকো।

—কিন্তু কাজটা বোধ হয়—

—ভালো হচ্ছে না—না?—সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল হাসিটা বীথির: যেন এ বাড়ির সবই ভালো চলছে। সবই ভেঙে যাচ্ছে ছোড়দা, এটা তুমি আমার চাইতে বেশি জানো। এখন আর আড়াল রেখে কী হবে? অতএব লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে চলো হাওড়া স্টেশনে। তুলে দিতে হবে মাদ্রাজ মেলে।

সব সমস্যার সমাধান করে দিলে বীথি।

মুহূর্তের জন্য সত্যজিতের দৃষ্টি ঘুরে গেল বীথির মুখের উপর দিয়ে। এই বাড়িটার ফাটলে সূর্যের আলোর একটা ঝলক। এই কালো মেয়েটা এখানে প্রক্ষিপ্ত। এ বাড়ির আলো-বাতাস-বিহীন উজ্জ্বল গৌরবর্ণতার ভিতর কোথা থেকে এনেছে রৌদ্রের রঙ—অরণ্যের শ্যামশ্রী। শিবশঙ্কর সহজাত সংস্কারেই চিনে নিয়েছেন—ও এখানকার কেউ নয়, এখানে ওকে মানায় না।

বীথি আবার বললে, ভাবছ কি? চলো। বড্ড ভীড় হবে গাড়িতে।

—দাঁড়া, চা খাই এক পেয়ালা।

—চা খাবে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।

সত্যজিৎ হাসল: এদিকে তো এত বড় বড় কথা—একা স্টেশনে যাওয়ার সাহস নেই?

—আছে। কিন্তু তোমাদের ভ্যানিটিকে একটু খুশি করতে চাই। অবলাদের সুবিধেটুকু ছাড়ব কেন? দেখো গাড়িতে জায়গা না থাকলেও কোনো সহৃদয় পুরুষ

আমাকে ঠিকই বলতে দেবেন।

—তুই ডেঞ্জারাস মেয়ে। আচ্ছা—চল্—

—বাবাকে ম্যানেজ করবার ভার কিন্তু তোমার।

—সে দেখা যাবে, চল্।

ট্রেনে বীথিকে তুলে দিতে অসুবিধে হল না। একটা দল ওদের ছিলই—একখানা থার্ড ক্লাস আগে থেকেই দখল করা ছিল ওদের।

আবার সন্ধ্যা। আবার নিজের ঘর।

টেবিলের উপরে একরাশ প্রুফ। বনশ্রী পাঠিয়েছে।

বিরক্তিকর। আজ সারাদিন মনের কাছে একা থাকতে চেয়েছিল সত্যজিৎ। নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে ভাবতে চেয়েছিল পুরবীর কথা। কিন্তু উপায় নেই। কেউ সময় দেবে না তাকে—এক মুহূর্তও না।

এমন সময় প্রীতি।

—কী চাই ?

—একটা খুব দরকারী কথা।

—বলো।—হতাশায় চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলে সত্যজিৎ : বলে যাও।

প্রীতির মুখ লাল টকটকে। উত্তেজনায় শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

—ছোড়দা—আমি—আমি—রীতেনকে বিয়ে করতে চাই।

দারুণভাবে চমকে উঠল সত্যজিৎ—চমকে উঠল প্রীতিও। ঝন্ঝন্ করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেজে উঠল সারা বাড়িতে। আছড়ে আছড়ে পেয়ালা-পিরিচ ভাঙছে ইন্দ্রজিৎ।

আর আর্ত চিৎকার।

তারস্বরে ভিলোঁর কবিতার আবৃত্তি করছে।

পঁচিশ

প্রায় দু মিনিট একটানা চিৎকার করল ইন্দ্রজিৎ, তারপর হঠাৎ থেমে গেল। উত্তেজনায় একটা অন্ধ উন্মত্ত উচ্ছ্বাসকে মুক্তি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল সে। আর চিৎকারটা থামবার পর সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল আশ্চর্য ভাবে। একটা পিন পড়ে গেলেও তার আওয়াজ পাওয়া যাবে এমনি স্তব্ধতা।

প্রীতির লাল টকটকে মুখখানা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ। সত্যজিতের সামনে ফেলে রাখা প্রুফটার ওপর লম্বালম্বি একটা মোটা আঁচড় পড়েছে—হাতের কলমটা চমকে চলে

গেছে তার ওপর দিয়ে। সমস্ত বাড়িতে এখনো চিৎকারটার নিঃশব্দ অনুরণন চলেছে—ফাটলধরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিউরে শিউরে উঠছে সেটা।

সত্যজিৎ-ই সহজ হল আগে।

—রীতেনকে বিয়ে করতে চাস ?

প্রীতি বসে পড়েছিল সামনের চেয়ারটায়। দু হাতে মুখ ঢেকে। লজ্জায় নয়—ভয়ে। ঘরের আলোটা কোণায় কোণায় একরাশ অর্থহীন বিকৃতি ছায়া রচনা করেছে—হঠাৎ সত্যজিতের মনে হল একদল অশরীরী যেন এখানে ওখানে গুঁড়ি মেরে বসে আছে—কী যেন একটা ভয়ংকর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

প্রীতি চোখ তুলল। রক্তাভ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

—তা ছাড়া আমার উপায় নেই ছোড়দা।

একটু সময় নিলে সত্যজিৎ। সিগার কেস খুলে একটা চুরুট বের করল, ধরিয়ে নিলে ধীরেসুস্থে।

—রীতেনকে তুই সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিস ?

শাড়ির আঁচল দিয়ে প্রীতি মুখটা মুছে নিল একবার।

—আমার মনে হয়, ভুল বুঝিনি।

—কিন্তু বাইরে থেকে যতটুকু ওকে দেখা যায়—

—সেটুকু ওর খেয়ালীপনা ছোড়দা। কিন্তু মনের দিক থেকে ও যে কী ছেলেমানুষ কত অসহায় সে অন্তত আমি জানি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। মুহূর্তের জন্য একটা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ভেসে গেল ভাবনার ওপর দিয়ে। পুরুষের ভালোবাসা শুরু হয় নেশা দিয়ে—মেয়েদের ক্ষেত্রেও কি তাই ? বাৎসল্য যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য পায়—মেয়েদের ভালোবাসা সেখানে উৎসারিত হয় তত সহজে। তাই রীতেনের সমস্ত পাগলামোর ওপরে বনশ্রীর এমন অবাধ প্রশ্রয় ; তাই যেগুলো রীতেন সম্পর্কে মানুষকে বিরূপ করে তোলে—সেইগুলোই প্রীতিকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। রীতেনের চরিত্রের উদ্দামতাই প্রীতির মনে মোহটাকে তীব্র করে তুলেছে—এই খামখেয়ালী অসংলগ্ন দায়িত্বহীন লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা পেয়ে বসেছে তাকে।

—কী ভাবছ ছোড়দা ?

—ভাবছি তুই নিজের মতো করে ওকে দেখছিস—ঠিক ওকে দেখতে পাচ্ছিস না।

—সকলেই নিজের মতো করেই অন্যকে দেখে ছোড়দা। ঠিক অন্যকে কেউ কি কোনোদিন দেখতে পায় ?

সত্যজিৎ উৎকর্ণ হল। এ-কথা বীথির মুখে মানাত—কিন্তু প্রীতির কাছ থেকে সে

আশা করেনি। নিজের চোখ দিয়েই তো সবাই দেখে। সে-ও পূরবীকে অমনি করেই দেখতে চেয়েছিল। পূরবীর আলাদা মনটার কথা ভাবেওনি কোনোদিন। তার দাম তাকে দিতে হয়েছে। আজ যদি প্রীতি ভুল করে—যদি দুঃখও পায়, তা হলেই বা সে বাধা দেবার কে? সে-ও তো রীতেনকে সত্যি করে দেখতে পাচ্ছে না—তার মন, তার চিন্তা দিয়েই বিচার করছে।

আর কে বলতে পারে, আমি আর একজনকে সম্পূর্ণ করে চিনতে পেরেছি? সংসারে যারা সব চাইতে নিকট, সেই স্বামী-স্ত্রীই কি দশ বছর ঘর করবার পরে এমন দাবী করতে পারে যে তাদের পরস্পরের পরিচয় একেবারে সম্পূর্ণ করে জানা হয়ে গেছে, সেখানে কোন আড়াল আর নেই, কোনো বিস্ময় আর লুকিয়ে নেই কোথাও?

দার্শনিক বলে, দর্শন হল এমন একখানা গ্রন্থ—যার প্রথম পাতা ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে —শেষ পাতা এখনো লেখাই হয়নি। মানুষও তো ঠিক তাই। ছেলেবেলায় কবে কোনখানে তার জীবনের পাণ্ডুলিপি লেখা শুরু হয়েছিল সে জানে না; তার চেতনার দিকটাতে পিঠ ফিরিয়ে বসে তারই আর এক সত্তা লিখে চলেছে এক গোপন উপন্যাস— মধ্যে মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় এক-আধটা পাতা উড়ে এলে সেইটুকুর মধ্যেই সে পায় তার নিভৃত আত্মকাহিনীর সংবাদ; আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—"The sealed envelope goes to the fireplace."

সেই নিভৃত নির্জন গ্রন্থটি পড়বার ক্ষীণ চেষ্টার নাম মনোবিজ্ঞান, একটা পেনসিল টর্চের আলো ধরে অন্ধকারে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার পাঠোদ্ধারের মতো। কেউ কাউকে জানে না। জানবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেই বা কী লাভ?

—কী করব ছোড়দা?

—যা ভালো বোঝ তাই করো।—সত্যজিৎ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল।

—কিন্তু বাবা?

সত্যজিৎ হাসল।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? বাবার অমন আদুরে মেয়ে হয়ে নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে বিয়ে করবি—আর ভেবেছিস বাবা দু হাত তুলে তোকে আশীর্বাদ করবেন? তার ওপর—সত্যজিৎ একটু হাসল: কিছু মনে করিসনি, বাবা নিশ্চয় দু-চারবার রীতেনকে দেখে থাকবেন। আর সে ক্ষেত্রেও—

বিমর্ষমুখে প্রীতি বললে, ও বলেছে দাড়িটা ও কামিয়েই ফেলবে।

এবার সশব্দে হেসে উঠল সত্যজিৎ। এক ঝলক বসন্তের হাওয়ায় যেন অনেকক্ষণের গুমোট কেটে গেল।

—এটা বুঝি তোর ফার্স্ট সাক্‌সেস্? তা আরম্ভ হিসেবে নেহাত মন্দ হয়নি। এরপর

যদি ওর গায়ের বিশ্রী শার্টটা আর ইয়াংকি ইংরেজি ছাড়াতে পারিস, তা হলে ভদ্র সমাজে একেবারে অচল হবে না।

প্রীতির পীড়িত মুখেও একটুকরো হাসি দেখা দিল।

—বলেছে, একটা মোটরকার কোম্পানিতে চাকরী পাওয়ার কথাও হচ্ছে।

—গুড্—ভেরি গুড্।—সত্যজিৎ সশব্দে প্রীতির পিঠ চাপড়ে দিলে: তুই তো দেখছি এর মধ্যে রাঁতেনকে একেবারে মানুষ করে ফেলেছিস। নাঃ—এরপর বিয়েটা তোদের আর ঠেকানো গেল না।

—কিন্তু—

চুরুটটা নিবে গিয়েছিল। আর একবার সেটায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, ও 'কিন্তু'র উত্তর দিতে পারব না। বিয়েটা এ বাড়িতে হওয়ার আশা ছেড়ে দাও—ওটা সেরে এসো রেজিস্ট্রি অফিসে। এবং আর যাই করো, বিয়ের পরে জোড় বেঁধে বাবার কাছে অন্তত আশীর্বাদ চাইতে যেয়ো না। তার ফল কী হবে তুমি জানো।

প্রীতি হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

—বাবা আমার গান শুনতে বড় ভালবাসেন ছোড়দা।

—সেই গান শোনাবার জন্যে নিজেকে তুমি বলি দিতে পারো না।

প্রীতি কেঁদে চলল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না সত্যজিৎ। এর কোনো সান্ত্বনা তার জানা নেই।

—বাবা কি কিছুতেই একে মেনে নিতে পারেন না ছোড়দা?

—না। শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অন্তত সে ভুল করবার কারণ নেই।

—কিন্তু বাবা খুব কষ্ট পাবেন ছোড়দা। হয়তো—

হয়তো? তার অর্থ সত্যজিৎও ভালোই বোঝে। বীথি হলে শিবশঙ্কর বলতেন—'বেরিয়ে যাক বাড়ি থেকে, ও আমার কেউ নয়। আমি ওর আর মুখদর্শনও করব না কোনোদিন। কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধে ও-কথা বলতে পারবেন তিনি? হুইস্কির গ্লাস যখন বিস্বাদ হয়ে যাবে, নিজের শূন্য রিক্ত অবসাদের ভেতর ভেনাস আর মার্সের কুৎসিত ছবিটা নিজের কাছেই যখন আরো কুৎসিত হয়ে উঠবে, তখন প্রীতির কীর্তন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত চেতনার একটুখানি ছায়াছত্র। সে আশ্রয় সরে গেলে কোথায় দাঁড়াবেন তিনি—কী নিয়ে বেঁচে থাকবেন?

—কেঁদে লাভ নেই প্রীতি। যা ঘটবে তাকে ঘটতে দেওয়াই ভালো। তুই তৈরি হয়ে নে। যদি দরকার পড়ে আমাকে জানাস—আমি সাধ্যমতো সাহায্য করব।

প্রীতি উঠে দাঁড়ালো। কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মুখার্জি ভিলায় এই-ই শেষ কান্না—সত্যজিৎ ভাবল। এই-ই মমতার শেষ উচ্ছ্বাস—

হৃদয়ের শেষ ব্যাকুলতা। এ-সব দুর্বলতার সীমা পার হয়ে গেছে বীথি—নতুন দিনের আলো পড়েছে তার চোখে। ইন্দ্রজিৎ প্রতি মুহূর্তে এখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে অভিশাপ—কোনোদিন নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে কিংবা যাকে হোক খুন করে সে সব কিছুর ওপর যবনিকা টেনে দেবে। শিবশঙ্কর তাঁর ফাইন্যাল স্ট্রোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর ত্রিশঙ্কু সত্যজিতের পক্ষে ঘরে বাইরে সবই সমান। কেবল এ-বাড়ির অন্তিম লগ্নে তিনটি জিনিসের পরিণামই সত্যজিৎ ভাবতে পারে না—এক রঘু, দুই আস্তাবলের বুড়ো ওয়েলার ঘোড়া আর তিন নম্বর কালপুরুষের মতো ওই মার্কারি ক্লকটা।...

...স্কুল থেকে প্রায় ছটার সময় ফিরল বনশ্রী। চারটে পর্যন্ত স্কুলের খাটুনি—তারপর এক ঘণ্টা কাটল সেক্রেটারির সঙ্গে বকবক করে। এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে বোঝাতে হল আর একজন টীচার ছাড়া স্কুল কিছুতেই চালানো যাচ্ছে না। তিন মাসের জন্যে একটা টেম্পোরারি একজন লোকও দরকার, মিনতি তার মেটার্নিটি লিভ এক্সটেণ্ড করতে চেয়েছে।

মিনতি সম্বন্ধে একটা কী মন্তব্য করতে গিয়েও সেক্রেটারি সামলে নিলেন। চকিতের জন্যে রাঙা হয়ে উঠেছিল বনশ্রীর মুখ। মিনতি অসহায় নিরুপায় জেনেও তার মনের ভিতরটা জ্বালা করছিল। এত দারিদ্র্য, এই স্বাস্থ্য! আর বছর বছর মা হওয়ার ব্যাপারে তার বিরাম নেই। কী খাওয়াবে তার ছেলেমেয়েদের—কেমন করে মানুষ করবে?

ক্রিমিন্যালিটি! পিওর ক্রিমিন্যালিটি!

বিতৃষ্ণ, বিরক্ত মন নিয়ে ক্লান্ত বনশ্রী এসে নিজের ঘরের ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন যথানিয়মে। রাতেন এখনো বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না—ঘরে বসে রেডিয়ো খুলে বিলিতী গান শুনছে। রক্-এন্-রোলের জাতীয় খানিক দুঃশ্রাব্য গান ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়িতে। বনশ্রী ভ্রূকুটি করল।

পাশের ছোট টেবিলের উপর চোখ পড়ল। একখানা চিঠি রয়েছে তার নামে। অচেনা হাতের লেখা এন্‌ভেলপ।

চিঠিটা ছিঁড়ে কয়েক লাইন পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনশ্রী সোজা হয়ে উঠে বসল। একখানা পাথর দিয়ে কে যেন একটা ঘা বসিয়ে দিল তার হৃৎপিণ্ডের ওপর।

মিনতি মারা গেছে। একটি মৃত সন্তানকে জন্ম দিয়ে পরশু হাসপাতালে তার জীবনের দায় মিটিয়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে স্কুলের কোনো অসুবিধেই আর রইল না।

অসাড় হয়ে রইল বনশ্রী—ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। মনে পড়ল সেদিনের কথা—যেদিন লজ্জা আর অপরাধের ভারে ম্লান হয়ে তার কাছে ছুটি চাইতে এসেছিল মিনতি। শীর্ণ রক্তহীন শরীর—বকের মতো শুকনো পা, অন্ধকার দুটো চোখের

কোণে তার জল ছলছল করছিল। আর বনশ্রী রুক্ষ গলায় বলেছিল—

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরল বনশ্রী। সেদিনের সেই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তার বুকটাকে পিষে দিতে লাগল। সে মা হয়নি—মার দুঃখ, মার বেদনা বোঝাবার শক্তিও তার নেই। তবু আরো একটু সহানুভূতি নিয়ে মিনতিকে বোঝবার চেষ্টা করতে পারত—অত অফিসিয়্যাল, অতখানি কর্কশ না হলেও তার কোনো ক্ষতি ছিল না।

আর ছুটি চাইতে আসবে না মিনতি। তার মেটার্নিটি লিভ্ নিয়ে আর কোনো সমস্যা দেখা দেবে না স্কুলে।

চিঠি লিখে জানিয়েছে মিনতির স্বামী। বলতে গেলে স্ত্রীকে হত্যাই করেছে লোকটা। কিন্তু আইন তাকে ছুঁতে পারবে না—কোনো বিচারও হবে না তার। বনশ্রী জানে, সাতদিন পরেই মিনতির যৎসামান্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার তাগিদ দিয়ে এই লোকটাই আবার অফিসিয়্যাল চিঠি লিখবে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবার বিয়ে করবে স্বচ্ছন্দে, নির্বিকার চিত্তে। কলকাতায় হোটেলে কোনোদিন হয়তো ফাউল কারীর মুর্গীতে টান পড়তে পারে—কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর অভাব বাংলা দেশে অন্তত কখনো ঘটবে না।

বনশ্রী নিথর হয়ে বসে রইল। গলে পড়তে লাগল চোখের জল।

কতক্ষণ সে জানে না। টেবিলের ওপর চা আর খাবার যে কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তাও তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ গলার আওয়াজে সে জেগে উঠল।

হীরু বললে, দিদিমণি, সত্যজিৎবাবু দেখা করতে এসেছেন।

ছাব্বিশ

বনশ্রী যখন নিচে নেমে এল, সত্যজিৎ তখন দেওয়ালের হরিণের শিংটার দিকে তাকিয়ে ছিল অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। কোথায় একটা মিল আছে নিজের বাড়ির সঙ্গে। একটা জীর্ণতা আছে যাকে ঠিক চোখে দেখা যায় না, একটা মৃত্যুর গন্ধ আছে যাকে ঘ্রাণের মধ্যে পাওয়া যায় না—স্নায়ুর ভিতর অনুভব করা যায়; কেবল কিছুক্ষণ চুপচাপ এই ঘরটার মধ্যে বসে থাকলে রাশি রাশি অবসাদ এসে শরীরকে অবশ করে—চতুর বিষাক্ত নেশার মতো সমস্ত চেতনা নিষ্ক্রিয়তার গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যেতে চায়।

এই ঘরে এসে এমনি ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থাকেন জি-কে রায়—সত্যজিৎ ভাবছিল। শিবশঙ্করের আর এক দিক। ছিতেন দেশে আর ফিরলই না। রীতেন দি গ্রেটার—

এমন সময় বনশ্রী এল।

—পথ ভুলে নাকি?—বনশ্রীর জিজ্ঞাসা।

সত্যজিৎ হাসল : তোমাদের এখানে আসব বলেই বেরিয়েছি এ-কথাটা বলতে পারলে তুমি খুশি হতে। কিন্তু মিথ্যে বলব না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। তোমার যদি হাতে কাজ থাকে বিরক্ত করব না।

উলটো দিকের সোফাটায় বসল বনশ্রী। হাসল একটুখানি।

—হাসলে যে ?

—আগেকার দিনগুলো মনে পড়ছিল। য়ুনিভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে দরকারী বই নিয়ে বসেছি নোট করতে, তুমি এসে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেছ সিনেমায়। লেডী ল্যামারের ছবি দেখতে তুমি ভালোবাসতে, আর ওই রাঙা মাকাল মেয়েটাকে দেখলে আমার গা জ্বালা করত। সেদিন আমার কাজে কি ক্ষতি হবে না হবে তা তুমি ভাবোনি। —একবার থামল বনশ্রী : কিন্তু তোমাকেই শুধু দোষ দিই কেন ? হয়তো তোমার বাড়িতে গিয়ে আমিও এই কথাই বলতাম।—সামনের গেটে অযত্নে জংলা হয়ে ওঠা হেনার ঝাড়টার দিকে চোখ মেলে বনশ্রী শেষ করল : আমরা বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

—শরীরের দিক থেকে বুড়ো হতে হয়তো কিছু দেরি আছে বনি।—আবার সেই ভাকটা মুখে ভেসে এল সত্যজিতের : আসলে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাই কারো ওপরে আর জোর খাটাতে চাই না, কেউ খাটালেও ভালো লাগে না !

—ক্লান্ত ?

—হাঁ, ক্লান্ত। আমরা—আমাদের দলের এই মানুষেরা—সবাই ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আমার কি মনে হয়, জানো ? জীবনে কোথাও একটা অন্ধ আবেগ আমাদের চাই—একটা বিশ্বাস চাই। সেই বিশ্বাস যদি অনেকটাই প্রিমিটিভ হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যা হোক তোমাকে আঁকড়ে ধরতেই হবে। হয় অ্যানার্কিস্টের মতো সব কিছু ভাঙবার আনন্দে মেতে ওঠো, নইলে যে কোনো একটা প্রত্যয়কে চেপে ধরো বজ্রমুঠিতে। আমাদের মতো যাদের বিশ্বাস করবার শক্তি গেছে হারিয়ে—অথচ অবিশ্বাস করবার মতো জোরটাও কোথাও নেই—আমরাই কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছি না ! তাই এ-যুগে ট্র্যাজেডীর ভূমিকায় আমাদেরই নেমে পড়তে হয়েছে।

বনশ্রী কথা বলল না। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল কেবল।

—ভাখো, রোমান্টিক হতে গেলে আমাদের হাসি পায়—অথচ রিয়্যালিটিকেই কি মানতে পারি সবটা ? মার্কস্‌বাদকে অনেকেই মানি—অথচ নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে কি যাচাই করে নিতে পারি ? বিশুদ্ধ বুদ্ধির দোহাই দিই—কিন্তু একটা আঘাত, একটা দুঃখকেই কি সেই বুদ্ধির তরীতে চেপে পার হয়ে যেতে পারি ? মনের জটিলতায় জটিল কবিতা লিখি—ভাঙাচুরো ইম্প্রেশনগুলো ফর্মের অরণ্যে হারিয়ে যায়, আমাদের

উপন্যাসের শেষ কথা এসে মুখ থুবড়ে পড়ে নৈরাজ্যের ধূসরতায়। জানো বনি! মনের ভেতর নিঃশব্দে বহুকাল ধরে একটা দাহন-ক্রিয়া চলছে আমাদের। পুড়ে আমরা খাক হয়ে গেছি। এলিয়টের মতো আমি বলব না—shape without form, আমাদের আকার-প্রকার সবই আছে—কিন্তু তা যেন ইলেকট্রিকের আগুনে নিঃশেষে জ্বলে যাওয়া, এখন কেবল কালের একটা ঝোড়ো নিঃশ্বাস লাগলেই আমরা দিকে দিকে উড়ে যাব।

অদৃশ্য জীর্ণতা, অলক্ষ্য মৃত্যুর-ছোঁয়া-লাগা এই ঘরটায়, ধুলো-জমা হরিণের শিঙে আর ছবির কাচে, স্প্রীং নষ্ট-হয়ে-যাওয়া পুরনো সোফায় আর বনশ্রীর বিহ্বল চোখের তারায় যেন সত্যজিতের কথাগুলো কাঁপতে লাগল ; যেন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সে একটা তরল অভ্রের পর্দা বানিয়ে দিয়েছে—চারদিকে দুলে দুলে উঠছে তার ছায়া।

নিজের কথার ঝোঁক থেমে গেলে সত্যজিৎ অপ্রতিভ হয়ে রুমাল বের করল পকেট থেকে, মুছে ফেলল কপালটা। বনশ্রী নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

—তুমি পেসিমিস্ট্ হয়ে যাচ্ছ ?

—একে কি পেসিমিজ্‌ম্ বলে ? আমি ইতিহাসের সত্যটাই বলছি শুধু।

—তার মানে, আমাদের আর কিছু ভবিষ্যৎ নেই ?

—আছে, যদি কোনো একটা সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারি। একেবারে প্রিমিটিভ মন নিয়ে।

—বুদ্ধির দরজা বন্ধ করে দিতে হবে ?

—কিছুদিন রাখলে ভালোই হয়।

বনশ্রী হাসল : তুমি সভ্যতার কাঁটাটাকে কোন্ দিকে ঘোরাতে চাইছ সত্যজিৎ ? সামনে না পেছনের দিকে ?

সত্যজিৎ জিভের ডগা শুকনো ঠোঁটে বুলিয়ে নিলে। চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বের করে আনল সিগারের কেসটা। একটা সিগার বের করতে করতে বললে, সে অর্থে বলছি না। ইতিহাসের যে-নিয়মে আমরা এই বুদ্ধির নৈরাজ্যে এসে পৌঁছেছি, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার কথাটাই ভাবছিলাম। সে মুক্তির পথও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এমন সংশয় আর এমন শ্রান্তির মধ্যে এসে আমরা পৌঁছে গেছি, যে কোনো জিনিসকেই ধরে রাখবার মতো জোর খুঁজে পাই না। কেবল একটু একটু করে জ্বলে যাচ্ছি নিজেদের ভেতর।

—তুমি তো চিরদিন নতুন আলো আর নতুন পৃথিবীর কথা বলেছ সত্যজিৎ! আজ এমন করে হাল ছেড়ে দিয়েছ কেন ?

—নতুন মানুষ আসছে শ্রী, নতুন ইতিহাসও আসবে। তারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না—যারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছি—অথচ এগোতেও পারছি না—আমাদের ঠেলে

সরিয়ে তারা এগিয়ে যাবে।

বনশ্রী আবার মৃদু রেখায় হাসল।

—তা হলে তোমার আর দুঃখ কিসের? ইতিহাসের চাকা তো থামবে না।

—না, থামবে না। শুধু নিজেদের নিরুপায় যন্ত্রণার কথাই ভাবছি। ভাবছি, এই বুদ্ধির চোরাগলি আর ক্লান্তির হাত থেকে নিজেদের যদি কিছুক্ষণের জন্যেও মুক্ত করে আনতে পারতাম—যদি একটা প্রিমিটিভ বিশ্বাসের জোর নিয়ে বলতে পারতাম: আমরাও নতুন আলোর দিকে চলেছি, আমরাও আর থামব না!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। যেন মনের ভেতর জমাট হয়ে থাকা অনেকখানি ভার এক সঙ্গে নামিয়ে দিয়ে শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সত্যজিৎ—আলোচনার জের টানতে বনশ্রীও আর উৎসাহ পেলো না। সত্যজিৎ থিয়োরী নিয়ে যা খুশি আলোচনা করুক, কিন্তু বনশ্রীও জানে—সে ক্লান্ত। এমন কি, মিনতির খবরটা একটু আগে তাকে যতখানি পীড়ন করেছিল, এখন আর তা ততখানি আঘাত করছে না। এই হয়—এমনিই চলে আসছে। স্নায়ুগুলো এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেখানে কোনো তীব্র স্পন্দন আর জেগে ওঠে না—না দুঃখের, না আনন্দের, না বাসনার।

: আমরা ছাইয়ের পুতুল, কেবল কালের নিঃশ্বাসে উড়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

সত্যজিৎ চুরুটটা ধরিয়ে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়া ছড়িয়ে বললে, জানো, রীতেন আর প্রীতি বিয়ে করতে যাচ্ছে।

বনশ্রী চমকে উঠল।

—সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

—হাঁ, ওরা আর দেরি করতে চায় না।

—কিন্তু প্রীতি শেষ পর্যন্ত রীতেনকে—আশ্চর্য!

সত্যজিৎ হাসল: শেক্‌সপীয়ার মনে আছে আশা করি। "I would my father look'd but with my eyes"—

—ঠাট্টা নয়। রীতেন তো এই। ওরা দাঁড়াবে কোথায়?

—রীতেন প্রতিজ্ঞা করেছে ভালো ছেলে হবে। খুব সিরিয়াস্‌লি চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেবে এবং সেই প্রতিজ্ঞার প্রথম শর্ত হিসেবে হি ইজ গোয়িং টু স্যাক্রিফাইস্‌ হিজ জুয়েল্‌ অফ বিয়ার্ডস্‌।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না বনশ্রী। বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখ।

—প্রীতি ভুল করছে, ভয়ানক ভুল করছে।

—ওটা অভিভাবকের চোখ দিয়ে দেখা বনি। ওদের মনটাকে ওতে চেনা যাবে

না। তা ছাড়া প্রেম মানুষকে নবজন্ম দেয়, হয়তো রীতেনও নতুন হয়ে উঠবে।

—তোমার বাবা?

—ছাট্‌স্‌ এ লিট্‌ল প্রব্লেম। হয়তো শক্‌টা ফেটাল হয়ে দেখা দিতে পারে।

বনশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেল।

—তোমার বাধা দেওয়া উচিত।

সত্যজিৎ স্নিগ্ধভাবে হাসল; এও নিয়মেরই স্রোত বনশ্রী—একে ঠেকানো যায় না!—চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে বললে, তুমিও আর দেরী করছ কেন? গেট্‌ সেট্‌ল্‌ড।

বনশ্রী উঠে দাঁড়ালো: তোমার জন্যে চা আনাই।

—চা একটু পরে হলেও চলবে। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যেয়ো না। বিয়ে করো এবার।

—পাত্র?

—হুকুম করো। হাজির আছি।

বনশ্রী আবার বসে পড়ল উচ্চকিত বিস্ময়ে।

—সে কি! পূরবী কোথায় গেল?

—আমাকে সইতে পারল না। চাকরি নিয়ে চলে গেছে কলকাতার বাইরে।

—আই অ্যাম্‌ সরি—রিয়্যালি সরি।

মনের কাঁটাটাকে ভোলবার চেষ্টায় সত্যজিৎ আরো সহজভাবে হাসতে চাইল। বললে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, তুমিও এসো, তুমিও এসো, তুমিও এসো—এবং তুমি। তাই তোমার কাছে আমার দাবি নিয়ে এলাম।

বনশ্রীর চোখের পাতা ভারি হয়ে এল, কাঁপতে লাগল ঠোঁটের কোণা।

—কিন্তু আমাকে নিয়ে কী করবে তুমি? তুমি ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। দু'জনের ক্লান্তির ভারে দু'দিন পরেই আমরা এ ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠব। তাছাড়া আমার একজন নীরব প্রার্থী আছে। মনের ভার তাকে তুলে দিলেও সে হাসি মুখে তা বইতে পারবে। তার দাবিটাও—

বনশ্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল। আশ্চর্য, এখনো এত সেন্টিমেণ্টাল। জীবনে এত পোড় খেয়েও আজও সে শক্ত হতে পারল না!

কিন্তু সত্যজিতের দৃষ্টি জ্বলে উঠল এবার। মনের কাঁটায় ফুটে উঠল রক্ত।

—কে সে? আমি কি তাকে চিনি?

জলভরা চোখ নিয়ে বনশ্রী তাকালো। তার সমস্ত চেহারাই কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে।

—চেনো তুমি। হীরেন।

—হীরেন !—একবার প্রতিধ্বনি করল সত্যজিৎ—কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে রইল চেয়ারের সঙ্গে। তারপর সশব্দ উজ্জ্বল হাসিতে ঘরটাকে ভরিয়ে তুলে বললে, অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাতাশ

দাড়িটা কামিয়ে ফেলে, একটা ভদ্রলোকের মতো ধুতি চাদর পরলে রীতেনকে যে বেশ ভালো দেখায়—এই সত্যটা আবিষ্কার করে খুশি হল সত্যজিৎ। আরো অদ্ভুত লাগল, গ্লোব-ট্রটার রীতেন যখন নিচু হয়ে তার পায়ে প্রণাম করলে। একটা কিছু আশীর্বাদ করা উচিত—সত্যজিৎ ভাবল। কিন্তু কী বলা যায় কিছুতেই মনে পড়ল না।

প্রীতির কপালে সিঁদুরের ফোঁটা জ্বল জ্বল করছে। সিঁথিতে রক্তচিহ্নের মতো সিঁদুরের রেখা। সত্যজিতের মনে হল, এ ছাড়া প্রীতিকে মানায় না। এতদিন ধরে ওর কুমারী ললাটে যেন ওকে জীবনের সহজ স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। যে মেয়েরা শান্ত স্নিগ্ধ গৃহবধূ হওয়ার জন্যেই জন্ম নেয়, প্রীতি তাদেরই দলের।

রীতেন আস্তে আস্তে মাথা তুলল। ডাকল, দাদা!

—বলো।

—আমি সেই মোটর কোম্পানির চাকরিটা পেয়েছি। আজকে আটাশে, আমাকে পয়লা থেকে জয়েন করতে হবে কানপুরে।

—সত্যি নাকি ?—পুলকিত বিস্ময়ে সত্যজিৎ বললে, ইট্‌স এ নিউজ।

—তাই প্রীতিকে নিয়ে কালই আমি কানপুরে চলে যেতে চাই।

যে আশীর্বাদটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না, এতক্ষণে সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গলায়।

—সুখী হও—সুখী হও।

—কিন্তু মাইনে মাত্র তিনশো টাকা—হয়তো প্রীতির কষ্ট হবে—

—কিছু না, কিছু না।—সত্যজিৎ এবার রীতেনের কাঁধে হাত রাখল : তুমি যদি প্রীতিকে ঠিক চিনতে পেরে থাকো, তা হলে ওর কোনো কষ্টই হবে না।

চায়ের টেবিলটায় মুখ গুঁজে প্রীতি সমানে কাঁদছিল। মুখার্জি ভিলায় সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। এখানকার বাঁধন চিরদিনের মতো ছিঁড়ে গেল তার। ভালোই হল—ওই বাড়ির ইতিহাসের, শিবশঙ্করের, ইন্দ্রজিতের আর অভ্যাসের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলো প্রীতি। এইবার বুঝতে পারবে, বাঁচবার একটা অর্থ আছে—মাথার ওপরে আকাশ আছে—পৃথিবীতে রক্তমাংসের মানুষ আছে। তবুও প্রীতি কাঁদছে।

একটা বিষাক্ত নেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে নেশাখোরও ছটফট করে, কাঁদে। কিন্তু এ কিছুই না। দুদিন পরেই সব সহজ হয়ে যাবে। প্রীতি বাঁচল।

হোটেলের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ। মেঘে মেঘে কালো হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে।

—উইশ ইউ বেস্ট্ অফ্ লাক। কানপুরে পৌঁছে একটা চিঠি দিয়ো।

প্রীতির দিকে আর একবারও না তাকিয়ে সত্যজিৎ পথে নামল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল মুখের ওপর।

প্রীতি সুখী হবে। হয়তো বনশ্রীও। অবশ্য কোনোদিন যদি বনশ্রীর মনে হয় এইবার তার বিয়ে করবার সময় হয়েছে। নীরব ভক্ত হীরেন প্রতীক্ষা করে আছে—হয়তো জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে। অত ধৈর্য সত্যজিতের নেই।

কিন্তু: একটা স্নিগ্ধ কৌতুকে মনটা ভরে উঠল। বনশ্রী হীরেনের ছেঁড়া গেঞ্জি পরবার অভ্যাসটা ছাড়াতে পারবে তো? আর চায়ের কাপ নিয়ে দাড়ি কামানো? দেওয়ালে ছারপোকার দাগ লাগা ওই ঘরে সংসার গুছিয়ে বসতে পারবে বনশ্রী? না—বিয়ের পরে নিশ্চয় কোথাও এক ছোটখাটো ভদ্র রকমের বাসা যোগাড় করে নেবে সে।

তারপর? বনশ্রী আরো বেশি করে নোট লিখবে, আরো মোটা করে বই বের করবে হীরেন: 'বাই এ গোল্ড্ মেডালিস্ট্'। ক্লান্ত বনশ্রী নিজের মনে সব ভার হীরেনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। 'শেষের কবিতা' মনে পড়ল সত্যজিতের—'যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়, ভালো মন্দ সুখ দুঃখ মিলায়ে সকলি।' সত্যজিৎ পারে না, নিঃশব্দে সব দেবার মত মন তার নয়—তার নিজেরও দাবি আছে। বনশ্রীই ঠিক বুঝেছে। এই ভালো হল।

আবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে। 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে, বৃষ্টি আসে রুদ্র বেশে'—প্রীতি গেয়েছে কতদিন। গেয়েছে মুখার্জি ভিলায় নিজের কারাগারের মতো ঘরের জানলায় বসে—যেখান থেকে আকাশের একটা ফালি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ওই বাড়িতে আর কেউ গান গাইবে না এর পর থেকে। কেবল অদ্ভুত বিকৃত কণ্ঠে বোদ্‌লেইয়রের কোনো বীভৎস কবিতা আবৃত্তি করবে ইন্দ্রজিৎ—মুখার্জি ভিলার যত গ্লানি, যত যন্ত্রণা, যত বিকার তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাবে।

টপ টপ করে কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা পড়ল। বৃষ্টি নামছে। সেদিনকার মতোই ধর্মতলা স্ট্রীটের আড্ডাটার দিকে দ্রুত পা চালালো আজও। সামনের তেতলা বাড়িটার মাথার ওপর মস্ত একটা ব্যানার—কেশ তেলের বিজ্ঞাপন। নিবিড় কালো চুল এলো করে দিয়েছে একটি মেয়ে—বনশ্রীর মুখের সঙ্গে তার আদল আসে।

আবার বনশ্রী। বুকের ভেতরে কোথায় ছোট একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে উঠল।

এতদিন বনশ্রী যখন ছিল না, তখন কোথাও ছিল না। বনশ্রী স্মৃতি হয়ে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল বার্ণসের কবিতাকে আরও একটু ভালো লাগার ভেতরে, মিশে গিয়েছিল প্রীতির গানে : 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো।' তারপর কবিতার লাইন থেকে, গানের সুরের ভেতর থেকে আবার বাস্তব হয়ে দেখা দিল বনশ্রী। আবার মনে হল—

নিজেকে বড় বেশি শ্রদ্ধা করেছিল সত্যজিৎ। অর্থহীন অহমিকায় ভেবেছিল, সবাই তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তার জন্যে ডালি সাজিয়ে প্রত্যেকে পথের ধারে বসে আছে—সে যখন খুশি, যাকে খুশি ধন্য করতে পারে। সে ভুল তার চুরমার হয়ে গেছে। সাধারণ, অতি সাধারণ হীরেন, যে ইংরেজিতে কিছুতেই এম. এ.টা পাস করতে পারল না, 'বাই এ গোল্ড্ মেডালিস্ট্' লেখা নোট বই ছাপিয়ে আর প্রুফ্ দেখে যার দিনযাত্রা, ছেঁড়া গেঞ্জী পরে, চায়ের কাপে দাড়ি কামায়, গরম জিলিপি আর ঠাণ্ডা চা দিয়ে যে বনশ্রীকে অভ্যর্থনা করে—উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত সত্যজিৎকে কখন সে হারিয়ে এগিয়ে চলে গেল। 'যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়—'

না—না। অত ছোট করে কেন সে দেখছে হীরেনকে? হীরেন জীবনকে অন্তত একটা সহজ সত্য দিয়ে বুঝে নিয়েছে—মনের মধ্যে কোথাও শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা আছে তার। আর সত্যজিৎ? নীহারিকার রজ্জুতে ঝুলে আছে অনিশ্চিতের মহাশূন্যে—নিজের বুদ্ধির জটিলতায় ঘুরে মরছে চোখ-বাঁধা কানামাছির খেলাতে। হীরেনের গণ্ডিটা যত ছোটই হোক—তার মধ্যেই তার আশ্রয় আছে একটা। আর সে? সে নিজে?

তাই কি পূরবীও তাকে সইতে পারল না? ছুটে পালালো তার কাছ থেকে?

সত্যজিৎ ডান হাতটা মুঠো করল একবার। মুখার্জি ভিলা। তার ঘর। তার নাগপাশ। তার জন্মগ্রহ।

জোরালো বৃষ্টি নেমেছে এতক্ষণে। সত্যজিৎ ছুটল। সামনেই সেই পুরনো আড্ডা।

ভেতরে পা দিয়ে দেখল, লম্বা হল ঘরটার একপাশে ফরাসের ওপর বসে তিন-চারটি ছেলে একমনে পোস্টার লিখছে। আর এদিকে লেনিনের বড় ছবিটার নীচে টেবিলের ওপর ঝুঁকে একমনে কী পড়ে চলেছে সুমিত্র।

—সুমিত্র!

—হ্যালো অধ্যাপক—কী মনে করে?

—কী আর মনে করব?—এই ঘরে পা দিয়ে, সেই পুরনো অভ্যাসেই যেন খানিকটা সহজ হল সত্যজিৎ। সুমিত্রের সামনে চেয়ারটা টেনে বললে, আবার সেই

—হুঁ, সিম্বলিক।—সুমিত্র গম্ভীর ভাবে একটা বিড়ি ধরালো: বৃষ্টি নামলেই তখন মাথা বাঁচাতে আমাদের এখানে আসতে হয়—নইলে মনেও পড়ে না। এর মধ্যে ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য বুঝতে পারছ অধ্যাপক?

—পারছি।

—কিন্তু যারা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, দুঃসময়ে তাদের আমরা আশ্রয় দেব এমন আশা রাখো নাকি?

—রাখি না। তাই ভুল শোধরাতে চাই।—সত্যজিৎ একটুখানি ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে: কাজ দাও আমাকে।

—রিয়্যালি?—সুমিত্রের চোখ হঠাৎ দপ দপ করে উঠল: সত্যি বলছিস?

—সত্যি বলছি।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সুমিত্র। এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরল সত্যজিৎকে। যে চারজন পোস্টার লিখছিল, তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একবার। এতক্ষণে সত্যজিৎ লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে একটি মেয়েও আছে এবং মেয়েটিকে সে তাদের বাড়িতেই বীথির কাছে আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।

—ওয়েলকাম অধ্যাপক, ওয়েলকাম—সুমিত্র ফেটে পড়ল উল্লাসে: কী যে খুশি হয়েছি। বলো—কী কাজ চাও।

—যা দেবে।

—ভেরি গুড্। আধুনিক ইকনমিক্‌সের খোঁজ-খবর রাখো কিছু?

সত্যজিৎ হাসল: সামান্য।

—ভেরি ওয়েল।—সশব্দে একটা ড্রয়ার টানল সুমিত্র, বার করলে কয়েকটা কাগজ-পত্র। বললে, এই ডেটাগুলো তোমায় দিচ্ছি। একটা জোরালো ইংরেজি প্রবন্ধ চাই আমাদের তিনদিনের মধ্যে।—তারপর ডাকল: অশোক?

একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো।

—চট করে নিচের চায়ের দোকানে পাঁচটা চা আর টোস্ট্ বলে এসো তো ভাই। ইটস্ এ গ্রেট ডে। ভালো করে সেলিব্রেট করতে হবে আমাদের।

পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বের করতে যাচ্ছিল সত্যজিৎ—সুমিত্র বাধা দিলে।

—নো-নো। আজ আমাদের খরচ! তোমাকে আমরা আজ অভ্যর্থনা করব।

মুখার্জি ভিলার গেট পার হয়ে সিঁড়ির দিকে উঠতে উঠতে সত্যজিৎ ভাবছিল, এবার সেও বাঁচল! বুদ্ধির এই মহাতামস থেকে বেরিয়ে এসে আবার শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল

বিশ্বাসের হাল। এই আট বছর ধরে যত নিজেকে নিয়ে ভেবেছে, ততই জটিলতার জাল জড়িয়েছে তাকে! আবার পুরনো জীবনের মধ্যেই সে ফিরে যাবে—আবার অনেকের সঙ্গে পা ফেলতে চেষ্টা করবে—আবার আশা করতে থাকবে: মানুষ বড় হবে—মানুষ মহৎ হবে—দুনিয়া বদলাবে! ইতিহাসের হাল আমাদের হাতে—আমরাই তাকে ভিড়িয়ে দিতে পারব নতুন কালের, নতুন দিগন্তের বন্দরে!

বীথি খুশি হবে। সব চাইতে বেশি খুশি হবে।

পায়ের ভারটা লঘু হয়ে গেছে—মন যেন এতদিন পরে রোগশয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। হালকা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল সত্যজিৎ, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল রঘুকে। তারপরই—সোজা ছুটে এল রঘু—আর্ত কান্নায় আছড়ে পড়ল সত্যজিতের পায়ের কাছে।

—কী হল—কী হল রঘু? বাবা কি—

না, শিবশঙ্কর নয়। মুখার্জি ভিলার মমির অত সহজেই বিলুপ্তি ঘটবে না। সাউথ্ ইণ্ডিয়ার কন্‌ফারেন্সে গিয়ে দু দিনের জ্বরে হার্টফেল করে মারা গেছে বীথি।

মুখার্জি ভিলা একটা বুরুজ হয়ে ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। রাশি রাশি বিদ্যুতে থান থান হওয়া মেঘের অন্ধকার নেমে আসছে চারদিক থেকে। চোখ বুজে অন্ধের মতো সিঁড়ির ওপর বসে পড়তে পড়তে সত্যজিতের মনে পড়ল: এই আশ্চর্য পৃথিবীতে—এই অপরূপ উজ্জ্বল জীবনের মধ্যে বীথি অনেক দিন—অনেক দিন বাঁচতে চেয়েছিল।

কিন্তু এ বাড়ি কাউকে বাঁচতে দেবে না।

আটাশ

সব জানলেন শিবশঙ্কর। সমস্ত। একটা কথাও গোপন রইল না।

বীথি নেই—প্রীতি আর কখনো ফিরবে না। যে সাম্রাজ্যে একদিন একেশ্বর হয়ে বসে ছিলেন, আজ তা টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাতের বাইরে। সিংহাসনটা আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে মাটির তলায়। এরপর—

সত্যজিৎ ভেবেছিল এইবার আর সইতে পারবেন না শিবশঙ্কর। পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা ফুটো জাহাজ এক দমকায় তলিয়ে যাবে সমুদ্রের তলায়।

কিন্তু আশ্চর্য!

দিন কয়েক আবার পাগলের মতো মদ খেলেন—ভোঁতা পিন দিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া রেকর্ডগুলো থেকে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন বীভৎস সুরের তরঙ্গ। প্রীতি-বীথির অন্ধকার ঘরের খোলা দরজা রাত্রির হাওয়ায় আছড়ে পড়তে লাগল—এক ঝলক স্বর্ণস্নাত হাসি, এক কলি অপরূপ গানের ঝঙ্কার সেই বীভৎসতাকে আর আড়াল করতে পারল না।

ইন্দ্রজিৎ চুপ। একটা কবরের মধ্যে শুয়ে আছে যেন। সে-ও সবই জানে, কিন্তু কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো বিকার নেই তার। সে-ও তো এই-ই চেয়েছিল। চেয়েছিল প্রীতি আত্মহত্যা করুক—বীথি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। ইন্দ্রজিতের মনোবাসনা সফল হয়েছে। এখন সে শান্ত—কবরের শান্তিতে জীবিত শবের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

শুধু রঘু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আরো বুড়ো হয়ে গেছে, আরো কুঁজো, গালের চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে আরো খানিকটা। তবু রুটিন-বাঁধা কাজে এতটুকুও ত্রুটি নেই তার। সেই ছায়ামূর্তির মতো শব্দহীন পায়ে চলাফেরা করে, ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে, চা আনে, খাবার আনে। ওই মার্কারি ক্লক—আর এই রঘু। এই বাড়ির শেষ অধ্যায় পর্যন্ত দেখে যাবে, তার আগে আর মুক্তি নেই ওদের।

প্রীতির গোটা দুই চিঠি এসেছে কানপুর থেকে। ভালো আছে—সুখে আছে সে। সেই সুখের কথা উছলে পড়ে প্রত্যেক লাইনে। প্রেম মানুষকে নতুন জীবন দেয়—রীতেনও হয়তো নতুন করে জেগে উঠেছে। শুধু বাবার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে চিঠির পাতায়, জানতে চায় বড়দা একটু ভালো আছে কিনা, বীথি কি এখনো তেমনি পাগলামো করে বেড়ায়?

না—বীথির খবরটা জানানো হয়নি প্রীতিকে। জানাতে সাহস পায়নি সত্যজিৎ।

বীথি। সূর্যমুখী হয়ে ফুটতে চেয়েছিল—পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অনেকদিন ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। এই বাড়ির নিঃশ্বাসই তাকে নিবিয়ে দিয়েছে।

তখনই কষ্ট হয়—বীথির কথা মনে পড়লে। দু হাতে কপাল টিপে ধরে সত্যজিৎ। মাথার দু পাশে শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায় তার। আর তখনই একটা হিংস্র অভিসম্পাত ঠিকরে বেরুতে চায় মুখ দিয়ে: আসুক—সেই ভূমিকম্পটা এবার প্রলয় দোলায় মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠুক। এই বাড়ির এক টুকরো ইট-কাঠও যেন আস্তো না থাকে—যেন ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায় হাওয়ায়।

কিন্তু সকাল হয়—পথ জাগে, স্রোত চলে। জীবন। ঘড়ির কাঁটা ধরে আবার সেই দিনযাত্রা। টিউশন, চাকরি, ক্লাসের বাঁধা লেক্‌চার। স্টাফ রুমের তর্ক, ব্ল্যাঙ্ক কার্ট্রিজের অগ্নিবাণ।

: এ পড়ানোর কোনো মানে হয় না, সব ফার্স।

: সমস্ত এডুকেশনাল সিস্টেমটাই পচে গেছে। নো মেন্‌ডিং বাট্‌ এন্‌ডিং!

: কী অন্যায় দেখুন তো! দু বছর হয়ে গেল, তবু কন্‌ফার্ম করছে না। এ সমস্ত সব ওই ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের জন্যে! মুখে মিষ্টি—আসলে একটি ভাইপার!

: ইচ্ছে করলেই তখন প্রেসিডেন্সিতে যেতে পারতুম, কিন্তু কী ভুলটাই হয়ে গেল। এখন সারাজীবন এখানে রট্‌ করতে হবে! ইটস্‌ এ হোল্‌! উঃ, নিজের হাতে ক্যারিয়ারটা

শেষ করে দিয়েছি!

নিঃশব্দে শুনে যায় সত্যজিৎ, ভদ্রতার খাতিরে কখনো কখনো যোগ দিতে হয় আলোচনায়, কখনো হাসতে হয়, কখনো বলতে হয়: 'যা বলেছেন।' তারপর সমস্ত মনে একটা বিস্বাদ অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে আসে কলেজ থেকে। পূরবী দত্ত বলে একটি মেয়ে এই কলেজে এক সময় পড়ত সেই কথাটা কিছুতেই, কোনোমতেই ভুলতে পারা যায় না।

পূরবী কেমন আছে?

ভালোই আছে হয়তো। যেমন আছে বনশ্রী। হীরেনকে এখনো বিয়ে করেনি—কোনোদিন করবে কিনা কে জানে। তবু, মুগ্ধ হীরেন অপেক্ষা করতে থাকবে—তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না।

সেদিনের আলোচনার পর মনের একটা দিকের ওপর পর্দা পড়ে গেছে সত্যজিতের। ওল্ড্ ফ্লেম এখনো জ্বলছে। নট্ ডেড অ্যাণ্ড নট্ ডেডলি। ও আগুনে সত্যজিৎ আর পুড়বে না। তার জ্বালাহীন দাহে এখন পুড়ছে নতুন ইন্ধন। হীরেন।

জি-কে রায় এখনো লেকের ধারে পায়চারী করেন সকাল বিকেল। সেদিন তাঁকে হাসতে দেখেছে সত্যজিৎ।

—জানো, সত্তরটা টাকা পাঠিয়েছে রীতেন। তা হলে একটু রেস্‌পন্‌সিবল হয়েছে কী বলো?

—হবে বইকি। ছেলেমানুষি কেটে যাবে আস্তে আস্তে।

মেঘের আড়ালে যেন একটু আলোর রেখা দেখেছেন জি-কে রায়। পুরনো পাইপটা ধরিয়েছেন আবার। হয়তো রীতেনের পাঠানো টাকাতেই তামাক কিনেছেন এক টিন।

—যাই বলো, মাই বয় ইজ ভেরি স্মার্ট। সে সত্যিকারের স্পোর্টস্‌ম্যান।

—আজ্ঞে হাঁ।

জি-কে রায় বেরিয়ে যান তৃপ্ত মুখে। সত্যজিৎ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। তারপর:

—নতুন কোনো কপি আছে বনি?

বনশ্রী বলে, বাঃ, সেইজন্যেই তো ডেকে পাঠিয়েছি। আর শোনো, স্কুল ফাইন্যালের সেই নোটটা কিন্তু খুব চালু হয়েছে বাজারে। এবার মোটা রয়্যাল্‌টি পাওয়া যাবে।

—বাঃ বাঃ, ভারী খুশির খবর। ভালো করে চা খাওয়াও।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অযোধ্যা—

সব সহজ হয়ে গেছে। ব্যবহারিক, বৈষয়িক। বন্ধুত্বের সম্পর্ক—পার্টনারশিপের অন্তরঙ্গতা। আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যা আজ আর ফিরবে না; তবু পাবলিশারের

কাছ থেকে যখন মোটা টাকার একটা চেক পাওয়া যায়, তখন ধুলো জমে থাকা হরিণের শিং আর কাচ ফাটা গ্রুপ-ফোটোগ্রাফও একটা নতুন সৌন্দর্যে ভরে ওঠে।

ছাইয়ের পুতুলরাও বাঁচে। কোনো এক রকম করে বেঁচে থাকে।

তবু এর মধ্যেই আরো গভীর, আরো পূর্ণ সত্যের সন্ধানে ফেরে সত্যজিৎ। বীথি নেই, তবু বীথির ছায়ায় আলোয় ভরা চোখ দুটো যেন জেগে থাকে বুকের ভেতর।

—ছোড়দা, আমরা হারব না। নতুন মানুষেরা আমাদের দলে। আমরা দিন বদলাব।

ঠিক। একটি শিক্ষক আন্দোলন হয়তো থমকে যায়—একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল স্তব্ধ হয় রক্তস্নানে। তবু শক্তি বাড়ে। পৃথিবীর দিকে দিকে দামামা শোনা যায়ঃ দিন বদলের পালা এলো। তোমরা এগিয়ে এসো।

সপ্তাহে তিন-চারদিন সেই আগামী দিনের প্রস্তুতির শব্দ শোনে সত্যজিৎ। সুমিত্রের পাল্লায় পড়ে একটা কাগজের দেখাশোনা করতে হয় এখন। বীথির চোখের আলো নিয়ে তাতে নতুন লেখা ঢেলে দেয় সে—নোট বই লেখার গ্লানি অনেকখানি মুছে যায় মন থেকে।

আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলে, নির্জন পথের ওপর নিজের ছায়া দেখে চলতে চলতে মনে হয়, আঃ—এখন পূরবী যদি তার পাশে থাকত!

আর প্রীতির গান!

শিবশঙ্কর উঠে বসেছেন আবার। কী করে জোর পেয়েছেন তিনিই জানেন। প্রথম দিনকয়েক সিঁড়ি ওঠা নামা করলেন, নিঃশব্দে সারা বাড়ি পায়চারি করে বেড়ালেন। তারপর একদিন পুরনো গাড়িতে পুরনো ঘোড়া জুড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রঘু এসে ঘরে ঢুকল।

—ছোড়দা!

—হুঁ।

—এই শরীর নিয়ে বাবু বেরোলেন? ঠিক হল?

সত্যজিৎ উত্তর দিল না। শিবশঙ্করের ঠিক বেঠিকের হিসেব কারো সঙ্গেই মেলে না।

—আমি যেতে চেয়েছিলুম, সঙ্গে নিলেন না—রঘুর চোখে জল ছলছল করতে লাগলঃ কী হবে ছোড়দা?

—কিছু হবে না, তুই ভাবিসনি।

সত্যিই ভাবনার কিছু ছিল না। প্রায় রাত বারোটায় ফিরলেন শিবশঙ্কর। রেসে গিয়েছিলেন অনেকদিন পরে—সব কিছুর সীমান্তে পৌঁছে আবার নতুন ভাবে শুরু করতে চেয়েছিলেন তিনি। যেন বলতে চেয়েছিলেনঃ আমি কোনোদিন হারিনি,...

আজও হারব না।

কিন্তু হারলেন। রেসের মাঠে যা নিয়ে গিয়েছিলেন, সব দিয়ে এলেন। হাতের হীরের আংটিটা বেচে ঢুকেছিলেন 'বারে'—মশালে শেষ আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন চিরকালের সঙ্গী অক্ষয়, বাধাও দিয়েছিলেন, কিন্তু শিবশঙ্কর শোনেননি।

যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন গাড়ি থেকে নামতে পারছিলেন না। রঘু হাত ধরে নামাতে গেল, তাকে নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়লেন কাঁকরের ওপর।

সত্যজিৎ ছুটে গেল। টেলিফোন—ডাক্তার।

কয়েকদিন পরে ডাক্তার বললেন, কম্‌প্লিট্‌ প্যারালিসিস্‌। আর কখনো উঠতে পারবেন না। যে ক'দিন বাঁচবেন, এই ভাবেই পড়ে থাকতে হবে ওঁকে। এই জীবন্মৃত অবস্থায়।

শিবশঙ্কর শুনতে পেলেন কিনা তিনিই জানেন। তাঁর রক্তাক্ত বিস্ফারিত চোখের তারা ভেনাস আর মার্সের ছবিটার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল কেবল।

আর নিজের ঘরে কবরের শান্তিতে নিথর হয়ে রইল ইন্দ্রজিৎ। একমাত্র তারই কোনো ভাবনা নেই।

ঊনত্রিশ

সত্যজিৎ পূরবীর কাছে এল। এল আরো দেড় বছর পরে।

সে দিনটাও মেঘে অন্ধকার। সকাল থেকেই কখনো বৃষ্টি—কখনো বাতাস। সাইক্লোনের আবহাওয়া। সারাটা দিনের ধূসর বিবর্ণতা বিকেলের ছায়ায় কালো হয়ে আসছে।

পূরবী নিজের ছোট কোয়ার্টারটির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সে ছাড়াও আর একটি শিক্ষিকা এখানে থাকে—অমলাদি। অমলাদি ব্রহ্মচারিণী। গেরুয়া পরে—জপতপ করে কঠিন ভাবে। অমলার আশা আছে পূরবীও একদিন তার মতো ব্রহ্মচারিণী হয়ে দীক্ষা নেবে। আভাসে ইঙ্গিতে সে কথা শুনিয়েওছে অনেকবার। কিন্তু পূরবী ঠিক মনের দিক থেকে তৈরি হতে পারেনি।

তার টাকা দরকার—বাবাকে সাহায্য করতে হয়। মা-দাদা এরা তার আসলে কেউ নয়—সবাই মায়া মাত্র, এই তত্ত্বজ্ঞানটা সে কোনোমতেই লাভ করতে পারেনি।

অমলাদি মধ্যে মধ্যে তাকে গীতার শঙ্কর ভাষ্য বোঝাতে চেষ্টা করে। বলার ভঙ্গিটি সুন্দর—সংস্কৃত উচ্চারণ আরো সুন্দর—বেশ লাগে পূরবীর। কিন্তু ব্যাখ্যার একটি বর্ণও তার কানে যায় না। অকারণে তার মনে হয়, এত মিষ্টি যার গলা, সে কেন গান শিখল না? আর মনে পড়ে, এক সময়ে নিজেও সে গান ভালোবাসত, কিন্তু প্রায় এই দেড়

বছরের ভেতরে হার্মোনিয়মে হাতও দেয়নি।

অমলাদি ব্রহ্মচারিণী। সংসারের সুখ দুঃখ প্রেম মমতা সব তার কাছে মায়া। সব ?

মাস কয়েক আগে সন্ধ্যাবেলা অমলাদি মন্দিরে গিয়েছিল আরতি দেখতে। পূরবী পড়তে বসেছিল। কখন জানলা দিয়ে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়ল অমলাদির বইয়ের টেবিলটার ওপর। কয়েকটা বই হুড়মুড়িয়ে পড়ল মেঝেতে—বেড়ালটা চমকে উঠে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই অদৃশ্য হল।

বইগুলো গুছিয়ে তুলতে গিয়ে ছোট একখানি ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল তার। যোগ-বাশিষ্ঠের মাঝখানে ছিল ছবিটা। কয়েক বছরের পুরনো ছবি—লালচে হয়ে এসেছে। বছর পঁচিশেকের একটি মানুষ, ওল্টানো চুল, চোখে চশমা, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ছবির তলায় ছোট ছোট করে লেখা : ক্যাপ্টেন কে. কে. দাশগুপ্ত।

আর ছবির শাদা পিঠে রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি লাইন : 'দ্বারে এসেছিলে ভুলে, পরশনে দ্বার যেত খুলে।' পূরবী জানে, ও হাতের লেখা অমলাদি ছাড়া আর কারুর নয়।

খুব কি আশ্চর্য হয়েছিল পূরবী ? না। ব্রহ্মচারিণী অমলাদি সংসারে সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটিয়ে এসেছে—কিন্তু বেদনার এই বাঁধনটুকু কিছুতেই ছিঁড়তে পারেনি। সেও মানুষ।

কে এই ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত ? দরজায় এসে ফিরে গেছে, অমলাদির মনকে চিনে নিতে পারেনি ? কোথায় গেল লোকটি ? ঠকিয়েছে ? ক্যাপ্টেন হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, সেখানেই কি মারা গেছে সে ? সে কাহিনী আজ স্মৃতির বাইরে হারিয়ে যাক। এই যোগবাশিষ্ঠের শক্ত শক্ত শ্লোকের ভেতর অমলাদির বেদনা ধীরে ধীরে বৈরাগ্যে মলিন হতে থাকুক।...

আবার বৃষ্টি এল। জোলো হাওয়ার একটা ঝলক এসে লাগল পূরবীর মুখে। খানিকটা চুল উড়ে এসে ছেয়ে ফেলল চোখ। হাত দিয়ে চুলটা সরিয়ে দিতে দিতে পূরবীর মনে হল, আজও সন্ধ্যায় অমলাদি মন্দিরে গেছে আরতি দেখতে। আরতির পর এক ঘণ্টা ধ্যান করে ফিরে আসবে। কিন্তু এমনি একটা বর্ষার সন্ধ্যায় এই হাওয়া আর বৃষ্টির মাতলামিতে ধ্যানে তার মন বসবে ? কোনো এক কে. কে. দাশগুপ্তের কথা—

কিন্তু পূরবী এসব অন্যায় ভাবনা কেন ভাবছে ? অমলাদির মনের খবরে তার কী দরকার ?

বারান্দার আলোটা জালিয়ে দিলে হয়। বিকেলের ছায়া কালো হয়ে আসছে সন্ধ্যার ছোঁয়ায়। কিন্তু কি হবে আলো দিয়ে ? এই সন্ধ্যাটা ভালো লাগছে, এই ভিজে মিষ্টি

হাওয়ার ছোঁয়াটুকু ভালো লাগছে, বৃষ্টির শিরশির ফিসফিস আওয়াজ ভালো লাগছে, ভিজে লাল কাঁকরের মাটি আর ঘাসের গন্ধ ভালো লাগার স্নিগ্ধ আমেজ শরীরে মনে বুলিয়ে দিচ্ছে।

পূরবী ছোট বারান্দাটুকুর শেষে—দেওয়াল ঘেঁষে, মেজেতেই বসে পড়ল। এখানে বৃষ্টি আসছে না—বৃষ্টির একটা আলগা ছোঁয়া আসছে কেবল। মুখে চোখে পড়ছে জলের গুঁড়ো—তাদের মুছে ফেলতেও ইচ্ছে করে না।

সামনে ছায়া ছায়া দুটো-একটা বাড়ি—আশ্রমের এক্‌স্‌টেন্‌শন হচ্ছে এদিকে। তা ছাড়া ঢেউ-খেলানো মাঠ চলেছে, যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে তাল-পলাশ-মহুয়ার গাছ। খানিক দূরে ছোট একটা পাহাড়ী নদীর খাত আছে, এই বর্ষায় আজ হয়তো জলের তোড় নেমেছে তাতে। আরো অনেক দূরে পাহাড়ের রেখা, পৃথিবীটা যেন সেইখানে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে—পূরবীর ভাবতে ভালো লাগে ওই পাহাড়ের সীমার পারে নীল অথৈ সমুদ্র দুলছে একটা।

দিনের বেলায় মাঠটার এক চেহারা—আজ এই বর্ষার সন্ধ্যায় আর একরকম। বৃষ্টিতে, অন্ধকারে, দূরের পাহাড়-পলাশ-তাল-মহুয়া সব একাকার হয়ে গেছে—যেন কল্পনার সেই সমুদ্রটা পাহাড় পার হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে। মাঠটা কি এখন অল্প অল্প দুলছে ঢেউয়ের মতো? এক্‌স্‌টেনশনের নতুন বাড়িগুলো কি ভেসে চলেছে জলের টানে?

'দ্বারে এসেছিলে ভুলে, পরশনে দ্বার যেত খুলে।' যোগবাশিষ্ঠের শুকনো পাতার ভাঁজে যে ফোটোটা দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তারই পিঠে কবে যেন লিখে রেখেছিল অমলাদি। গানটার প্রথম লাইন মনে আসছে: 'চিনিলে না, আমারে কি।' নিজের মনের কথাটাকে জোর করে নির্বাসন দিয়েছে অমলাদি। কিন্তু পূরবী কী তা পারে?

সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ তাকে চেয়েছিল। তবু সে পালিয়ে এসেছে। তার উপায় ছিল না। বুঝেছিল সত্যজিতের তাকে চাওয়ার ভেতরে যতখানি ভালোবাসা আছে, তারও চেয়ে বেশি আছে দয়া; যতটা নিবিড়তা আছে, তার চাইতে অনেক বেশি আছে রঙ। পূরবী মোহের সুযোগ নিতে চায় না—দয়ার দান নেবার মতো কাঙালও সে নয়।

তবু দূরে সরে এসে এই কথাটাই জেগে আছে বুকের মধ্যে 'পরশনে দ্বার যেত খুলে—'

সেও কি ব্রহ্মচর্য নেবে নাকি অমলার মতো? সত্যজিতের স্মৃতিকেও অমনি করে লুকিয়ে রাখবে কোনো পুঁথির পাতার আড়ালে? তারপর একেবারে নির্মোহ, একেবারে নির্ভাবনা?

কিন্তু পারেনি। মা, বাবা, দাদা, সত্যজিৎ। একজনকে জাগিয়ে রেখে আজ এক-জনকে কি ভোলা সম্ভব?

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পূরবী আশ্রমের দিকে তাকাল। কারা যেন এদিকেই আসছে। দুজন মানুষ। একটা ইলেক্ট্রিক পোস্টের তলায় আসতে দেখা গেল ছাতা মাথায় আসছেন আশ্রমের একজন স্বামীজী। ওয়াটারপ্রুফমোড়া সঙ্গের লোকটিকে চেনা গেল না। বাইরের থেকে কেউ এসেছেন খুব সম্ভব। কিন্তু এদিকে কেন?

এই বাড়ির দিকেই?

সন্দেহ ভাঙতে বেশি সময় লাগল না।

ব্যস্ত হয়ে পূরবী উঠে দাঁড়াতেই স্বামীজী বললেন, ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কলকাতার লোকটি ওয়াটারপ্রুফের হুড্টা খুলে ফেলবার পর আর সন্দেহ মাত্র রইল না। মাঠ পেরিয়ে যে সমুদ্রটা এতক্ষণ এগিয়ে আসছিল, সে এবার পূরবীর বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ল।

বৃষ্টি ভেজা চশমাটা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে মৃদু রেখায় হাসল সত্যজিৎ।

—ভালো আছো তো?

বাইরে জোরে আরম্ভ হয়েছে বৃষ্টি। ঘরের আলোটা পর্যন্ত যেন বৃষ্টিতে ভেজা মলিন আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে সত্যজিৎ—টেবিল থেকে পূরবীর একখানা বই তুলে নিয়েছে হাতে। এই বইগুলো নিয়েই সে ক্লাস করত, এখনো মার্জিনে মার্জিনে সত্যজিতের কথা নোট করা। এ বছর তার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

কিন্তু সত্যজিৎ বইটা খোলেনি। হাতের উপর নিয়ে চুপ করে আছে। একটু দূরে দু'হাতে মুখ ঢেকে খাটের ওপর বসে আছে পূরবী—কাঁদছে।

সত্যজিৎ আস্তে আস্তে বইটাকে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। কেস্ থেকে একটা আধ-পোড়া চুরুট বের করে ধরালো। অল্প হাসল তার পরে।

—তুমি মিথ্যেই দুঃখ পাচ্ছ। মুখার্জি ভিলার অনেক ঋণ জমেছিল, বীথি তার কিছু শোধ দিয়ে গেল। কিন্তু তখনো অনেক দেনা বাকী ছিল। বাবা প্যারালিসিসে চিরদিনের মতো অসাড় হয়ে পড়লেন। তখন এল দাদার পালা। মাঝরাতে একদিন বাবার ঘরে গিয়ে সে বোঝাতে লাগল: হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ্ সুইসাইড? সারা জীবনে ক্রাইম ছাড়া আর কিছু করোনি। তোমার পাপে মা মরেছেন—প্রীতি পালিয়েছে—বীথি প্রাণ দিয়েছে, অ্যাণ্ড নাউ—লুক অ্যাট মি! দো ইট্স্ টু লেট, তবু এখনো টু

সেভ ইয়োর প্রেস্‌টিজ,—তুমি আত্মহত্যা করতে পারো। কী চাও? ছুরি, বন্দুক, বিষ—না সিম্‌প্‌ল দড়ি? যদিও ছেলে হিসেবে তোমার ওপর আমার এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত নয়—তবু তোমার জন্যে এটুকু আমি করতে রাজি আছি।

পূরবী মুখ খুলল। জলভরা চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত করে তাকালো সত্যজিতের দিকে।

—চেঁচামেচি শুনে আমরা ছুটে গেলুম। আমি আর রঘু। দাদাকে কিছুতে থামানো যায় না—সে কি সময়! বাবা থর থর করে কাঁপতে লাগলেন, ওই অবস্থাতেই উঠে বসতে চাইলেন বিছানায়, তারপর পড়ে গেলেন মুখ গুঁজে। অ্যাণ্ড হি ডায়েড্।

চোখের জল শুকিয়ে গেল পূরবীর। বাইরে বাতাসে সাইক্লোনের আভাস। বৃষ্টির কান্নাকে একটা হিংস্র ক্রোধ যেন চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

অসহ্য ভয়ে পূরবী বললে, তারপর?

সত্যজিতের হাতের চুরুট নিভে গিয়েছিল। একবার টান দিয়ে বিকৃত করল মুখটা। বললে, দেখতে না দেখতে ধ্বসে পড়ল সব। বাবা বেঁচে থেকে যে সর্বনাশটাকে আড়াল করে রেখেছিলেন সেটা মুখ বের করে দাঁড়ালো। সাড়ে তিন লাখের ওপর দেনা। মুখার্জি-ভিলা আর ভাড়াটে বাড়িগুলোর বদলেও পুরো শোধ হল না। দাদাকে একটা মেণ্টাল হোমে পাঠিয়েছি--সেখানেই জীবনের শেষ দিনগুলো সে কাটাবে। মুখার্জি-ভিলা ভাঙা হচ্ছে—কালোয়ারদের নতুন চারতলা বাড়ি উঠবে সেখানে। শুধু এখনো মধ্যে মধ্যে উল্‌টো দিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে থাকে রঘু—হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।

আবার বাইরে হাওয়ার শব্দ। চাবুক খাওয়া বৃষ্টির কান্না। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা। কাচের শার্সীতে ক্রুদ্ধ শরাঘাতের মতো জলের আওয়াজ।

ঝি এসে উনুন ধরিয়েছিল। চা করে এনে রাখল সত্যজিতের সামনে। পেয়ালায় একটা চুমুক দিল সত্যজিৎ।

—অল্প ভাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়েছি একটা। ভবানীপুরে। তোমাকে নিতে এলাম।

ভারী চোখ দুটো চমকে উঠল পূরবীর।

—আমাকে?

—এই তো সময়। মুখার্জি-ভিলার যে আড়াল ছিল সে সরে গেছে। এখন তোমার কোনো লজ্জা নেই, আমারও কোনো বাধা নেই। দুজনেই মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি, কাকা কাকিমা খুশিই হবেন।

—কিন্তু—

—এখনো কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

—সে কথা নয়। পূরবীর গলার স্বর জড়িয়ে এল: কিন্তু আমি যে—

—তুমি কী?—একবারের জন্যে সত্যজিতের মুখে সংশয়ের মেঘ ঘনালো। পূরবীও কি হীরেনের মতো কাউকে খুঁজে পেয়েছে? বনশ্রীর মতোই তারও জীবনে কি এমন কেউ এসেছে যে তাকে আরো সহজে গ্রহণ করতে পারে? তা হলে?

পূরবী প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললে, আমি যে এখানে সেবিকা হবো ঠিক করেছি।

—সেবিকা?

—হাঁ, ব্রহ্মচারিণী।

মিনিট দুই চুপ করে রইল সত্যজিৎ। মেঘ কেটে যাওয়া হাসিতে মুখ ভরে উঠল—উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

—আর বসবো না। স্বামীজীরা হয়তো রাগ করবেন এরপর। যে হোটেলে উঠেছি, সেটা স্টেশনের কাছে—অনেকটা পথও যেতে হবে। তা ছাড়া যাওয়ার আগে স্বামীজীদের সঙ্গেও একটু কথা বলে যেতে চাই। সকাল ন'টায় ট্রেন, মনে রেখো। আমি আটটার মধ্যেই আসব—গুছিয়ে নিয়ো সমস্ত।

অসমাপ্ত ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা নিতে ঝি ঘরে এসেছিল। তাই জবাবটা যে ভাবে দিতে চেয়েছিল সত্যজিৎ সেভাবে দিতে পারল না। পূরবীর দিকে এক পা এগিয়েই থমকে গেল।

শান্ত কোমল গলায় বললে, অনেকদিনের ফাঁকির আগুনে পুড়ে পুড়ে প্রায় ছাইয়ের পুতুল হতে চলেছি তবু কিছু বাকী আছে এখনো। নিজের দিক থেকে সেটুকু বাঁচাতে চাই—তোমাকেও মিথ্যে হতে দিতে পারি না। কাল আটটার ভেতরেই আমি আসব।

সত্যজিৎ বেরিয়ে গেল বৃষ্টির ভেতরে। পূরবী প্রণাম করবারও সময় পেল না।

কাল আটটায় সত্যজিৎ আসবে। একবার কলকাতা থেকে পালিয়েছিল পূরবী। কিন্তু এখন পালাবে কোথায়? আর কি পালাবার শক্তি আছে তার? এখন দূরের পাহাড় পার হয়ে সমুদ্র চলে এসেছে তার কাছে—তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পূরবীর চোখ বুজে এল।

বাইরে আবার কার পায়ের শব্দ। বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে গেল তার। সত্যজিৎ কি এখনই ফিরে এল তাকে নিয়ে যেতে—সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মতো দুটি কঠিন বাহু কি এই মুহূর্তেই তাকে কেড়ে নিয়ে যাবে?

না—সত্যজিৎ নয়। বৃষ্টির কান্না আর ঝড়ের দীর্ঘশ্বাস সর্বাঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে ব্রহ্মচারিণী অমলা।

গন্ধরাজ

খস্

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। গায়ের গরম ব্লাউজটার ওপরে পাতলা বর্ষাতিটা চাপিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল কিরণলেখা। তারপর থেমে দাঁড়াল ত্ব' সেকেণ্ডের জন্যে। মুখ না ফিরিয়েই বললে, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

কেউ সাড়া দিল না—সাড়া পাওয়ার জন্যে অপেক্ষাও করল না কিরণলেখা। এক ঝলক হাওয়ার মতো প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে সে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। নীল বর্ষাতিটা ডুবে গেল নীল্‌চে কুয়াশার আড়ালে।

একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল কি দেখল না ভবতোষ। বালিশে পিঠ উঁচু করে যেমনভাবে শুয়ে ছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে রইল। শুধু তার হাতে খবরের কাগজের একটা পাতা উলটে গেল একবার। কাগজের খচ্ খচ্ আওয়াজটা কেমন তীক্ষ্ণ ঠেকল কানে, একবারের জন্যে কুঁকড়ে উঠল ভবতোষের কপাল, তারপর জেনেভা বৈঠকে কেন্দ্রিত মনটা অসতর্কভাবে পিছলে পড়ল একটা কোম্পানির রিডাক্‌শন সেলের বিজ্ঞাপনে।

ঘরটা চুপচাপ এইবার। আঙুলের চাপে একটুও খর্ খর্ করে উঠল না কাগজটা। বাইরে নিঃশব্দ বৃষ্টি। সব চুপ। কাচের জানালার বাইরে আবছা আবছা পেনসিলের টানের মতো ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলো, একটা মেঘলা পাইন গাছের চুড়ো, রাস্তার ওপারে একখানা ভাঙা মোটরের হুড্—সব কিছু যেন নিঝুম হয়ে গেল একসঙ্গে। আধশোয়া শরীরে একটা স্তব্ধ সমকোণ রচনা করে জুতোর বিজ্ঞাপনে ডুবে রইল ভবতোষ।

আর কী করতে পারে—কী করবার আছে ওর। দেড় বছর যদি চাকরি না থাকে, যদি দৈনিক কয়েকটা সিগারেটের পয়সার জন্যে হাত পাততে হয় স্ত্রীর কাছে, যদি জীবনটা চারদিক থেকে একটা শক্ত থাবার মতো কুঁকড়ে আসতে থাকে—তা হলে। তা হলে তিনদিনের পুরনো একটা খবরের কাগজকে পরীক্ষার পড়ার মতো লাইনে লাইনে মুখস্থ করা ছাড়া কী করা চলে আর! সিনেমার খবর, জুতোর দাম, পাটের বাজার, জেনেভা বৈঠক আর সুন্দরবনের ত্বর্ভিক্ষ—সমস্ত একাকার হয়ে যায়। শুধু থেকে থেকে গালে ত্ব'দিনের দাড়ি অস্বস্তির চমক দিয়ে ওঠে—মুহূর্তের জন্যে তালগোল পাকিয়ে যায় খবরের কাগজের লাইনগুলো, আর মনে হয়—বলা যায় না। ছ'পয়সার একখানা ব্লেডের কথা কিছুতেই বলা যায় না কিরণলেখাকে।

আশি ডিগ্রির বিস্তৃতি থেকে এবার ষাট ডিগ্রিতে নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে আনল

ভবতোষ। কাগজটা খসে পড়ল মেঝের ওপর। আবার খানিকটা খচ্ খচ্ খর্ খর্ শব্দ। কেমন যেন কানে লাগল ওর। ভবতোষ আজকাল অদ্ভুত রকম স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে। সেদিন জানালার কাচে ডেঙ্গুর মশার মতো কী একটা বসে ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছিল, ওইটে গায়ে এসে পড়লে অস্বাভাবিক গলায় একটা চিৎকার করে উঠবে সে।

এই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন? এরই জন্যে কি মানুষ জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে? এরই জন্যে কি একটা কালো বেড়াল যখন তখন ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, দেওয়ালে নিজের ফটোটা বদলে গিয়ে একটা মরা-মানুষের মুখে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই জন্যেই কি নিজের গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে দু'হাতে? একটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাইল ভবতোষ।

যে কারণে একদিন কিরণলেখা তীব্র আকর্ষণে টেনেছিল ভবতোষকে—আজ ঠিক সেই কারণেই নিজেকে বড় বেশী পরাভূত মনে হয় ভবতোষের। পোস্ট গ্রাজুয়েটের দেড়শো ছেলের ঈর্ষাভরা দৃষ্টির সামনে কিরণলেখা ভবতোষের জীবনে এসেছিল। ঠিক স্ত্রী হয়ে নয়—প্রতিপক্ষের মতো। ভবতোষকে সে মেনে নেবে না—মানিয়ে নিতে হবে। পুরুষের মতো লম্বা শক্ত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে একটা স্তব্ধ উগ্রতা—নিরলঙ্কার কাটা-ছাঁটা ভাষা। বইয়ের পাতা থেকে মিনিট খানেকের জন্যে চোখ তুলে শুনেছিল বিয়ের প্রস্তাবটা। তারপর একটা লাল পেন্সিল তুলে নিয়ে মার্জিনে দাগ দিতে দিতে বলেছিল, আমার আপত্তি নেই। তবে মাস তিনেকের আগে নয়।

ভবতোষ উচ্ছ্বসিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিল কিরণলেখা। দৃষ্টিতে একটা নিরুত্তাপ শাসন।

—পড়ার সময় আর বিরক্ত কোরো না। কথা তো হয়ে গেল—এবার যেতে পারো।

কিরণলেখার হাত প্রথম মুঠোর মধ্যে নিতে পেরেছিল ভবতোষ রেজিস্ট্রেশন অফিসে। ভবতোষের হাত কাঁপছিল, কিন্তু কিরণলেখার কঠিন আঙুলগুলোতে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্যের ছোঁয়া ছিল না। সেদিনও নয়—তারপরেও নয়। তিন বছর ধরে সহজ স্বাভাবিক চুক্তির মতো ঘর করছে দু'জনে। ভবতোষ একটা চলনসই চাকরি জুটিয়েছে—মেয়েদের স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস হয়েছে কিরণলেখা। সসম্মানে সংসার করেছে দু'জন—কারো কাছে কাউকে মাথা নিচু করতে হয়নি।

তারপর চাকরি গেল ভবতোষের। অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডালহৌসি স্কোয়ারের রেলিঙে হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য

করতে লাগল জি-পি-ওর ঘড়ির কাঁটা দুটোর লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাওয়া। তারপর প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল—এখন ? এইবার ?

অন্নাভাব হয়তো আসবে না—একটার জায়গায় না হয় তিনটে প্রাইভেট পড়ানো জোগাড় করে নেবে কিরণলেখা। কিন্তু কোন্ মর্যাদা নিয়ে এখন দাঁড়িয়ে থাকবে ভবতোষ—দাঁড়াবে আত্মসম্মানের কোন্ শক্ত ডাঙার ওপরে ? এক প্যাকেট সিগারেট—একখানা ব্লেড্—

না—চাকরি আর জোটেনি। চাকরি না পাওয়ার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা যাদের আছে, হয়ত ভবতোষ তাদেরই একজন। দু'একবার মুঠোর কাছাকাছি এসেও হাত পিছলে বেরিয়ে গেছে সুযোগ। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েই দিয়েছে ভবতোষ। কিরণলেখার কাছ থেকেই নিতে হয়েছে সিগারেটের দাম—ব্লেডের খরচ। আর চুক্তি নয়—বশ্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়—আত্মসমর্পণ। কিরণলেখার শান্ত করুণার ছায়ায় দিনের পর দিন নিভে গেছে ভবতোষ, গভীর স্নায়বিক শ্রান্তিতে সারা রাত কান পেতে গুণেছে কতগুলো মড়া সারারাত কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে চলে গেল।

এরই নাম নার্ভাস ব্রেক-ডাউন ? টান-টান করে বাঁধা পৌরুষের তারগুলো হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার এই পরিণাম ? এরই জন্যে কি দেওয়ালে নিজের ফোটো-গ্রাফটাকে হঠাৎ একটা মড়ার মুখের মতো মনে হয়, এই জন্যেই কি যখন-তখন ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় একটা কালো বেড়াল, এই জন্যেই কি একটা বিষাক্ত নেশার পীড়নের মতো কখনো কখনো ইচ্ছে হয়—

কিরণলেখা কর্তব্যে ত্রুটি করেনি। এক মাসও বাকি পড়েনি বাড়িভাড়া, বাদ যায়নি এক সপ্তাহের রেশন। যেমন আসত তেমনি করেই মাংস এসেছে প্রত্যেক রবিবারে। হয়তো দুটোর জায়গায় পাচটা প্রাইভেট ট্যুইশান নিয়েছে কিরণলেখা—ভবতোষ জানেও না। আগেও যেমন রাত্তি ন'টার পরে সে বাড়ি ফিরত—এখনো তাই ফেরে। হয়তো মাঝখানের ঘণ্টা দুয়েকের বিশ্রামটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে।

আর নিজের ভয়াবহ মনোমন্থনের মধ্যে মধ্যে ভবতোষ ভেবেছে তার নিজের অক্ষমতা সংসারে তো এতটুকুও ফাঁকার সৃষ্টি করেনি। এতবড় যন্ত্রটার একটা চাকাও কোথাও অচল হয়ে যায়নি তো। একবারও তো কিরণলেখা মুখ ফুটে বলেনি সংসারে বড্ড টানাটানি যাচ্ছে আজকাল। তা হলে কি ভবতোষ আদৌ না থাকলেও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটত না কিরণলেখার ? কল্পনা করতেই আহত পুরুষ আর্তনাদ করে উঠেছে বুকের ভেতরে। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমকে মনে হয়েছে—তা হলে আজ সে শুধুই ভার, একটা অনাবশ্যক বোঝা ছাড়া কিছুই নয় !

শেষ পর্যন্ত চোখ পড়েছে কিরণলেখার। ভবতোষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ডাক্তার এসেছে বাড়িতে।

—চেঞ্জে নিয়ে যান।—একটা টনিকের সঙ্গে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন।

—চেঞ্জে !—উচ্চকিত হয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ভবতোষ। ফুটবল ম্যাচ দেখা ছেড়ে দেবার পরে এত জোরে সে কখনো আর চিৎকার করে ওঠেনি।

চোখের দৃষ্টিতে শুষ্ক উগ্রতাটাকে উগ্রতর করে তাকিয়েছে কিরণলেখা। শীতল কণ্ঠে বলেছে, সে যা করার আমি করব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ভাবতেও হয়নি ভবতোষের। কোথা থেকে টাকা জোগাড় করেছে, ঘর ভাড়া করেছে, তারপর এই গরমের ছুটিতে ভবতোষকে নিয়ে এসেছে দার্জিলিঙে—সে-সব কিরণলেখার একার দায়িত্ব। একটা টাকার হিসেব করতে হয়নি, এমন কি পথে কুলির সঙ্গে দরাদরি পর্যন্ত করতে হয়নি ভবতোষকে। চুক্তির পর্ব শেষ হয়ে গেছে—এখন বশ্যতার পালা। আগে নিজের ব্যক্তিত্বকে তলোয়ারের মতো শান দিয়ে রাখতে হত—এখন চলছে কাটা-সৈনিকের ভূমিকা। কিরণলেখার স্নেহচ্ছায়ায় এখন তার তিলে তিলে নির্বাণ আর অলস-কল্পনায় ইন্ধন দিয়ে দিয়ে ভাবা : নিজের সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ করবার মতো দুটো ভালো কবিতার লাইন কোথায় পাওয়া যেতে পারে ?

মেঝে থেকে একবার খবরের কাগজটাকে কুড়িয়ে নেবার কথা ভাবল ভবতোষ, কিন্তু উৎসাহ পেল না। নিস্তব্ধ ঘরের শীতল অবসাদের মধ্যে সে তলিয়ে রইল, আর তাকিয়ে দেখতে লাগল বাইরের নীলাভ কুয়াশায় আবছা রেখায় আঁকা নিস্পন্দ ইলেক্‌ট্রিকের তার, একটা পাইন গাছের কালির ছোপ, একটা ভাঙা মোটরের হুড, আর—

কিরণলেখা জানত রণজিৎ অপেক্ষা করবে। কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না—এমন কি এক বিন্দু আভাস পর্যন্ত দেয়নি কিরণলেখা। তবু লাডেন্ লা রোডের রেলিং ধরে রণজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল। এই অল্প অল্প বৃষ্টি—থেকে থেকে ঘনিয়ে আসা কুয়াশা—কোনো এক কাক-জ্যোৎস্নায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কবরের মতো নীচের বাড়িগুলো আর দূরের ঝাপসা বিষণ্ণ পাহাড়—এরা এমন কিছু আকর্ষণের বস্তু নয় রণজিতের কাছে। প্রায় নির্জন পথের ওপর রণজিতের মূর্তিটা কুয়াশায় অদ্ভুত দীর্ঘকায় মনে হল। যেন বিরাট কোনো এক সমাধি-ভূমিতে একটা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

—এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন ?

কেমন চমকে উঠল রণজিৎ। কেন, কে জানে। হয়তো আগে থেকে কিরণ-লেখাকে দেখতে পায়নি, সেই জন্যেই ; হয়তো কিরণলেখা আসতে পারে এই

কল্পনাতেই তদ্গত হয়ে ছিল সে—এসে পড়ার বাস্তবতাকে ঠিক সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না।

রণজিৎ বললে, আপনি ?

অভিনয়। কিরণলেখা অল্প একটু হাসল : মাছের সন্ধানে বেরিয়েছি। যাব বাজারের দিকে।

—মাছ ? এই দুপুরবেলায় ?

—দার্জিলিঙের বাজারে এই সময়েই মাছ আসে। আপনি হোটেলে থাকেন, তাই এ-সব খবর জানবার দরকার হয় না। কিন্তু এই বৃষ্টির ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছেন আপনি ?

—আমি ?—রণজিৎ কেমন ঘোলা চোখে তাকালো। অথবা ওর চশমার কাচের ওপর রেণু রেণু বৃষ্টি জমেছে বলেই অমন আবছা দেখাল ওর চোখ : দার্জিলিঙে এমনি অল্প অল্প বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে।

অভিনয় ? কিরণলেখা এবার আর হাসল না, ফেলল শান্ত বিশ্লেষণের দৃষ্টি।

—কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে। জ্বর হয়ে বসতে পারে চট্ করে।

—জ্বর ? আজ কুড়ি বছরের মধ্যে একদিনও আমার মাথা ধরেনি—বেশ ভরাট পরিতৃপ্ত গলায় বললে রণজিৎ। আবার খানিকটা কুয়াশা এসে রণজিৎকে আড়াল করে দিলে—আবার তাকে অদ্ভুত রকম দীর্ঘকায় বলে মনে হল কিরণলেখার।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল। হঠাৎ যেন কিরণলেখা অনুভব করল, এখনি দুটো বিশাল বলিষ্ঠ বাহুতে রণজিৎ তাকে তুলে নিতে পারে, তারপর নিছক খেয়ালের প্রেরণায় ছুঁড়ে দিতে পারে সামনের কোনো একটা অতল শূন্যতার ভেতরে। এবং পরক্ষণেই, যেন একটা প্রকাণ্ড কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছে এমনিভাবে, এই কুয়াশা, ওই বাড়িগুলো, দূরের ওই বিষণ্ণ পাহাড়—সব কিছুকে চকিত করে দিয়ে হেসে উঠতে পারে হা হা করে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইল কিরণলেখাই : আর কতদিন থাকবেন এখানে ?

—কিছু ঠিক করিনি এ-পর্যন্ত। এখনো লম্বা ছুটি রয়েছে হাইকোর্টের। যদি ভালো লাগে, হয়তো আরো দু' সপ্তাহ কাটিয়ে যেতে পারি।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সে রণজিৎ নয়—কিরণলেখা ভাবল। কোনো মেয়ে কাছে গিয়ে লেকচার নোটের খাতা চাইলে যে রণজিতের মুখের রঙ বদলাত বহুরূপীর মতো, করিডোরে কথা কইতে গেলে যার কপালে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে উঠত, টেলিফোনে কিরণলেখাকে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে যে নিজে তিন-তিনবার কানেক্‌শন কেটে দিয়েছে, সেই লাজুক শান্ত ছাত্রটির সঙ্গে কোনো মিল নেই এই

রণজিতের। জীবনের নতুন নাটকে আজ সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেছে তার। এখন সে হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। আত্মবিশ্বাস এসেছে—এসেছে আত্মপ্রকাশের শক্তি। জনশ্রুতি শোনা যায়, ভবতোষের সঙ্গে কিরণলেখার বিয়ের পরে সমানে তিনদিন ধরে বেহালা বাজিয়েছিল রণজিৎ। আজ সেই বেহালার স্মৃতিচিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।—হয়তো এখন রিভলবারের লাইসেন্স নিয়েছে রণজিৎ—হয়তো আজকাল সে গ্রে-হাউণ্ড্‌ পোষে বাড়িতে।

কিরণলেখা বলে ফেলল, চলুন, আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত।

কথাটা বলেই মনের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল কিরণলেখা। এই প্রস্তাবটা আসা উচিত ছিল রণজিতের কাছ থেকেই। মোলায়েম বিনীত গলায়, কুণ্ঠিত মিনতিতে। তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে, প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত স্মিত হাসিতে কিরণলেখা বলত, বেশ—চলুন।

কিন্তু কেমন উলটো হয়ে গেল ব্যাপারটা। কে জানত, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ক্লাস ঘরে কুঁকড়ে থাকা অঙ্কুরটা দার্জিলিঙের কুয়াশায় পাইনগাছের মতো মাথা তোলে! তেমনি ঋজু, তেমনি উর্ধ্বমুখী!

যে-হাসিটা কিরণলেখার ছিল, নিজের পৌরুষে সেইটে কেড়ে নিয়ে রণজিৎ বললে, চলুন না, ভালোই তো।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এক ফালি মেঘভাঙা রোদ পড়ল চকচকে পথের ওপর। মেঘ আর কুয়াশায় মিলে আকাশ-মাটি ছাওয়া শাদা পর্দাটা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে দূরে। রণজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—চা খাবেন ?

—থাক এখন।

—থাকবে কেন ? আসুন না। কি রকম কন্‌কনে ঠাণ্ডা দেখেছেন! একটু চা নইলে উৎসাহ বোধ হচ্ছে না!

ঠিক তাই। নিজেকে কেমন স্তিমিত মনে হল কিরণলেখারও। প্রতিবাদ করল না।

রাস্তার ডানদিকে এক ধাপ নেমে সাজানো ছোট একটা রেস্তোরাঁ। শো-কেসে একখানা অতিকায় পাঁউরুটি, রঙ্‌ বেরঙের কেক। সবুজ পর্দা ঢাকা ছোট ছোট কেবিন। প্লাস্টিকের বিচিত্র টেবিলক্লথের ওপর রেডিওর অনুকরণে অ্যাশ্‌ট্রে। ফুলদানি থেকে 'সুইট-পী'র একটা হাল্‌কা আতরের গন্ধ।

দুজনে মুখোমুখি। চা—স্যাণ্ড্‌উইচ্‌।

স্যাণ্ড্‌উইচের একটা কোণা দাঁতে কেটে রণজিৎ বললে, আপনার ওখানে

একদিনও যাওয়া হল না।

টি-পটের নল থেকে উঠে আসা বাদামী ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য করতে করতে কিরণলেখা বললে, এলেই তো পারেন।

—বিনা-নিমন্ত্রণে যাব ?—রণজিৎ হাসল।

তা বটে। এ-কথা আজকের রণজিৎ বলতে পারে—বলতে পারে অ্যাড্‌ভোকেট রণজিৎ। কিন্তু কয়েক বছর আগে কি এ-দাবিটা জোর করে করতে পারত সে ? সেদিন একটুখানি প্রশ্রয়ের হাসিই ছিল যথেষ্ট, আজ সেখানে আগ বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ করতে হবে কিরণলেখাকে।

কিরণলেখা জবাব দিল না—কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল মনের ভেতরে। একেবারেই কি সে ফুরিয়ে গেছে—সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে রণজিতের কাছে ? তার কঠিন চোখ, তার পুরুষালী চেহারা, তার কাটাছাঁটা বৈষয়িক কথার ভঙ্গি—এরা সবাই মিলে কোনো প্রতিক্রিয়াই আর সৃষ্টি করে না রণজিতের মনে ? এত শক্তি কি সত্যিই কোথাও ছিল তার ?

—বেশ ভালোই আছেন আজকাল ?—হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন এল রণজিতের কাছ থেকে।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কুঁজো ঘাড়টাকে সোজা করে বসল কিরণলেখা। ধারাল গলায় বললে, খারাপ থাকবার কী কারণ আছে বলুন ?

আঘাতটা কি লাগল রণজিৎকে ? বোঝা গেল না। একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধটা ঝাঁকালো একবার,—না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—ও।

আবার চুপচাপ। টি-পটের নল দিয়ে রেশমী সুতোর মতো বাদামী রঙের ধোঁয়া। সুইট্-পীর গন্ধ। প্ল্যাস্‌টিকের টেবিল-ক্লথে বিচিত্র কারুকাজ। রাস্তায় মোটরের হর্ন।

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে তার সোনালী লেবেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রণজিৎ। তারপর : টাইগার হিল থেকে সান্-রাইজ দেখেছেন ?

—না।

—যাবেন কাল ?—রণজিৎ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনে।

এতক্ষণে নিজের মধ্যে একটা উত্তাপ অনুভব করল কিরণলেখা, এতক্ষণ পরে বুঝি চায়ের প্রতিক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। চশমার কাচের তলায় দেখা যাচ্ছে রণজিতের চোখ। ব্রীফ নয়—হাইকোর্ট নয়—এই মুহূর্তে কি নিজের হারিয়ে-যাওয়া ধূলিধূসর বেহালাটাকে মনে পড়ল রণজিতের ?

—কাল কখন ?—চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কিরণলেখা জানতে চাইল।

—অন্তত রাত চারটের মধ্যে বেরুতেই হবে। নইলে দেরি হয়ে যাবে পৌঁছুতে।

—অত রাতে?

রণজিৎ হাসল: ভয় করবে?

ভয়! আবার ছাড়িয়ে যেতে চাইছে রণজিৎ—আবার মাথাটা তুলতে চাইছে অনেক ওপরে। কিন্তু বাইরে এখন আর কুয়াশা নেই। হঠাৎ রোদ উঠেছে—তীব্র খরধার রোদ। এই রোদে মনে পড়ে কলকাতাকে। কলেজ স্ট্রীট্। ডবল-ডেকার। ইউনিভার্সিটি—লিফ্ট। পেছন থেকে বাংলা ডিপার্টমেন্টের কবি-কবি চেহারার হ্যাংলা ছেলেটার ছুঁড়ে-দেওয়া মন্তব্য। একটা ঘৃণার দৃষ্টি ফেলতেও অনুকম্পা হয়।

—বেশ, যাব।

রণজিৎ বললে, ধন্যবাদ। কদিন থেকেই প্ল্যান করছি, কিন্তু একা একা যেতে কিছুতেই উৎসাহ হয় না। তাহলে কাল ভোরেই আমি গাড়ি নিয়ে আসব লাডেন্‌লা রোডে। হর্ন দেব। আপনি রেডি হয়ে থাকবেন।

—আচ্ছা।

কিন্তু ভবতোষের কথা কেউ তুলল না। রণজিৎ বলল না, মনে করিয়ে দিল না কিরণলেখা। রণজিতের সঙ্গে এই শক্তি-পরীক্ষায় কোথাও কোনো ভূমিকা নেই ভবতোষের। এমনকি, দর্শকেরও না। শুধু একবারের জন্যে কিরণলেখা ভাবল, ভবতোষের দাড়িগুলো বড় হয়ে গেছে—হয়তো একখানা ব্লেড্ দরকার ওর। আর দরকার এক টিন সিগারেট, আজকের খবরের কাগজ।

কিরণলেখা বললে, চলুন—ওঠা যাক এবার। আর বেশি দেরি হলে বাজারে ভালো মাছ কিছুই পড়ে থাকবে না।

লেপমুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে ভবতোষ। ঘুমুচ্ছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। অথবা রাত্রের ঘুমটাকে দিন-রাত্রির একটা ক্লান্তিকর ঝিমুনির মধ্যে প্রসারিত করে নিয়েছে সে। একবার ইচ্ছে করল মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় একটুখানি। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুরে আসা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া হয়তো ভালো লাগবে না ভবতোষের।

চা করতে হবে। কিরণলেখা স্টোভ ধরাতে বসল।

পাশের ঘরে এক মারাঠী ভদ্রলোক আছেন—এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর এক পাল ছোট ছেলেমেয়ে লাফালাফি করছে সমানে। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মশলা-মেশানো রসুনের উগ্র গন্ধ—কী একটা ভালো জিনিস রান্না হচ্ছে ওখানে। মোটা-গলায় ধমক দিচ্ছেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। জানালার বাইরে একটু দূরের রাস্তায়

ভুটিয়া ঘোড়ায় চেপে চলেছে দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে। স্টোভে পাম্প করতে করতে একবার ভবতোষের দিকে তাকিয়ে দেখল কিরণলেখা। নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে আছে বিছানায়—কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দু হাতের শীর্ণ আঙুলগুলোকে !

ঘরটা খালি। বিশ্রী রকমের খালি। পাশের ঘরে মারাঠী বাচ্চাগুলোর চিৎকার। ভারী একা-একা লাগল কিরণলেখার। স্টোভে কেট্‌লি চাপিয়ে বিছানার পাশে বেতের চেয়ারটায় এসে বসল।

ভবতোষ চোখ মেলল। ঝিমুচ্ছিল ? জেগেই ছিল ? কে জানে !

কিরণলেখা আস্তে আস্তে বললে, তোমার সিগারেট এনেছি—আর ব্লেড্।

—আচ্ছা।

—আর এই আজকের খবরের কাগজ।

—দাও।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল ভবতোষ। কিন্তু পড়ার আগ্রহ দেখা গেল না। নিরাসক্ত শান্তিতে মেলে রাখল বুকের ওপর।

একবার কিরণলেখার মনে হল, কথাটা বলবে ভবতোষকে ? বলবে, কাল শেষ রাত্রে রণজিতের সঙ্গে টাইগার হিলে যাওয়ার প্রোগ্রামের কথাটা ? জিজ্ঞাসা করবে, তুমিও যাবে নাকি একবার ? রাত-দিন তো ঘরেই শুয়ে থাকো, এমন করলে শরীর ভালো হবে কী করে ? চলো না—ঘুরে আসবে একটু ?

কিন্তু বলেই বা কী হবে ? কিছুতেই জাগানো যাবে না ভবতোষকে। একটা অতল নির্বেদের মধ্যে সে নিঃশেষিত। সেখান থেকে কিছুতেই উঠে আসতে চাইবে না। এমন কি, কাল শেষ রাতে রণজিতের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কুৎসিত কল্পনার যে সুযোগ আছে, তাই নিয়ে একবারও চঞ্চল হয়ে উঠবে না ভবতোষ। মনে মনেও না।

একবার হয়তো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবে—হয়তো তাও না। হয়তো লেপটাকে আরো বেশি করে মুখের ওপরে টেনে আনবে। জিজ্ঞাসাও করবে না, কোথায় যাচ্ছ, কখন ফিরবে, অথবা আদৌ আর ফিরবে কিনা !

একেই কি নার্ভাস ব্রেক-ডাউন বলে ?

শক্ত পুরুষালি চেহারার কিরণলেখা শিউরে উঠল একবারের জন্যে। ঘরটা খালি—বিশ্রী রকমের খালি। চার বছর পরে—বিয়ের চার বছর পরে এই প্রথম ভবতোষের উপস্থিতি অসহ্য লাগল তার কাছে।

পরক্ষণেই নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা—যেন মুক্ত করে নিলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে। চায়ের কেট্‌লিতে জলটা টগবগ করে ফুটছে।

পরদিন কিরণলেখার ঘুম ভাঙল ভোর চারটের আগেই।

চোখ মেলতেই দৃষ্টি পড়ল পাশের টি-পয়ের ওপর। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা ঝকঝক করছে ওখানে। কাচের আড়াল থেকে কতগুলো সবুজ অগ্নিবিন্দু হিংস্রভাবে জলজল করছে। রণজিতের আসতে পনেরো মিনিট দেরি আছে এখনো।

সহজ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস পড়ছে ভবতোষের। হয়তো সেই বর্ণহীন ঘুমে তলিয়ে আছে সে : যেখানে আলো নেই, আকাশ নেই—কিরণলেখা নেই—কেউ নেই। শুধু ছায়ার মতো কতগুলো ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন আছে অথবা তাও নয়। যাই থাক—সেখানে কিরণলেখা নেই—না থাকলেও ক্ষতি নেই।

একবার রূঢ় একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ভবতোষকে—একটা অর্থহীন কান্নায় ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তার চাইতেও সহজ কাজ নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে যাওয়া। কিরণলেখা তাই করল।

ঘরের কোন্ জিনিসটা কোথায় আছে, তার নির্ভুল হিসেব জানে কিরণলেখা। খাট থেকে নেমে তিন পা বাঁ দিকে গেলে আল্না—হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে নীল রঙের শাড়িটা। তার পাশেই ঝুলছে ওভারকোট। রিস্ট্ওয়াচটা কোটের পকেটেই আছে। ভবতোষের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটার পাশেই পড়ে আছে হাতব্যাগ। বর্ষাতি রয়েছে দরজার কাছেই। রাত্রে চুল বেঁধে শুয়েছে—তার জন্যেও কোনো ভাবনা নেই। কস্‌মেটিক সে ব্যবহার করে না—প্রশ্নই ওঠে না তার।

এখন শুধু অপেক্ষা করা—শুধু কান পেতে থাকা রণজিতের মোটরের হর্নের জন্যে। ভবতোষের ঘড়িতে সবুজ অগ্নিকণায় আরো পাঁচ মিনিট বাকী।

নিঃশব্দে দরজা খুলল কিরণলেখা। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বাইরের ঠাণ্ডাটা যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতের মতো চোখে-মুখে এসে পড়ল। ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো যেন হা হা করে উঠল নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসিতে। শীতল কালো আকাশ অসংখ্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে কিরণলেখার মুখের দিকে তাকাল।

তারপরেই চমকে উঠল সে।

কোথা থেকে তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝলক বয়ে এল একটা। পথের ও-পাশে দীর্ঘ পাইন গাছটার চূড়ো মর্মরিত হল—যেন একটা অতিলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠতে লাগল থরথরিয়ে। ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোতে শাঁ শাঁ করে কান্নার মতো শব্দ বাজল। আর কিরণলেখার মনে হল—ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রণজিতের দীর্ঘ দেহ কিরকম ছায়া ফেলবে কে জানে! ওই রকম অলৌকিক—ওই রকম বিরাট, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত আতঙ্কে তার মনে হবে : এই মুহূর্তে একটা ছোট পাখির মতো তাকে মুঠোয়

করে তুলে নিতে পারে রণজিৎ—ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে কোনো অতলস্পর্শ খাদের ভেতরে, আর তারপর হো হো করে একটা প্রচণ্ড কৌতুকের হাসিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে রাত্রির অন্ধকারকে !

ভয় ! এবার আর নিজের কাছে মন লুকোতে পারল না কিরণলেখা। ভয়। শীতল নিষ্ঠুর অন্ধকার—অসংখ্য নক্ষত্রের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি—পাইন গাছের চুড়োটার অলৌকিক দোলা, আর—আর—

কিরণলেখা ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এল। এক কোণে ছুঁড়ে দিলে ওভারকোটটা। তারপর পলাতক একটা খরগোশ যেমন করে তার গর্তের মধ্যে এসে লুকোয়—তেমনি করে ডুবে গেল লেপের ভেতরে।

আর আশ্চর্য, এরই জন্যে কি অপেক্ষা করছিল ভবতোষ ? সে কি জানত, এমনি একটা কিছু ঘটবে ? নইলে আজ দু বছর পাশে পাশে শুয়েও ঘুমের ঘোরে যে ভবতোষ কিরণলেখাকে স্পর্শ করেনি, সে কেন তাকে এমন করে জড়িয়ে নিলে বুকের মধ্যে ?

বাইরের রাস্তায় একটা মোটর থামল। দুবার হর্ন বাজল। কিরণলেখা আরো বেশি করে সরে এলো ভবতোষের বুকের মধ্যে, ভবতোষের হাতটা আরো বেশি করে সাঁড়াশির মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপরে কতবার হর্ন বাজল, কতক্ষণ ধরে অধৈর্য প্রতীক্ষায় বাজতে বাজতে থেমে গেল, কিরণলেখা টেরও পেল না। সমস্ত রাতে বিনিদ্র অস্বস্তির পরে এইবার প্রথম তার চোখ ভরে ঘুম নেমে এল।

কিরণলেখা জানত, রণজিৎ ক্ষমা করবে না। একবার যখন দাবি করতে শিখেছে, তখন সহজে সে-দাবি ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের নিরীহ নিস্তরঙ্গ রণজিতের মধ্যে একটা উগ্র-ক্ষুধার্ত জাগরণের পালা শুরু হয়েছে। আর সে বেহালা বাজায় না—হয়তো রিভলভারের লাইসেন্স নিয়েছে এখন।

দুদিন ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে গেল লাডেন্ লা রোড—ম্যাল্—দারোগা বাজারের রাস্তা। যে নেপালী কাঞ্ছাটা দুবেলা বাসন মাজে, ঘর-দুয়োর পরিষ্কার করে, বাজার করাল তাকে দিয়েই। আধখানা বুনে রাখা স্কার্ফটাকে টেনে খুলে ফেলল—তারপর সকাল-বিকেল বসে গেল সেইটেকে নতুন করে বুনতে।

কী ভাবল ভবতোষ ? কিছু কি ভাবল ? দাড়ি কামাল, পর পর কয়েকটা সিগারেট খেল, এমন কি নিজেই বেরিয়ে গিয়ে কিনে আনল খবরের কাগজ। রাত্রিতে কিরণলেখার ওই আত্মসমর্পণের মধ্যে কোনো অর্থ কি খুঁজে পেয়েছে ভবতোষ ?

নিজের ভেতরে কোথাও কি এতটুকু শক্তিকে আবিষ্কার করেছে সে?

দুটো দিন—দুটো তীক্ষ্ণ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। কোথায় মিলিয়ে গেল কুয়াশা—কোথায় হারিয়ে গেল শীতার্ত বিষণ্ণতার কুহক। পাথর গরম হয়ে উঠল।—উদযাস্ত ঝকঝক করতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা, চারদিকের নানা রঙের বাড়িগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল নিষ্ঠুর নগ্নতায়। এই আলোয়—এত প্রখর সূর্যকিরণের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল রণজিৎ। এই রোদে ঝকঝক করে ওঠে ইউনিভার্সিটির প্রকাণ্ড সাদা বাড়িটা—হেদুয়ার জল—কলেজ স্ট্রীট—কলকাতা। এ আলোয় রণজিতের কুঁকড়ে লুকিয়ে থাকার পালা। আর কিরণলেখার বসে বসে ভাবা: এতখানি প্রশ্রয় কী করে সে দিয়েছিল রণজিৎকে—কেমন করে সে বলতে পেরেছিল: আমাকে এগিয়ে দেবেন বাজার পর্যন্ত?

রণজিৎ এল আরও দুদিন পরে।

এতটা দুঃসাহস কোথা থেকে এল রণজিতের—যে অসঙ্কোচে চলে আসতে পারল সেখানে—যেখানে ভবতোষ আছে? কেমন করে সে দুম্‌দুম্‌ করে ঘা দিতে পারল দরজায়? যেন দরকার হলে ভেঙে ফেলবে?

তার কারণ ছিল বৃষ্টি—অশ্রান্ত বৃষ্টি। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ আকাশ পোড়া ছাইয়ের মতো রঙ ধরেছিল দিনের বেলা, রাত্রির অন্ধকারে তা আলকাতরার মতো কালো হয়ে উঠলো। সামনের পাইন গাছটায় আছড়ে পড়তে লাগলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক—শন্‌ শন্‌ করে আর্তনাদ করে চলল ইলেক্ট্রিকের তার। আর সেই সময় প্রচণ্ডভাবে দরজায় ঘা দিলে রণজিৎ।

হাতের বোনাটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিরণলেখা—যেন ভূত দেখল। বিছানার ওপরে উঠে বসল ভবতোষ। রণজিতের ওয়াটারপ্রুফ থেকে স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে কার্পেটের ওপর, বৃষ্টিতে চক্‌চক্‌ করছে পায়ের কালো গাম বুট। ওয়াটারপ্রুফটাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে শব্দ করে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। আজ বিনা নিমন্ত্রণেই সে এসেছে।

তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বললে,—অনেকদিন পরে দেখা হল ভবতোষ, ভালো আছো তো?

কী একটা বলতে চাইল ভবতোষ—বলতে পারল না। শুধু দুটো কোটরে বসা চোখের ভেতর থেকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রণজিতের দিকে। সে দৃষ্টিকে রণজিৎ গ্রাহ্যও করল না।

কিরণলেখা দেখল, বাঘের মতো দপদপিয়ে উঠেছে রণজিতের চোখ।

রণজিৎ বললে, সেদিন কথা দিয়েও কেন গেলেন না আপনি? প্রায় আধঘণ্টা ধরে মোটরের হর্ন বাজিয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

বাইরে বৃষ্টির একটানা শব্দ—ইলেকট্রিক তারের গুঞ্জন—পাইন গাছটার আর্তনাদ। কী ভয়ঙ্কর—কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে রণজিৎ! এই দুর্যোগের পটভূমিতে যেন হিংস্র একটা বন্য শক্তির মতো আবির্ভূত হয়েছে সে। কে জানে তার ওভারকোটের পকেটে একটা রিভলভারও আছে কিনা!

হয়তো হাঁটু ভেঙে বসে পড়ত কিরণলেখা—হয়তো বলেও বসত: ক্ষমা করো আমাকে, এমন অপরাধ আমি আর করব না।—হয়তো রণজিৎ যদি তখন তার হাত ধরে এই ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেত, এক বিন্দু প্রতিবাদের শক্তি থাকত না কিরণলেখার।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই—বৃষ্টি আর হাওয়ার সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর গুরু গুরু শব্দ উঠল একটা। সে শব্দ আকাশে নয়—মাটিতে। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো দুলে উঠল ঘরটা।

খাটের থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ভবতোষ। ধস্ নামছে।

আবার সেই গুরু গুরু ধ্বনিটা কানে এল। আরো তীব্র—আরো ভয়াল। দপ করে নিভে গেল ঘরের ইলেকট্রিকের আলোটা। মেঝেটা দুলতে লাগল, পাশের মারাঠী পরিবারের থেকে শোনা গেল আকুল কান্নার শব্দ। মড়মড় করে পাইন গাছটা ভেঙে পড়ল—ঘরের পিছন দিকটা হঠাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে টুকরো টুকরো কাঠের মতো ঢালু বেয়ে গড়িয়ে চলল।

একটা পৈশাচিক আর্তনাদ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল রণজিৎ—কিন্তু বেশী দূর যেতে পারল না। সামনে পিছনে দুদিকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পথের রেখা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অতল অন্ধকারে দূরে-কাছে ক্রমাগত ধস্ ভাঙতে লাগল। মানুষের চিৎকার—বুক ফাটা কান্না—মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি—সব একসঙ্গে মিলে একটা বীভৎস নরকের মধ্যে পৌঁছে দিলে রণজিৎকে।

রণজিৎ দাঁড়াতে পারল না। হাঁটুতে এক বিন্দু শক্তি কোথাও অবশিষ্ট নেই। চোখ বুজে বসে পড়ল পথের ওপর। এই দ্বীপের মতো জায়গাটুকু যে কোনো সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ—

ততক্ষণ বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কিরণলেখার আর্তনাদ তার কানে এসে ঘা দিতে লাগল: আমাকে তোলো, আমাকে তোলো এখান থেকে। আমি এখনো বেঁচে আছি—

উঠে দাঁড়াতে চাইল রণজিৎ—সাধ্য কী! সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতে অসাড়

হয়ে গেছে তার। অসহ্য বিষাক্ত যন্ত্রণায় সে কান পেতে শুনতে লাগল কিরণলেখার আকৃতি : ওগো কোথায় তুমি! আমি যে এখনো বেঁচে আছি—

চোখ দুটো বোজবার আগে দেখতে পেল রণজিৎ—অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেল। কিরণলেখার কাছে যার কথা শুনেছিল—একটা শবদেহের মতো যাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল বিছানায়, সেই ভবতোষ একটা প্রচণ্ড দানবের মতো ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে প্রাণপণে। এত শক্তি, এমন অমানুষিক শক্তি কোথায় পেল ভবতোষ? কী করে এমন ভয়ংকরভাবে বেঁচে উঠল সে, যে কিরণলেখাকে সে বাঁচিয়ে তুলবেই?

একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো রণজিৎ অনুভব করল, অনেক বর্ষা, অনেক শরৎ, অনেক সূর্যের আলো আর অনেক অন্ধকার তিলে তিলে এই শক্তি দিয়েছে ভবতোষকে। একটা আকস্মিক আবেগ নয়—একটা উন্মত্ততা নয়, এ শক্তির মধ্যে অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। তার মৃত্যু হয়নি—শুধু আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। জড়তা ছিল কঠিন—তাই তার আবরণ ভাঙবার জন্যে প্রয়োজন হল এমন ভয়াবহ চরম মুহূর্তের।

—আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও তুমি—

উন্মত্ত দানবীয় শক্তিতে কাঠ সরাচ্ছে ভবতোষ। দাম্পত্য জীবনের যে প্রেম তিলে তিলে সংগ্রহ করেছে সূর্য আর নক্ষত্রের অগ্নিকণা—তাই এখন বজ্রপ্রদীপ হয়ে জ্বলছে ভবতোষের রক্তে। কিরণলেখাকে সে-ই বাঁচাবে, সে-ই শুধু বাঁচাতে পারে। সীমাহীন দীনতায় হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে রণজিৎ নিশ্চেতনার গভীরে তলিয়ে গেল।

কল্প-পুরুষ

আলো নিভিয়ে দিলেও ঘর অন্ধকার হয় না—এই এক দোষ কলকাতার। এমন একটা শান্ত তিমির কোথাও নেই—যেখানে নিজের চারদিকটাকে মুছে দিয়ে ডুবে যাওয়া যায় আকাশের সমুদ্রে! পার্কের এক কোণায় গিয়ে বসলে শোনা যাবে পেন্‌শন-পাওয়া বড়বাবুদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা; গড়ের মাঠের এক প্রান্তে গিয়ে বসলেও কানে আসবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টাকার হিসেব করছে কেউ—অথবা ব্যাখ্যা করছে ক্রিকেট ম্যাচের। চীনে-বাদামের খোলা ভাঙবার আওয়াজে মুখর হয়ে থাকবে গঙ্গার ধার—মনে হবে সারা পৃথিবীতে রাশি রাশি দাঁত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই আর।

নির্জনতা কোথাও নেই—নেই অন্ধকার। এমন একটা বিবর নেই—যেখানে আহত জন্তু লেহন করতে পারে নিজের ক্ষতকে। আলো আর শব্দ, শব্দ আর আলো—সব সময় খুঁজে ফিরছে শিকারীর মতো। সামনের রাস্তা থেকে বল্লমের ফলার মতো আলো এসে পড়েছে ঘরে—ওধারের বাড়িটার তেতলার ঘরে একটা একশো পাওয়ারের আলো জেলেছে কেউ,—যতবার দৃষ্টি যাচ্ছে, ততবারই মনে হচ্ছে এক এক মুঠো কর্‌করে বালি এসে পড়ছে চোখের ভেতরে।

শুয়েছিল, উঠে বসল শিবেন। আবার কি ব্ল্যাক-আউট আসতে পারে না কলকাতায়, ফিরে আসতে পারে না যুদ্ধের যুগের সেই তিমিরান্ধ দুঃস্বপ্ন? অথবা এখান থেকে একটা ভারী পাথর ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে চুরমার করা যায় না ওই একশো পাওয়ারের বাল্‌বটা?

কিন্তু মনের ভেতর? সেখানে কী করে টেনে আনা যাবে কালো অন্ধকার? বাইরের সমস্ত আলো মুছে গেলেও বুকের মধ্যে কী করে আসবে একটা শীতল মৃত রাত্রি? সায়নাইড্? ছিঃ ছিঃ! অত কাপুরুষ নয় শিবেন।

শিবেন কাপুরুষ নয়। তবু আলো-নেভানো ঘরের দরজাটা হুড়মুড় করে খুলে যেতেই সে থরথর করে কেঁপে উঠল, দু'-তিনটে গলায় সমস্বরে চিৎকার উঠল, চলো শিবেন, চলো। এক সেকেণ্ড দেরি নয় আর।

—কোথায় যেতে হবে?—নির্বোধ অভিভূত প্রশ্ন এল শিবেনের।

একজন এগিয়ে গিয়ে টেনে দিলে ঘরের সুইচটা। একরাশ নগ্ন হিংস্র আলো নিঃশব্দে হেসে উঠল হা হা করে। শিবেন দু' হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

—আজকের দিনে এমন করে আলো নিভিয়ে বসে থাকতে হয়? গাধা কোথাকার!—আর একজনের গলায় ধিক্কার শোনা গেল: চট্ করে ভালো জামা কাপড় যা আছে পরে নে। এক্ষুনি তোকে যেতে হবে অমিতাকে বিয়ে করতে।

—অমিতাকে বিয়ে করতে! আমাকে!—যেন অনেক দূর থেকে কথা কইল শিবেন।

—হ্যাঁ, তোকেই বইকি। রাত দশটায় শেষ লগ্ন। এক্ষুণি বেরোতে হবে।—আর একজন তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে: এখন আটটা—যেতে প্রায় ঘণ্টা-খানেক লাগবে। আমরা বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছি।—সজোরে শিবেনের পিঠে একটা থাবড়া মারল সে, হেসে বললে, জীবনটা শুধু নাটক নয় রে মূর্খ, কখনো কখনো মেলোড্রামাও হয়ে ওঠে।

তক্তপোশ থেকে প্রায় জোর করে টেনেই তুলল শিবেনকে। নীচে থেকে বার দুই ট্যাক্সির অধৈর্য হর্ন শোনা গেল—যে বসে আছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। এখান

থেকে একেবারে যাদবপুরে যেতে হবে—অনেকখানি রাস্তা।

ঠনঠনিয়া থেকে যাদবপুর। অনেকখানি রাস্তা বইকি। অনেকটা সময় লাগবে। ট্যাক্সি চলতে থাকুক। সেই ফাঁকে, ওরা বিয়ে বাড়ি না পৌছানো পর্যন্ত, দিন কয়েক পেছনে ফেরা যাক। শোনা যাক একটা পুরনো গল্প।

অমিতার বাবা শৈলেশ রায়—যিনি পোর্ট কমিশনারে একটা ভালো গোছের চাকরি করেন এবং হালে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কাঠা তিনেক জমি কিনে কর্পোরেশনে বাড়ির প্ল্যান পাঠিয়েছেন—তিনি শিবেনের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। শিবেন যখন চাকরিটা পাব-পাব করছে অথচ আজ-কাল করে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় মাস তিনেকের জন্যে শিবেনকে থাকতে হয়েছিল অমিতাদের বাড়িতে।

বাংলা দেশে যে ধরনের ছেলেকে 'বেশ ব্রাইট' বলা যায়—শিবেন সেই দলের। শ্যামবর্ণের লম্বা চেহারা, অথচ হাঁটবার সময় কুঁজো হয়ে পড়ে না পিঠটা ; স্যুট পরলে ঝকঝকে দেখায়, শার্টের কলার তুলে দিয়ে ধুতির সঙ্গে কাবুলি চটি পরলে মনে হয় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ধারালো ছাত্র। বিদেশী সাহিত্য আর বিদেশী ফিল্মের কিছু খবর রাখে, কিছু গানের গলা আছে, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা সম্পূর্ণ কবিতা ভদ্র উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারে, সভার শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাতে পারে বেশ স্পষ্ট নির্ভীক ভঙ্গিতে।

আর অমিতা তখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। শিবেন তাকে কয়েকটা ইংরেজী কবিতা বুঝিয়ে দিলে, গোটাকয়েক গানের সুর ঠিক করে দিলে এবং অমিতার চোখের সামনেই একটা বখাটে ছেলেকে থাবড়া বসিয়ে দিলে ঘা কতক। কিশোরী অমিতার প্রথম মেলা দৃষ্টির সামনে পুরুষোত্তম হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে শিবেন।

তারপর চাকরি নিয়ে যেদিন সে মেসে চলে এল সেদিন সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল অমিতা। অসুখের ভান করে কলেজে কামাই দিয়েছিল একদিন। আর শিবেনকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, সপ্তাহে অন্তত একদিন করেও এ বাড়িতে সে আসবে।

প্রায় এক বছর ধরে সে প্রতিজ্ঞা নিয়মিত পালন করে এসেছে শিবেন। আই. এস-সি. পরীক্ষার পরে অমিতা যখন এলাহাবাদে মামার বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছে আর শিবেন চিন্তা করছে একটা রবিবারের সঙ্গে দু'দিন ছুটি যোগ করে নেওয়া সম্ভব কিনা—ঠিক সেই সময় বোমা ফাটালেন শৈলেশ।

সে বোমা দেরাদুনের দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের মতো ছেলে নাকি আর হয় না। এম এস-সি. পাস করে ফরেস্ট রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে সে—কিছুদিনের ভেতরেই বাইরে যাওয়ার স্কলারশিপ পাবে একটা। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা—টেনিস খেলায় নাম ছিল কলেজে পড়বার সময়। মা নেই—বাবা রিটায়ার করে মুসৌরিতে থাকেন। নির্ঝঞ্ঝাট সুন্দর সংসার।

বলতে বলতে আবেগে প্রায় গলা ধরে এল শৈলেশের : এ তো পাত্র নয়—যেন আকাশের চাঁদ। অমিতার কপালে এমন ভালো ছেলে জুটবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

শুনে অমিতার মা ফোঁস করে উঠেছিলেন : অতই বা বলছ কেন ? আমার মেয়েই কি ফেলবার নাকি ? দেখতে সুন্দরী—লেখাপড়া শিখছে—

শৈলেশ বাধা দিয়েছিলেন : আহা-হা, ওটুকু লেখাপড়া আজকাল সব মেয়েই শেখে। মেয়ে আমার সুন্দরী—তা বলতে পারো বটে। কিন্তু অমন ভালো ছেলে, তার জন্যে কি আর রূপসী মেয়ের অভাব হত ?

তর্কের জন্যেই তর্ক তুললেও কথাটা মেনে নিতে হয়েছিল মমতাকে।

—তা কী করে এল এই সম্বন্ধ ?

—দীপঙ্করের কাকা মথুরেশবাবু আমাদের অফিসেই চাকরি করেন যে—গলাটা নামিয়ে এনেছিলেন শৈলেশবাবু। যেন কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন, এমনিভাবে চুপি চুপি বলেছিলেন : দীপু—মানে দীপঙ্করের বাবা তাঁরই হাতে সব ভার দিয়েছেন। আর মথুরেশের ভারী পছন্দ হয়েছে অমিতাকে।

—মেয়েকে তিনি দেখলেন কী করে ?

—গত রবিবারে যখন অমিতাকে 'জু'তে নিয়ে যাই—তখনই মথুরেশের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় সেদিনই একটু আভাস দিয়েছিলেন, আমি ভালো বুঝতে পারিনি। আজ খুলেই বললেন।

—ছেলে নিজে একবার দেখতে আসবে না ?

—না না, সে-ধরনেরই নয় সে। বাবা কাকা যা বলবেন, মাথা নিচু করে তাই শুনবে।

—এ সবই ভালো কথা—মমতার মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছিল এবার : কিন্তু দেনাপাওনা ? সেইটেই তো আসল। হাতী কেনবার তো শক্তি নেই আমাদের।

শৈলেশের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, চোখ দুটো জলজল করে উঠেছিল আনন্দে : না, সেখানেও কোনো চাপ নেই ওদের। দীপুর বাবা ওসব জিনিসের ঘোর বিরোধী—সাহেবী ধাঁচের মানুষ কিনা। আমরা যা খুশি দেব—ওঁদের দাবি-দাওয়া নেই কিছু।

এ সৌভাগ্য লটারিতে রাতারাতি লাখ টাকা পাওয়ার মতো। অথবা তার চাইতেও বেশী। যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং দেবদূত নেমে এসেছে অমিতাকে তুলে নিতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম নিয়ে বসে গিয়েছিলেন হিসেব করতে।

শৈলেশ বলেছিলেন, দেরি করা ওঁদের ইচ্ছে নয়। সম্ভব হলে বৈশাখেই। হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যেই বিলেতে রওনা হবে দীপু। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

—অমিকে বিলেতে নিয়ে যাবে?—ভাটপাড়ার পণ্ডিত বংশের মেয়ে মমতার চোখে পলক পড়েনি অনেকক্ষণ: বলো কি!

কিন্তু এত বড় সুখবরে খুশী হয়নি অমিতা। ছুটে পালিয়ে এসেছে ছাদে। নিজের মনে কেঁদেছে আধঘণ্টা ধরে। ছাদের কার্নিশের কাছে গিয়ে ভেবেছে আত্মহত্যার কথা, তারপর পাশের বাড়ির গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের ওপর একটা কালো বেড়ালের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে পালিয়ে এসেছে নীচে।

প্রতিবাদ অবশ্য জানালো সে পরের দিন। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে।

—আমি এখন বিয়ে করব না মা।

প্রথমটায় আমল দিলেন না মা। সেলাইয়ের কলে নিবিষ্ট মনে সুতো পরাতে পরাতে বললেন, কী করবি তবে?

—আরো পড়ব। বি এস-সি, এম. এস-সি।

—কী হবে তাতে?—মমতা চোখ তুললেন এবার। কড়া পাওয়ারের চশমার নীচে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল চোখের পাতা দুটো।

—কী হবে?—অগাধ বিস্ময়ে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অমিতা। গঙ্গার স্তব আর মহিম্ন স্তোত্র যার কণ্ঠস্থ, এ-যুগে এরকম প্রশ্ন করা সেই মা'র পক্ষেই সম্ভব!

—লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াব!

এলোমেলোভাবে অমিতা জবাব দিতে চেষ্টা করল একটা।

—নিজের পায়ে দাঁড়াবার কষ্ট আর তোমায় করতে হবে না। আমরা বিয়ে দেব তোমার।

—মা!

মমতা রূঢ় গলায় বললেন, আজকাল ওই এক বুলি ফুটেছে তোমাদের। যে-সব মেয়ের ঘর-বর জোটে না তারাই আই.-এ., বি.-এ. পাস করে, আর ও-সমস্ত কথা আওড়ায়। পাকামি কোরো না—তোমার যাতে ভালো হয় তাই আমরা করব।

এর ওপরে তর্ক চলে না। ব্যর্থ ক্রোধে দুম্ দুম করে চলে এল নিজের ঘরে। তারপর চিঠি লিখল শিবেনকে।

: শীগগির এসো তুমি। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ভীষণ ব্যাপার।

মাত্র তিনটি লাইন। এবং ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগল না শিবেনের। সমস্ত পৃথিবীর রং বিবর্ণ হয়ে গেল—কোথা থেকে যেন একটা হ্যাঁচকা টান লাগল হৃৎপিণ্ডে।

শিবেন আসতে একটা কবিতা বোঝাবার অছিলায় অমিতা তাকে ডেকে নিয়ে গেল পড়ার ঘরে। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলে বললে, আমায় বাঁচাও।

খবরটা অবশ্য বাড়িতে পা দিতেই পেয়েছিল শিবেন। শৈলেশ জিনিসটাকে আপাতত যথাসম্ভব চেপে রাখতেই বলেছিলেন, কিন্তু আত্মীয় শিবেনের কাছে মনের আনন্দ মমতা লুকিয়ে রাখতে পারেননি। হয়তো ইচ্ছে করেই ঘরের সে-দিকটাতেই চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল শিবেন—যেদিকে আলোটা কম, যেখানে তার বিবর্ণ কালো মুখটা ভাল করে দেখা যায় না, যেখানে তার চোখের বোবা যন্ত্রণা অনেকখানি আবছা হয়ে থাকে।

তখনি হয়তো তার ছুটে পালানো উচিত ছিল শৈলেশের বাড়ি থেকে। কিন্তু যন্ত্রণা পাওয়ারও যে একটা বিষাক্ত নেশা আছে, সেই নেশার টানেই নির্জীব পায়ে সে অমিতার পড়ার ঘরে উঠে এসেছিল।

অমিতার কান্না কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেখবার পর শিবেন বললে, কী করব?

—আমি কী জানি? তুমি উপায় করো।

—উপায়?—একটা পেন্‌সিল-কাটা ছুরির হলদে বাঁটটাকে একমনে লক্ষ্য করতে লাগলো শিবেন।

—তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। হতেই পারে না।

—কী করা যায়?—ছুরির বাঁটটার দিকে চোখ রেখেই শিবেন আওড়ালো। গলার আওয়াজে এমন একটা ক্লীবকাতরতা ফুটে বার হলো যে এত দুঃখের ভেতরেও একটা চাপা বিরক্তি বোধ হল অমিতার।

—বাবাকে বলো।—অমিতা আঁচলে চোখ মুছে ফেলল।

—রাজী হবেন কেন?—প্রাণপণে একটা মর্মান্তিক হাসি হাসল শিবেন। নিজের গায়ে একটার পর একটা ছুরির আঁচড় টেনে যাওয়ার মতো বলে চলল, দীপঙ্করের পাশে আমি কে? তার বিদ্যে বেশী, চাকরি বড়, অবস্থা ভালো, দুদিন পরে বিলেত থেকে ফিরে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে বসবে সে। আর আমার—

অমিতা তীব্র হয়ে উঠল: থামো—থামো। যার খুশি সে কেষ্ট-বিষ্টু হোক, আমার কী? আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। বাবা যদি মত না দেন, চলো আমরা পালিয়ে যাই—

পালিয়ে যাওয়া ! সারা শরীরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগল শিবেনের—মাথার ভেতরে ছলকে পড়ল এক ঝলক রক্ত। অতখানি ? আইন অনুসারে এখনো পুরো সাবালিকা হয়েছে কিনা অমিতা, তাই বা কে জানে! সামনে পুলিস কেসের সম্ভাবনা। তা ছাড়া চাকরিতে মাত্র মাস আষ্টেক হয়েছে, এখনো 'প্রোবেশন' চলছে। চাকরিটা পাওয়ার ব্যাপারে শৈলেশের হাত যতখানি কাজ করেছিলো, যাওয়ার ব্যাপারে তার চাইতে বেশীই কাজ করবে হয়তো। আর এ-বাজারে একটা চাকরি গেলে—

ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল শিবেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও চুলের গোড়াগুলো ভিজে উঠতে লাগল তার।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে মা'র ডাক শোনা গেল : অমি, এক কাপ চা করে দিলি না শিবেনকে ?

—যাচ্ছি—চোখের ওপর আর একবার আঁচলটা বুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অমিতা, আর এতক্ষণে যেন চাপা একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল শিবেনের। সময় চাই তার। কোনো একটা নিভৃতিতে—কোনো একটা নিঃসঙ্গ অন্ধকারের ভেতরে। যেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই, এমনকি অমিতাও না। সেই একান্ত অবকাশে নিজের সত্তাটাকে সে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখবে : দেখবে তার প্রতিটি স্নায়ু-পেশী-মর্মগ্রন্থিকে।

সময় চাই তার।

কিন্তু অদৃশ্য মেঘনাদ দীপঙ্কর এর মধ্যে বাণে বাণে ছেয়ে ফেলছে আকাশ। ছিমছাম পোশাকের সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় মথুরেশবাবু একদিন এসে গানও শুনে গেলেন অমিতার।

আপত্তি করেছিল বইকি অমিতা। কেলেঙ্কারি না ঘটিয়ে যতখানি করা সম্ভব। কিন্তু স্নেহশীল ভালোমানুষ বাবার মুখের দিকে তাকালে কেমন মায়া হয় যেন। তা ছাড়া কড়া পাওয়ারের শিখার নীচে মায়ের কঠিন চোখ। হিংস্র অবাধ্য মনটা কুঁকড়ে যায় তার সামনে।

ওদিকে সময় নিচ্ছে শিবেন। বন্ধ করেছে সিনেমায় যাওয়া। নতুন যে বইটা পড়বার জন্যে এনেছিল, ফ্ল্যাপের পরে তা আর বেশী দূর এগোয়নি। নিজেকে ভোলবার জন্যেই জোর করে দু'দিন বসেছিল ক্ল্যাশ বোর্ডে—লাভের মধ্যে গুনতে হয়েছে মোটা রকমের হারের কড়ি।

আবার চিঠি এল অমিতার।

: 'তুমি করছ কী ? শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি ওই দীপঙ্করের সঙ্গে আমার বিয়ে

হয়ে যাবে ?'

কিন্তু ও-বাড়িতে আর যাওয়া সম্ভব নয় শিবেনের পক্ষে। একটা জ্বলন্ত জতুগৃহের মতো ওই বাড়ি। ওর প্রত্যেকটা দেওয়াল থেকে অসহ্য উত্তাপ ঠিকরে আসে—জানলা-দরজার প্রত্যেকখানা কাচ জ্বলতে থাকে আগুনের শিখার মতো। মানুষ-গুলোকে মনে হয় আগুনের পুতুল, এমন কি অমিতাকেও। তবু দূরে থেকেও দহন থামে না। এক-একবার অসহ্য হয়ে শিবেন ভাবে—পালিয়েই যাবে অমিতাকে নিয়ে। কিন্তু একটার পর একটা 'কিন্তু'র শেকল পাক দিয়ে বাঁধতে থাকে তাকে।

দুপুরবেলা অসময়ে অফিস থেকে ফিরলেন শৈলেশ। অত্যন্ত উত্তেজিত।

—কী হল ?—ভয় পেয়ে জানতে চাইলেন মমতা।

—একটা সাংঘাতিক কথা আছে। ঘরে এসো।

ধড়াস করে দরজা বন্ধ করলেন শৈলেশ, বুকপকেট থেকে বের করলেন চিঠি একখানা। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ো।

মমতা পড়লেন। এলোমেলো কাঁচা অক্ষরের চিঠি। কেউ বাঁ হাত দিয়ে লিখলে যেমন হয়। তবে বক্তব্যটা বুঝতে অসুবিধে হল না বিশেষ।

অমিতার বিয়েতে আপত্তি নেই। তবে শিবেন ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। কারণ শিবেনকে সে ভালোবাসে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোথাও বিয়ে দিলে আত্মহত্যা করবে সে।

শৈলেশ সভয়ে বললেন, এখন ?

—এখন আবার কী ?—মমতা ভয়ঙ্কর চোখে একবার তাকালেন স্বামীর দিকে, তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগলেন চিঠিখানা : আমি আন্দাজ করেছিলাম আগেই।

আর্ত হয়ে উঠলেন শৈলেশ : তা হলে কি শিবেনের সঙ্গেই—

—ক্ষেপেছ তুমি ! আকাশের চাঁদ ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দেবে এই বাক্যিসর্বস্ব ছেলেটার সঙ্গে ?—মমতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল : ওই শিবেনকে বাড়ির ত্রি-সীমানায় আর আসতে দেব না আমি।

—কিন্তু অমি যে ওকে ভালোবাসে !—অসহায়ভাবে শৈলেশ বললেন, জোর করে বিয়ে দিতে গিয়ে শেষকালে যদি কিছু একটা—

জানলা দিয়ে চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে মমতা বললেন, কিছু হবে না। তোমার আদরেই এতখানি এঁচোড়ে পেকেছে মেয়েটা। সতেরো বছর বয়েস—এখনো কাঁচা মাটির মতো মন। বিয়ে দিয়ে দাও। অমন হীরের টুকরো ছেলে—এক মাস যেতে না যেতে শিবেনের চিহ্নও কোথাও থাকবে না।

মিতাকে ডেকে একবার—

—কিছু দরকার নেই।—মমতা উঠে পড়লেন। তুমি মথুরেশবাবুকে বলো পাকা দেখার ব্যবস্থা করুন ওঁরা।

শৈলেশ শেষবার একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন: যদি আত্মহত্যা—

—করতে হলে তুমিই করবে—মমতার স্বরে ইস্পাতের ঝলক: অমন আহ্লাদে শৌখিন মেয়ের অতখানি মনের জোর থাকে না।

কথাটা সম্পূর্ণ মানলেন না শৈলেশ, কিন্তু হার মানলেন। আর সত্যিই তো—সতেরো বছরের মন। একতাল কাঁচা মাটির মন। নতুন হাতের ছোঁয়া লাগলেই আবার নতুন হয়ে উঠবে সে। তা ছাড়া শিবেন! দীপঙ্কর যদি না আসত, তা হলে একবার ভাবা যেত প্রস্তাবটা। কিন্তু এখন! এখন আর সে প্রশ্নই ওঠে না।

এরই দিন দশেক পরে শিবেনের সঙ্গে অমিতার দেখা হল পার্কে। বাড়িতে দেখা-শুনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। অমিতার চোখে এবার আর জল নেই—জ্বলন্ত ক্রোধ।

—কী করছ তুমি?

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে তিনটে কাঠি নষ্ট হল শিবেনের।

—ভাবছি।

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেলে তারপরে কি তোমার ভাবনার শেষ হবে?

শিবেন অমিতার দিকে তাকাতে পারল না, তাকালো হাতের সিগারেটটার দিকে। এত কষ্ট করে ধরাবার পরেও আবার নিবে গেছে সেটা।

—হবেই একটা কিছু।

—ছাই হবে।—অমিতার চোখ ঝকঝক করতে লাগল: কাল আমাকে আশীর্বাদ করতে আসবে—জানো?

শিবেন একটা ঢোঁক গিলল। কেমন আঠা আঠা লাগছে গলার ভেতরে।

অমিতা ঝুপ করে বসে পড়ল পাশের মরা ঘাসগুলোর ওপরে। একটা শুকনো শালপাতা কুড়িয়ে নিয়ে টুকরো করতে লাগল দু হাতে।

—দীপঙ্কর! অমন ছেলে আর হয় না!—প্যারডির ভঙ্গিতে বলে চলল: এম. এস-সি. পাস—বড় চাকরি করেন! অমন অনেক আছে। চেহারা সুন্দর? দুনিয়ায় মাকালের অভাব নেই। ভালো টেনিস খেলোয়াড়? আমি তো টেনিস র‍্যাকেট নই। আজ আবার শুনলাম নাকি বেহালা বাজায়। বেহালা তো যাত্রার দলের লোকেও বাজাতে পারে! কী বলো তুমি?

কী বলবে শিবেন? দীপঙ্কর কাছে নেই—বহু দূরের দেরাদুন থেকে একটার পর

একটা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ছে। যদি সে কলকাতায় থাকত, থাকত দৃষ্টির সামনে—তাহলে তার অন্তত একটা বৃত্তরেখা দেখতে পেত শিবেন, একটা রন্ধ্র খুঁজে বের করতে চেষ্টা করত তার ভেতরে। কিন্তু মাঝখানে এই বিরাট ব্যবধানটাকে ছড়িয়ে দিয়ে যেন অলৌকিক আর অসীম হয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এখন সে একটা ভাবমূর্তি! হাজার সুপুরুষ হলেও তার সামনের গোটা দুই দাঁত অতিরিক্ত উঁচু কিনা সে-কথা বলবার উপায় নেই, তার বেহালা কখনো কখনো বেসুরে বাজে কিনা তা-ই বা কে বলবে, এম. এস-সি তে সে থার্ড ক্লাস পেয়েছিল কিনা—কোন্ ক্যালেণ্ডার মন্থন করেই বা আবিষ্কার করা যাবে সে-কথা! দীপঙ্কর অবাস্তব—দীপঙ্কর অতিলৌকিক। বাস্তব দীপঙ্করের সঙ্গে তবু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু এই মেঘনাদের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে কী করে?

জোর করে শিবেন হাসতে চেষ্টা করল: আমার চাইতে অনেক যোগ্য লোককেই তো পাচ্ছ তুমি। মেনে নাও ওকে।

—মেনে নেব ওকে?—ছিটকে উঠে পড়ল অমিতা: একথা তুমিও বললে? বেশ, তুমি কিছু করতে না পারো—আমিই করব।

পার্ক থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না অমিতা ট্রামে উঠল, ততক্ষণ হতাশ দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে রইল শিবেন। তারপর ট্রামটা অদৃশ্য হয়ে গেলে মুখপোড়া সিগারেটটা আবার ধরাতে গিয়ে দেখল একটাও কাঠি নেই দেশলাইয়ে।

কিন্তু কী করবার শক্তি আছে অমিতার? চাপা আক্রোশে এক-একদিন ভালো করে না খেয়েই উঠে যাওয়া, রাতের পর রাত বিনিদ্র বিছানায় ছটফট করা, শিবেনকে একটার পর একটা চিঠি লেখা, আর তারপরেই শিবেনের কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়ে চিঠিগুলোকে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

শৈলেশ লক্ষ্য করলেন না, কিন্তু মমতা? তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না নিশ্চয়ই। তবু আশ্চর্য নিরাসক্তি মমতার। তাঁর কড়া পাওয়ারের চশমার নীচে চোখের দৃষ্টি একবারও কোমল হয়ে ওঠে না, একবারও প্রশ্ন করেন না তিনি: ভালো করে খেলি নে কেন অমি? শরীর কি ভালো নেই?—দুই আর দুইয়ের চিরন্তন যোগফলের মতোই ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মেয়ে ধ্রুব জানেন, সতেরো বছরের মেয়ের মনের কাছে শিবেন একটা ভেঙে-যাওয়া রঙিন খেলনা। তার জন্যে শোকের পরমায়ু দুদিনের বেশী নয়।

আবার দেখা হল পার্কে।

—এখনো কিছু করছ না?

শিবেনের আজকাল কেমন ভয় করে অমিতাকে। কেমন মনে হয়, অমিতা কোথাও তাকে স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না—বারে বারে আলোড়ন তুলে কেমন ঘোলাটে করে দিচ্ছে সব। অন্তত একটা দূরত্ব দিক কয়েক দিনের জন্যে : কিছু অবকাশ : যেখানে শিবেন প্রস্তুত করে নিতে পারে নিজেকে।

তবু অমিতার টানে না এসে উপায় নেই। যেন বুকের শিরাগুলোকে ধরে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করে সে।

—ভাবছি!—পড়া-না-পারা ছাত্রের গলায় জবাব দিলে শিবেন।

—আশীর্বাদ করে গেছে। করুক!—উদ্ধত বিদ্রোহে অমিতা বলে চলল : বিয়ে আমি কিছুতেই করব না। বিয়ের আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। তুমি আমাকে না নিয়ে যাও—চলে যাব যেদিকে খুশি।

—কিন্তু অমিতা—কিছু বলবার নেই, তবু অমিতার মুখের কথাগুলিকে এগিয়ে দেবার জন্যেই ওটুকু জুড়ে দিলে শিবেন।

—কিন্তু কিসের আবার? তুমি ভয় পেতে পারো, আমার কোনো ভয় নেই। দীপঙ্কর!—সুন্দর মুখখানাকে ব্যঙ্গে বিকৃত করলে অমিতা : দীপঙ্করের মতো ছেলে পৃথিবীতে একটাই জন্মায় যেন। আবার ঘটা করে ফোটো পাঠিয়েছে কাল।

শিবেন মাথা তুলল। তাকিয়ে রইল মাছের চোখের মতো নির্বোধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

কেমন একটু আশ্চর্য মনে হল, অমিতা এবারে আর লক্ষ্য করছে না শিবেনকে। সামনের দিকে মেলে দিয়েছে চোখ—যেখানে ট্যাঙ্কের জলটায় বেলাশেষের রঙ দুলছে একরাশ মরসুমী ফুলের পাপড়ির মতো। অমিতার চোখের তারায় ওই জলটা কাঁপছে, ওই আলোটা ছল্‌ছল্‌ করছে—ওই দূরের ম্লান-পাংশু আকাশটা মেদুর হয়ে রয়েছে। সে শিবেনের সঙ্গে কথা কইছে না—যেন ঝগড়া করছে বহু দূরের দীপঙ্করের সঙ্গে।

—ফোটো পাঠিয়েছে আবার। ভাবটা যেন দেখো কী চমৎকার চেহারা আমার! নেহাত লজ্জা করল তাই, নইলে ওই ছবিটা মা'র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমি ওর মাথায় গাধার টুপি এঁকে দিতাম।

অদ্ভুত অস্বস্তিভরে শিবেন উঠে দাঁড়াল হঠাৎ : আমার একটু কাজ আছে অমি —আজ আমি যাই।

গভীর নিমগ্ন চোখের ওপরে সেই জল আর রোদের দোলা নিয়ে অমিতা বললে, যাও। কিন্তু আমি তোমায় বলে রাখছি, তুমি যদি একটা ব্যবস্থা না করো, তা হলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে বিয়ের রাতে।

এই সেই বিয়ের রাত।

নিমন্ত্রণের চিঠিটা যথাসময়েই পেয়েছিল শিবেন। আর তার অক্ষম পরাভূত মনকে আরো বেশি অপমান করার জন্যেই যেন চিঠির পিঠে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন মমতা : তোমার আসা চাইই।

ঘরটাকে অন্ধকার করে পড়ে ছিলো শিবেন। ভাবতে চেষ্টা করছিল পৃথিবীর কোথায় আছে সেই তিমিরান্ধ নিভৃতি—যেখানে তার পলাতক চেতনাকে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে সে—যেখানে নিজের চোখ দুটোকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে পারে আকাশের সমুদ্রে।

আর সেই সময় খবর এলো অমিতাকে বিয়ে করতে হবে তাকেই। নিতে পাঠিয়েছেন শৈলেশ নিজেই।

ট্যাক্সি হু হু করে ছুটেছে যাদবপুরের দিকে। একটা উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্ন দেখছে শিবেন। মাটি দিয়ে নয়, ট্যাক্সি চেপেও নয়, জ্বলন্ত কোনো হাউইয়ের মতো মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে সে। জীবন নয়—ফ্যাণ্টাসি!

অনেকটা জলের তলা থেকে মানুষ যেমন করে ওপরে ভেসে ওঠে, তেমনিভাবেই বাস্তবের সীমান্তে উদ্ভাসিত হল শিবেন। গাড়ি ততক্ষণে প্রায় গড়িয়াহাটা মার্কেটের কাছাকাছি।

দীপঙ্কর? দীপঙ্করের কী হল?

—মারা গেছে।

—মারা গেছে!—শিবেন চিৎকার করে উঠল। খবরটা বুকে এসে লেগেছে বন্দুকের গুলির মতো।

সেই বন্ধু—যে শিবেন আর অমিতার ব্যাপারটা জানত—শৈলেশবাবুর পরিবারের সঙ্গেও যার একটা আত্মীয়তার সূত্র রয়েছে এবং যে পরমোৎসাহে শিবেনকে নিতে এসেছিল, অদ্ভুত নির্দয় আর জান্তব ভঙ্গিতে হেসে উঠল সে।

—জীবনটা শুধু নাটক নয়, কখনো কখনো মেলোড্রামাও বটে। ঠিক বিয়ে করতে বেরুবার আগেই কলঘরের আলোটা জ্বালাতে গিয়েছিল দীপঙ্কর। খানিকটা অবাধ্য কারেণ্ট চিরদিনের মতোই আটকে রেখেছে দীপঙ্করকে।

একবার শিবেনের মনে হল—কেন কে জানে মনে হল—বন্ধুর মুখটা সে চেপে ধরে দু হাতে।

ট্যাক্সি চলতে লাগল। যেন প্রাণপণে পালিয়ে চলল একটা নিশি-পাওয়া রাত্রির কাছ থেকে। দু পাশের আলোগুলো শিবেনের চোখে যেন মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়ে

দিতে লাগল, একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল শিবেন।

তারপরে আরো অনেক আলো। অনেক উৎসব, অনেক কোলাহল। তীক্ষ্ণ কান্নার মতো কয়েকটা শাঁখের আওয়াজ।

—এসো বাবা, তুমিই আমাদের বাঁচাও!—কেমন একটা চাপা কণ্ঠস্বর শৈলেশের: বিয়ের রাত্রেই এমন অমঙ্গল—তুমি উদ্ধার না করলে মেয়েটার আর গতি নেই।

অন্ধের মতো চলল শিবেন। সব দেখল, কিন্তু কিছুই দেখল না। শুধু একবার চোখ মেলল শুভদৃষ্টির সময়। এইবারে দেখবে তার অমিতাকে।

—মালা-বদল করো—পাশ থেকে কাকে বলতে শোনা গেল।

কিন্তু মালা-বদল করবে কার সঙ্গে শিবেন? তার অমিতা? সে তো কোথাও নেই! এ যে দীপঙ্করের বিধবা। এর সমস্ত মুখে শ্মশানের শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে! দিনের পর দিন দীপঙ্করকে অস্বীকার করতে গিয়ে তিলে তিলে দীপঙ্করকেই মেনে নিয়েছে সে—তিলে তিলে মুছে গেছে শিবেন!

এ কোন্ চির-বৈধ্যবের গলায় মালা দেবে সে? কোন্ অভিশপ্ত শ্মশানে বসন্তের স্বপ্ন তার? মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরো বড় হয়ে গেছে দীপঙ্কর—আরো বিরাট, আরো জ্যোতির্ময়!

অমিতার নিষ্প্রাণ বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের মালা মাটিতে পড়ে গেল শিবেনের। অবরুদ্ধ গলায় ভেতর থেকে বোবা কান্নার মতো বেরিয়ে এল: না—না, আমি পারব না!

তাস

ভাই বোন দুজনেরই তাস খেলার দারুণ উৎসাহ। অমূল্য প্রায় নামকরা খেলোয়াড়—একবার ব্রীজ টুর্নামেণ্টে সেমিফাইন্যাল পর্যন্ত উঠেছিল। দাদার মতো না হলেও নমিতাও কম যায় না—সে-ও বাহান্নখানা তাসের হিসেব গড়গড়িয়ে করে ফেলতে পারে।

মুশকিলে পড়েছে বাকি দুজন—অমূল্যর স্ত্রী রেখা আর নমিতার স্বামী অসিত।

রেখার বাবা বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনদিন তাসকে ঘেঁষতে দেননি, ওই কর্ম-নাশা খেলাটাকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না তিনি। তাই রেখারও তাস দেখলে গায়ে জ্বর আসে। অমূল্য অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি—রেখাকে চলনসই রকমের খেলাও অন্তত শেখবার জন্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে, কি ভাবে কল 'ওপন'

করতে হয় আর 'লীড' দেবার নিয়মই বা কী—চার ভাগে তাস সাজিয়ে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, এমন কি কাল্‌বার্টসনের বই পর্যন্ত পড়িয়েছে। কিন্তু রেখার বিশেষ উন্নতি হয়নি, এখনও সে হরতন আর ইস্কাবনের মধ্যে গোলমাল করে ফেলে।

অমূল্য মধ্যে মধ্যে চটে ওঠে : এত করে যে বলি, কিছুই শুনতে পাও না না কি ? না, এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় ?

রেখা করুণ হয়ে বলে, কী করব, কিছুতেই মনে থাকে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

—গোলমাল হয়ে যায় ?—আরও চটে অমূল্য : এতটুকু ম্যাথামেটিক্যাল ব্রেনও যদি না থাকে, তা হলে বি এস-সি পাস করলে কী করে ?

তাস খেলা বুঝতে পারে না তবু বি এস-সি পাস করেছে, নিজের কাছে অপরাধের মতোই মনে হয় রেখার ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। একবার অনেক ভেবে-চিন্তে যদিই বা খানিকটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলল, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই হয়তো এমন একটা কাণ্ড করে বসে যে, রেগে-মেগে শুধু নাচতে বাকি রাখে অমূল্য।

অসিতের অবস্থা আরও করুণ। ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া স্বামী আই এ. ফেল স্ত্রীর কাছে বার বার ধিক্কার শোনে : আচ্ছা, তুমি কী ! দেখছ না ট্রাম্প্‌সের খেলা—

মাথা চুলকে অসিত বলে, এর পরে আর ভুল হবে না—ঠিক বলছি।

পৌরুষে ঘা লাগে, মধ্যে মধ্যে অন্তত 'সিরিয়াস' ভাবে অসিত খেলাটাকে অনু-ধাবন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পোস্ট-গ্রাজুয়েটে পড়বার সময় সেই প্রথম সিগারেট খাওয়ার যুগে তাস খেলা শিখতে গিয়ে যা ঘটত, আজও তারই পুনরাবৃত্তি চলে। খেলতে খেলতে কখন চোখ বাইরে চলে যায়, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার দিনে যেমন জানলা দিয়ে তাকিয়ে শিরীষপাতায় রোদের ঝিলিমিলি দেখত—এখনও তেমনি তাকিয়ে দেখে নীল পাহাড়টার মাথায় পালে পালে শাদা মেঘ এসে কেমন করে জড়ো হচ্ছে।

চমক ভাঙে নমিতার চিৎকারে।

—এ কী করলে, কল ছেড়ে দিলে ? আমাদের যে পাঁচটার খেলা হয়ে যেত !

অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আরও পুরো এক মাস এই যম-যন্ত্রণা সইতে হবে তাকে। গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙের এই চা-বাগানে বেড়াতে আসবার সময় অনেক কাব্য আর কল্পনা ছিল মনে। কিন্তু স্পেড যে এমন করে কোদাল হয়ে তার মাথায় পড়বে আর হার্ট এমন হৃদয়হীনভাবে তার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেবে, সে ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা কে ভেবেছিল তখন !

এক দিকে মংপুর সিন্‌কোনা প্ল্যাণ্টেশন, অন্য দিকে ঘন কুয়াশা আর নিবিড় জাপানী পাইনের অরণ্য দিয়ে ছাওয়া ছাউনি হিল্‌স। এরই মাঝামাঝি জায়গায় একটা ইউরোপীয়ান টী-এস্টেট। যেন দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা।

কিন্তু সমতল অর্থে সী-লেভেল নয়, চার হাজার ফিটের ওপরে অল্‌টিচ্যুড। দু-ধারের ঢাল বেয়ে চা-বাগানের গাঢ় সবুজ ঢেউ নেমেছে, —মাঝে মোষের পিঠের মতো জায়গাটাতে কারখানা, অফিস-কোয়ার্টার আর ছোট একটুখানি গঞ্জ। এই চা-বাগানেরই ডাক্তার অমূল্য।

গরমের ছুটি। কলেজ বন্ধ। কলকাতার অসহ্য একশো পাঁচ ডিগ্রীতে অসিত যখন ছটফট করছিল, তখন অমূল্যর চিঠি এল নমিতার কাছে।

—গরমে কেন কষ্ট পাচ্ছিস ওখানে? অসিতকে নিয়ে চলে আয়। ভয় নেই, দার্জিলিং এখান থেকে অনেক দূরে। অসিতের ভালোই লাগবে।

দার্জিলিং অসিতের পছন্দ নয়। একবার বেড়াতে এসে দিন তিনেক থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল শ্যামবাজার আর বাগবাজার—কালীঘাট আর বালিগঞ্জ ওভারকোট পরে দার্জিলিঙে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেই হাতীবাগানের কাকা, সেই ভবানীপুরের কুট্টিমামা, কলকাতার সেই অসহ্য বন্ধুবান্ধবের দল, সবাই যেন ভিড় করে এসে জড়ো হয়েছে দার্জিলিঙে। তা হলে খামোকা কনকনে ঠাণ্ডা আর শিরশিরে বৃষ্টির উৎপাত সয়ে লাভ কী? তার চাইতে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

অমূল্যর চিঠিটা লোভ জাগিয়ে দিলে। দার্জিলিঙের পাহাড় রয়েছে, তার সব কিছু সৌন্দর্য আছে, অথচ কলকাতার লোকের উৎপাত নেই—এমন জায়গায় মাস দেড়েক কাটিয়ে আসবার নিমন্ত্রণটা অসিত উপেক্ষা করতে পারল না। অতএব যথানিয়মে নমিতাকে নিয়ে সে অমূল্যর চা-বাগানে উপস্থিত হল।

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, খাসা জায়গা। 'স্বর্গ যদি কোথাও থাকে'—ইত্যাদি। শীত আছে বটে, কিন্তু দার্জিলিঙের মতো তীব্র নয়, সারা শরীরে যেন গোলাপী আমেজ বুলিয়ে দেয়। টী-প্ল্যাণ্টেশনকে অতিকায় মৌচাকের মতো দেখায়, যেন মাটির বুক থেকে শুষে-নেওয়া সবুজ মধুতে টলমল করছে। কুঁচি, শানাই ফুল আর গুচ্ছ গুচ্ছ হাইড্রেঞ্জিয়ায় আলো হয়ে রয়েছে চারদিক। একটু দূরেই পুরনো একটা শালবন, নিবিড়-নিবদ্ধ পাতায় পাতায় যেন আদ্যিকালের অন্ধকার, গাছের ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মতো শ্যাওলা ঝুলছে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কাক আর ময়নায়।

মেশানো এক রকম আশ্চর্য পাখি—দুটো-চারটে মৃদুকণ্ঠ ঝরণার সুরে সুর মেলায় শান্ত-করুণ সবুজ ঘুঘুর ডাক।

এই শালবনে ঘুরে শানাই ফুল আর হাইড্রেঞ্জিয়ার গুচ্ছ তুলে দিন কয়েক সত্যিই ভারি আরামে কেটেছিল অসিতের। কিন্তু এ সুখ বরাতে বেশিদিন সইল না। একদিন দুপুরের খাওয়ার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে টেপের খাটিয়ায় লম্বা হতে যাচ্ছে, এমন সময় ফটাফট শব্দে হাতে এক প্যাকেট তাস ভাঁজতে ভাঁজতে অমূল্য হাজির।

—আরে, এসব জায়গায় দুপুরে ঘুমুলে শরীর খারাপ করে, গা ভারি হয়ে যায়। তার চাইতে এসো এক বাজি তাস খেলা যাক।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন। কী করা যায়—উঠে বসতেই হল অসিতকে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে লাফাতে লাফাতে নমিতার প্রবেশ : হ্যাঁ দাদা, সেই ভালো।

অগত্যা অনিচ্ছুক রেখাকেও উল বোনা ফেলে এসে যোগ দিতে হল তাসের আসরে। সেই যে শুরু হয়েছে, আর কামাই নেই তারপর থেকে। এখানে তাসের সঙ্গী না পেয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে ক্ষুধিত হয়ে ছিল অমূল্য, এবার সুদে-আসলে উশুল করতে শুরু করল। কেবল ডিস্পেনস্যারির নিয়ম রক্ষা আর দুটো একটা কলে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া তাস আর তাস! রইল পড়ে সবুজ ঘুঘুর মিষ্টি ডাকে-ছাওয়া পুরনো শালবন—শানাই ফুলগুলো শীতে আর শিশিরে কুঁকড়ে কুঁকড়ে টুপটাপ করে ঝরে যেতে লাগল, আর অসিতের দু কান ভরে বাজতে লাগল : নো ট্রাম্প্‌স্‌—ফাইভ ক্লাব্‌স্‌—রি-ডাব্‌ল্‌!

কলকাতায় পালাতে পারলে বাঁচা যায় এখন। প্রস্তাবটা তুলতেই প্রায় তেড়ে এল নমিতা।

: এখনও তো এক মাস ছুটি রয়েছে। কী এমন রাজকার্যটা কলকাতায় পড়ে রয়েছে, শুনি? ওই গরমের ভেতরে গিয়ে হাঁড়ি-কাবাবের মতো সেদ্ধ হতে না পারলে বুঝি ভালো লাগছে না?

কিন্তু জেরবার হয়ে উঠেছে অসিত। শুধু মধ্যে মধ্যে আশ্বাস পাওয়া যায় রেখার পীড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে। তার দুঃখের ভাগীদার অন্তত আরও একজন আছে—আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

শাল দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অসিত। অমূল্য ডিস্পেন্সারিতে গেলে, এই ফাঁকে একবার প্রকৃতি পর্যটন করে আসবে কি না সেই কথাটাই ভাবছিল। এমন সময় এক পেয়ালা চা নিয়ে রেখা ঘরে ঢুকল।

—জানলা দিয়ে বুঝি প্রকৃতির শোভা দেখছেন অসিতবাবু?

—প্রকৃতির শোভা!—অসিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : পাহাড়টাকে এখন কইতনের

মতো দেখাচ্ছে, আর আকাশের মেঘগুলো যেন ঝাঁকে ঝাঁকে চিঁড়েতনের মতো উড়ে আসছে আমার দিকে।

রেখা খিলখিল করে হেসে উঠল। উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারার এই মেয়েটিকে হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়। রেখার হাসিটা আস্বাদন করে প্রসন্নতায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল অসিত।

—মনে হচ্ছে যেন রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে' বাস করছি। ওই গানটা জানেন—"ইস্কাবন চিঁড়েতন হরতন, অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন?"

আর একবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল রেখা। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, যা বলেছেন। আমার তো মধ্যে মধ্যে দস্তুরমতো কান্না পায়। কিন্তু ওদের ভাই-বোনের কী যে তাসের নেশা—কিছুতেই বুঝবে না।

—আর জোর করে খেলতে বসাবে, একটু ভুল হলেই যা-তা গালমন্দ করবে।

—সমর্থন পেয়ে আরও উৎসাহিত হল অসিত: খেলা, খেলা! এ তো আর ক্যাল-ক্যুলাসের অঙ্ক নয় যে, একটুখানি ভুল হলেই মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে? অথচ এমন চেঁচামেচি করে যে মনে হয় বুঝি লাখ টাকার জমিদারি নিলেমে উঠল।

—যা বলেছেন।—রেখা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল। তারপর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। অসিত চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, মধ্যে মধ্যে ভীষণ প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়, জানেন?

—প্রতিশোধ?—রেখা আশ্চর্য হল: কিসের প্রতিশোধ?

—এই অপমানের। ইচ্ছে করে এমন খেলা দেখিয়ে দিই যে, দুজনেই একেবারে জব্দ হয়ে যায়।

—কিন্তু পারবেন কী করে?—রেখা নিরাশ ভঙ্গিতে বললে, ওরা যে দুজনেই পাকা খেলুড়ে। আপনার আমার সাধ্য কি ওদের জব্দ করি?

—একটা চক্রান্ত করছি।—অসিত চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল: আপনি দলে আসবেন আমার?

রেখা আবার হেসে উঠল: কেন আসব না? ওদের জব্দ করার ব্যাপারে আপনার আমার ইণ্টারেস্ট্ সমান।

সন্তর্পণে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করলে, নমিতা কোথায়?

—স্নান করতে ঢুকেছে।

—তা হলে সেদিক দিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। একখানা পুরো সাবান

খরচ করে বেরুবে। আর অমূল্যদাও দশটার আগে আসছেন না। আসুন, এই বেলা আমাদের প্ল্যান ঠিক করে ফেলি।

—কী প্ল্যান?

অসিত গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, চুরি করব।

—চুরি! বলেন কী?—রেখা দু চোখ কপালে তুলল: প্রোফেসার মানুষ আপনি, ছাত্রদের মরাল গার্ডিয়ান। আপনি চুরি করবেন কি রকম?

—রেখে দিন মরাল গার্ডিয়ান!—উত্তেজিত ভাবে সশব্দে সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করলে অসিত: তাসে চুরি করায় দোষ নেই। মনুর আমলে ভারতবর্ষে তাস খেলার রেওয়াজ ছিল না, নইলে তিনিও আমায় সাপোর্ট করে যেতেন। বুঝছেন না, নইলে কিছুতেই ওদের কায়দা করা যাবে না।

—বুঝলাম।—রেখা স্মিত হাসিতে বললে, কিন্তু চুরিটা হবে কী ভাবে?

—কয়েকটা হিন্ট্ দিচ্ছি আপনাকে। ধরুন, আমি যদি বাঁ হাত দিয়ে কান চুলকোই, তা হলে বুঝলেন আমার হাতে ইস্কাবন নেই। ডান হাত দিয়ে গাল চুলকোলে হয়তো বুঝবেন, আমি আপনাকে স্পেডে লীড্ দিতে বলছি। কিংবা ধরুন, প্রথমে যে কল দিয়ে খেলা শুরু করলাম, আমার হাতে সেটা উইকেস্ট, অর্থাৎ ওদের কল নষ্ট করে দেবার মতলব—

কৌতুকে রেখার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: অত গড়গড় করে বললে তো হবে না, আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া আমি তো আপনার অ্যান্টি-পার্টি—

অসিত বাধা দিয়ে বললে, আজ থেকে আমরা পার্টনার।

সেদিন দুপুরে খেলতে বসেই অমূল্য স্তম্ভিত।

—সে কি?—অসিত আর রেখা পার্টনার! খেলবে কি হে! দুজনেই তো সমান।

অসিত মুখ টিপে হাসল: দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে। এতদিন ধরে তালিম দিচ্ছ, কিছুই কি আর উন্নতি হয়নি?

নমিতা খুশি হয়ে উঠল: বেশ তো দাদা, খেলুক না ওরা। কিন্তু স্টেকে খেলা হবে আজ। হাজারে দু আনা।

অসিত বললে, রাজী।

কিন্তু খানিক পরেই অস্বস্তিতে অমূল্য আর নমিতা ছটফট করে উঠল। ব্লাফ্ কল আর এলোপাথাড়ি আক্রমণে ওদের দুজনের পাকা খেলোয়াড়ী বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে

যেতে লাগল। চুরির নিষিদ্ধ আনন্দে অদ্ভুত উত্তেজনায় আশ্চর্য ভালো খেলতে লাগল অসিত, রেখাও যে দরকারমতো এমন মারাত্মক লীড দিতে পারে সে কথাই বা কে ভেবেছিল!

খেলার শেষে হিসেব করে দেখা গেল, অসিত আর রেখার পয়েন্টই বেশী, মোট ছ' আনা জিতে নিয়েছে ওরা।

অমূল্য মাথা চুলকে বললে, মির‍্যাক্‌লে বিশ্বাস করতে পারতাম না, এখন দেখছি তাও ঘটে!

নমিতা গজগজ করতে লাগল: বা রে, অমন ভাবে, ব্লাফ্‌ দিলে কেউ খেলতে পারে নাকি?

—এ ভারি অন্যায়।

অসিত বললে, অন্যায় আবার কী! তোমাদের যা খুশি কল নাও না, আমরা কি বারণ করেছি নাকি?

চাপা হাসিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল রেখার চোখ।

পরদিন সকালে আবার যখন এক ঘণ্টার জন্যে নমিতা বাথরুমে ঢুকেছে আর অমূল্য গেছে ডিসপেনসারিতে, নিয়মমতো চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঢুকল রেখা।

এসেই উচ্ছ্বসিত হাসি: কী মজা হল বলুন তো!

হাসিটা ভারি সুন্দর। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল অসিত। তারপর পরিতৃপ্ত মুখে বললে, মজার এখনি কী হয়েছে! দেখবেন না আজ কী করি! নতুন টেকনিকে নতুন আক্রমণ।

—নতুন টেকনিকে?

—এক রকম হিন্ট্‌ রোজ দিলে ওরা ধরে ফেলবে। তা ছাড়া দেখছিলেন তো, নমিতা কাল রীতিমত সন্দেহ করছিল দু-একবার। আমাকে তো ফস করে জিজ্ঞেস করেই বসল, বার বার নাক চুলকোচ্ছ কেন, সর্দি হয়েছে নাকি? আজকে নতুন কোড।

—কী রকম?

—বসুন, বুঝিয়ে বলি।

বাহান্নখানা তাসের মধ্যে, এত রোমাঞ্চ আর এমন উত্তেজনা আছে এর আগে কে জানত সে কথা? এতদিন পরে নেশা ধরেছে অসিতের, আর সে নেশা রেখার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এখন সকালবেলাতেই পাহাড়টাকে রুইতনের মতো মনে হয় না অসিতের। দুপুরে খেলতে বসবার আতঙ্ক বিভীষিকার মতো তাড়না

করে না তাকে। বরং একটা বিচিত্র আগ্রহ নিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে অসিত প্রতীক্ষা করতে থাকে—তুপুরবেলা অমূল্যর জরুরি ডাক পড়লে অসিতই ক্ষুব্ধ হয় বেশি। বোঝা যায় রেখারও প্রায় একই অবস্থা। কাজের ভেতরে সেও যেন ছটফট করে বেড়ায়। নমিতার চোখ এড়িয়ে মধ্যে মধ্যে এসে দাঁড়ায় অসিতের কাছে। ফিসফিস করে বলে, আজকের হিণ্টগুলো কী বলুন তো? আর একবার মনে করিয়ে দিন, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

একটা চমৎকার অন্তরঙ্গ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তুজনের মধ্যে। অমূল্য আর নমিতার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। কৌতুকে আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তুজনে।

—কাল নমিতার মুখের অবস্থা দেখেছিলেন?

—ওঁর অবস্থাও খুব করুণ। কী ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

—দাঁড়ান না, আরও অস্ত্র আছে আমার তূণে। এক-একটা করে বার করব।

আবার রেখার সেই উজ্জ্বল উচ্ছলিত হাসি। রেখার চিবুকের নীচের ভাঁজটা এত সুন্দর, দার্শনিক অধ্যাপক অসিত এর আগে সেটা লক্ষ্যই করেনি। হঠাৎ এক সময় অসিতের মনে হয়, এই মার্জিত দীপ্ত মেয়েটির পাশে অমূল্য যেন অনেকখানি স্থূল, কেমন যেন বেমানান!

আর রেখা বলে, নমিতা কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন?

—হবেই তো। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অসিত বলে, আর কোনোদিকে তো লক্ষ্য নেই। পড়ে পড়ে ঘুমোবে আর বাংলা সিনেমা দেখবে, এ ছাড়া তো কাজকর্ম নেই কিছু। এখনি হয়েছে কী, কিছুদিন পরে দেখবেন তেলের কুপোর মতো গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে।

—যাঃ, কী যে বলেন!—জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সৌজন্যের খাতিরে হাসিটাকে সংযত করে রেখা। আর অসিত তাকিয়ে দেখে নাচের 'ফিগারে'র মতো ছিমছাম কমনীয় শরীর রেখার—সংস্কৃত কবির ভাষায় 'পল্লবিনীলতেব'।

তাস, তাস আর তাস। কিন্তু এখন শুধু 'হিণ্ট'ই নয়, ফার্স্ট-ক্লাস-পাওয়া ছাত্র তার সমস্ত মনোযোগ কেবল তাসের ওপরেই উজাড় করে দিয়েছে। খেলতে খেলতে এখন আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় না, পুরনো শালবনের আদিম অন্ধকারে সবুজ ঘুঘুর ডাক আর মনকে উদাস করে দেয় না, পাহাড়ের নীল মাথার ওপর শাদা শাদা ঘুমন্ত মেঘগুলো অসিতকে আর শ্রান্তিতে অবসন্ন করে আনে না। সমস্ত উৎসাহ আর বুদ্ধিকে সজাগ করে রেখে তাসের নির্ভুল হিসেব করে অসিত, বুঝতে পারে খেলাটা কত সহজে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। রেখাও সজাগ আর সতর্ক হয়ে উঠেছে, তুজনকে তুজনের চেনা হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। চোখ তুললেই

অসিত দেখতে পায়, রেখার উজ্জ্বল চোখের গভীর বিশ্বাসভরা অন্তরঙ্গ দৃষ্টি তারই মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রয়েছে।

সংসারে তাস খেলার মতো ভালো জিনিস আর নেই, এ সম্বন্ধে অসিত নিঃসন্দেহ এখন। রেখাও একমত তার সঙ্গে।

সেদিন দুপুরে খেলাটা কিন্তু জমল না।

সবে তাস পেড়ে অমূল্য বসতে যাবে, এমন সময় ভগ্নদূত এল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারখানায়। ওয়েদারিং হাউসের দোতলা থেকে একজন জমাদার সোজা পড়ে গেছে নীচে, গোটা দুই পাঁজর ভেঙে গেছে খুব সম্ভব। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল অমূল্য।

বিষণ্ণ হয়ে অসিত বললে, তা হলে তিন হাতেই হোক।

রেখা বললে, তাই ভালো।

কিন্তু নমিতা রাজী নয়। কেমন নার্ভাস হয়ে গেছে আজকাল, অমূল্য না থাকলে ভরসা পায় না। হাই তুলে বললে, না না, সে জমবে না। তার চেয়ে গিয়ে একটু গড়াই, একটা নতুন সিনেমার পত্রিকা এসেছে, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি গে।

রেখা ক্ষুব্ধ চিত্তে বললে, আজ তা হলে খেলাটা আর হল না?

—কই আর হল?—অসিত হতাশ ভাবে সিগারেট ধরাল: অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েই লোকটা সব মাটি করে দিলে।

—কী করবেন তা হলে? ঘুমোবেন?

—এখানে ঘুমুতে ডাক্তারের বারণ, মাথা ভার হয়ে যাবে, গা ম্যাজ ম্যাজ করবে।—অসিত বললে, একটা বই-টই দিন, পড়ি।

—বই বলতে তো সিনেমা-ম্যাগাজিন আর মেটিরিয়া মেডিকা।—আসন্ন হাসির সূচনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রেখার চোখে মুখে: চলবে?

—তবে তো মুশকিল!

—মুশকিল কেন?—রেখাই মুশকিল আসান করে দিলে: চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

—চমৎকার প্রস্তাব।—অসিত সোৎসাহে উঠে বসল: চলুন।

—নমিতাকে ডাকব?

—ক্ষেপেছেন? লেপ মুড়ি দিয়ে সিনেমার কাগজ নিয়ে শুয়েছে, এখন ওকে ওঠানো আর বিন্ধ্যপর্বতকে নড়ানো একই কথা। চলুন আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ি।

খুশিতে রেখার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: চুপি চুপি?

—হ্যাঁ, চুপি চুপি।

—তবে দাঁড়ান, স্কার্ফটা নিয়ে আসি।—প্রায় নিঃশব্দে পাখির মতো উড়ে গেল রেখা।

কুচি ঝরে ঝরে পড়ছে পথের ওপর। মিষ্টি লালচে রোদে দুধের মতো সাদা শানাই ফুল হেসে উঠেছে। হাইড্রেঞ্জিয়ার স্তবকে মৌমাছি আর বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির আনাগোনা। টেলিগ্রাফের তারে মাকড়শার জালে জড়ানো কুয়াশার কণায় রোদ ঝিকমিক করছে—যেন মুক্তোর ঝালর ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। কলকণ্ঠে কথা বলে চলেছে রেখা।

—কতদিন ইচ্ছে করে এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই ; কিন্তু ওঁকে তো জানেন ! ওঁর এসব কাব্য-টাব্য করবার সময় নেই। বলেন, বেড়াতে হয় একাই যাও—আমার অত পাহাড় ঠ্যাঙাতে উৎসাহ হয় না। অথচ বলুন তো, একা একা কেউ বেড়াতে পারে এ ভাবে ? আর সংসারের কাজ করতে করতে আমি এ সব তো প্রায় ভুলতেই বসেছি। জানলা দিয়ে একটু বাইরে তাকিয়ে থাকারও সময় পাই না—ভয় হয় উনুনে বসানো ডালটা বুঝি পুড়ে গেল !

চলতে চলতে খুশিমতো ফুল তুলল রেখা, গুনগুন করে গান গাইল দু-চার কলি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়েটিকে যেন পনেরো-ষোল বছরের কিশোরী মেয়ের মতো দেখাচ্ছে—মনে মনে ভাবল অসিত।

তারপর সেই পুরনো শালবন। অনাদি কালের বিষণ্ণ শীতল ছায়া দিয়ে ঘেরা। গাছের গুঁড়িতে ডালে ডালে ডাইনীর চুলের মতো শ্যাওলা ঝুলছে। কাক আর ময়নার মেশানো পাখিরা খুঁটে খুঁটে কী যেন খেয়ে চলেছে। ঝরণার মৃদু কল-ঝঙ্কার আসছে কোথা থেকে, ঘুম-ভরা গলায় সবুজ ঘুঘু ডেকে চলেছে অবিশ্রাম।

নির্জনতা। পৃথিবীর প্রাথমিক নির্জনতা। যেন ওরা আসবার আগে এখানে আর কোনও মানুষের পা কখনও পড়েনি। রেখার মসৃণ কোমল শরীরটাকে কেমন অপার্থিব বলে মনে হল অসিতের। শীতল নিস্তব্ধ ছায়ায় তার নিবিড় চোখ দুটো আশ্চর্য আলোয় জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ গভীর গলায় অসিত বললে, আসুন, এই পাথরটার ওপরে বসি দুজনে।

রেখা বসল, অসিত বসল। ঝরণার শব্দ, পাখির ডাক। টুপটাপ করে শিশির পড়বার আওয়াজ। দুজনের পৃথিবী। আর কেউ নেই।

মৃদু আবিষ্ট স্বরে রেখা বললে, আর কেউ নেই।

অসিত বললে, না, শুধু আমরা দুজন। আমরা দুজন পার্টনার।

—শুধু আমরা ছাড়া আমাদের কথা কেউ জানে না, না ?

—না, আর কেউ জানে না।—অসিতের গলা ভারী হয়ে এল : আর কেউ জানবে না।

কী ছিল কথাটার স্বরে ? হঠাৎ শিউরে উঠল রেখা। হঠাৎ মনে হল, দুজনে বড় বেশি কাছাকাছি বসে আছে—অসিতের ঠাণ্ডা নিশ্বাস লাগছে ওর গায়ে। একটা সীমাহীন ভয়ে রেখার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। এ তো শুধু তাস নয়! এ ওরা কোথায় চলেছে ? এই নিরালা আদিম শালবনের মধ্য দিয়ে কোন্ ভয়ঙ্কর পথ দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে ?

রেখা উঠে দাঁড়াল তড়িৎবেগে। সঙ্গে সঙ্গে অসিতও। সে কি বুঝতে পেরেছে কিছু ? আভাস পেয়েছে অন্তত ?

স্কার্ফটায় শীত আর বাগ মানছে না যেন। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে আওয়াজ তুলে রেখা বললে, চলুন, ফেরা যাক।

অসিত জবাব দিলে না। তার আগেই সে হাঁটতে শুরু করেছে।

ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল নমিতা।

—এমন বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে কেন বউদি ? কী পুড়ছে উনুনে ?

বউদির জবাব এল না ; কিন্তু অসিত বুঝতে পেরেছিল, কী পুড়ছে। মোটা কম্বলে মাথাটা পর্যন্ত ঢেকে খাটিয়ার ওপর পড়ে রইল অসিত। কম্বলের আড়ালেই কি মুখ লুকোনো যাবে চিরদিনের মতো ?

দু প্যাকেট তাস পুড়তে সময় লাগে। সেই সঙ্গে বুকের ভেতরটাও ধিকিধিকি করে পুড়ছে রেখার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখছে, প্রত্যেকখানা তাস কী অদ্ভুতভাবে বেঁকে বেঁকে পুড়ে যাচ্ছে—

মনে হচ্ছে, অসংখ্য কেউটে সাপের ফণা।

লজ্জা

বিনয় যেদিন তাদের বাড়িতে প্রথম এল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে উজ্জ্বলার।

চায়ের পেয়ালা সামনে বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। রবিবারের প্রকাণ্ড কাগজ—আপিসের ছুটি। সব তন্ন-তন্ন ভাবে শেষ করে বাবা এবার অকারণ কৌতূহলে 'ওয়ান্টেড' কলমে মন দিয়েছিলেন।

উজ্জ্বলা ঘরে ঢুকল।

—এই ড্যাফোডিল্স্ কবিতার শেষ লাইন ক'টা বুঝিয়ে দাও বাবা।

—ড্যাফোডিল্স্ ? ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ?—বাবা বইটার দিকে হাত বাড়ালেন।—দেখি ?

ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে বিনয় ডাকল, দুর্গেশবাবু আছেন ?

সন্ত্রস্ত হয়ে বাবা সাড়া দিলেন, কে, বিনয় ? এসো—এসো—

বিনয় ঘরে ঢুকল। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল। গায়ে আস্তিন-গোটানো আধময়লা শার্ট। চোখে মোটা কাচের চশমা আর তার ভেতর থেকে একটা অর্থহীন উদাস দৃষ্টি। ফিলজফিতে এম. এ. পড়ে ছেলেটি, চেহারা চলা-ফেরাতেও পুরোদস্তুর দার্শনিক।

দুর্গেশবাবু বললেন, কী খবর ? বোসো—বোসো—

বিনয় অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে একটা চেয়ারের একান্তে বসে পড়ল। আশ্চর্য শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। যেন দুর্গেশবাবুকে দেখছে না, উজ্জ্বলাকেও দেখছে না। বিনয় বললে, কাল আমাদের বাড়ি জগদ্ধাত্রী পুজো। দয়া করে আপনারা সবাই আসবেন।

এটা প্রতি বছরের প্রথা ; কিন্তু বিনয় কোনোবার আসেনি। গত বছর পর্যন্ত ওর বাবা বেঁচে ছিলেন, এ সব সামাজিক কৃত্য তিনিই করে বেড়াতেন। এবার তিনি না থাকায় দায়টা বিনয়ের ওপরেই বর্তেছে।

দুর্গেশবাবু বললেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়। মায়ের পুজো, তার জন্যে কি আর নেমন্তন্ন করবার দরকার আছে ! এ তো আমরা এমনিই যাব।

বিনয় উঠে দাঁড়াল : তবে আমি আসি।

হঠাৎ কি যে ভাবলেন দুর্গেশবাবু, তিনিই জানেন। উজ্জ্বলাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আর বিপন্ন করে বলে ফেললেন, একটা উপকার করো দেখি বিনয়। তুমি তো স্কলার ছেলে—এই ড্যাফোডিল্স্ কবিতাটা সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দাও তো মেয়েটাকে। আমরা সেই কবে পড়েছি, ও সব কি আর মনে আছে ছাই !

লজ্জায় লাল হয়ে পালাবার উপক্রম করল উজ্জ্বলা।

— না বাবা থাক্, আমি নিজেই পড়ে নেব এখন।

—নিজেই পড়ে নিবি কেন ?—দুর্গেশবাবু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : বিনয়ের মতো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র যখন এসেই পড়েছে, তখন ছেড়ে দিবি ওকে ? আরে, পাড়ার ছেলে, আর বলতে গেলে তো জ্ঞাতির মধ্যেই পড়ে। ওর কাছে লজ্জা কী ? দাও তো বিনয়, দু কথায় ওকে বুঝিয়ে দাও কবিতাটা।

বিনয় আবার চেয়ারের কোণায় বসে পড়ল। বললে, বেশ তো দিন বইটা।

আশ্চর্য সহজ গলা, কোনও সঙ্কোচ নেই, বিব্রত হওয়ার ভাব নেই কণামাত্রও।

অথবা সঙ্কোচ করবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি বিনয়ের মনে। তেমনি উদাসীন আর আত্মমগ্নতার দৃষ্টি—উজ্জ্বলাকে সে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না যেন।

বই এগিয়ে দিতে হাত কাঁপছে উজ্জ্বলার; কিন্তু বিনয় লক্ষ্যই করল না। বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলে চলল, আপনার ডিফিক্যাল্‌টি কোথায়? শেষ চারটে লাইন? For oft when on my couch I lie? বোধ হয় জানেন, এই ক'টা লাইন কবি নিজে লেখেননি—

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বিনয় যখন থামল, তখন আনন্দে ঘন ঘন দুর্গেশবাবুর মাথা নড়ছে, আর উজ্জ্বলা নিবিড় মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বিনয়ের দিকে। বিনয়ের কথার অর্ধেকও সে বুঝতে পারেনি, সে তার বুদ্ধির বাইরে; কিন্তু এমন আশ্চর্য সুরেলা গলায় কেউ যে কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, এমন চমৎকার উচ্চারণে অনর্গল ইংরেজী বলতে পারে, কথা বলতে বলতে কারও শূন্য স্তিমিত চোখ যে বুদ্ধি আর প্রতিভার আলোয় এমন ঝকঝক করে জ্বলে উঠতে পারে, উজ্জ্বলা তা জানত না।

হঠাৎ দুর্গেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: সুপার্ব্‌! ইউনিক!

তাঁর চিৎকারটা এতক্ষণের মোহাবিষ্টতার ওপরে একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করল উজ্জ্বলা।

দুর্গেশবাবু বললেন, কিছু মনে কোরো না বিনয়, কলেজে পড়বার সময় ডক্টর ঘোষের ইংরেজী শুনেছিলাম আর এই শুনলাম তোমার মুখে। সিম্প্‌লি ওয়াণ্ডারফুল! আমার এই মেয়েটা ইংরেজীতে বড় কাঁচা, যদি সময় করে মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু ওকে পড়িয়ে দাও—বড় উপকার হয় তা হলে। আর তা ছাড়া—তোষামোদের ভঙ্গিতে দুর্গেশবাবু হাসলেন: বলতে গেলে তোমরা তো ঘরের লোক, জ্ঞাতির মধ্যেই পড়ো। এটুকু জোর করতে পারি তোমার ওপর।

বাবার কথার ভঙ্গিটা ভারি বিশ্রী লাগল উজ্জ্বলার কানে। ইচ্ছে হল, প্রতিবাদ করে বলে, এ আমাদের অন্যায় জুলুম বাবা। উনি কেন কাজের ক্ষতি করে সময় নষ্ট করবেন আমার জন্যে?

কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখা দিল না বিনয়ের মুখে। তেমনি নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে বইটা উজ্জ্বলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, বেশ তো, আসবো।—এতটুকু আগ্রহের দীপ্তি নেই মুখে, এক বিন্দু বিরক্তির চিহ্নও না। উজ্জ্বলা হঠাৎ কেমন অপমানিত বোধ করল নিজেকে।

তার পরেই উঠে পড়ল বিনয়। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, তবে আজ আসি দুর্গেশবাবু, আমাকে আরও তিন-চার জায়গায় বলে যেতে হবে।

উজ্জ্বলা ভেবেছিল ওটা কথার কথা, সৌজন্য বজায় রেখে চলে যাওয়া। তার পরে রাস্তায় বেরিয়েই বিনয় সে কথা একেবারে ভুলে যাবে। আজ পাঁচ বছর ধরে সে তো এই পথ দিয়েই বিনয়কে যেতে-আসতে দেখতে পায়। অদ্ভুত আত্মমগ্ন মানুষ —সহজে কারও সঙ্গে কথা বলে না, ফিরে তাকায় না কারও দিকেই। পাড়ার লোকে বলে, ছেলেটা পাগল। দিনরাত বইয়ের ভেতরে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, আর কিছু যেন দেখতেই পায় না। দু পায়ে দু রকম জুতো পরে হাঁটে, উল্টো জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে শেষে পকেট খুঁজে পায় না, একটা পয়সা সঙ্গে না নিয়েই ট্রামে উঠে বসেছে কতদিন। অদ্ভুত ভুলো মানুষ, কলেজ থেকে নিজের বাড়িতে কী করে যে ফিরে আসে সেইটেই আশ্চর্য!

কিন্তু এবার বিনয় প্রমাণ করে ফেলল যে, কোনো কোনো কথা তার মনেও থাকে। তাই দিন পাঁচেক পরে সন্ধ্যাবেলায় তার ডাক পড়ল : দুর্গেশবাবু!

দুর্গেশবাবু বাড়িতে ছিলেন না, উজ্জ্বলাকেই দরজা খুলে দিতে হল।

—বাবা এখন নেই।

বিনয় বললে, তা হোক। আমি তোমাকে ইংরাজী পড়াতে এসেছি।

কয়েক মুহূর্ত আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল উজ্জ্বলা। তারপরে দেখতে পেল, শিশুর মতো শান্ত একটা সারল্য বিনয়ের মুখে—চোখে সেই আত্মমগ্ন বিচিত্র দৃষ্টি।

একটু চুপ করে থেকে বিনয় বললে, আজ পড়বে, না, আর একদিন আমি আসব?

উজ্জ্বলা বললে, না না, আজই আসুন।

সেই থেকে শুরু। বিনয় ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম. এ. পাস করল, শুরু করল রিসার্চ। উজ্জ্বলা ভর্তি হল কলেজে। এখনও নিয়মিত আসে বিনয়—সপ্তাহে দু-তিন দিন করে ইংরেজী পড়িয়ে যায়—সংস্কৃত কিংবা লজিকও দেখিয়ে দিয়ে যায় কোনো কোনো দিন। আরও নিজের দশটা কাজের মতো ওটাও যেন অভ্যাস করে নিয়েছে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পড়ায়—ধ্যানস্তিমিত চোখগুলো জ্বলজ্বল করতে থাকে, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে এক সময়।

—আজ চললাম, আমার কাজ আছে।

মধ্যে মধ্যে একটা তীব্র অন্তর্জ্বালায় ঠোঁট কামড়ে ধরে উজ্জ্বলা। অদ্ভুত নির্দয় মনে হয় বিনয়কে। বই আর বই—কথা আর কথা। অথচ উজ্জ্বলার সব সময়ে তা ভালো লাগে না। কখনও কখনও ভাবে : কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুক বিনয়—দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসে থাক্ কয়েক মিনিট, বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকুক, আর দুরু দুরু বুকে উজ্জ্বলা ভাবুক—এখুনি এমন একটা কিছু ঘটবে, যা এর আগে কখনো ঘটেনি।

কিন্তু দু বছরে তা ঘটল না। অনেক বৃষ্টি পড়ার সন্ধ্যা বাইরে সেই আশ্চর্য সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করেছে—কথা না বলার সেই আশ্চর্য মুহূর্ত বহুবার ঘন হয়ে ওঠবার আগেই মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। বইয়ের পাতার কোটরের বাইরে পলকের জন্যেও বেরিয়ে আসেনি বিনয়। বরং চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বলেছে যে, বৃষ্টির ছাট্ আসছে—জানলাটা বন্ধ করে দাও।

এদিকে তলায় তলায় বইতে শুরু হয়েছে অন্তঃশীলা। বিনয়ের বিধবা মা কিছুদিন ধরে যাওয়া-আসা করছেন উজ্জ্বলাদের বাড়িতে। তাঁর ওই একটি মাত্র ছেলে, তাকে সংসারী না করলে সংসারে আর মন টিকছে না তাঁর। একটি ভালো পাত্রী যদি তিনি পান—

তারপর বুকের মধ্যে ঝড়-ওঠানো সেই ভয়ঙ্কর খবর একদিন শুনতে পেল উজ্জ্বলা। বিনয়ের মা তাকেই পুত্রবধূ করার কথা ভাবছেন। বিনয় এতদিন ধরে যখন এ বাড়িতে নিয়মিত আসাযাওয়া করছে, তখন নিশ্চয়ই—। আর উজ্জ্বলা মেয়েটি সম্পর্কে বিনয়ের মারও লোভ আছে অনেক দিন থেকেই। কিছুই দিতে পারবেন না দুর্গেশবাবু—তা হোক। তাঁদের আশীর্বাদে বিনয়ের বাবা যা রেখে গেছেন—

অসহ্য আনন্দে আর দুর্বোধ একটা যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ মুখ বুজে বিছানায় পড়ে রইল উজ্জ্বলা। শেষ পর্যন্ত পুঁথির পাতা থেকে নেমে বিনয় ধরা দিতে আসছে তারই জীবনে! ওই ঘুমন্ত পুরুষটি তারই ছোঁয়ায় এবার জেগে উঠবে ধীরে ধীরে, শিশুর মতো বিস্ময়চকিত চোখ মেলে তাকাবে তার দিকে, বলবে—

বিনিদ্র রাতের প্রহর-জাগা শুরু হল উজ্জ্বলার। শুরু হল আকাশের তারা-কুড়োনো।

কিন্তু তিন দিন পরেই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বিনয় এসে হাজির হল দুর্গেশবাবুর বাড়িতে। দুর্গেশবাবু সবে আপিস থেকে ফিরেছেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ে বসতে দিলেন।

বিনয় কোনো ভূমিকা করলে না। ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে আরও খানিকটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে বললে, কী পাগলামি শুরু করেছেন আপনারা?

দুর্গেশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন: মানে?

—মানে আপনারাই ভালো জানেন। উজ্জ্বলার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার আইডিয়া আপনাদের হল কী করে?—শান্ত উদাসীন বিনয়ের স্বরে স্পষ্ট বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে বেরুল: এই নিয়ে এইমাত্র মার সঙ্গে আমার কতকগুলো আন্‌প্লেজেন্ট আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয় ভেবেই উজ্জ্বলাকে আমি পড়াতে আসি, কিন্তু বিয়ে করার কথা উঠতে পারে তা বুঝলে আমি আপনাদের এখানে কখনও আসতাম না।

দুর্গেশবাবু নিভে গেলেন একেবারে: এ তুমি কী বলছ বিনয়? এত আশা করে আছি আমরা। কথাবার্তা প্রায় ঠিক—

নির্বাক নিরুত্তেজ বিনয় অবিশ্বাস্য ভাবে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল : কথাবার্তা কে আপনাদের ঠিক করতে বলেছিল ? বিয়ে করব আমি, অথচ আমার মতামতের কোনও প্রশ্নই নেই ! চমৎকার !

দুর্গেশবাবু শেষ চেষ্টা করলেন : কিন্তু উজ্জ্বলা তো—

—খুবই চমৎকার মেয়ে। সেই জন্যেই তো আরও বলছি, ওকেও কেন জড়াচ্ছেন এসব ক্ষ্যাপামির ভেতরে ? আমি এখন বিয়ে করব না, ভবিষ্যতেও বিয়ে করার জন্যে কোনো আগ্রহ আমার নেই। তা ছাড়া আর একটা কথা। উজ্জ্বলাকে পড়ানো নিয়েই যখন এত গোলমাল উঠেছে, তখন ভবিষ্যতে আর আমি এ-বাড়িতে পড়াতে আসব না।

যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত বেগে নিজের বক্তব্য শেষ করে বেরিয়ে গেল বিনয়। দুর্গেশবাবু স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলেন। আর ঘরের বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল উজ্জ্বলা, সেইখানেই সে নিথর হয়ে রইল—এক পাও নড়তে পারল না।

* * *

আজ উজ্জ্বলার বিয়ে।

কে পাত্র, কী তার পরিচয়—কেউ তা ভাল করে জানে না। এমন কি, মেয়ে পর্যন্ত দেখতে আসেনি কেউ। দুর্গেশবাবু কোথা থেকে কী যে বন্দোবস্ত করেছেন, একমাত্র তিনিই তা বলতে পারেন।

উজ্জ্বলা একটা কথা বলেনি, একবারের জন্যেও প্রতিবাদ তোলেনি। যার খুশি আসুক, যে খুশি তাকে তুলে নিয়ে যাক। সব সমান তার কাছে। বিনয় চলে যাওয়ার পর থেকেই সে বুঝতে পেরেছে, জীবনে আর কোনো কিছুই তার দরকার নেই। সমস্ত আশঙ্কার ওপরে দাঁড়ি টেনে দিয়ে একটা পরম নির্বেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে সে। বিনয়ের মতোই তারও চিন্তা-ভাবনা নিরাসক্তির নেশায় আচ্ছন্ন।

বিনয় ! চেলী-চন্দন-পরা উজ্জ্বলা নির্দয় ভাবে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার। আজই শেষ। এর পরে বিনয়ের কথা আর কোনদিনই তার মনে পড়বে না। বিনয় যদি এত সহজেই তাকে ভুলে যেতে পেরে থাকে, তারও মনে রাখবার দায় নেই।

বাইরে বাজনার আওয়াজ—শঙ্খে ফুঁ উঠছে ঘন ঘন। একটা প্রবল কোলাহল।

একটি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এল : উজ্জ্বলাদি, বর এসে গেছে তোমার।

একবার, শুধু একবারের জন্যে। উজ্জ্বলার ইচ্ছে হল, এই মালা, এই গয়না—সব সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে পরনের চেলী। তারপর—

হঠাৎ নীচের কোলাহলটা এক প্রবল বিশৃঙ্খলায় পরিণত হল। যেন মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

—বুড়ো—বুড়ো বর ! ষাট বছরের বুড়ো !—কে যেন চিৎকার করে উঠল।

—মাথার সব চুল শাদা। মুখে দাঁত নেই বললেই হয়।

—মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে !

উজ্জ্বলার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। এই ভালো হয়েছে—এর চাইতে ভালো কী আর হতে পারত ! সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চিরনির্বাণ, একেবারে পরিপূর্ণ সমাধি। দু বছর পরেই হয়তো শাদা থান পরে ব্রহ্মচর্যের তপস্যা।

চমৎকার ! তিলে তিলে আত্মহত্যা করবার ভদ্র উপায় এর চাইতে কী আর হওয়া সম্ভব !

নীচে বিশৃঙ্খল চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঝড় বইছে যেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর যে-ঘরে উজ্জ্বলা বসে ছিল, সেখানে ঢুকলেন বিনয়ের মা। পেছনে পেছনে মা এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে, বাবা এলেন অপরাধীর মতো।

দু চোখে আগুন ছড়িয়ে বিনয়ের মা বললেন, এটা কী করছেন দুর্গেশবাবু ?

—কী করা যায় বলুন ! আমার যা অবস্থা—

—তাই বলে কশাইয়ের মতো জবাই করবেন মেয়েটাকে ?

দুর্গেশবাবু কেঁদে ফেললেন : আমার দশা দেখুন এখন। পাড়ার ছেলেরা তো বরের গাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, কিছুতেই নামতে দেবে না। অথচ সব হয়ে গেছে, লগ্ন বয়ে যায়—

বিনয়ের মা বললেন, সে আমি দেখছি।—তারপর গলা তুলে তীব্রস্বরে ডাকলেন : বিনয়

ঘরের বাইরেই বোধ হয় বিনয় দাঁড়িয়ে ছিল, ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে চলে এল। এতক্ষণ ধরে তারই সামনে আশে-পাশে যে নাটকটা ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে কোথাও যেন যোগ ছিল না উজ্জ্বলার—যেন দর্শকের নির্বিকল্প আসনে বসে ছিল সে ; কিন্তু বিনয় ঘরে ঢোকবামাত্র উজ্জ্বলার বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত আছাড় খেয়ে পড়ল, ইচ্ছে হল নিজের গলা দু হাতে টিপে ধরে সে। বিনয় নিষ্ঠুর—কল্পনাতীত ভাবে নিষ্ঠুর ! নইলে আজকের দিনে এই বাড়িতে সে আসতে পারল কী করে !

বিনয়ের মা ডাকলেন, বিনয় !

বিনয় চোখ তুলল। মাত্র কয়েক হাত দূরেই চেলী-চন্দন-মালায় সাজানো প্রতিমার মতো বসে আছে উজ্জ্বলা ; কিন্তু বিনয় তা দেখতে পেল না।

বিনয়ের মা বললেন, এমন ফুলের মতো মেয়েটা—তুমি কি চাও ওর এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটে যাক ?

বিনয়ের দৃষ্টি এবার উজ্জ্বলার ওপরে গিয়ে পড়ল। মাথা নীচু করে রইল উজ্জ্বলা,

থরথর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট ; কিন্তু বিনয়ের চোখে একবিন্দু বিস্ময় ফুটল না, এতটুকু কৌতূহলও না। সেই প্রথম দিনে উজ্জ্বলাকে সে যে ভাবে দেখেছিল, আজও তাকালো ঠিক তেমনি ভাবেই।

বিনয় বললে, কী করতে হবে বলো ?

—উজ্জ্বলাকে তুমি বিয়ে করবে। নইলে জাত যাবে ভদ্রলোকের, সর্বনাশ হবে মেয়েটার।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বিনয়। তারপর সহজ গলায় বললে, বেশ। আমিই বিয়ে করব।—ঠিক যেমন করে এক কথায় সে উজ্জ্বলাকে পড়াতে রাজী হয়েছিল, তার সঙ্গে এ গলার কোনো পার্থক্য নেই।

দুর্গেশবাবু বিনয়কে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। কান্নার আকুল গলায় বললেন, বাবা, তুমি আমায় বাঁচালে।

বিনয়ের মা বললেন, আপনি ওই বরকে ফেরত পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন। আমি বিনয়কে সাজিয়ে নিয়ে আসছি। দু ঘণ্টা পরে আবার লগ্ন আছে, সেই লগ্নেই বিয়ে হবে।

ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে গেল সবাই। উজ্জ্বলা আবার একা। খুশি হবে কি-না বুঝতে পারছে না। একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে ; কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত। সানাইয়ে আবার সুর উঠেছে, বাড়িতে আনন্দের সাড়া পড়েছে আবার, বুড়ো বর হয়তো ব্যর্থ-অপমানে মাথা নীচু করে ফিরে গেছে এখন। আশ্চর্য, বিনয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনায় তো বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারছে না উজ্জ্বলা। সেই প্রত্যাখ্যাত অপমানিত মানুষটির কথা ভেবে সমবেদনায় সমস্ত মন তার আকীর্ণ হয়ে গেছে। উপায় থাকলে, শক্তি থাকলে নিজে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনত উজ্জ্বলা, বলত, তুমিই আমায় নাও, উদ্ধার করো এই অসহ্য যন্ত্রণার পীড়ন থেকে।

হঠাৎ উজ্জ্বলার সমবয়সী তিন-চারটি মেয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। প্রচণ্ড হাসির বেগে ভেঙে পড়ল তারা।

—উঃ, কী চমৎকার নাটকটাই হয়ে গেল রে উজ্জ্বলা !

—আর কী অদ্ভুত ইনোসেণ্ট বিনয়বাবু ! পাড়াসুদ্ধ সবাই মিলে প্ল্যান করলে, অথচ বিনয়বাবু তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না।

সন্দেহের আঘাতে উজ্জ্বলা চকিত হয়ে উঠল।

—প্ল্যান ? কিসের প্ল্যান ?

—তুইও জানিস নে ?—আবার কিছুক্ষণ হাসির ঐকতান চলল : তা হলে শুধু

তোদের দুজনকেই বোকা বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। শোন্, এ সমস্তই সাজানো। যিনি বর সেজে এসেছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল শাদা পরচুলা, দাঁতে কালি-মাখানো। ভদ্রলোক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেতা। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও আগে থেকেই বন্দোবস্ত ছিল। তোর বাবা, বিনয়বাবুর মা, এ প্ল্যানের মধ্যে সবাই-ই ছিলেন।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

মুহূর্তে মরমে মরে গেল উজ্জ্বলা। শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই তাকে পেতে হল বিনয়কে? এমনি ছলনা দিয়ে, এমনি মিথ্যার ভেতরে? সকলে মিলে একটা হীন চক্রান্ত করে তাকে জড়িয়ে দিলে বিনয়ের জীবনে? এ লজ্জা সে কোথায় রাখবে?

সখীর দল সরে যেতেই আর অপেক্ষা করল না উজ্জ্বলা। আর সময় নেই! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এ গ্লানি, এত বড় অপমান সে সারাজীবন বইবে কী করে? বিনয়কে নিজে সে জয় করতে পারল না—বাঁধতে হল মিথ্যার পাশে? এমন অসম্মান আর পরাজয়ের লজ্জা বয়ে কেমন করে কাটাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?

তেতলার ছাতের একেবারে অন্ধকার কোণটায় গিয়ে দাঁড়াল উজ্জ্বলা। নীচের আলোকিত পথটা একটা দুর্বার আকর্ষণে তাকে ডাকছে। মৃত্যুর শূন্যতায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শেষবারের মতো উজ্জ্বলা বললে, ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

ইদু মিঞার মোরগ

বৌ জোহরা প্রায়ই ঝগড়া করে।

—ওটাকে এবার বিক্রি করে দাও না। দিব্যি তেল-চুক্চুকে হয়েছে—গোস্ত হয়েছে অনেক। এখন বেচলে কোন্ না চারটে টাকাও দাম পাওয়া যাবে ওর!

কিন্তু ইদু মিঞা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, এখন থাক।

—থাক? কেন থাকবে? খাসী মোরগ—গোস্ত খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে তো লাগবে না। মিথ্যে পুষে লাভ কী?

—ওকে পুষতে তোমার কি খুব খরচ হচ্ছে?—ইদু মিঞা কান থেকে একটা বিড়ি নামায়ঃ ঘরের খুদকুঁড়ো আর আদাড়ে-পাঁদাড়ে যা পায় কুড়িয়ে খেয়ে বেড়ায়। ওর জন্যে তোমার চোখ টাটায় কেন?

জোহরা বলে, এমনি টাটায় না। আর কদিন পরে বুড়ো হয়ে যাবে, পোকা পড়বে গায়ে, শক্ত ছিবড়ে হয়ে যাবে মাংস। আট গণ্ডা পয়সাও কেউ দেবে না তখন।

—দরকার নেই। ও যেমন আছে, তেমনি থাক।

শুনে গা জ্বালা করে জোহরার।

—বেশ তো, বেচো না তুমি। একদিন নিজেই আমি ওটাকে কেটে উনুনে চড়াব।

বিড়িটা ধরাতে ধরাতে শান্ত কঠিন গলায় ইদু মিঞা বলে : তা হলে সেদিনই আমি পাড়া-পড়শী জড়ো করব সমস্ত। তারপর সকলের সামনে চেঁচিয়ে তিনবার বলব : তালাক্—তালাক্—তালাক্—

—এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে! আমার চাইতে ওই খাসী মোরগটাই বড় হল তোমার কাছে!—জোহরার চোখে জল আসে : বেশ, তাই হোক্। আমাকে তুমি তালাকই দাও।

জোহরার চোখের জল অনেকবারই অনেক অঘটন ঘটিয়েছে ইদু মিঞার জীবনে। ডাইনে চলতে গিয়ে অনেকবার বাঁয়ে ঘুরেছে—যাদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে চেয়েছিল, আপস করে নিতে হয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে ইদু মিঞা কিছুতেই বশ মানতে রাজী নয়। কী যে টান তার পড়েছে ওই খাসী মোরগটার ওপরে—নিজেও খাবে না, কাউকে বিক্রিও করবে না।

খরিদ্দার এসে হয়তো বলে, কাল দাওয়াত আছে—তোমার খাসী মোরগটা হলে বেশ কুলিয়ে যায়।

—খাসী মোরগটা না হলেও তোমার কুলিয়ে যাবে মিঞা। আরো দশটা তো রয়েছে—যেটা খুশি বেছে নাও না। ওটা আমি বেচব না।

—বেচবে না? কেন বেচবে না? তিন টাকা দিচ্ছি—

—দশ টাকাতেও বেচব না।

—হঠাৎ এত দরদ কেন? ধর্মব্যাটা নাকি তোমার?

—আমার যাই হোক, তোমার কী?—ইদু মিঞা চটে ওঠে : আমি ওটা বেচব না—এই আমার পাকা কথা। ব্যাস্।

লোক-জানাজানি হয়ে গেছে এখন। খাসী মোরগটা ইদু মিঞার ধর্মব্যাটা।

শুধু গজগজ করে জোহরা।

—এত হাঁস মুরগী শেয়ালে-ভামে খেয়ে যায়, ওটাকে তো ছোঁয়ও না! ওটা যমের অরুচি!

ইদু মিঞা বিষন্ন হয়ে বসে থাকে। একটা কথা গলার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারে না সেটা। কেমন সংকোচ আসে—কেমন মনে

হয়, কেউ তাকে বুঝবে না।

সে নিজেই কি বোঝে কেন এমনটা হল ?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মুরগী জবাই দিয়েছে সে। আজও দিতে হয়। কিন্তু মাত্র দু বছর আগে—

বাড়িতে কুটুম এসেছিল। মুরগী কাটতে হবে। প্রথমেই ইদুর নজর পড়েছিল ওটার দিকে। দিনের বেলা মুরগী ধরা সহজ নয়। পাঁচ-ছ'জন মিলে ওটার পেছনে ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। সারা উঠোনময় দৌড়-ঝাঁপ চলতে লাগল। ইদু উঠোনের পেয়ারাতলায় বসে দেখছিল ব্যাপারটা। মোরগটা হয়তো টের পেয়েছিল—যেমন করে সমস্ত প্রাণীই টের পায়। যে কারণে কসাই এসে দড়ি ধরলে গোরু কিছুতেই নড়তে চায় না, যে কারণে ছুরি আনবার আগেই পাঁঠা ব্যা ব্যা করতে থাকে—সেই কারণেই ওটা কিছুতেই ধরা দিতে চাইছিল না। তারপর যখন দেখল আর আত্মরক্ষার কোনো আশাই নেই, তখন পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একেবারে ইদু মিঞার কোলের মধ্যে এসে পড়ল।

ইদু তৎক্ষণাৎ ওটার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল হঠাৎ। থর থর করে একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঁপছে মোরগটা—বিচিত্র কাতর প্রার্থনায় তাকাচ্ছে তার দিকে, আর ভয়ার্ত শিশুর মতো আশ্রয় খুঁজছে তার বুকের ভেতরে।

একটা আশ্চর্য করুণায় ইদুর সমস্ত মন ভরে উঠল। মোরগটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, এটা থাক—অন্য মুরগী জবাই হবে আজ।

সেই থেকেই ওটা গোকুলে বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তিতে ইদুর মনে হয়, সংসারে কি একরাশ লকলকে জিভ ছাড়া কিছুই নেই আর ? মানুষ যা দেখে তাই কি খেতে ইচ্ছে করে তার ? একটু স্নেহ নেই, একটু করুণা নেই—একবিন্দু সহানুভূতি নেই কোথাও ?

বাইরে থেকে কঁক্ কঁক্ আওয়াজ উঠল একটা। তারপরেই ক্যাঁ ক্যাঁ করে কয়েকটা তীব্র আর্তনাদ। সন্দেহ নেই—ওই খাসী মোরগটারই গলা।

ইদু দাঁড়িয়ে উঠল তড়াক করে। একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়। শেয়াল এসে ধরল নাকি দিনের বেলাতেই ?

তারপরেই মুরগীর ক্যাঁ ক্যাঁ একটানা আওয়াজ ছাপিয়ে দরাজ গলার হাঁক উঠল : ইদু শেখ আছো নাকি—ও ইদু শেখ ?

একটা তীব্র সন্দেহে এক লাফে ইদু মিঞা বেরিয়ে এল বাইরে।

অনুমান নির্ভুল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দবিরুদ্দিন দফাদার। হাঁড়োলের মতো

প্রকাণ্ড মুখে চরিতার্থ হাসি। তার হাতের ভেতরে মোরগটা। প্রাণপণে ছটফট করছে আর চিৎকার জুড়ে দিয়েছে তারস্বরে। একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে দবিরুদ্দিন বাঁধছে মোরগের পা দুটো।

ইদু আর্তস্বরে বললে, ওটা ধরেছ কেন দফাদার সাহেব? ছেড়ে দাও ওকে।

দৈত্যের মতো চেহারার দবিরুদ্দিন কাঠচেরার মতো খরখরে আওয়াজ করে হাসল।

—বড় জবরদস্ত মোরগা মিঞা—এমনটি সহজে দেখা যায় না। ধরেছি যখন আর ছাড়ছি না। কত দাম চাও—বলো।

—খোদার কসম—আমি ওটা বেচব না।

দবিরুদ্দিন কথা বাড়াবার দরকার বোধ করল না। খাকী রঙের সরকারী জামাটার পকেটে হাত দিয়ে দুটো রূপোর টাকা বের করে আনল। তারপর ঠন্ ঠন্ করে ইদুর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেড় টাকার বেশি দাম হয় না—এই নাও, পুরো দুটো টাকাই দিলাম।

ইদু প্রায় হাহাকার করে উঠল।

—ওকে ছেড়ে দাও দফাদার সাহেব, আল্লার দোহাই—ছেড়ে দাও ওকে। আমি কিছুতেই প্রাণে ধরে ওটাকে কাটতে দিতে পারব না।

—শেষে মোরগার ওপর দরদ উথ্‌লে উঠেছে নাকি? সোভান্ আল্লা!—আবার কাঠচেরার মতো কর্‌করে আওয়াজ তুলে হাসল দফাদার। তারপর হাঁটতে শুরু করলে গজেন্দ্র-গমনে—মোরগটার কাতর আর্তনাদ যেন ছুরির পোঁচের মতো ইদুর বুকে এসে বিঁধতে লাগল।

ইদু মিঞা শেষবার অসহায় গলায় ডাকল: দফাদার সাহেব!

দফাদার জবাব দিলে না। দরকারই বোধ করল না আর।

কয়েক মুহূর্ত ইদু দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে—তারপর চুপ করে বসে পড়ল ধুলোর ওপর। চোখের জলে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে—মোরগের কাতর মিনতি এখনো কানে ভেসে আসছে তার।

ছুটে এল জোহরা। আশ্চর্য, মুরগীর ওপরের সমস্ত ক্রোধটা এখন তার দফাদারের ওপর গিয়ে পড়েছে।

—জোর করে কেড়ে নিয়ে গেল? একি জুলুমবাজি?—আকাশের দিকে হাত তুলে জোহরা বললে, ওই মোরগ কক্ষণো ও খেতে পারবে না। খোদা আছেন—তিনিই বিচার করবেন।

গরীবের প্রার্থনা খোদা কখনো শুনতে পান না—তিনি হাইকোর্টের জজের মতো।

উকিল-ব্যারিস্টারকে বিস্তর টাকা খাওয়াতে পারলে, অর্থাৎ মোল্লা-মৌলবীদের জুৎ মতো ভেট যোগাতে পারলে তবেই আরজি পেশ করা যায় তাঁর দরবারে। সবাই একথা জানে, দবিরুদ্দিন দফাদারও জানত। কিন্তু আজ বোধ হয় তিনি বোগদাদের বাদশা হারুণ-অল-রশীদের মতো ছদ্মবেশে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাই জোহরার প্রার্থনা তিনি শুনতে পেলেন। মোরগটা সত্যিই দবিরুদ্দিনের ভোগে লাগল না।

খানিক দূর হাঁটতেই দেখা হয়ে গেল দীন মহম্মদ দারোগার সঙ্গে। একটা সাইকেলে করে তিনি থানার দিকে ফিরছিলেন। অভ্যাসবশে দাঁড়িয়ে পড়ল দফাদার —সজোরে সেলাম ঠুকল একটা।

দারোগা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঝাঁ করে নেমে পড়লেন হঠাৎ। তাঁর চোখ মোরগের দিকে গিয়ে পড়েছে।

—খাসা মোরগটা তো দফাদার। কিনলে নাকি?

মুহূর্তে দফাদারের বুক শুকিয়ে গেল।

—জী হুজুর, কিনলাম বৈকি। বিনি পয়সায় আমাদের আর কে দিচ্ছে এসব?

—বড় ভালো চিজ্, আজকাল এমনটি আর দেখাই যায় না।—দারোগা ঠোঁট চাটলেন।

—জী হাঁ।—সন্ত্রস্ত গলায় দফাদার জবাব দিলে।

দারোগা আর একবার মোরগটার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন মোটা মোটা পা দুটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ওটা হাঁড়িকাবাবে পরিণত হয়ে গেল। রসুন, ঘি আর মসলা-জর্জরিত বাদামী রঙের হাঁড়িকাবাবটি যেন একেবারে দারোগার নাকের সামনেই দুলতে লাগল। আর ওই সঙ্গে যদি পোলাও হয়—

এরপরে আর চক্ষুলজ্জার আবরণ রাখলেন না দারোগা।

—দাও হে দফাদার, ওটা আমার সাইকেলেই বেঁধে দাও।

দবিরুদ্দিন মুখ কালো করে বললে, কিন্তু হুজুর—

দারোগা সংক্ষেপে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আর একটা কিনে নিয়ো। কত দিতে হবে দাম?

ক্রোধে, হতাশায় দবিরুদ্দিনের চোখ ধক্ ধক্ করে উঠল। মুখের গ্রাস যখন কেড়ে খাবেই, তখন কিসের এত খাতির?

দবিরুদ্দিন শুকনো গলায় বললে, তিন টাকা দেবেন হুজুর।

—তিন টাকা?—চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দারোগা। তিনটে টাকার জন্যে নয়—আশ্চর্য হয়ে গেছেন দবিরুদ্দিনের দুঃসাহস দেখে। কুড়ি বছরের

চাকরি-জীবনে এ অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম। তাঁরই দফাদার একটা মুরগীর দাম দাবি করে তাঁর কাছ থেকে!

পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে দারোগা ছড়িয়ে দিলেন রাস্তার ওপর। দবিরুদ্দিন ইতু মিঞা নয়—সঙ্গে সঙ্গে টাকা তিনটে কুড়িয়ে নিলে সে।

দারোগা মনে মনে বললেন, আচ্ছা, থাকো। এই তিন টাকার শোধ আমি তুলে নেব।

সাইকেলে মোরগটা ঝুলিয়ে দারোগা চললেন। সেই অবস্থাতেই একবার টিপে দেখলেন মোরগটা—একেবারে সীসের মতো ঠাসা। মোরগ আবার ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ শব্দে আর্তনাদ তুলল—দারোগার কানে শব্দটা যেন মধু বর্ষণ করতে লাগল। না—ঠকা হয়নি তিন টাকায়।

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্যাডেল্ করে চললেন দারোগা। বড় বিবি খানদানি ঘরের মেয়ে—ওদের কোন্ পূর্বপুরুষ নাকি মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজেদ আলীর খাস বাবুর্চি ছিল। সেই পূর্বপুরুষের গুণপনা বড় বিবির মধ্যে এসেও বর্তেছে।

চমৎকার রান্নার হাত বড় বিবির। খেতেও হয় না—সে রান্নার খোশবুতেই মেজাজ খোশ হয়ে যায়।

যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা হাঁড়িকাবাবটা নাকের সামনে দুলছে এখনো। দারোগা গুন্ গুন্ করে 'মোহব্বত-এ-দিল্' ছবির একখানা গান গাইতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু থানার কম্পাউণ্ডে ঢুকেই চক্ষুঃস্থির। বারান্দায় একখানা চেয়ার টেনে বসে আছেন ইন্‌স্পেক্‌টার ইমতিয়াজ চৌধুরী। জমাদার জামান মিঞা পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ইন্‌স্পেক্‌টারের আরদালী আবদুল প্রায় কাঁদি খানেক ডাব নিয়ে কাটতে বসেছে!

দারোগা দীন মহম্মদ ট্যারা হয়ে গেলেন। ইন্‌স্পেক্‌টার ইমতিয়াজ চৌধুরী অত্যন্ত প্যাঁচালো লোক—মহকুমার একটি দারোগাও তাঁর জ্বালায় স্বস্তিতে থাকতে পারে না। তার ওপর দীন মহম্মদকে তিনি মোটেই নেক-নজরে দেখেন না—ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাতদিন।

বারান্দায় সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে শশব্যস্তে দারোগা ওপরে উঠে এলেন।

—আদাব স্যার, কতক্ষণ এসেছেন?

ইন্‌স্পেক্‌টার তখন কুঁজোর মতো প্রকাণ্ড একটা ডাব ধরেছেন মুখের কাছে। গলার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছে গব্‌ গব্‌ করে। ডাবটা নিঃশেষ করে ইন্‌স্পেক্‌টার সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, মুখ মুছলেন রুমালে, একটা ঢেঁকুর তুললেন, তারপর গোটা কয়েক নিঃশ্বাস ফেললেন বড় বড়। নাক থেকে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেমন

যেন শব্দ বেরিয়ে এল খানিকটা।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, এই কিছুক্ষণ হল এসেছি। সাপুইহাটির ডাকাতি কেস্‌টা নিয়ে একটু দরকারী আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে। তা ছাড়া ইন্‌স্‌পেক্‌শনও করব।

মনে মনে একটা অশ্রাব্য গালাগালি উচ্চারণ করলেন দারোগা।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, আমার সময় বেশিক্ষণ নেই। জীপ্‌ নিয়ে এসেছি, একটু পরেই আমি সদরে ফিরে যাব। অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম, ভাবলাম আপনার এখানেও একটু ঘুরে যাই।

কৃতার্থ ভঙ্গিতে দীন মহম্মদ বললেন, বেশ করেছেন স্যার, ভালোই করেছেন। তা হলে আমার ওখানে খানাপিনার একটু বন্দোবস্ত করি?—মনে মনে বললেন, তুমি না সরে পড়া পর্যন্ত মোরগাটা আমি জবাই করছি না। তোমার খাওয়া তো আমি জানি—আমাদের জন্যে হাড় ক'খানাও পড়ে থাকবে না তা হলে। চিবিয়ে তা-ও তুমি ছিবড়ে করে দেবে!

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, না—না, আমি খেয়েই এসেছি। আমার জন্যে ভাববেন না।

দারোগা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই সন্ধ্যা হবে এ তো জানা কথা!

অতএব পরক্ষণেই ইমতিয়াজ চৌধুরীর চোখ গিয়ে পড়ল সাইকেলে বাঁধা মোরগাটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ালের চোখের মতো জলজল করে উঠল তাঁর দৃষ্টি!

—বাঃ—বাঃ, দিব্যি চিজটি তো! কোথায় পেলেন?

দারোগার হৃৎপিণ্ড ধড়াস্‌ করে লাফিয়ে উঠল। বিরস মুখে বললেন, কিসের কথা বলছেন স্যার?

—ওই মোরগাটা। বহুদিন এমন জিনিস চোখেও দেখিনি।

দারোগা আর্ত হয়ে উঠলেন।

—ও বিশেষ কিছু নয় স্যার। ওর চাইতে ঢের ভালো মোরগা শহরে পাওয়া যায়।

—ক্ষেপেছেন আপনি?—ইন্‌স্‌পেক্‌টার উবু হয়ে বসলেন: শহরের মোরগায় কি আর বস্তু আছে নাকি? খালি হাড় আর হাড়—মনে হয় যেন মাছের কাঁটা চিবুচ্ছি। এ সব জিনিস শুধু পাড়াগাঁয়েই পাওয়া যায়। তাজা জল-হাওয়ায় তেলে-মাংসে জবজবে হয়ে ওঠে।

ইন্‌স্‌পেক্‌টারের জিভে সুড়ুৎ করে শব্দ হল একটা; খানিক লালা টানলেন খুব সম্ভব।

দারোগা কাষ্ঠহাসি হাসলেন : বেশ তো স্যার—পরে দু'চারটে পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

—পরের কথা পরে হবে !—ইন্‌স্‌পেক্‌টার আর মোরগাটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না : এটার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। আবদুল, যা তো মোরগাটাকে জীপে তুলে নে।

চড়াৎ করে বুকের একটা শিরা যেন ছিঁড়ে গেল দারোগার।

—আমি বলছিলাম কি স্যার—

—আরে মিঞা সায়েব, আপনারা পাড়াগাঁয়ে থাকেন, ও-রকম মোরগা বিস্তর পাবেন। আবদুল, যা—ওটাকে জীপে তুলে দে চট্‌পট্। ভালো কথা, কত দিয়ে কিনেছেন মোরগা ?

শেষ কথাটা বলবার জন্যেই বলেছিলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার—নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই বলা। নইলে একটা মুরগী দিয়ে দারোগা ইন্‌স্‌পেক্‌টারের কাছ থেকে দাম নিতে পারে—কে কল্পনা করবে সে কথা ?

মনে মনে দাড়ি ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল দারোগার। নিজের নয়—ইন্‌স্‌পেক্‌টারেরও।

সদয় হাসিতে ইন্‌স্‌পেক্‌টার আবার বললেন, কত দাম ওটার ?—এই বলে যে-পকেটে তিনি হাত ঢোকালেন সেখানে টাকা ছিল না।

কিন্তু বজ্রাঘাত হল বিনা মেঘেই।

নিরুপায় ক্রোধে জর্জরিত হয়ে কালো মুখে দারোগা বললেন, তা হলে চারটে টাকাই দেবেন স্যার।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। জমাদার জামান খাঁ নড়ে উঠলেন, ডাব কাটতে গিয়েই দায়ের কোপটা আর একটু হলে প্রায় আবদুলের হাতে গিয়ে পড়ত। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ।

দারোগা মরিয়া হয়ে বললেন, দাম একটু বেশিই স্যার। পুরো দেড় সের গোস্ত হবে—দু'-এক ছটাক বেশি বই তো কম নয় !

অদ্ভুত প্রশান্ত হাসি হাসলেন ইম্‌তিয়াজ চৌধুরী।

—তা বটে। ভালো জিনিস হলে দাম একটু চড়াই হয়। এই নিন—এবার আর একটা পকেট থেকে দু'খানা দু'টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখলেন : এই নিন। আবদুল—

—যাতে হেঁ হুজুর—

আবদুল মোরগাটাকে খুলে নিলে সাইকেল থেকে। আর একবার কঁক্-কঁক্-

ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল একটা। দারোগা মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার বললেন, তা হলে এবার আপনার ডাইরি-টাইরিগুলো নিয়ে আসুন দারোগা সাহেব। হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

*   *   *   *

—ভাগ্‌তা হ্যায় হুজুর, ভাগ যা-তা—আবদুল চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেও রাখা গেল না। আবদুলের প্রসারিত হাতে গোটা কয়েক নখের আঁচড় দিয়ে পাখা ঝাপ্‌টে চলন্ত জীপ থেকে বাইরে উড়ে পড়ল মোরগটা! দবিরুদ্দিনের আলগা ফাঁস কখন খুলে গিয়েছিল কে জানে!

—থামা, গাড়ি থামা!—ইমতিয়াজ চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠলেন।

গাড়ি ব্রাস্‌-স্‌ করে থেমে গেল। ছরাৎ ছরাৎ করে একরাশ কাদা ছিট্‌কে পড়ল চারদিকে।

মোরগ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্যাঁক্‌ ক্যাঁক্‌ করে একটা কচুবনের দিকে ছুটেছে। 'পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো' বলে উত্তেজনায় ইন্‌স্‌পেক্‌টার নিজেই লাফিয়ে পড়লেন নিচে।

কিন্তু পায়ের নিচে এঁটেল মাটির কাদা। লাফিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সড়াক্‌ করে হাত তিনেক পিছলে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার, তারপর নাচের ভঙ্গিতে বোঁ করে একটা পাক খেলেন, তারও পরে একখানা মোক্ষম আছাড়—একেবারে সোজা চলে গেলেন লাটাবনের ভেতরে।

আবদুল আর ড্রাইভার ছুটেছিল মোরগের পেছনে—দৌড়ে ফিরে এল তারা। ইন্‌স্‌পেক্‌টার তখন আর উঠতে পারছেন না—একটা হাঁটুতে বোধ হয় ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। লাটাবনের কাঁটায় গাল-কপাল ক্ষতবিক্ষত!

ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে যখন জীপে তোলা হল, তখন আর পলাতক মোরগাকে খুঁজে বের করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। খোঁজবার মতো কারো মনের অবস্থাও নয়।

সন্ধ্যা নামছিল আস্তে আস্তে। ঘরের দাওয়ায় চুপ করে বসে ছিল ইদু মিঞা। মোরগার শোক এখনও তার বুকে পুত্রশোকের কাঁটার মতো বিঁধছে। হঠাৎ যেন শূন্য থেকে শোনা গেল: কঁক্‌—কোঁকোর—কোঁ—

ইদু মিঞা চমকে উঠল। সেই ডাক! ভুল শুনছে না তো? নাকি মোরগটার প্রেতাত্মা মায়ার টানে শূন্য থেকে জানান দিয়ে গেল?

আবার সেই ডাক: কঁক্‌—কঁক্‌—কোঁকর-কোঁ-ও-ও—

উঠোন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জোহরা: সাহেব, তোমার মোরগ ফিরে এসেছে!

বসে আছে চালের ওপর !

ইদু লাফিয়ে নেমে পড়ল উঠোনে। সত্যিই ফিরে এসেছে ! গাঁয়ের মোরগ—বহুদূর পর্যন্ত চরে বেড়ায়—মাইল খানেক রাস্তা চিনে আসতে খুব অসুবিধে হয়নি তার।

চালের ওপর বসে তৃতীয়বার মোরগ জয়ধ্বনি করল। তারপর ঝট্‌পট করে উড়ে পড়ল উঠোনে—বিজয়ী সম্রাটের মতো মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল নিজের খোঁয়াড়ের দিকে।

আরো তিনটে ছোট ছোট ঘটনা ঘটল তারপরে।

কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার জন্যে এক মাস পরে দারোগার রিপোর্টে দবিরুদ্দিন দফাদারের চাকরি গেল।

প্রায় দেড় মাস পরে ভাঙা হাঁটুতে জোড় লাগল ইন্‌স্‌পেক্‌টার ইমতিয়াজ চৌধুরীর।

আরো তিন মাস পর সাপুইহাটি ডাকাতির ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাস্‌পেণ্ড হয়ে গেলেন দারোগা দীন মহম্মদ।

হরিণের রঙ

পর পর দুটো দিন খুব খারাপ গেছে। কী যে হয়েছে, ও ভালো করে মনেও আনতে পারে না। কখনো কার একটা হিমের মতো ঠাণ্ডা হাত হৃৎপিণ্ডের কাছে উঠে এসেছে—চেপে ধরতে চেয়েছে বজ্রমুঠিতে। কখনো বা চোখের সামনে নিবিড় কুয়াশার মতো ধোঁয়া এসে জমেছে। সে-ধোঁয়া পাথরের মতো ঘন হয়েছে ক্রমশ—শ্বাস টানতে পারেনি ভালো করে, অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে মনে হয়েছে সাপের মতো কী যেন পাক দিয়ে দিয়ে ধরছে ওর গলায়। আবার কখনো বোধ হয়েছে যেন আশ্চর্য লঘু হয়ে গেছে ওর শরীর—পাখির একটা পালকের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে ও। ঠিক মেঘের মতো। অনেক—অনেক নীচে দীর্ঘ ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে অজস্র হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। একটা—দুটো—একশো—এক হাজার—

অসংখ্য হরিণের গায়ে সেই লক্ষ লক্ষ বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও একটা বিন্দুর মতো

ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর সেই বিন্দুটা চৈতন্যের একটা বৃত্তের রূপ নিল, এক টুকরো মন ক্রমে ক্রমে সজাগ হয়ে উঠল যন্ত্রণাভরা একটা শরীরে। মাথায় পাথরের ভার, হাত-পাগুলো অবশ, বুকের ভিতর থেকে-থেকে অসহ্য বেদনায় উৎক্ষেপ !

ক্রাইসিস্ কেটেছে একটা। মেঘ নেমেছে মাটিতে। ফিরে এসেছে শরীর—সেই সঙ্গে এসেছে ফিডিং কাপ, এসেছে ওষুধের শিশি, এসেছে থার্মোমিটার, পান্নার রঙের একগুচ্ছ আঙুর—কমল-হীরের মতো আধভাঙা বেদানার দানা। ঘরের ওই যে কোণটায় আবছা অন্ধকারের ভেতর ছায়া-ছায়া দু'-তিনজন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছিল, তারা 'মথ্' হয়ে বাইরের রাত্রির আড়ালে মিলিয়ে গেছে ; এখন ওখানে কাশ্মীরী টিপয়ের উপর সেই পুরনো পরিচিত রেডিয়োটা মৃদু গুঞ্জন করছে—জ্বলজ্বল করছে তার সবুজ 'ম্যাজিক আই'।

এই কি ভালো হল ? এমনি করে ফিরে আসা ? কত বড় মাঠ—সবুজের কী অন্তহীন তরঙ্গ ! কত অসংখ্য হরিণ—তাদের গা থেকে লাল-শাদা রঙগুলো যেন একরাশ বলের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। ওরও সমস্ত মন যেন ওই বলগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল—হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গিয়েও হারিয়ে যাচ্ছিল বার বার।

বেশ লাগছিল খেলাটা। তবু শরীরের ভেতরে ফিরে আসতে হল।

—আমায় একবার ধরবি নন্দা ?

এই সকাল বেলাতেই নন্দা কয়েকটা ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ঘরে। চমকে ফিরে তাকালো।

—একটু বারান্দায় নিয়ে চল্ নন্দা। ঘরে শুয়ে শুয়ে আর তো ভালো লাগছে না।

ও জানত, নন্দা কিছুতেই রাজী হবে না। আলতো ধমক দিয়ে বলবে, কী পাগলামী করছ বৌদি ! ডাক্তার তোমাকে নড়তে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে !—জেনেই ও বলেছিল কথাটা। বলেছিল দুদিন পরে নিজের কথা নিজের কানে শোনবার জন্যেই।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ তো নন্দা রেগে উঠল না। ভারী নরম, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, কিন্তু তুমি তো উঠে যেতে পারবে না বৌদি। ভারী কষ্ট হবে তোমার।

—কিচ্ছু কষ্ট হবে না।—ও হাসল। একবারের জন্যে মনে হল, একখানা আয়না সামনে পেলে দেখত নিজের হাসিটা আজও আগের মতো আছে কিনা। যা দেখেই নাকি বিশেষ করে অনিল ওর প্রেমে পড়েছিল সে-হাসি এখনো একটুখানি জড়িয়ে আছে কিনা ওর ঠোঁটের কোণায়।

—একটু হাতটা ধর্ নন্দা, তা হলেই আমি ঠিক উঠে যেতে পারব। আজ ভালো আছি—সব অসুখ সেরে গেছে আমার।—ও আবার হাসল। ইচ্ছে করল ছোট আয়নাটা চায় নন্দার কাছে, কিন্তু কেমন বাধো-বাধো ঠেকল।

নন্দা কাছে এগিয়ে এল। কোনো কথা বললে না, আস্তে আস্তে ধরে বাইরে নিয়ে এল। ঘর থেকে বারান্দার পথ হাত দশেকের বেশী না। তবু মনে হচ্ছিল, ও যেন অনেকদিন ধরে অনেক পাহাড় পার হয়ে চলেছে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না—আজ ছ মাস পরে শরীরটা অদ্ভুত লঘু হয়ে গেছে ওর। নন্দা এখন ওর হাত ছেড়ে দিলেই ও যেন মাটি ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে—পেরিয়ে যেতে পারবে সামনের বাগানটা, লাল মাটির পথটুকু দূরে। শালবন, পাহাড়ের টিলাটা, রূপনারায়ণপুরের স্টেশন—তারপর—

বারান্দায় বড় ডেক-চেয়ারটায় শুইয়ে দিলে ওকে। পাখির ছানা রেখে দেওয়ার মতো সতর্ক কোমল ভঙ্গিতে ঠিক করে দিলে মাথাটা। দুধের ফেনার মতো শাদা শালটাকে সযত্নে বিছিয়ে দিলে শরীরের উপর। তারপর একটু দূরে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে রইল তন্ময় হয়ে।

নন্দার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ওর কষ্ট হচ্ছিল—তাই সামনের দিকে চোখ মেলে দিলে। মগ্ন-চৈতন্যের সেই প্রখর উজ্জ্বল রোদটা নয়—বাগান, লাল মাটির পথ আর শালবনের ওপরে আধ-পাকা কমলা লেবুর রঙ ঝিল্‌মিল্ করছে। শরতের রোদ। কাছাকাছি কোনো নদী থাকলে তার বালিডাঙায় কত কাশফুল দেখা যেত এখন।

ইটের কেয়ারির ভিতরে দুটো একটা সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার মুখ খুলছে। কয়েকটা দোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার মঞ্জরী প্রায় জড়াজড়ি করে হাওয়ায় কাঁপছে। বাঁ-দিকের শাদা হয়ে যাওয়া শিউলিতলা থেকে পচা ফুলের কেমন একটা অস্বস্তিকর গন্ধ ভেসে আসছে ঝলকে ঝলকে।

—তোর দাদা কোথায় নন্দা?—ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কষ্ট হয়, তাই সামনের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

—কিছু বলছিলে বৌদি?—যেন স্বপ্ন থেকে নন্দা জেগে উঠেছে।

—এই সকালে তোর দাদা আবার গেল কোথায়?

—রজতদা—মানে ডাক্তারবাবুর ওখানে!

রজতদা—মানে ডাক্তারবাবু! কি রকম সামলে নিয়েছে নন্দা! কিন্তু একটুখানি ঠাট্টা করতেও ইচ্ছে হয় না মেয়েটাকে। ভারী ভীতু—ভারী কোমল। ফুলের উপর শিশিরের মতো চোখ দুটো জলে যেন টলটল করছে—সামান্য ছোঁয়া লাগলেই টুপ্

টুপ্ করে গড়িয়ে পড়বে।

ওকে বিয়ে করলে সুখীই হবে রজত। যে-কেউ সুখী হবে। অবশ্য গায়ের ফর্সা রঙটাকেই যারা বড় করে দেখে তাদের কথা আলাদা।

একটু কষ্ট হল, তবু নন্দার দিকে মাথা ঘুরিয়ে একবারটি তাকিয়ে দেখবার লোভ ও সামলাতে পারল না। তেমনি তন্ময় হয়ে বসে আছে নন্দা। শালবনটা দেখছে? দেখছে পাহাড়টাকে? নাকি রজতকে ভাবছে—রজতের কথাই ভাবছে শুধু?

—আবার এই সকাল বেলাতেই রজতবাবুকে বিরক্ত করা কেন?—নন্দার কালো বিনুনিতে লাল ফিতের ফাঁসটা দেখতে দেখতে ও বললে, আমি খুব ভালো আছি আজ। মনে হচ্ছে, একেবারেই সেরে গেছি।

নন্দা এবার ওর দিকে চোখ ফেরাল। সেই টলটলে চোখ। আজকে যেন আরো বেশি চকচক করছে। মনে হচ্ছে কেবল কয়েক ফোঁটা জলই নয়—ও দুটোই কখন ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়তে পারে।

নন্দার ঠোঁট দুটো খুব অল্প অল্প নড়ে উঠল, যেমন করে মৌমাছির ডানার হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি নড়ে ওঠে। আবার নিঃশব্দ স্বর ভেসে এল: আজ আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না বৌদি?

—কিচ্ছু না। একেবারেই নয়।—পুরো ছ'মাস পরে আজ ও সম্পূর্ণভাবে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, একটা ছোট্ট কাঁটাও খচ্‌খচ্ করল না কোনোখানে।

—এ তো খুব ভাল কথা বৌদি।

—ভালো কথা আর কী করে হল?—ওর মনের অপরিমিত খুশিটা কমলা রঙের রোদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল: আবার তো তোর দাদাকে বকাবকি করব। মার্কেটিঙে নিয়ে যাবার জন্যে বিরক্ত করে মারব। তার চেয়ে আমি মরে গেলেই ভালো হত। তোর দাদা বেশ শান্তশিষ্ট মনের মতো একটি বউ ঘরে আনত—সাত চড়েও একটি রা ফুটত না যার মুখ দিয়ে। না রে?

—কী যে বলছ বৌদি!—অভ্যাসবশে আজও প্রতিবাদ করল নন্দা; কিন্তু সে রাগের ভঙ্গিটা নেই কোথাও—কেমন ভিজে ভিজে গলার স্বর। রজতের কথা ভাবছে নন্দা?

—কিন্তু আমি মরব না। দু'দিনের ধাক্কা যখন সামলে উঠেছি—আর মরব না। দেখিস, এক মাসের মধ্যেই আবার আগেকার শরীর ফিরে পাব আমি—আবার ব্যাড্‌মিন্টন খেলব তোদের সঙ্গে। তোর দাদার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। দিব্যি আর একটা বিয়ে করার চান্স পাচ্ছিলেন—একটুর জন্যে ফসকে গেল।

—এত কথা বলছ বৌদি—তোমার ক্ষতি হতে পারে।

—ক্ষতি হবে কি রে? দেখছিস না, এক কোঁটা জ্বর নেই আজ? শরীরটা কেমন হালকা হয়ে গেছে। আজ কিন্তু দুটি ভাত খাব আমি, বলে দিস ঠাকুরকে।

—বেশ তো, দাদা ওঁরা আসুন। যদি বলেন—নন্দার ঝাপ্‌সা স্বর ভেসে এল।

—ওঁরা আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?—নিজের মনেই ও কথা কইতে লাগল। বাগানের ফুলগুলো, শালবনের ভিতর দিয়ে লাল মাটির পথ—দূরের পাহাড়টা—শরতের ঝিলমিলে রোদ-মাখানো এদের সকলের সঙ্গেই কথা কইতে লাগল ও। নন্দা সামনে না থাকলেও চলত এখন।

—এখন ভালো হয়ে উঠতেই হবে আমাকে: পৃথিবীর ঘন গন্ধ, বাগানের মাটিতে অভ্রের ঝিকিমিকি, পাশাপাশি সই-পাতানো দোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার দোলা ওর রক্তে রিন্‌রিন্ করতে লাগল: ইস্—এই ছ'টা মাস কী ভাবে কেটেছে! কিছু দেখতে পারিনি—একটা কাজ করতে পারিনি বাড়ির। মণ্টু আর খোকন একেবারে পড়াশুনো করেনি, ঝিটা ডজন ধরে কাচের গেলাস আর চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে, তোর দাদা ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যা-খুশি খেয়ে বেড়িয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে—আবার গুছিয়ে নিতে হবে সমস্ত। কত কাজ—কত কাজ আমার!

কেন ছট্‌ফট্ করে উঠল নন্দা? কেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো? ওর ভালো লাগছে না? রজতের কথা ভাবছিল—ও কি তাতে বাধা দিচ্ছে বারে বারে? একটুখানি লজ্জিত হয়ে ও চুপ করল। নন্দা আস্তে আস্তে নেমে গেল বারান্দা থেকে—শিউলি গাছটার পাশে একরাশ বিবর্ণ ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

ও নন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। নন্দাকে দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে সাত বছর আগেকার নিজেকে—যখন ওর বয়েস ছিল সতেরো, যখন ও থার্ড ইয়ারে পড়ত। অনিল এসে দাদার সঙ্গে গল্প করে চলে যাওয়ার পর এমনিভাবে ও-ও এসে বসত শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়ির দোতলার বারান্দায়—নিজের মধ্যে মন ডুবিয়ে চেয়ে থাকত খানিকটা সবুজ পোড়ো জমি আর টালির বস্তির দিকে। অনিলকে ভাবতে চাইত, কিন্তু আশ্চর্য—অনিলের মুখখানা কিছুতেই ওর মনে আসত না। খালি চোখের উপর ভেসে উঠত, সিউড়ীতে ময়ূরাক্ষীর ধারে বৃষ্টি থেমে যাওয়া শীতল একটা শান্ত গোধূলি, তালবনের উপর নিখুঁত একটা সম্পূর্ণ রামধনু। অতবড় রামধনু জীবনে ও কোনোদিন দেখেনি।

নন্দা কি ভাবতে পারছে রজতের মুখ? কিংবা ভাবছে শেষ রাত্রের কোনো গ্যাস্ পোস্টের স্তিমিত আলোটার কথা? কিংবা গিরিডির সেই মহুয়া গাছটার এক ঝাঁক হরিয়াল? কিংবা?

খুব ভালো হবে রজতের সঙ্গে নন্দার বিয়ে হলে। খুব খুশি হবে ও। কতদিন বিয়ে হয়নি বাড়িতে। সানাইয়ের সুর—নানা রঙের শাড়ি—হাসি, গান, কোলাহল, চারদিকের জোরালো আলোগুলোতে পর্যন্ত চেলী চন্দনের রঙ। কতদিন দেখেনি। সেই বিয়ের দিনে আবার পাঁচ বছর পরে ও বেনারসী পরবে একখানা; ফুলশয্যার রাত্রে যে গন্ধের শিশিটা উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল ওর শাড়িতে, ওদের বিছানায়, আবার তাই একটু মেখে নেবে নতুন করে। নন্দার এই রাতটির মধুচক্র থেকে ও-ও চুরি করে নেবে একটুখানি, সংগ্রহ করে রাখবে এক ছড়া মালা আর একটুখানি চন্দন; নিরিবিলি সুযোগ পেলেই সেই চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেবে অনিলের কপালে, মালাটা ঝুলিয়ে দেবে গলায়। অনিল আশ্চর্য হয়ে একটাও কথা বলবার আগেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে পালিয়ে যাবে সামনে থেকে—পাঁচ বছর আগে যেমন করে পালিয়ে যেত।

কল্পনাটা ওর মনে একটু একটু করে নেশার মতো ঘনিয়ে আসতে লাগল। আবার একটা হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। দেড় মাস আগে যখন ওকে হাসপাতাল থেকে অনিল নিয়ে এল—সেদিন কেউ কোনো কথা বলেনি; কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল—বুঝতে পেরেছিল সকলের মেঘলা মুখের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়েছে। আমাদের আর কিছু করবার নেই—এখন তোমাদের মধ্যে গিয়েই শেষের ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিক। আর সেই শান্তিতে যাতে এতটুকুও ব্যাঘাত না হয় সেই জন্যেই অনিল ওকে এখানে নিয়ে এসেছে—এই শালবনে, লাল মাটির এই পথের ধারে, আধ-পাকা কমলা লেবুর মতো এই ঘুম্-ঘুম্ রোদের ভেতরে।

গত দুদিন ধরে সেই ছুটির ডাক ও শুনেছিল। গলার ওপরে সাপের বেড়ীর মতো কী একটা পাক দিয়ে দিয়ে ধরছিল বার বার। ঘরের কোণে সেখানে পরিচিত রেডিয়োটার 'ম্যাজিক আই' জ্বলছে, ওখানে দাঁড়িয়ে শাদা-শাদা দু'-তিনজন কী যেন আলোচনা করছিল ফিস্‌ফিস্ গলায়। আর ছিল সীমানাহীন একটা মাঠের ভিতর অসংখ্য অগণিত হরিণের রঙ—একরাশ রঙিন বলের মধ্যে নিজেকে ও খুঁজে ফিরছিল, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই।

কিন্তু সে-ঘোর ওর কেটে গেছে। যে-শরীরটাকে ফেলে ও চলে যেতে চাইছিল—এখন সেই শরীরটাকেই গভীর মমতার সঙ্গে ও জড়িয়ে থাকতে চাইছে। নিজের শুভ্র শীর্ণ ডান হাতখানা ও চোখের সামনে তুলে ধরল। আঙুলগুলো যেন হাতীর দাঁত দিয়ে গড়া—বিবর্ণ নীরক্ততার ওপরে আংটির চুনীটা জমাট রক্তের মতো টক টক করছে। তবু হাতখানাকে ওর ভালো লাগল—ভালো লাগল সমস্ত শরীরটাকে—

ভালো লাগল আলো-গন্ধ-মাটির মধ্যে এমনি নিবিড় হয়ে বসে থাকতে।

—আর ভয় নেই, এবার আমি বাঁচব। আর আমি মরব না।—হাতখানাকে ও বুকের উপর নামিয়ে আনল, অনুভব করতে চাইল নিজের জীবনের স্পন্দন। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে—বেঁচে থাকার কথা ভাবতেও আশ্চর্য আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার মন। মাত্র চব্বিশ বছর আমার বয়েস—এখনো কোনো কিছু আমার শুরুই করা হয়নি। খুব ভালো আছি আজ—ছ' মাসের মধ্যে এত ভালো কখনো থাকিনি। এখন আমি অনেকদিন বাঁচব।

হ্যাঁ। নন্দার বিয়ের দিনে। সেই দিনই আরম্ভ করতে হবে আবার। হঠাৎ কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে গলায় মালা ঝুলিয়ে দিলে কি রকম হবে অনিলের মুখের চেহারা? কৌতুকভরা সুখের আবেশে ওর মন ডুবে যেতে লাগল। কোন্ শাড়িটা পরব? ওই আকাশের মতো মৃদু নীল যার রঙ? কিংবা লাল মাটির পথটার লাল আভা দিয়ে যেটা জড়ানো? কোন্‌টা পরব আমি—কোন্‌খানা?

আসন্ন সানাইয়ের সুরে, আগামী সুগন্ধের রোমাঞ্চে, ভালো হয়ে—সম্পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দে ও এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেল যে টেরই পেল না কখন গেট দিয়ে ঢুকল অনিল আর ছোকরা ডাক্তার রজত। দেখতেই পেল না কখন নন্দার ভীতি-ব্যাকুল মুখের ওপরেও একটুখানি লজ্জার আভাস দোল খেয়ে উঠল। এমন কি অনিল আর রজত যখন ওর পাশে এসে দাঁড়াল, রক্তবিন্দুর মতো চুনীর আংটিপরা শীর্ণ শুভ্র হাতখানা রজত তুলে ধরে যখন পরীক্ষা করতে লাগল—তখনো না—তখনো ওর ঘোর ভাঙল না। তাকিয়েও দেখল না বারান্দার কোণায় কখন অনিলকে ডেকে নিয়ে গেল রজত।

—আপনার মাকে এখুনি টেলিগ্রাম করে দিন অনিলদা। আর দেরি করবেন না—

—কিন্তু আশ্চর্য ভালো ছিল সকাল থেকে—একটুও কষ্ট ছিল না—সব জেনে, সব বুঝেও বলতে চাইল অনিল। রজতকে নয়—যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল শেষ চেষ্টায়।

—'টি-বি'র লাস্ট স্টেজে ওটা জীবনের আলেয়া অনিলদা। রাতটাও বোধ হয় কাটবে না।

অনিল জানে—রজতের চেয়ে বেশি করেই জানে। তৈরিও হচ্ছিল একটু-একটু করেই। তবু পাংশু হয়ে গেল মুখ। নন্দার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল না—কেবল শরীরটাকে এলিয়ে দিলে থামের গায়ে, নইলে হয়তো মাটিতেই লুটিয়ে পড়ত।

—আপনি থাকুন, আমিই বরং টেলিগ্রামটা করে আসছি—রজত বলল।

কিন্তু ও তখনো স্বপ্ন দেখছিল। আর নিজের অজ্ঞাতেই আস্তে-আস্তে আকাশ-মাটি-রোদ-শাড়ি আর সানাইয়ের সুর কখন মুছে যাচ্ছিল একটু-একটু করে।

আবার সেই মেঘ হয়ে ভেসে যাওয়া। আর নীচে নিবিড়-উজ্জ্বল সবুজ মাঠের ভিতর সেই অজস্র অসংখ্য হরিণের রঙ।

গন্ধরাজ

রেল লাইন ছাড়িয়ে কত দূরে ময়ূরাক্ষী? আরো কত দূরে?

কাঁকর-ছড়ানো মাটি। অসুর-মুণ্ডের মতো ছোট-বড় ঢিবি ছড়িয়ে আছে আচক্রবাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো এক রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন এই মাঠ। কোনো কোনো ঢিবির ওপরে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার এক-আধটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আজে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। হাঁপানি রোগীর গলায় অতিকায় মাতুলীর মতো এক-একটা হাঁড়ি ঝুলছে কোনো-কোনোটাতে। রুক্ষ মাটির যা শ্রী—এক ফোঁটাও রস গড়ায় বলে মনে হয় না।

ক্যান্‌ভাসার শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী, হাল সাকিন বারোর সাত ছকু খানসামা লেন, জিলা কলিকাতা—একবার থমকে দাঁড়ালো। এ জেলায় এই তার প্রথম আবির্ভাব। শুনেছিল ময়ূরাক্ষী পার হয়ে—একটা শাল-পলাশের বন ছাড়ালেই ব্রজপুর গ্রাম। ময়ূরাক্ষী নদী, শাল-পলাশের বন, গ্রামের নাম ব্রজপুর। তিনটে একসঙ্গে মিলে মনের মধ্যে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল দস্তুরমতো। সুধাংশু চক্রবর্তী কল্পনাতে আরো খানিক জুড়ে নিয়েছিল এদের সঙ্গে সঙ্গে। হোক শীতকাল, থাকুক চারদিকে শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুতা—তবু ব্রজপুর এদের চাইতে অনেকখানি আলাদাই হবে নিশ্চয়। তার গাছে গাছে কোকিল ডাকতে থাকবে, ফুলের গন্ধ বয়ে বেড়াবে বাতাস, তার মাঠে মাঠে শ্যামলী ইত্যাদি ধেনুরা চরে বেড়াবে। বেণু বাজবে এবং সন্ধ্যে হলেই শ্বেত-চন্দন ঘষা একখানি পাটার মতো পূর্ণচাঁদ উঠে আসবে আকাশে।

কিন্তু কোথায় কী!

আপাতত মাঠ আর মাঠ। দেড় বছরের পুরনো জুতোটা নতুন জুতোর মতো মচ্ মচ্ আওয়াজ করছে তলার কঠিন কাঁকরে। এদিকে কি ডালভাঙা ক্রোশ? তিন মাইল পথ যে আর ফুরোয় না!

সামনেই ছোট খাল একটা। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে পড়েছে অনেকখানি ঢালুতে। হোক মরা খাল—তবু তো এতক্ষণে জলের দেখা পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল,

সে বুঝি বোখারা-সমরখন্দের কোনো মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ হাঁটছে!

একটা গরুর গাড়ি ছপ্‌ছপিয়ে উঠে এল খাল পেরিয়ে। চাকা থেকে তরল কাদা গলে গলে পড়ছে তার। গাড়োয়ান সাঁওতাল। খোলা ছইয়ের ভেতরে রুপোর হাঁসুলীপরা একটি কালো মেয়ে বসে আছে—নিবিড় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে তাকালো সুধাংশুর দিকে। একফালি জলের সঙ্গে একটি তরল দৃষ্টি যেন সুধাংশুর সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে।

—ভাই, ময়ূরাক্ষী কত দূর?

গাড়ির ভেতরে মেয়েটি হেসে উঠল। গাড়োয়ান আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখল সুধাংশুর। বিদেশী।

বললে, এটাই তো ময়ূরাক্ষী নদী।

—অ্যাঁ! এই নদী!

কয়েক বছর আগে যে সুধাংশু চক্রবর্তী বাস করত মেঘনা নদীর ধারে এবং অধুনা বাস্তুহারা হয়ে সে বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে বাসা বেঁধেছে, তার পক্ষে এটা শোনবার মতো খবর বটে! নদী এর নাম! এবং কাব্য করে একেই বলা হয় ময়ূরাক্ষী!

কিন্তু বিস্ময়টা ঘোষণা করে শোনাবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না। গোরুর গাড়িটা ততক্ষণে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটার ওপরে উঠে গেছে—শুধু খোলা ছইয়ের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে এখনো।

আপাতত নদী পার হতে হচ্ছে তা হলে।

খেয়া পাড়ি দেবার সমস্যা নেই—সাঁতারও দিতে হবে না। এক হাতে জুতো, আর এক হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ধরলেই চলবে। সুধাংশুও তাই করল। পায়ের তলায় কিছু দলিত শ্যাওলা, ভাঙা ঝিনুকের টুকরো আর এঁটেল কাদা অতিক্রম করে সে ওপারে পৌঁছুল। জুতোটা একরকম করে পরা গেল বটে, তবে পায়ের গোড়ালিতে আঠার মতো চটচট করতে লাগলো।

নদী তো মিটল। এবারে শাল-পলাশের বন?

সেও কাছাকাছিই ছিল; কিন্তু এর নাম বন? গোটা কয়েক মাঝারি ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। সুসঙ্গের পাহাড়ে-দেখা নিবিড় মেঘবর্ণ অরণ্য স্বপ্নের মতো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। এটা পার হলেই ব্রজপুর। সুধাংশুর কল্পনা ফিকে হতে শুরু করেছে।

ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।

লাল মাটির দেওয়াল—কিংবা টিনের চাল। খান দুই নোনাধরা দালান। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের চারদিকে অজস্র পোড়া মাটির ছোট ছোট ঘোড়া। ও জিনিসটা সুধাংশু আগেই চিনেছে—ধর্মঠাকুরের ঘোড়া ওগুলো।

কিন্তু ঘোড়া জ্যান্তই হোক আর মাটিরই হোক সে কখনো কথা কয় না এবং যুগের মাহাত্ম্যে ধর্মঠাকুর সম্প্রতি নির্বাক। পতিতপাবনী এম-ই স্কুলের হেড্‌মাস্টার নিশাকর সামন্তের হদিশটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে? কাছাকাছি কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের রোদে গ্রামটা ঘুমিয়ে আছে যেন।

আরো দু পা এগোতেই একটি ছোট দোকান।

তোলা উনুনে খোলা চাপিয়ে একটি লোক খই ভাজছে। বাঁশের খুন্তি দিয়ে নাড়ছে গরম বালি। পট্‌-পট্‌ করে ধান ফুটছে—মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খইয়ের দল খোলা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে।

সুধাংশু তাকেই নিবেদন করল প্রশ্নটা।

—ইস্কুল?—দু-তিনটে বিদ্রোহী খইয়ের আঘাতে মুখখানাকে বিকৃত করে লোকটা বললে, এগিয়ে যান সামনে। লাল রঙের বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবেন।

এ বাঁকটা আর ডাঙভাঙা ক্রোশ নয়—কাছাকাছিই ছিল এবং টিনের চালওয়ালা লাল রঙের বাড়িটাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করল না। আশায়-আনন্দে উৎসুক পা চালিয়ে দিলে সুধাংশু। 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি'র মালিক অক্ষয়বাবু আগেই চিঠি দিয়েছেন নিশাকর সামন্তকে। দু'জনে কিরকম একটা বন্ধুত্ব আছে। নিশাকর সামন্ত তাঁর ওখানে সুধাংশুকে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁরই বাড়িতে দিন চারেক থেকে আশেপাশের স্কুলগুলোতে বইয়ের ক্যান্‌ভাস করবে সুধাংশু। ইস্কুলের দর্শন পেয়ে তাই স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। অর্থাৎ থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে, কিছু খাদ্য জুটবে এবং হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে ঘণ্টা কয়েক!

ইস্কুল টিফিন পিরিয়ড চলছে খুব সম্ভব। বাইরে দাপাদাপি করছে একদল ছোট ছোট ছেলে। একটা টিনের সাইনবোর্ড কাত হয়ে ঝুলছে ইস্কুলের নাম। পিটা মুছে গেছে—মনে হচ্ছে অতীতপাবনী।

জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া বারান্দাটা পার হয়ে সুধাংশু এসে ঢুকল টীচার্স-রুমে। খান কয়েক কাঠের চেয়ার—মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। কাচভাঙা আলমারীতে ছেঁড়া-খোঁড়া খান ত্রিশেক বই, র‍্যাকে সাজানো গোটা কয়েক ম্যাপ। আলমারীর মাথা থেকে তিন-চারখানা বেতের ডগা উঁকি মারছে। আর এই দীনতার ভেতরে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে দেওয়ালে একটি সুহাসিনী সুন্দরী মহিলার

মস্ত একখানা অয়েলপেইন্টিং। খুব সম্ভব উনিই পতিত-পাবনী।

ঘরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুধাংশু। কলাই করা বড় একখানা থালায় একটি লোক তেল আর চীনে বাদাম দিয়ে মুড়ি মাখছে প্রাণপণে। খুব সম্ভব দপ্তরী। ছ' জোড়া চোখ লোলুপভাবে তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। টিফিনের ব্যবস্থা।

সুধাংশু একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ছ'জন মানুষ একসঙ্গে ফিরে তাকালেন। শীর্ণকান্তি জীর্ণদেহ ছ'টি খাঁটি স্কুল-মাস্টার। আসন্ন টিফিনের ব্যাপারে ব্যাঘাত পড়ায় স্পষ্ট অপ্রীতি ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখে।

সমবেত ছ'জনের উদ্দেশ্যেই কপালে হাতটা ঠেকাল সুধাংশু। তারপর বললে, নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে আসছি।

ততক্ষণে তার কাঁধে কলেজ স্কোয়ারের স্ফীতোদর ছিটের ঝোলাটি চোখে পড়েছে সকলের। একজন চশমাটা নাকের নিচের দিকে ঠেলে নামালেন খানিকটা। বিরসমুখে বললেন, বইয়ের এজেন্ট তো ?

— আজ্ঞে হাঁ।

—বসুন একটু।

একটা খালি টিনের চেয়ার ছিল একটেরেয়। সুধাংশু বসতেই ঠক-ঠক করে দুলে উঠল বারকয়েক। একটা পায়া একটু ছোট আছে খুব সম্ভব।

—আমি নিশাকরবাবুর কাছে এসেছিলাম—কলাইকরা থালায় মুড়ি মাখবার শব্দটা সুধাংশুর অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

—হেড্‌মাস্টারমশাই ?—প্রথম সম্ভাষণ যিনি করেছিলেন, তিনিই বললেন, তিনি তিন মাসের ছুটিতে দেশে আছেন। তাঁর খুড়িমা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে তারপর বিষয়-সম্পত্তির কী সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে ফিরে আসবেন।

চমকে উঠল সুধাংশু। ঢোঁক গিলল একটা।

—দিন চারেক আগে আমাদের পাবলিশার অক্ষয়বাবু তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন—

একটা প্লেটে করে খানিক মুড়ি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আর একজন বললেন, সেটা নিশ্চয় রি-ডাইরেকটেড হয়ে সাঁইথিয়ায় চলে গেছে—আপনি ভাববেন না।

না, ভাবনার আর কী আছে! মুড়ি চিবোনোর শব্দে সুধাংশু আবার ঢোক গিলল। মধ্য দুপুরের তীব্র ক্ষুধা এতক্ষণে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার। নিশাকরবাবুর বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবু—এই

দুপুরেও অন্তত দুটি ভাতের একটা নিশ্চিত আশা মনের মধ্যে জেগে ছিল তার। সুধাংশু এতক্ষণে বাস্তবভাবে অনুভব করল—ব্রজপুর সত্যিই অন্ধকার। তার কানু মথুরায় নয়—সাঁইথিয়ায় বিদায় নিয়েছেন।

কিছু ভাবতে না পারার আচ্ছন্নতায় সুধাংশু ঝিম ধরে বসে রইল কতক্ষণ। কী অদ্ভুত লোলুপভাবে যে মুড়ি খাচ্ছে লোকগুলো! একজন আবার টুকটুকে একটা পাকা লঙ্কায় কামড় দিচ্ছে—সুধাংশুর শুকনো জিভের আগায় খানিকটা লালা ঘনিয়ে এল। রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন! আঃ—অত শব্দ করে অমনভাবে চিবোচ্ছে কেন ওরা? ওদের খাওয়া কি শেষ হবে না কখনো?

আর থাকা যায় না। ওই একটানা শব্দটা অসহ্য।

—বই দেখবেন না?

—হাঁ—হাঁ নিশ্চয়।—তিন চারজন ঘাড় ফেরালেন। মুড়ির পাত্রগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। দু জন উঠে গেলেন হাত ধুতে।

—এই দেখুন—মুড়ি ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই একরাশ বই ছড়িয়ে দিলে সুধাংশু।

—ওঃ! গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং? আপনাদের অনেকগুলো বই তো আমাদের রয়েইছে মশাই!—

ধুতির কোঁচায় হাত মুছে একজন একটা বই তুলে নিলেন: 'জ্ঞানের আলো', 'স্বাস্থ্য সমাচার', 'ভূগোলের গল্প'—সবই তো আছে আমাদের।

—এবারেও যাতে থাকে, সেইজন্যেই আসা—অনুগত বিনয়ে সুধাংশু হাত কচলালো: তা ছাড়া আমাদের নতুন ট্রান্স্লেসনের বইটা দেখেননি বোধ হয়? বাই কে-পি পাজা, এম-এ বি-টি, হেডমাস্টার বামুনপুকুর এইচ-ই স্কুল।

—হুঁ!

—বাড়িয়ে বলছি না স্যার, বাজারে যে কোনো চলতি বইয়ের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখুন। সিম্প্লেস্ট প্রোসেস্, নতুন নতুন আইটেম, একটা ওয়ার্ডবুকও আছে সঙ্গে—

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজল। অবশিষ্ট টীচারেরা গোগ্রাসে মুড়ি শেষ করলেন।

প্রথম লোকটি হাই তুললেন: আপনি আপাতত এই এরিয়ায়ই তো আছেন? কাল তা হলে একবার দশটার দিকে আসুন। তখনই কথাবার্তা হবে। আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার—এবার আমার ওপরেই ভার। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার!—অগত্যা থলের মধ্যে বইগুলো পুরে সুধাংশু উঠে পড়ল।

আসুন। অর্থাৎ আবাহন নয়—বিসর্জন। আপনি যান; কিন্তু যাওয়া যায়

কোথায় ?

গ্রামটা যখন মাঝারি, তখন জেলা বোর্ডের একটা ডাকবাংলো কোথাও থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই জীর্ণ চেহারার দীন ক্যান্‌ভাসার—চৌকিদার কি আমল দেবে ? আর যদি বা থাকতেও দেয়—খাওয়া ছাড়াও দৈনিক দুটো টাকা চার্জ তো নির্ঘাৎ। স্কুল বইয়ের ক্যানভাসারের পক্ষে দৈনিক দু টাকা দিয়ে ডাক-বাংলোয় থাকা আর বারোর সাত ছকু খানসামা লেন থেকে চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে ওঠা—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই কিছু।

অতএব—

অতএব ব্রজধাম ছেড়ে আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা ? উঁহু, সেও অসম্ভব। এ এরিয়াতে আশে-পাশে পাঁচ-ছ'টা স্কুল রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে চলে গেলে নিস্তার নেই। অক্ষয়বাবু ঠিক টের পেয়ে যাবেন এবং, অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

খিদেয় পেটের নাড়ীগুলো দাপাদাপি করছে। সেই খইয়ের দোকানটাকে মনে পড়ল। কয়েকটা কালো ছিটধরা চাঁপা কলাও ঝুলতে দেখেছিল সেখানে। কিঞ্চিৎ ফলারের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়।

শুধু চাঁপা কলা নয়, মোষের দুধও ছিল এবং একটু মোদো-গন্ধভরা ভেলিগুড়। পনেরো পয়সায় খাওয়াটা নেহাৎ মন্দ হল না। আচমকা সুধাংশুর মনে হল, এমন খই-কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা ?

শীতের নরম রোদ। পেটে খাবার পরে গা এলিয়ে আসছে। একটু শুতে পারলে হত।

কাছেই ধর্মঠাকুরের বটগাছ। ছিমছাম জায়গাটি। দেবতার স্থান, অতএব সর্বজনীন সম্পত্তি। এখানে হত্যে দেবার নাম করে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়।

যা ভাবা—তাই কাজ। ব্যাগের ভেতর থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা র‍্যাপারটা সে বের করে আনল। পথে বিছানাটা এক জায়গায় রেখে এসে ভারী ভুল করেছে সে। নিশাকরবাবুর ওখানে বিছানা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—বন্ধু লোক।—অক্ষয়বাবু বুঝিয়েছিলেন।

ফিরেই যেতে হবে। থানা গাড়তে হবে তিন মাইল দূরের স্টেশনেই। ওখান থেকে যতটা 'এরিয়া' কভার করা যায়। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ল সুধাংশু। ধর্মঠাকুরের মাটির ঘোড়াগুলো কেমন পিট-পিট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কতক্ষণ ?

—ও মশাই—কত ঘুমুবেন ? উঠুন—উঠুন—

ঘোড়াগুলো ডাকছে নাকি ? সুধাংশু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—আপনি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন্—চলুন এবার—

ঘোড়া নয়। একটি মানুষ এবং স্কুলের একজন মাস্টার।

—কেন বলুন তো ?

সুধাংশুর মনে পড়ল, এই লোকটিকেই টীচার্স রুমে বসে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা চিবুতে দেখেছিল সে।

মাস্টার মিটি-মিটি হাসলেন : আছে মশাই, ব্যাপার আছে। সাধে কি আর এসেছি—ওপরওলার হুকুমে।

—ওপরওলার হুকুমে !—সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ?

—ছোঃ !—মাস্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : ওকে কে পরোয়া করে মশাই ? সেক্রেটারীর কুটুম বলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হয়েছে—নইলে ওর বিদ্যে তো ম্যাট্রিক অবধি। গুণের মধ্যে খালি সেক্রেটারীর কান ভারী করতে পারে। আমিও শশধর বাঁড়ুয্যে মশাই—আই-এ পাশ করেছি, হেডমাস্টারের লেখাতে ভুল ধরেছি দু-দুবার। গজেন বিশ্বাসকে আমি গ্রাহ্যও করি না।

—তবে কার তলব ? থানার দারোগার নয়তো ?—এবার ভয়ে সুধাংশুর গলা বুজে এল।

—দারোগা আবার কেন ?—শশধর বাঁড়ুয্যে হা-হা করে হেসে উঠলেন : আপনি কি চোর-ডাকাত ? দারোগা নয়—ম্যাজিস্ট্রেট ডেকেছে। চলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট ! রহস্য অতল !

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধাংশু উঠে পড়ল।

এবং কী আশ্চর্য—যেতে হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নয়, শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে।

বাড়ি রাস্তার ধারেই। সামনে একটি ফুলের বাগান। লাল মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। একটি ছোট ধানের মরাই আর এক পাশে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সুধাংশু থমকে গেল। শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে এতখানি আশা তার ছিল না।

একখানি তক্তপোষের ওপরে, পরিষ্কার একটি সুজনী পাতা। শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল এবং পাশে একটি চেয়ার। আর সব চেয়ে আশ্চর্য—টেবিলের

ওপরে কোণাভাঙা সস্তা একটি কাচের ফুলদানিতে সপত্র একগুচ্ছ গন্ধরাজ! এই শীতকালে গন্ধরাজ!

কিন্তু গন্ধরাজের চাইতেও বিস্ময়কর অভ্যর্থনার এই আয়োজনটা। মনে হচ্ছে—সুধাংশুর সম্মানেই ঘরখানাকে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন কনে দেখতে এসেছে সে।

শশধর বললেন, বসুন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকছি।—বলেই আবার হেসে উঠলেন হা-হা করে। তারপর পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে।

সুধাংশু থ হয়ে রইল। এ আবার কোন্ পরিস্থিতি! একটা দুর্বোধ্য নাটকের মতো ঠেকছে সব। অসময়ের গন্ধরাজের একটা মৃদু সৌরভ রহস্যলোক সৃষ্টি করতে লাগল তার চারদিকে।

—মণ্টুদা—চিনতে পারছো না?—কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি সরিয়ে শ্যামবর্ণ একটি তরুণী মেয়ে ঢুকল ঘরে। হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল।

তটস্থ হয়ে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। মণ্টুদা—কে মণ্টুদা?

—দেখুন, আমি তো আপনাকে—

—চিনতে পারোনি—না? কিন্তু আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছি। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারো—কিন্তু আমাকে নয়। কেমন ধরে আনলাম—দেখো।

একটা ভুল হচ্ছে—মারাত্মক ভুল! বলবার চেষ্টায় বার দুত্তিন হাঁ করল সুধাংশু।

—আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না। তোমাকে আমি জব্দ করতে জানি। বেশি দুষ্টুমি করো তো সব ফাঁস করে দেব—মেয়েটি মৃদু হাসল: দাঁড়াও—তার আগে তোমার চা করে আনি। দিনে এখনো সে পনেরোবার চা খাওয়ার অভ্যাসটি আছে তো? না—রত্নার শাসনে এখন কমেছে একটু?

রত্না? এবার আর হাঁ-টা সুধাংশু বন্ধ করতে পারল না।

—ওই দেখো, সাপের মুখে চুণ পড়ল!—মেয়েটি সকৌতুকে হেসে উঠল।

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে শশধর ফিরে এলেন। মেয়েটি একটুখানি নামিয়ে আনল মাথার ঘোমটা।

শশধর বললেন, তুমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো ওঁর জন্যে। আমি একবার ঘুরে আসি বাগ্‌দীপাড়া থেকে। দেখি বিল থেকে দুটো চারটে কই মাছ ওরা ধরে এনেছে কিনা!

—দেখুন শশধরবাবু—

—পরে দেখব মশাই। এখন সময় নেই—

শশধর বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটি হাসল: পালাবার ফন্দি? ও হবে না। অনেকদিন পরে ধরেছি তোমাকে। এখন চুপ করে বোসো। আমি চা আনছি—

অতঃপর আবার সেই বিব্রত প্রহর যাপনের পালা সুধাংশুর। এ কী হচ্ছে—এ কোথায় এল সে! মণ্টুদা বলে তার কোনো নাম আছে একথা সে এই প্রথম শুনল! এবং রত্না! সেই-ই বা কে? বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে যে তার ঘর আলো করে রয়েছে, তাকেও তো সে এতকাল নিভাননী ওরফে বুলু বলেই জানত!

একটা ভুল হচ্ছে—ভয়ঙ্কর ভুল। ভুলটা ভেঙে দিয়ে এই মুহূর্তে তার ভদ্রলোকের মতো সরে পড়া উচিত।

কিন্তু—

কিন্তু চা আসছে এবং এ সময় এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মতো মূঢ়তাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। চা-টা খাওয়া শেষ হলেই এক ফাঁকে ঝোলাটা কাঁধে করে সে উঠে পড়বে। তারপর এক দৌড়ে শালবন ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী পার হতে আর কতক্ষণ!

সামনে ফুলদানি থেকে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে। শীতের ফুল! সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরময় শীতল ছায়া ঘনাচ্ছে। মশার গুঞ্জন উঠেছে। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সুধাংশু অভিভূতের মতো বসে রইল।

ভেতর থেকে গরম ঘিয়ের গন্ধ আসছে। খাবার তৈরি হচ্ছে—এবং নিশ্চয় তারই সম্মানে। সুধাংশুর মুখে আবার লালা জমে উঠল। রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন! খই জিনিসটা লঘু পাক; কিন্তু চাঁপা কলা আর মোষের দুধও যে এমন অবলীলাক্রমে হজম হয়ে যায়—সে রহস্যই বা কার জানা ছিল! চায়ের প্রলোভনটাকে আরো শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরল ঘিয়ের গন্ধ। রাত্রে স্টেশনের হোটেলে তো জুটবে ট্যাড়শ-চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল—এক টুকরো মাছ যদি পাওয়া যায়, তার স্বাদ মনে হবে পিস্‌বোর্ডের মতো। তার চাইতে এখান থেকে যথাসাধ্য রেশন নিয়ে নেওয়া যাক। হোক ভ্রান্তি-বিলাস, তবু ধরে নেওয়া যাবে এটা বাংলা দেশের পুরোনো আতিথেয়তার নমুনা মাত্র।

গন্ধরাজের সৌরভ ছাপিয়ে লুচির গন্ধ আসছে। সুধাংশু প্রতীক্ষা করে বসে রইল।

একটু পরেই একহাতে সধূম লুচির থালা, আর এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল মেয়েটি।

—এত কেন ?

—খাওয়ার জন্যে।—মেয়েটি হাসল : নাও—আর ভদ্রতা কোরো না। সামনেই গাড়ু-গামছা রয়েছে—ধুয়ে নাও হাতমুখ।

যা হওয়ার হোক। এস্‌পার কি ওস্‌পার! মেঘনার ধারের সুধাংশু চক্রবর্তী আর বিস্মিত হবে না ঠিক করল। দেশ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে—তখন শিশিরে আর ভয় নেই তার।

বেপরোয়া হয়ে লুচি-বেগুন ভাজায় মনোনিবেশ করল সে।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কত রোগা হয়ে গেছ আজকাল !

শুনে রোমাঞ্চ হয় যে সুধাংশুও একদিন মোটা ছিল !

মেয়েটি বললে, সেই দশ বছর আগে যখন রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছিলে, সেদিন কত কথাই উঠেছিল গ্রামে ; কিন্তু আমি তো জানতাম—যা করেছ, ভালোই করেছ !

রত্নাকে নিয়ে পালানো ! হে ভগবান, রক্ষা করো ! সুধাংশুর গলায় লুচি আটকে আসতে লাগল। তাদের হেডমাস্টার থাকলে এখন সাক্ষী দিয়ে বলতেন, ইস্কুলে বরাবর গুড-কণ্ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছে সে !

—কাকিমা তো অগ্নিমূর্তি !—মেয়েটির চোখে স্মৃতির দূরত্ব ঘনিয়ে আসতে লাগল : আমাকে এসে বললেন, কণা, তুই দুঃখ পাসনি। ওর কপালে অনেক শাস্তি আছে—দেখে নিস্‌। সত্যি বলছি মণ্টুদা—বিশ্বাস করো আমাকে। আমি খুশি হয়েছিলাম। জাত বড় নয়—রত্না সত্যিকারের ভালো মেয়ে। আর তোমাকেও তো জানি। প্রাণে ধরে রত্নাকে তুমি কখনো দুঃখ দেবে না।

আহা, এই কথাগুলো যদি বুলু শুনত ! তার ধারণা, স্বামী হিসেবে যে বস্তুটি তার কপালে জুটেছে, পুরুষের অপদার্থতম নমুনা হচ্ছে সেইটিই !

—সত্যি, রত্নার কষ্ট চোখে দেখা যেত না। সৎমা কী অত্যাচারই করত ওর ওপরে। কতদিন খেতে পর্যন্ত দেয়নি। তবু মেয়েটা মুখ ফুটে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি কখনো। এমন ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। জাতটা কিছু নয় মণ্টুদা—জীবনে সত্যিই তুমি জিতেছ !

অজানা-অদেখা রত্নার জন্যে এবারে সুধাংশুরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে পড়ে গেল, ঝগড়া করবার আগে কোমরে হাত দিয়ে বুলুর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

লুচির থালা শেষ হতে সময় লাগল না।

—আর দুখানা এনে দিই মণ্টুদা ?

—না—না—সর্বনাশ !

কণা বলে চলল, তোমার চেহারা বদলেছে মণ্টুদা—কত ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ। তবু আমি কি ভুল করতে পারি ? সেই চোখ, সেই কোঁকড়া চুল, সেই মুখের আদল, সেই হাঁটবার ভঙ্গি। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন ধর্মখোলার দিকে চলে যাচ্ছিলে, তখনি আমি চিনে ফেললাম ! তারপর উনি যখন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন যে, কলকাতা থেকে বইয়ের এজেণ্ট এসেছে, তখনি আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। এখনো তো সেই বইয়ের কাজই করছ ?

—হুঁ !—সংক্ষিপ্ততম উত্তরই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

—শোনো—কণার গলার স্বর নিচু হয়ে এল : আমি ওকে বলেছি, তুমি সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই।—কণা অর্থগভীর হাসি হাসল : তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ো না—কেমন ?

—না—না !—সুধাংশু আন্তরিকভাবে মাথা নাড়ল : তা কখনো বলতে পারি ! তা হলে আজ বরং উঠি আমি। রাত হয়ে যাচ্ছে—আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।

—বা রে, ভেবেছ কী তুমি ? এম্‌নি ছেড়ে দেব ? ওকে মাছ আনতে পাঠালাম —দেখলে না ? আমার রান্না খেতে তুমি কত ভালোবাসতে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? ও সব হবে না। যাও দেখি—কেমন যেতে পারো।

—কিন্তু বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই—

—কণা গরীব হতে পারে, কিন্তু তোমাকে শুতে দেবার মতো একখানা লেপ আর একটা বালিশ তার জুটবে। বেশি ভদ্রতা কোরো না আমার সঙ্গে—বুঝেছ ?

বুঝেছে বই কি সুধাংশু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতারকের একটা চমৎকার ভূমিকায় নেমে পড়েছে সে। এখন আর সহজে পালাবার উপায় নেই। শশধর তাকে কখোনোই দেখেন নি এবং কণা তাকে মণ্টুদা বলে প্রমাণ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতএব জালিয়াতিটা অন্তত আজ রাতে ধরা পড়বে না। কাল ভোরেই তাকে পালাতে হবে—এবং এ এরিয়া ছেড়ে। তারপরে অক্ষয়বাবু রইলেন আর সে রইল।

বাগানে টিনের গেট খুলে কে ভেতরে ঢুকল। পাওয়া গেল চটির আওয়াজ।

শশধর ফিরে এলেন। হাতের বাঁধা ন্যাকড়াটার মধ্যে উত্তেজিত দাপাদাপি চলছে।

উল্লসিত হয়ে শশধর বললেন, অতিথি-সেবার পুণ্যে আজ ভালো মাছ পাওয়া গেল কণা। দশটা বড় বড় কই।

কণার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

—মণ্টুদার ভারী প্রিয় মাছ। মনে আছে মণ্টুদা—রেলের বাঁধের তলা থেকে

একবার তুমি আর আমি ছিপ দিয়ে এক কুড়ি কই ধরেছিলাম ? তারপর বাড়িতে ফিরে মার হাতে সে কি পিট্টি !

শশধর সস্নেহ হাসি হাসলেন। ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারটায় : ভাই বোনে মিলে খুব দুষ্টুমি হত বুঝি ? তা বেশ ; কিন্তু শিবেন বাবুকে এখনো চা দাও নি ?

শিবেনবাবু ! সুধাংশু আর একবার ঢোঁক গিলল। নিজের নামটা প্রায় অষ্টোত্তর শতনামের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

—তুমি আসবে বলেই দেরী করছিলাম।

—দাও—দাও।—শশধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : বিকেলের চা-ই তো এখনো জোটেনি ওঁর। কুটুম মানুষ—বদনাম গাইবেন।

—মণ্টুদা খুব ভালো ছেলে—কারো বদনাম করে না—কণা ভেতরে চলে গেল।

খাওয়ার দিক থেকে কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। বারোর সাত ছকু খানসামা লেনের সুধাংশু চক্রবর্তী এমন টাট্‌কা কইমাছ চোখে দেখেনি দেশ ছাড়বার পরে। এ অঞ্চল নাকি কাঁকরের জন্যে বিখ্যাত, কই চালে তো একটি দানা কাঁকরেরও সন্ধান পাওয়া গেল না !

শশধর গল্প করলেন অজস্র। দেশের কথা, ইস্কুলের কথা। যোগ্যতায় বি-এ ফেল হেড্ মাস্টার নিশাকর সামন্তের পরেই তাঁর স্থান—এ কথাও ঘোষণা করলেন বার বার। শুধু সেক্রেটারীর কুটুম ওই গজেন বিশ্বাস ! মামার জোরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—নইলে একটা ইংরেজি সেন্‌টেন্সও কারেক্ট করে লিখতে জানে নাকি ?

—আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আপনি আমার কুটুম—গ্রেট্ ইণ্ডিয়ানদের সব বই আমি ধরিয়ে দেব স্কুলে। ও দায়িত্বটা এখন আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

বাইরে কন্‌কনে শীতের রাত। ভারী হাওয়ায় অসময়ের গন্ধরাজের গন্ধ। মাটির দেওয়ালে কেরোসিনের আলোর কাঁপনলাগা ছায়া। বিমিশ্র অনুভূতি বিজড়িত একটা স্তব্ধ মন নিয়ে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে রইল লেপের মধ্যে। আশ্চর্য। জীবনটা এত আশ্চর্য—কে জানত !

মণ্টুদা ?

কণা ঘরে ঢুকল।

—জেগেই আছি। শশধরবাবু কী করছেন ?

—ওঁর তো এখন মাঝ রাত। পড়া আর মড়া। শুনছ না—নাক ডাকছে ?—কণা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল : ওই নাকের ডাকের ভয়ে পাড়ার চোর আসতে পারে না।

সুধাংশু অপ্রতিভের মতো হাসল। টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারটা নিয়ে বসল কণা। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল লণ্ঠনের বাড়ানো কমানোর চাবিটা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না।

সুধাংশু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল কণার দিকে। এক কালে সুশ্রীই ছিল মুখখানা। এখন পরিশ্রম আর চিন্তার একটা ম্লান আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপবে।

তারপর :

একটা কথা বলব ভাবছি মণ্টুদা। বলব কিনা বুঝতে পারছি না।

—বলো। অত সংকোচের কী আছে ?

—না, তোমার কাছে সংকোচের আমার কিছুই নেই।—কণা ভেতরের দিকে মাথা ফিরিয়ে একবার কী দেখল, যেন কান পেতে শুনল শশধরের নাকের ডাকটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল : রত্না অমন করে মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে তোমার ঘরে হাঁড়ি ঠেলার ব্যবস্থাই যে আমার পাকা হয়ে গিয়েছিল সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে ?

সুধাংশু শিউরে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে কণার চোখ। ঘন বর্ষার মেঘের মতো কী যেন টলমল করছে সেখানে।

কণা বললে, ভয় নেই। তুমি ভেবো না—আমি রাগ করেছি। আমি তো জানি রত্না কত ভালো মেয়ে!—কণার চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বুকের ওপর : আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি মণ্টুদা।—

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে কণা আবার হেসে উঠল। শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের লীলার মতো তার হাসি-কান্না দেখতে লাগল সুধাংশু।

কণা বলে চলল, দশ বছর পরে দেখা, ভেবেছিলাম, কথাটা বলা ঠিক হবে না। তারপরে ভেবে দেখলাম, পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারি! —গলার স্বর নামিয়ে কণা বললে, মণ্টুদা, কুড়িটা টাকা দেবে আমাকে ?

কুড়ি টাকা! ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী সভয়ে নড়ে উঠল।

আঁচলের গিঁট থেকে একটা চিঠি বের করলে কণা। বললে, এইটে পড়ো।

সুধাংশু বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিখানা। বোলপুর থেকে কোন্ এক বিনু চিঠি দিয়েছে দিদিকে। তার ম্যাট্রিকের ফী এমাসেই দিতে হবে—দিদি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেয়।

হতবাক হয়ে চিঠিটার দিকে সে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ!

—অবাক হয়ে গেলে তো ? দশ বছর আগে যে ছোট্ট বিনুকে দেখেছিলে, সে

আর ছোটটি নেই। ম্যাট্রিক দেবে এবার। ভালো ছেলে—ভালো করেই পাশ করবে। অথচ ফীয়ের টাকা নিয়েই মুসকিল। বাবার অবস্থা তো সবই জানো—কোনোমতে আধপেটা খেয়ে আছেন। অথচ এদের কাছেও চাইতে পারি না। নিজেরই সংসার চলে না, তবু বাবাকে যখন পারেন দু পাঁচ টাকা পাঠান। এই কুড়িটা টাকার জন্যে ওঁকে আর কী ভাবে চাপ দিই বলো ?

সুধাংশু তেমনি নির্বাক হয়ে রইল।

কোমল গভীর গলায় কণা বললে, একদিন তোমার কাছে সবই আমার চাইবার দাবী ছিল মণ্টুদা। আজ সেই সাহসেই কথাটা বলতে পারলাম। রত্নাকে আমি সবই তো দিয়েছি—কণার চোখে জল চকচক করতে লাগল : মোটে কুড়িটা টাকাও আমি চাইতে পারব না ?

অভিনেতা সুধাংশুর কাছে অভিনয়টা কখন সত্যি হয়ে উঠল সে নিজেই জানে না। তেমনি গভীর গলায় সেও বললে, নিশ্চয় কণা—নিশ্চয়।

বালিশের তলায় রাখা মানিব্যাগ্‌টার দিকে সে হাত বাড়ালো।

—এখুনি ?—কণা বললে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কলকাতা গিয়েও বিনুকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও বরং।

ব্যাগটা বের করে এনে সুধাংশু বললে, না—না। অঢেল কাজ নিয়ে থাকি, কলকাতায় গিয়ে ভুলে যেতে কতক্ষণ ? টাকাটা তুমিই রাখো কণা।

শীতের হাওয়ায় ঘরে গন্ধরাজের মৃদু সুরভি। দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে। আশ্চর্য তরল কণার চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এবার আর সে তা মুছতে পারল না।

* * *

শাল-পলাশের বনে ভোরের কুয়াশা। পায়ের তলায় শিশির-ভেজা ধুলো। ময়ূরাক্ষী আর কতদূরে ?

ঠাণ্ডা নরম রোদে—শালের পাতায় সোনালি ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আর মন্থর পা ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তীর মনে হল—অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে ?—সে—না কণা ? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার একটা চক্রান্ত কিনা ?

কিন্তু তা হলে কি এত মিষ্টি লাগত গন্ধরাজের গন্ধটা ? এই সকালে কি এত সুন্দর দেখাত এই শাল-পলাশের বন ? আর সামনে—সামনে ওই তো ময়ূরাক্ষী ! ময়ূরের চোখের মতোই সোনার আলো-ছড়ানো কী অপরূপ নীল ওর জল।

এই কুড়িটা টাকার হিসেব সহজে বোঝানো যাবে না ব্যবসায়ী অক্ষয়বাবুকে।

এ এরিয়ায় কাজও সবই তো পড়ে রইল। আর অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

এর ঋণ শোধ করতে হবে এক মাস রেশন না এনে ; কণার চোখের জলের দাম শোধ করে দিতে হবে বুলুকে। পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই ! শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ার খরচ জোটে না। তবু একজন তো ম্যাট্রিকের ফী দিতে পারবে—একজন তো কৃতী হতে পারবে জীবনে !

কুড়িটা টাকার চেয়ে ঢের বেশি সত্য বুকের পকেটে এই গন্ধরাজ দুটো। অসময়ের ফুল। কাচের ফুলদানিটা থেকে চুরি করে এনেছে সুধাংশু—পালিয়ে এসেছে ভোরের অন্ধকারে। যে অন্ধকারে ব্রজপুর একটা স্বপ্নমাধুরী নিয়ে পেছনে পড়ে রইল !

সামনে ময়ূরাক্ষী। কী আশ্চর্য নীল সোনালী ওর জল !

উন্মেষ

বড় রাস্তার মোড়ের কাছে একটা সোরগোল উঠল। দু' চারজন পথে নেমে এল, কিছু লোক সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দুধারে—যেমন করে দাঁড়ায় প্রোসেশন যাওয়ার সময়। যারা নামল না, তারা বকের মত গলা বাড়িয়ে দিলে বারান্দা থেকে।

ব্যাপার আর কিছু নয়—নৃপেন রায় আসছেন।

কে এই নৃপেন রায় ? দেশনেতা নন, রাজা মহারাজা নন, সিনেমার অভিনেতাও নন। কোনো আশ্রমে-টাশ্রমে মোটা টাকাও দান করে বসেননি। তবু তাঁর সম্পর্কে লোকের সীমাহীন কৌতূহল।

কেন যে কৌতূহল, তার জবাব পাওয়া গেল যখন তিনি বাঁক ঘুরে সামনে এসে পৌঁছুলেন।

ছ হাতের মতো লম্বা। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো বাবরী চুল—সংপ্রতি বিপর্যস্ত। লম্বাটে মুখের কোণিক হাড়গুলোতে অনেক ডাম্বেল-কষা মুগুর-ভাঁজার কাঠিন্য। ঢালের মতো চওড়া বুক—আজানুলম্বিত পেশল হাত দুখানিকে মহাবাহু ছাড়া আর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। পদ্মপলাশ বিস্তৃত চোখ এবং সে চোখ পলাশ ফুলের মতোই আরক্তিম।

পরনে ব্রীচেস্, কাঁধে ঝোলানো দু-দুটো বন্দুক। ভয়ঙ্কর মানুষটাকে তা আরো বীভৎস করে তুলেছে ; কিন্তু তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে একটি মেয়েও আছে।

তাঁরি মেয়ে। তার আকর্ষণও কম নয়॥

বছর বারোর মেয়ে। বব্ ছাঁটা ধূলিরুক্ষ চুল। খাকি রঙা সালোয়ারের ওপর একটি খাকি শার্ট পরা। মেয়েটির গলায় টোটার মালা। শুধু টোটা নয়—আর একছড়া মালাও আছে। তাতে ঝুলছে রক্তমাখা গোটা পাঁচেক স্নাইপ এবং একজোড়া 'চায়না ডাক'। মেয়েটির জামার এখানে ওখানে সে রক্তের ছোপ লেগেছে—যেন ভৈরবীর মূর্তি!

সব মিলিয়ে দৃশ্যটাকে ভয়ানক বললেও কম বলা হয়। পৈশাচিক।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে একটা।

—দেখেছ কাণ্ড! মেয়েটাকে শুদ্ধ কী বানিয়ে তুলছে!

আর একজন বললে, লোকটা একেবারে অমানুষ।

—যা বলেছ!—কেউ সরস করে ব্যাখ্যা করে দিলে জিনিসটা: মানুষ নিশ্চয় নয়। রাক্ষস।

বাপ মেয়ে কথাগুলো কেউ শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। শুনলেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না নৃপেন রায়। জীবনে করেনওনি কোনোদিন।

মাথার ওপর উঠে আসা দুপুরের সূর্যের কড়া রোদে দুজনে সোজা চলে গেলেন। দুজনেই বুট পরা, শুধু বহুদূর থেকেও সেই দু'জোড়া বুটের অস্পষ্ট হয়ে আসা মচ্মচানি শোনা যেতে লাগল।

শহরের একটেরেয় নৃপেন রায়ের বাড়ি। সামনে একখানা মাঝারি ধরনের বাগান। তাতে একটি গন্ধরাজ, একটি ম্যাগ্নোলিয়া এবং দুটি শিউলি। একপাশে বহু পুরোনো একটি আমগাছ, তাতে আজকাল আর ফল ধরে না। বসন্তের হাওয়ায় কয়েকটি শীর্ণ মুকুল দেখা দিয়েই ঝরে যায় বিবর্ণ জীর্ণতায়। একদিকে বেশ পুরু একটি কেয়া ঝোপ। বাড়ির গায়ে কেয়া বন কোনো গৃহস্থের ভালো লাগার কথা নয়—বর্ষায় ফুল ফুটলে তার পাগল করা গন্ধে নাকি আনাগোনা শুরু হয় গোখরো সাপের। কিন্তু ওসব কোনো কুসংস্কার নেই নৃপেন রায়ের। আর এ ছাড়া বাগানের সবচেয়ে বিশেষত্ব হল, সযত্নরোপিত নানা জাতের ক্যাক্টাস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশির ভাগই তীক্ষ্ণ কাঁটায় আকীর্ণ—নানা বিচিত্র ধরণের ফুল ফোটে তাতে। শিকার আর ক্যাক্টাসের পরিচর্যা—এই হল নৃপেন রায়ের প্রধান ব্যসন।

বাড়িটা বড়—কিন্তু এখন শ্রীহীন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা আর চা-বাগানের মোটা রকমের শেয়ার রেখে বাপ চোখ বুজেছিলেন। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা কয়েকটি বছরের মধ্যেই উড়িয়েছেন নৃপেন রায়। এখন সংসার

চলে বাঁধা মাইনের মতো শেয়ারের একটা নিয়মিত আয়ে। তারও পরিমাণ উপেক্ষার নয়। খুশিমতো আর অপচয় করা চলে না বটে, কিন্তু রুচিমাফিক অপব্যয়ে বাধা নেই এখনো। সে অপব্যয়টা চলে শিকার আর বিলাতী মদের রন্ধ্রপথে।

নৃপেন আর তাঁর মেয়ে গৌরী—এই দুজনকে নিয়েই সংসার। একটা বুড়ো চাকর আছে বাপের আমলের, চোখে অল্প অল্প ছানি পড়েছে, কানেও কম শোনে। সংসারের ঝক্কিটা পোয়াতে হয় তাকেই। গৌরীর বছর দুই বয়েসের সময় নৃপেন রায়ের স্ত্রী স্বামীর আটত্রিশ বোবের রিভলবারটা দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই থেকে ওদিকটাতে নিশ্চিন্ত হয়েছেন নৃপেন রায়। তারপরে আর বিয়ে করেন নি। মেয়েদের তিনি সহ্য করতে পারেন না।

বাইরের ঘরে ঢুকে একটা সোফার ওপর বন্দুক দুটোকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর বুট-শুদ্ধ পা দুটোকে তুলেই এলিয়ে পড়লেন একটা কাউচে।

পাখি আর টোটার মালা গলায় নিয়ে গৌরী তখনো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কী করতে হবে জানে না—বাপের আদেশের অপেক্ষা করছে সে।

—পাখাটা খুলে দে তো গৌরী। আর ওগুলো নামিয়ে রাখ মেঝেতে।

গৌরী তাই করল।

—আয়, বোস আমার কাছে—নৃপেন রায় ডাকলেন। গলার স্বরে মেশাতে চাইলেন স্নেহের নমনীয় আমেজ। সে স্বরে স্নেহ ফুটল কিনা বোঝা গেল না—কিন্তু গৌরী যেন আশ্বস্ত বোধ করল একটু। একটা টুল টেনে নিয়ে নীরবে বাপের পাশে এসে বসল।

—আজ খুব কষ্ট হয়েছে না রে?—আবার সস্নেহ স্বরে জানতে চাইলেন নৃপেন রায়।

—হ্যাঁ বাবা—আস্তে আস্তে জবাব দিলে গৌরী।

মিষ্টি, ক্লান্ত গলার আওয়াজ। এতক্ষণ পরে মেয়েটিকে যেন দেখতে পাওয়া গেল ভালো করে। অলক্ষ্মীর মতো বব্-করা রুক্ষ চুলের পটভূমিতেও শান্ত কমনীয় একখানা মুখ। গভীর কালো চোখের তারায় ব্যথিত শঙ্কা। বাইরের পোশাকের সঙ্গে যেন কোনো মিল নেই তার মনের চেহারার।

আরো একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে—তার মুখে কোথাও যেন ভাবের স্পষ্ট আভাস নেই কিছু। কেমন প্রাণহীন। একটা জন্তুর মতো প্রাকৃতিক ভয়—প্রাকৃতিক দুঃখানুভূতি। কোনো ডাক্তার দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই বলে দেবে, মেয়েটা হাবা। তার শিশুর মতো অপরিণত চেতনা চিরকাল নীহারিকায় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, কোনোদিন অভিজ্ঞতার কঠিন আকৃতি-বন্ধনে পূর্ণ হয়ে উঠবে না।

প্রথমদিকে একবার ডাক্তার দেখানো হয়েছিল অবশ্য।

পরীক্ষা করে ডাক্তার শুধু মাথা নেড়েছিলেন বার কয়েক। তারপর ধিক্কারভরা চোখে নৃপেন রায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনার পাপেরই ও প্রায়শ্চিত্ত করছে, এর কোনো ওষুধ নেই।

—তার মানে ?

—মানে এখনো জানতে চান ?—ডাক্তারের মুখে ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল : জন্মের আগেই ওর সমস্ত জীবনকে আপনি নষ্ট করে রেখেছেন। আজ আর ওর ভালো করবার চেষ্টা বৃথা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন নৃপেন রায়। নিস্পন্দ হয়ে থেমে গিয়েছিল মুখের সমুন্নত কঠিন হাড়ের সঙ্গে জড়ানো মাংসপেশীগুলো। শক্ত থাবায় চেয়ারের হাতলটাকে ধরেছিলেন মুঠো করে।

—জানেন, কী বলছেন আপনি ?

ডাক্তার ভয় পাননি। স্থিতপ্রজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে চশমাটা রুমালে মুছতে মুছতে বলেছিলেন, জানি। যদি বিশ্বাস না করেন, আপনার আর আপনার মেয়ের ব্লাড দিয়ে যান। কাল কান্ টেস্টের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব—তা থেকেই আশা করি সব বুঝতে পারবেন।

জীবনে এই প্রথম থমকে গিয়েছিলেন নৃপেন রায়—যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। শিথিল হয়ে গিয়েছিল মুখের পেশীগুলো—মুঠিটা ঢিলে হয়ে এসেছিল চেয়ারের গায়ে। আর দাঁড়াননি তারপর।

ডাক্তারের টেবিলের ওপর প্রায় ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ফী-এর টাকাগুলো। মেয়ের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলেছিলেন, চল্।

কিন্তু আর চিকিৎসা হয়নি গৌরীর।

চিকিৎসা করেও কোনো লাভ হবে না এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন নৃপেন রায়। কিছুদিন একটা গভীর অপরাধবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তারপর ক্রমশঃ নিজের মধ্যেই একটা জোর খুঁজে পেলেন তিনি। অন্যায় যদি তাঁর হয়ে থাকে, তবে তার প্রতীকারের দায়িত্বও তাঁরই হাতে। গৌরীকে তিনি জাগিয়ে তুলবেন। চেতনার আলো ছড়িয়ে দেবেন তার অন্ধকার মনের প্রান্তে প্রান্তে।

প্রাণ যদি নাই পায়—অন্তত অন্যদিক থেকে সজাগ করে তুলবেন একটার পর একটা নিষ্ঠুর হিংসার খোঁচা দিয়ে।

হিংসা ! তাই বটে। কী বিরাট—কী প্রচণ্ড শক্তি ! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যখন তাঁকে সামনা সামনি চার্জ করেছে, তখন সে শক্তির বিদ্যুৎঝলক টের পেয়েছেন

রক্তের মধ্যে ; শালবনের ভেতরে মাত্‌লা হাতী শিকার করতে গিয়ে সেই শক্তির উৎক্ষেপে দুলে উঠেছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। সেই শক্তি—সেই হিংসা। জীবনে নৃপেন রায় তার চেয়ে কোনো বড় জিনিসের কথা ভাবতেও পারেননি।

গৌরী জাগুক। কেটে যাক তার চৈতন্যের ওপর থেকে এই কুয়াশার আবরণ। তারপর ডাক্তারকে তিনি দেখে নেবেন।

আজও অস্পষ্টভাবে তাঁর মাথার মধ্যে যেন ঘুরে যাচ্ছিল এই চিন্তাটাই। আধ-বোজা চোখে গৌরীর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন আবিষ্টের মতো।

—হাঁস দুটো আজ বড় ভুগিয়েছে, না?

তেমনি প্রাণহীন গলায় গৌরী বললে, হ্যাঁ বাবা।

—শিকারে যেতে তোর ভালো লাগে না?

—লাগে।

—কষ্ট হয় না?

—হয়। —গৌরী জানলার বাইরে আমগাছটার দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে: অনেক কাঁটা আর বড্ড রোদ। হাঁটতে পারা যায় না।

ওটুকু কষ্ট না করলে শিকারী হতে পারে কেউ? —উৎসাহে নৃপেন রায় দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ মুক্ত করে ধরলেন: শিকার কি আর ধরা দেয় অত সহজে? অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক রোদ কাঁটা সইতে হয়। একবার নেশা ধরলে দেখবি দুনিয়ার আর সব একেবারেই ভুলিয়ে দেবে।

—কিন্তু পাখী মেরে কী হয় বাবা?—গৌরীর নিষ্প্রাণ চোখে একটা জান্তব বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল: কেমন সুন্দর দেখতে! আর কী মিষ্টি করে ডাকে!

হঠাৎ একটা খোঁচা খেলেন নৃপেন রায়—চমকে উঠলেন কিসের অশুভ সংকেতে। উল্টো সুর বলছে গৌরীর গলায়। এমন কথা ছিল না—এমন হওয়া উচিত নয়।

কাউচের উপর উঠে বসলেন তিনি। মানসিক অধৈর্যে বুটপরা পা দুটোকে সশব্দে নামিয়ে আনলেন মেঝের ওপর। স্বগতোক্তির মতো পুনরাবৃত্তি করলেন গৌরীর কথা দুটোর: খুব সুন্দর দেখতে, না? খুব মিষ্টি করে ডাকে, কেমন?

হকচকিয়ে গেল গৌরী। নীহারিকার মতো অস্বচ্ছ মনের ধোঁয়াটে পর্দায় জান্তব ভীতির পূর্বাভাস পড়েছে। চাপা উৎকণ্ঠায় গৌরী বললে, হ্যাঁ বাবা!

—হ্যাঁ বাবা!—নৃপেন রায় বিশ্রীভাবে ভেংচে উঠলেন একটা। ইচ্ছে করল থাবার মতো তাঁর প্রচণ্ড মুঠিটা সজোরে বসিয়ে দেন মেয়েটার মাথার ওপর।

—আর খেতে কেমন লাগে? কেমন লাগে নরম তুলতুলে মাংসগুলো?—বিকৃত গলায় তিনি একটা তিক্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—চাবুকের আওয়াজের মতো যেন

বাতাস কেটে গেল কথাটা।

সভয়ে গৌরী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

—কী, কথা কইছিস না যে? —পায়ের নীচে একটা কিছুকে থেঁতলে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে বুটজোড়া মেঝেতে ঠুকলেন নৃপেন রায়।

প্রায় নিঃশব্দে জবাব এল গৌরীর। খেতে ভালোই লাগে বাবা।

—খেতে যা ভালো লাগে, তা মারতেও মন্দ লাগা উচিত নয়—হিপ্‌নটাইজ করবার মতো একটা নির্নিমেষ খরতা জ্বলতে লাগল নৃপেন রায়ের চোখে: যা, পাখিগুলোর পালক ছাড়িয়ে কেটে-কুটে তৈরী করে রাখগে।

—আমি?—ব্যথিত বিস্ময়ে গৌরী বললে, আমি তো কখনো করি না বাবা। ওসব তো বৃন্দাবন করে।

—না, আজ থেকে বৃন্দাবন আর করবে না, তোকেই করতে হবে: নৃপেন রায়ের সমস্ত মুখখানা মুছে গিয়ে গৌরীর দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে রইল শুধু দুটো আগ্নেয় চোখ: তুই-ই করবি এর পর থেকে। যা—

কলের পুতুলের মতো উঠে পড়ল গৌরী। তারপর পিঠের ওপর বাপের প্রখর দৃষ্টির উত্তাপ অনুভব করতে করতে তাড়া-খাওয়া একটা জানোয়ারের মতো পাখি-গুলোকে তুলে নিয়ে ছুটে পালালো।

লাল হয়ে আসা শেষ রোদে বাগানের মধ্যে পায়চারী করছিলেন নৃপেন রায়। অদ্ভুত কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন সূর্য ডোবার আগেই কোথা থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা পাহাড়ী মথ্‌। বেশ বড় আকারের—প্রায় পাঁচ ইঞ্চি করে ফিকে নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা ডানা। মথ্‌টা ঘুরে ঘুরে কেয়াপাতার ওপর বসবার চেষ্টা করছে—কিন্তু তারপরেই তীক্ষ্ণধার কাঁটার ঘায়ে উড়ে যাচ্ছে সেখান থেকে।

সুন্দর পাখা—খাসা রঙ। কিন্তু নির্বোধটা জানে না, এই কেয়াকাঁটার ঝাড়ে রঙীন পাখনা নিয়ে বসবার মতো জায়গা নেই কোথাও। হঠাৎ একটা অমানুষিক-আনন্দে নৃপেন রায় থাবা দিয়ে ধরলেন মথ্‌টাকে। মুঠির মধ্যে পড়তে না পড়তে সেটা পিষ্ট হয়ে গেল—হাতের তালুতে পরাগের মতো জড়িয়ে রইল একরাশ শাদা গুঁড়ো।

ফুলের পাঁপড়ি ছেঁড়ার মতো করে, ভোরের আকাশে নীলিমার বুকের ওপর প্রথম সূর্যের আলো পড়ার মতো শুভ্রতায় রেখায়িত পাখা দুটোকে তিনি নখের ডগায় টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। বেশ লাগে ছিঁড়তে। অদ্ভুত সূক্ষ্ম—আশ্চর্য নরম! কিন্তু কেয়াগাছের একটি পাতাও অমন করে ছেঁড়া যাবে না, সে

চেষ্টা করতে গেলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে হাতের চামড়া—ভেসে যাবে রক্তের ধারায়।

বাগানের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সমস্ত মুখখানা খুশির আলোয় তাঁর ঝলমল করে উঠছে।

এই তো। এতদিন পরে তবে ফুল ফুটেছে!

রাজপুতানা থেকে আনা, মরুভূমির বালিতে বেঁচে থাকা এই ক্যাকটাস। কেয়ার চাইতেও বড় বড় খরমুখ কাঁটা। এদের ভীষণতার এইটুকুই মাত্র পরিচয় নয়। এই ক্যাকটাসগুলোর আশে পাশে থাকে এক জাতের ছোট ছোট বেলে সাপ, যেমন দ্রুত, তেমনি অব্যর্থ তাদের বিষ! এই বিষকন্যার আজ যৌবন এসেছে, ফুল ফুটেছে এর গায়ে।

একটিমাত্র ফুল—মাঝারি ধরণের আনারসের মতো চেহারা। হরিদ্রাভ বর্ণে হালকা হালকা লালের ছোপ। কৌতূহলী হয়ে তার গায়ে হাত দিতে গিয়েই চমকে সরে এলেন নৃপেন রায়। হাতে লাগল কাঁটার তীক্ষ্ণ খোঁচা, জ্বালা করতে লাগল। তাকিয়ে দেখলেন মধ্যমার উপরে এসে জমেছে এক বিন্দু রক্ত।

নিজের রক্ত কতবার দেখেছেন—তবু এই একটি বিন্দুকে কেমন বিস্ময়কর বলে মনে হল তাঁর। আশ্চর্য স্বচ্ছ আর নির্মল দেখালো তার রঙ। নৃপেন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। এই রক্তে বিষ আছে—বিষ আছে তাঁদের নিজের অপরাধের। অসম্ভব।

হঠাৎ কান দুটো সতর্ক করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। গানের স্বর। গৌরী গান গাইছে।

আঙুলে ক্যাকটাসের বিষাক্ত জ্বালা নিয়ে অস্থির পায়ে ঘরের দিকে এগোলেন নৃপেন রায়।

বাইরের ঘরে একটা জানলার পাশে বসে বুড়ো আমগাছটার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে গৌরী। কোলের ওপর তার দুটি সদ্যফোটা গন্ধরাজ। নিজের মনেই কী একটা গানের স্বর সে গুঞ্জন করে চলেছে।

—গৌরী?

তীক্ষ্ণ গলায় তিনি ডাকলেন। বিদ্যুৎবেগে গৌরী দাঁড়িয়ে পড়ল, মাটিতে পড়ল কোলের ওপরে রাখা গন্ধরাজ দুটো।

—কী দেখছিলি?

—দুটো ঘুঘু বাবা। কী সুন্দর ডাকছে!—গৌরীর গলায় একটা আনন্দিত কৌতূহলের আমেজ। কিন্তু তাতে কোনো চেতন-সত্তার বোধের চিহ্ন নেই। একটা প্রাকৃতিক অনুভূতি। নদীর নীল জলের আয়নায় নিজের ছায়া দেখে অর্থহীন আনন্দে

ডেকে ওঠা কোনো হরিণের মতো ।

—কোথায় ঘুঘু ?—নৃপেন রায়ের চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

—ওই যে—গৌরী আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে : কেমন গায়ে গায়ে লাগিয়ে বসে আছে। এখুনি ঘু-ঘু করে ডাকছিল।

—ওঃ !

নৃপেন রায় সরে এলেন। তুলে আনলেন দেওয়ালের কোণায় ঠেসান দেওয়া বন্দুকটা। লোড করাই ছিল। আনলোডেড বন্দুক কখনো তিনি ঘরে রাখেন না।

গৌরীর হাতে বন্দুকটা তুলে দিয়ে বললেন, মার্—

হরিণের চোখে যেন বাঘের ছায়া পড়ল !

—বাবা !

—মার্—পাথরের মতো শক্ত শোনালো নৃপেন রায়ের গলা। জ্বলে উঠল সম্মোহকের দৃষ্টি। তারপর গৌরীর সামনে থেকে তাঁর সমস্ত মুখখানা মিলিয়ে গেল—জেগে রইল শুধু দুটো আগ্নেয় চোখ। সে দুটো যেন ক্রমশ বড়—আরো বড় হয়ে কোনো চলন্ত ট্রেনের দুটো আলোর মতো এগিয়ে আসতে লাগলো গৌরীর দিকে।

ঘামে ভেজা হাতে ঠাণ্ডা বন্দুকটা আঁকড়ে ধরল গৌরী। আস্তে আস্তে তুলে নিলে—লক্ষ্য ঠিক করল। তারপরেই একটা তীব্র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুটো তুলোর বলের মতো ঘুঘু জোড়া ছটফট্ করতে করতে পড়ল মাটিতে।

ঘর কাঁপানো একটা অট্টহাসিতে নৃপেন রায় ফেটে পড়লেন।

—খাসা টিপ হয়েছে তোর। বন্দুক ধরেই জাত-শিকারী !—অসীম আনন্দে আর একবার তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

কিন্তু গৌরী আর দাঁড়ালো না। দু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই নাকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়বার মতো হাসিটা থেমে গেল নৃপেন রায়ের। না—এখনো হয়নি। এখনো অনেক দেরী। পায়ের নীচে গন্ধরাজ দুটোকে নির্মমভাবে দলিত-মথিত করতে করতে তিনি ভাবতে লাগলেন—বাগানে একটাও ফুলের গাছ আর তিনি রাখবেন না। কালই কাটিয়ে নির্মূল করবেন সমস্ত। আর সেখানে পুঁতে দেবেন আরো গোটাকয়েক ক্যাকটাস্—আরো নির্মম, আরো কণ্টকিত।

*　　　*　　　*　　　*

দিন দশেক পরে বাড়িতে দুটো বড় বড় বাক্স এল। আর সেই সঙ্গে এল শক্ত তারের জাল দেওয়া একটা মস্ত বড় খাঁচা। খাঁচার মাঝখানে জালের আর একটা পার্টিশন—দুটো জানোয়ার পাশাপাশি রাখার ব্যবস্থা।

গৌরী অবাক বিস্ময়ে বললে, এতে কী হবে বাবা ?

—মজা হবে।—নৃপেন রায় হাসলেন। হাতের তেলোয় একটা প্রজাপতি পিষে ফেলবার মতো হাসি। মজার চেহারাটাও একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাঠের একটা বাক্স খুলতেই খাঁচার এদিকের ঘরে লাফিয়ে ঢুকল মাঝারি ধরনের একটা লেপার্ড। পোষমানা নয়—বন্য এবং উদ্দাম।

—বাঃ, কী সুন্দর বাঘ! খুশিতে ছলছল করে উঠল গৌরী : এ বাঘটা আমাদের ?

—আমাদের বৈকি।

আনন্দে গৌরী হাততালি দিলে : কী মজা। আর ওই বাক্সে ?

দ্বিতীয় বাক্স থেকে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে সভয়ে গৌরী অব্যক্ত শব্দ করল একটা। খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াল। তারপর তীক্ষ্ণ শিস্ টানার মতো গর্জন করে হাত চারেকের মতো উঁচু হয়ে উঠল—বিশাল ফণা তুলে প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল খাঁচার দরজায়।

হাত আটেক লম্বা একটি শঙ্খচূড। উজ্জ্বল, মসৃণ চিত্রিত দেহে আরণ্যক বিভীষিকা।

গৌরী পিছিয়ে যাচ্ছিল, নৃপেন তার হাতটাকে আঁকড়ে ধরলেন। এত জোরে ধরলেন যে গৌরীর হাড়টা মড়মড় করে উঠল।

—পালাচ্ছিস কেন—দাঁড়া। এইবারেই তো মজা শুরু হবে।

বাক্স যারা বয়ে এনেছিল, তারা একবার এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সরে পড়ল সেখান থেকে। শুধু আমগাছটার ছায়ার নিচে নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে ঝিমুতে লাগল বৃন্দাবন—সে চোখে দেখতে পায় না, কানেও শুনতে পায় না।

গৌরী বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাঁচায় ঢুকে বাঘটা সবে শ্রান্তভাবে বসে পড়েছিল—চাটতে শুরু করেছিল সামনের একটা থাবা। শঙ্খচূড়ের গর্জন শোনা মাত্র বিদ্যুৎবেগে সে উঠে দাঁড়াল।

প্রতিদ্বন্দ্বী তার পাশে—মাত্র এক ইঞ্চি সরু একটা জালের ব্যবধানে। সেই জালের ওপারে সে লতিয়ে লতিয়ে উঠতে চাইছে, তার চোখ দুটো এই দিনের আলোয়ও দু-টুকরো সিগারেটের আগুনের মতো জ্বলছে।

বাঘটা পায়ে পায়ে একেবারে খাঁচার এপারে সরে এল। একটা অতিকায় বিড়ালের মতো ফুলে উঠল তার গায়ের রোঁয়াগুলো। হিংস্র হাসির ভঙ্গিতে দাঁতগুলো বের করে চাপা স্বরে সেও একটা গর্জন করল। কিন্তু সে গর্জনে বীরত্ব প্রকাশ পেল না। তার চোখ দুটোয় ফুটে উঠল মর্মান্তিক ভয়ের ছায়া।

শিরদাঁড়া ধনুকের মতো বাঁকিয়ে নিয়ে সাপটা ফণা বিস্তার করল। তারপর আবার একটা তীব্র শিসের শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল পার্টিশনের গায়ে। সমস্ত খাঁচাটা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল, দুর্বলভাবে একটা থাবা তুলে লেপার্ডটা অস্ফুট গর্জন করল : গর্‌-রর্‌—

নৃপেন রায় মেয়ের দিকে তাকালেন। হাঁ—প্রাণ জেগে উঠেছে, ভাষা জেগে উঠেছে গৌরীর চোখে। ঝলমল করে উঠেছে কৌতূহলের আলোয়। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে একটা অদ্ভুত প্রত্যাশায়।

সাপটা এবার ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। উদ্ধত আহ্বানের মতো হেলতে লাগল ডাইনে বাঁয়ে। সিগারেটের আগুনের মতো চোখে ফুটে উঠল একটা বিষাক্ত নীলিম দীপ্তি। লেপার্ডটা একবার লেজ আছড়ালো—নির্নিমেষভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শঙ্খচূড়ের দিকে—তারপর যেন মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্টিশনের ওপরে।

এইবার সাপটার পিছিয়ে যাওয়ার পালা। কিন্তু ভয়ের আভাস নেই—শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা। তারপরেই নিজেকে আবার দৃঢ় করে নিয়ে খাঁচা-কাটানো ছোবল বসিয়ে দিলে।

বিদ্যুৎবেগে বাঘ সরে এল খাঁচার নিরাপদ কোণে। কান্নার মতো আওয়াজ তুলল : গর্‌-র্‌-র্‌—

গৌরী নেচে উঠল। হাততালি দিয়ে হেসে উঠল : বা-বা, কী চমৎকার!

তারপর সারাটা দিন ধরে চলল সেই অমানুষিক স্নায়ুযুদ্ধ। সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত বাঘটা খাঁচার মাঝখানে এলিয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে তো ছুটি দেবে না গৌরী। একটা ছোট লাঠি দিয়ে বাইরে থেকে খোঁচা দিতে লাগল বারবার—আর বাঁচবার শেষ আকুতিতে থেকে থেকে ক্ষুব্ধ কান্নায় খাঁচার এদিক ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বাঘটা।

সারা দিনের মধ্যে গৌরীকে নড়ানো গেল না খাঁচার সামনে থেকে। হিংস্র আনন্দে থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল : কী চমৎকার!

অনেক রাতে গৌরীকে ঘুমন্ত খাঁচার সামনে থেকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গেল বৃন্দাবন।

রাত তখন প্রায় দুটো হবে। গৌরী উঠে বসল। রক্তের মধ্যে একটা অস্থির চঞ্চলতা। বিছানা থেকে সে নেমে পড়ল, সামনের টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলে নৃপেন রায়ের হান্টিং টর্চটা।

পাশের ঘরে নাকের ডাকের শব্দ। পায়ে পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল

সে। টর্চের আলোয় দেখা গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে সাপটা। বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খাঁচার কোণায়। অধৈর্যভাবে খাঁচার গায়ে কয়েকটা টোকা মারতে শঙ্খচূড় একবার নড়ে উঠল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না লেপার্ডের তরফ থেকে।

ছোট লাঠিটা কুড়িয়ে এনে বাঘকে খোঁচা দিলে গৌরী। নড়ল না, গর্জে উঠল না অসহায় যন্ত্রণায়। টর্চের তীব্র আলোয় বুঝতে পারা গেল—সীমাহীন ভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শিথিল স্নায়ু নিয়ে সে ঢলে পড়েছে।

কিন্তু শঙ্খচূড় উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। শিরদাঁড়ায় ভর দিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বী চাই তার। পার্টিশনের ওপর আবার একটা ভয়ঙ্কর ছোবল পড়ল—কিন্তু তার শত্রু আর নড়ল না। নড়বেও না আর।

হতাশায় ক্ষোভে গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সহ্য করতে পারছে না। তার সমস্ত জান্তব বোধকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে একটা প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র আনন্দ। উপায় চাই—উপকরণ চাই। নেশা চাই তার। যেমন করে হোক্—যে উপায়েই হোক।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে গৌরী খাঁচাটায় সজোরে একটা ধাক্কা দিলে। সরল না। আর একটা ধাক্কা—আরো জোরে। খাঁচার কাঠের চাকাগুলো গড়গড় করে এগিয়ে গেল কয়েক পা। আর একটু ঠেলে দিলেই নৃপেন রায়ের দরজা। অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে নৃপেন রায় মেজের ওপরেই গড়িয়ে পড়ে আছেন—দরজা বন্ধ করে দেবার সুযোগ তাঁর হয়নি।

...শঙ্খচূড়ের গর্জনে আতঙ্ক-বিহ্বল নৃপেন রায় উঠে দাঁড়ালেন। তখনও নেশায় টলছেন, তখনও চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলেন আট হাত লম্বা আরণ্যক বিভীষিকা তাঁর মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে—হেলছে দুলছে, চোখে নীল হিংসার খরদীপ্তি!

একলাফে দরজার দিকে সরে গেলেন। টানতে গেলেন প্রাণপণে—দরজা খুলল না। গৌরী বাইরে থেকে শিকল বন্ধ করে দিয়েছে!

—গৌরী! গৌরী!

আর্তস্বরে নৃপেন রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। গৌরীর জবাব এল না—এল হাসির শব্দ। কাচের জানালার মধ্য দিয়ে সে ব্যাপারটা দেখছে। আর একটা নতুন খেলা—একটা নতুন আনন্দ! নেশা!

প্রচণ্ড বেগে ছোবল মারল সাপটা। আটত্রিশ বোরের রিভলভারটা ড্রয়ার থেকে বার করবার আর সময় নেই—শেষ চেষ্টায় সাপকে আঁকড়ে ধরতে গেলেন নৃপেন রায়। পারলেন না। মণিবন্ধের ওপর দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করতে

করতে দেখলেন কাচের জানলায় হাততালি দিয়ে দিয়ে হেসে উঠছে গৌরী। সে প্রাণ পেয়ে উঠেছে—কোথাও কিছু বাকি নেই তার। আর শঙ্খচূড় সাপের মতো তারও জান্তব চোখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আদিম হিংসার নীল আলোয়।

দরজা

আর একটা হাসপাতালের সামনে গাড়িটা এসে থামল। কপালের ঘাম মুছল মুসলমান কোচম্যান। আকাশে রুদ্র মূর্তি দুপুরের সূর্য। তপ্ত ঝোড়ো হাওয়ায় দিকে দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মরা পাতা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো। পীচ গলছে গাড়ির চাকার তলায়, ঘোড়ার নালে জড়িয়ে যাচ্ছে কালো কাদার মতো।

কাকের গলা শুকিয়ে আসা তৃষ্ণার্ত দুপুর। দীর্ঘশ্বাস ফেলা ঘূর্ণি। প্রায় নির্জন দীর্ঘ পথটার ওপরে প্রতিফলিত রোদ একরাশ ছেঁড়া সেতারের তারের মতো ঝিলমিল করছে।

—আল্লা!—মস্ত একটা নিশ্বাস ছাড়ল কোচম্যান। তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিরক্তি। বেলা দশটা থেকে শুরু হয়েছে ঘুরপাক। এখন একটা বাজে। সারাদিনেও এ ঘূর্ণি ফুরোবে বলে ভরসা হচ্ছে না।

প্রথম দু-একবার কোচবাক্স থেকে নেমে নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। এখন আর খোলে না। গাড়ির ভেতরে যে মেয়েটি বসেছিল সেও বুঝতে পেরেছে। তার জন্যে সব দরজাই বন্ধ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কেউই আর খুলবে না—কেউ না।

কিন্তু তবু তাকে চেষ্টা করতেই হবে। উপায় নেই তার—সময় নেই। হয়তো আজ—আজ না হলে কালই। কেউ তাকে বলেনি, তবু সে বুঝতে পেরেছে, বুঝেছে নিজের রক্তার্জিত সংস্কারে। স্তনে দুধ আসবার সময় যেমন করে বুঝতে পেরেছিল, ঠিক তেমনিভাবেই।

কোচম্যানের অধৈর্য ডাক শোনা গেল: কই দেরী করছেন কেন? নামবেন না?

—হাঁ, নামব বইকি।—দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলে মেয়েটি। পেটের ভেতরে আবার সেই প্রাণশক্তিটা নড়ে উঠেছে, কয়েকটা আঘাত দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। অসহ্য যন্ত্রণায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চাইল যেন। দাঁতে দাঁত চেপে সে সহ্য করে নিলে যন্ত্রণার চমকটা, তারপর আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নামল ফুটপাথে, চুল এসে ছড়িয়ে পড়ল তার মুখের ওপরে। একবারের জন্যে সে যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখল সমস্ত,

ইচ্ছে হল এই পথটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ে। না—তবু তাকে চেষ্টা করতে হবে। তার সময় নেই।

হাসপাতালের গেট দিয়ে ভেতরে চলে যাওয়া সেই ক্লান্ত পীড়িত মূর্তিটির দিকে সহানুভূতিভরা চোখে তাকিয়ে রইল কোচম্যান। আবার একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে বললে, আল্লা—করিম!—তারপর নেমে এল কোচবাক্স থেকে। পিপাসায় ফেনা দেখা দিয়েছে ঘোড়া দুটোর মুখে, গাড়ি থেকে তাদের খুলে নিয়ে সে চলল লোহার জলাধারটার দিকে। আহা, অবোলা প্রাণী!

কিন্তু মেয়েটি?

বেলা নটার ট্রেনে সে স্টেশনে নেমেছে। হাতের শেষ সম্বল চুড়ি দুগাছা বিক্রি করে যে ক'টা টাকা পেয়েছিল, তার ওপর ভরসা করেই ভাড়া করেছে গাড়িটা। তারপরে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের সন্ধানে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও তার জন্যে দরজা খুলল না।

পেছনের যে দরজা বন্ধ করে এসেছে—সেখানে ফেরবার কোনো পথই তার নেই আর। কলঙ্কের কালো বাধা পাথরের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে সেখানে।

আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল—পারেনি। সে ভীরু, মরতে ভয় পায়। ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়িয়েও নিচের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে এসেছে। জামা কাপড়ে এক ডজন সেফ্‌টিপিন এঁটেও সে কেরোসিনের বোতলটা তুলে নিতে পারেনি হাত বাড়িয়ে, কড়ির আংটার সঙ্গে কাপড়ের ফাঁস বেঁধেও কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে বিমূঢ় চোখে—ভেবেছে আকাশ পাতাল, মনে পড়ে গেছে তার বয়েস মাত্র উনিশ বছর, তারপর আস্তে আস্তে খুলে নিয়েছে ফাঁসটা। সে আত্মহত্যা করতে পারেনি।

বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই। উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল বড় বোনের সংসারে। চল্লিশ বছরের ভগ্নীপতি—মুখে ঝাঁটা ঝাঁটা গোঁফ। চাকরি-বাকরি করে না—কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তারই দেখাশোনা করে। আর করে ধর্মচর্চা। কালী-কীর্তন গায়, কখনো কখনো রক্তবস্ত্র পরে, বলে, আমি সাধক। বিষয়-বাসনায় আমার মন নেই।

বিষয়-বাসনায় মন নেই, তবু সে তান্ত্রিক। ভৈরবী চাই তার।

এক বর্ষার রাত্রে ঘরে এল। দিদি তখন অঘোর ঘুমে মগ্ন। রাক্ষসের মতো শক্ত থাবায় মুখ চেপে ধরল তার। প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে শেষে সে জ্ঞান হারাল।

সে ভীরু—সে অসহায়। ছাইগাদার আড়ালে লুকিয়ে থেকে এক কাল-রাত্রিতে

সে দেখেছিল বাড়িময় নাচছে মশালের উগ্র লাল আলো—তার বাবা, তার ভাইদের উঠোনে টেনে এনে দা দিয়ে কাটা হচ্ছে টুকরো টুকরো করে। পুতুলের মতো পলকহীন চোখ ফেলে দেখে গিয়েছিল সমস্ত—একবার চিৎকার করে ওঠারও সাহস পায়নি। সেই থেকে একটা জান্তব ভয় স্থির হয়ে আছে তার বুকের ভেতরে, স্তব্ধ হয়ে আছে তার চোখের তারায়।

নিজের ঘরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল—একটা কথা বলতে পারল না দিদিকে। তার পরের বার নয়, তার পরের বারেও নয়। প্রতিদিন একটা করে ছোরার আঘাত গায়ে লাগতে লাগতে শেষে যেমন সমস্ত বেদনাবোধই নিঃসাড় হয়ে যায়, তারও তাই হল শেষ পর্যন্ত। মৃতের মতো নিশ্চেতন স্নায়ু নিয়ে সে সহ্য করে যেতে লাগল ক্ষিপ্ত পশুটার আক্রমণ।

তারপর—

দিদির হিংস্র চিৎকার : মুখপুড়ী, সর্বনাশী! একেবারে ভিজে বেড়াল, এদিকে এত গুণ? সর্বনাশ বাধিয়ে বসে আছিস? তোর জন্যে কি এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে আমাদের? একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক করে এনেছিলাম, কিন্তু কে জানত : দিদির চিৎকার আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল : বেরো আমার বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যা। যে চুলোয় যেতে ইচ্ছে হয়—চলে যা সেখানেই।

ঘরের ভেতরে রক্তবস্ত্র পরে কালীকীর্তন গাইছিলেন ভগ্নীপতি, এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে গেল না। স্বরগ্রাম আরো উঁচুতে তুলে আবেগভরা গলায় তিনি গেয়ে চললেন :

"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে নাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে,
ডুব দে রে মন, কালী বলে—"

দেশ থেকে সব হারিয়ে আসবার সময় যে ছোট পুঁটলিটা সঙ্গে করে এনেছিল, সেইটে নিয়েই পথে নামল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে থামিয়ে দেয় ওই কালীকীর্তন, বুক-ছেঁড়া চিৎকারে দিয়ে আসে তার শেষ জবাব। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল—কী হবে? নিজের সব ভেঙেছে—তাই হোক; দিদির সংসার ভেঙে দিয়ে কী লাভ হবে আর?

আর এক জায়গায়। আর এক আত্মীয়ের বাড়িতে; কালো সে—সে কুশ্রী। তবু বাড়ির বড় ছেলে একটু একটু করে আকৃষ্ট হচ্ছিল তার দিকে। কিন্তু তার মাতৃত্ব

তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাড়ির সর্তক আবরণে পুরুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় —মেয়েদের দৃষ্টি এড়ানো যায় না।

—এ কেলেঙ্কারী আমার বাড়িতে সইবে না বাছা। তুমি পথ দেখ।

আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত বড় ছেলেটি হুঙ্কার করে উঠল।

—নষ্ট, নচ্ছার মেয়ে! এক্ষুনি বাড়ি থেকে দূর করে দাও মা। আর বলে দাও, যদি কখনো এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসে, ঠেঙিয়ে দেব। মেয়েছেলে বলে রেয়াত করব না।

অত কষ্ট আর করতে হয়নি বীরপুরুষকে। ও বাড়ির ত্রিসীমানায় যাওয়ার কোন স্পৃহাই অনুভব করেনি সে।

আরো দু জায়গায় তারপরে। একজন শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছিলেন, দয়াও জেগেছিল তাঁর। কিন্তু স্ত্রীর শাসনে তাঁকে স্তব্ধ হতে হয়েছে নিরুপায় ভাবে।

—তা হলে এ বাড়িতে একে নিয়ে তুমিই থাকো। আমি চলে যাই বাপের বাড়িতে।

না, কারোর ঘর ভাঙতে চায় না সে। আবার বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় যাবে? স্টেশন থেকে স্টেশনে। প্লাট্ফর্ম থেকে প্লাট্ফর্মে—ওয়েটিং-রুম থেকে ওয়েটিং রুমে।

এক মাস কাটল গলার সরু হারছড়া বিক্রীর টাকায়। কিন্তু আর তো চলে না। রক্তার্জিত সংস্কারেই সে বুঝতে পেরেছে, যেমন বুঝতে পেরেছিল স্তনে দুধ আসবার সময়। আজ কিংবা কাল। পেটের মধ্যে মধ্যে থেকে থেকে সেই অন্ধ প্রাণশক্তির নিষ্ঠুর আঘাত। বেরিয়ে আসতে চায়—মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু কোন্ পৃথিবীতে? কোন্ আলোয়?

গাড়িটা ঘুরছে সেই সকাল দশটা থেকে। চুড়ি বিক্রীর টাকাটা হয়তো ফুরিয়ে যাবে ওর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিতেই। তারপরে ফুটপাথ।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখবে সে। শেষ চেষ্টা।

ক্লান্ত মন্থর পায়ে মেটারনিটি লেখা ঘরটার ভেতরে সে পা দিলে। চারদিকে একটা তীব্র ওষুধের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে—খানিকটা উগ্র মাদকের মতো। ক্রিয়া করছে তার শিরা-স্নায়ুতে। সংকীর্ণ আর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি—নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না সে।

পাশ দিয়ে কে একটি মেয়ে চলে গেল—বোধ হয় ঝি। হাতে একটা থালা, তাতে ভাত-তরকারীর ধ্বংসাবশেষ। সে দিকে তাকিয়ে তার চোখ চকচক করে উঠল, একটা মোচড় খেয়ে উঠল পেটের নাড়িতে। সন্তান নয়—অসহ্য ক্ষুধা। মনে

পড়ে গেল, কাল রাত থেকে সে কিছুই খায়নি।

থাবা দিয়ে থালাটা নিয়ে নেওয়া যায় না ওর হাত থেকে? ওগুলো এঁটো—ফেলাই যাবে নিশ্চয়। অথচ ওরই এক মুঠো পেলে ক্ষিদের দুঃসহ জ্বালাটা তার আপাতত নিভত—নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে আরো খানিকটা সময় পেত সে। কিন্তু সে ভীরু। তার মনে, তার দুটি গভীর চোখে সে কাল-রাত্রির ভয়, যে রাত্রে একটা ছাইগাদার আড়ালে বসে পলকহীন দৃষ্টিতে সে দেখেছিল, তার বাবা আর ভাইদের মশাল-জ্বলা রাঙা আলোয় টুকরো টুকরো করে কাটা হচ্ছে তাদেরই উঠোনের ওপরে।

নিজের শুকনো ঠোঁটটা চাটল একবার। দেখল, পাশেই সুইং ডোর। অফিস। ওপরে একটা পাখার ঘূর্ণি তলায় দু-তিনজোড়া জুতো আর মোজাপরা পা। বুকের মধ্যে অস্বস্তির চমক খেলে গেল একটা। মানুষ নেই—মোজা পরা পা। এমন ভয়ঙ্কর মনে হয় কেন কে জানে।

আস্তে দরজাটা ঠেলল। ক্যাঁচ করে তীক্ষ্ণ শব্দ হল একটা—যেন প্রতিবাদ করল।

হাউস্ সার্জন একটা কেস্ বোঝাচ্ছিলেন দুজন ছাত্রকে। তিনজোড়া চশমার আড়াল থেকে ছ'টি তরুণ চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল তার ওপরে।

—নমস্কার!—সে দু হাত জড়ো করে তুলল কপালে।

—কী চাই?—হাউস্ সার্জনের প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসার আগেই উত্তর এসে গেছে।

আসন্ন মাতৃত্ব আর এতটুকু প্রচ্ছন্ন নেই কোনোখানে।

—আমি একটা সীট্ চাই। ফ্রী বেড।

তিনজোড়া চশমার আড়ালে ছ'টি তরুণ চোখ আবার বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইল তাকে। তার শুভ্র নির্মল সীমন্তে সিঁদুরের ক্ষীণতম সংকেত নেই কোথাও; হাতে শঙ্খবলয় নেই। পরনের খয়েরী রঙের শাড়ি দেখে বুঝতে দেরী হয় না যে বৈধব্যের ছাড়পত্রও সে বয়ে আনেনি।

এক মিনিট চুপ করে থেকে হাউস্ সার্জন বললেন, আপনি একা এসেছেন? দাঁড়াবার জন্যে জোর খুঁজতে গিয়ে টেবিলের একটা কোনা সে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। কিন্তু সাহস পেল না। নিজের অজ্ঞাতেই তার হাত দুটো সরে এল সংকুচিত হয়ে, নিজের পায়ে ভর দিয়েই প্রাণপণে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল সে।

বোবাধরা গলাটাকে যথাসাধ্য আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতে করতে বললে, আমি একাই।

—আপনার স্বামী আসেননি ?

এ প্রশ্ন আরো দু-একবার শুনেছে সে—'মিথ্যে জবাব দিতেও চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আরো দুটি-একটি প্রশ্নের আঘাতেই ভিত্তিটা ধসে পড়ে গেছে দুর্বল মিথ্যার। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে নগ্ন নিরাবরণ হয়েই যখন পৃথিবীর সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে, তখন আত্মরক্ষার ওই ক্ষীণ প্রয়াসটুকু একেবারেই অর্থহীন।

নিরুত্তেজ গলায় সে বললে, আমার স্বামী নেই।

অভিজ্ঞ হাউস্ সার্জন চোখ কুঁচকে তাকালেন একবার। ছাত্র দুটি নড়ে উঠল অস্বস্তিতে।

—আপনি বিধবা ?—আর একটা বৈষয়িক নিরুত্তাপ প্রশ্ন।

—না।—কথাটা বলবার আগে আরো দু-তিন জায়গায় সে বারবার দ্বিধা করেছে, কে যেন নিষ্ঠুর হাতে তার জিভটাকে টেনে ধরতে চেয়েছে ভেতর দিকে, মনে হয়েছে ত্রেতাযুগের মতো পায়ের তলার মাটিটা দু-ফাঁক হয়ে গেলে সে লুকিয়ে যেত তার আড়ালে। কিন্তু দেখেছে, মাটি আর এখন ফাঁক হয় না—আরো নির্মম কঠিনতায় নিশ্চল হয়ে থাকে। দেখছে, সে কথা না বললেও অন্যের মুখ থেকে চাপা ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসে হৃদয়হীন উত্তর : ইটস্ অ্যান্ ইল্লিগ্যাল কন্‌সেপশন দেন্ ?

—না।—নিস্পৃহ স্বরে সে বললে, আমি কুমারী।

হাউস্ সার্জনের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না—মনে মনে এমনি জবাবের জন্যে তৈরি হয়েই ছিলেন তিনি। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামালেন, একটা টোব্যাকো পাউচ্ কুড়িয়ে নিলেন টেবিল থেকে। কিন্তু চমকে উঠল ছাত্র দুজন। জীবনে অভিজ্ঞতার পালাটা সবে শুরু হয়েছে ওদের—একজনের হাত থেকে স্টেথোটা শব্দ করে খসে পড়ল মেজের ওপর।

হাউস্ সার্জন বললেন, এক্সকিউজ মী। কোনো বেড নেই।

—আমি বারান্দায় পড়ে থাকব। মেঝেতে। শুধু দুদিন—মাত্র দুদিন—একটা পশুর কাকুতি বেজে উঠল তার গলায়।

—সরি। কোনো উপায় নেই।

একটি ছাত্র রুমাল বের করলে পকেট থেকে, কপালটা মুছে নিলে একবার।

—তা হলে কোথায় যাব আমি ?—নিরর্থক জেনেও প্রশ্নটা না করে সে থাকতে পারল না। করতে সে চায়ওনি—তবু কখন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠেছে কথাটা।

—অন্য কোনো হাসপাতালে দেখুন।—হাউস সার্জনের স্বর উদাস : কোনো

উপায় নেই আমাদের। দুঃখিত—মর্মান্তিক দুঃখিত। আচ্ছা—আসুন—

আরো কিছু তার বলবার হয়তো ছিল। কিন্তু নতুন কিছু নয়। বলা যায়—না বললেও ক্ষতি নেই।

—নমস্কার।

সে পিছন ফিরল। পা দুটো মাটির ভেতর যেন কংক্রীট জমিয়ে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, টেনে তুলতে হল তাদের। আবার তীক্ষ্ণ শব্দ করে খুলল স্যুইং ডোরটা—সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তার পেছনে।

আর একটা দরজা বন্ধ হল। হয়তো শেষ দরজা।

হাউস্ সার্জন বললেন, আসুন, ডিস্কাশনটা শেষ করে নিই।

যে ছাত্রটি রুমাল দিয়ে কপাল মুছছিল, তার দুটো চোখ জল্‌জল্ করে উঠল হঠাৎ।

—বেড তো ছিল একটা।

হাউস্ সার্জন হাসলেন: কিন্তু নট্ ফর্ হার। ওটা সতী স্ত্রীদের জন্যে। মেয়েটা বুদ্ধি করে কপালে খানিকটা সিঁদুর লেপে এলেও পারত। বুঝেও না বোঝার ভান করা চলত।

—কিন্তু ডক্টর—ছেলেটি চোখের সামনে একটা শীর্ণ গর্ভকাতর পীড়িত মুখ দেখতে পাচ্ছিল তখনও: মেয়েটা একেবারে হেল্‌পলেস।

—আমরাও।—হাউস্ সার্জন একটা সিগারেট পাকাতে লাগলেন: এ সমস্ত বিশ্রী ব্যাপার ঢুকিয়ে শেষে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়বে কে? এসব অনেক দেখতে হয় এখানে। দু-এক বছরের মধ্যে আপানাদেরও তো ডিউটির পালা আসবে—বুঝবেন তখন।

—কিন্তু মেয়েটা যে অত্যন্ত অ্যাড্‌ভান্সড্। কী উপায় হবে ওর?

—শি মাস্ট্ পে ফর হার সিন!—ঘরের মধ্যে একটা পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইলেন হাউস্ সার্জন: কী করব—আমাদের একটু সাবধান থাকাই ভালো।

না, আর কোনো উপায় নেই। স্বপ্নাবিষ্টের মতো আবার সে হাঁটতে লাগল। একটা দীর্ঘ করিডর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি আরো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—পৃথিবীটা আরো সংকীর্ণ আর সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে তার চারদিকে। এইবারে হয়তো ফুটপাথেই এলিয়ে পড়তে হবে তাকে।

কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যুকে সে চায় না—মরতে সে ভয় পায়। চোখের সামনে এখনো সেই কালরাত্রির বিভীষিকা জেগে আছে তার। ছাদের কার্নিশ—কেরোসিন তেল—হুকে বাঁধা দড়ির ফাঁসটা—কত প্রলোভনই তো ছিল সামনে। সে তাদের সুযোগ নিতে পারেনি।

—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। শিশুর কান্না। বুকের মধ্যে একটা শীতল বিদ্যুৎ বয়ে গেল তার। কে কাঁদছে? তার গর্ভের শিশু?

—ওঁয়া—ওঁয়া—

মার বুক। বাবার প্রসন্ন হাসি। নার্সও হাসছে। কেমন সুন্দর ছেলে হয়েছে আপনার। রাঙা জামা আসবে এর পরে। বেলুন—খেল্‌না—রঙীন্ দোল্‌না। খোকা দেয়ালা করছে ঘুমের মধ্যে। মার চুমু নেমে এল কাজলপরা চোখের ওপর। অন্ন-প্রাশন। শানাই বাজছে—

দু হাতে কান চেপে ধরে ছুটে চলল সে। আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ের শেষ শক্তিতে। এইবার শুধু মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়াই অবশিষ্ট আছে তার!

বাইরে জ্বলন্ত পৃথিবী। ঘূর্ণির দীর্ঘশ্বাসে ধুলো উড়ছে—পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে শুকনো পাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো। চোখের ওপর আছড়ে পড়ছে আগুনের হল্‌কা।

কোচম্যান বসে আছে মূর্তির মতো। চোখের কোণায় ব্যথিত জিজ্ঞাসা সঞ্চার করে তাকিয়ে দেখল একবার।

গাড়িতে উঠে দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে। পেটের ভেতরে সেই নাড়ী-ছেঁড়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে আবার। আবার সেই অন্ধ প্রাণশক্তি মাথা খুঁড়ছে! সন্তান নয়—ঘাতক!

কোচম্যান জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাব এবারে? কতক্ষণ ঘুরব আর?

কোনো জবাব এলো না।

বিকেল বেলা। শহরতলীর একটি ছোট মুসলমানী হাসপাতাল।

ডাক্তার হাসলেন: আদাব মিঞা সায়েব। আপনার বিবি?

—জী জনাব।

—ব্যথা উঠেছে দেখছি। আচ্ছা, এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।

এখন আর কোচম্যান নয়—গোলাম রহমান সে। গায়ে ফর্সা জামা—পরনে ধোপদুরস্ত লুঙ্গি। বিনীত হেসে বললে, আপনার মেহেরবানি।

—কি নাম বিবির?

—রোকেয়া।

—পাঠিয়ে দিন ভেতরে—

আর একটি দরজা খুলল। আর একটি নতুন শিশুর জন্যে।

নতুন গান

বাজার থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল রায় মশায়। গাঁজা পাওয়া যায়নি। শহরে আজ হরতাল। হালে আরো জোরালো হয়েছে নামটা—'আম হরতাল'। অর্থাৎ একটি মানুষ বাজারে যাবে না, একটা পান-বিড়ির দোকান পর্যন্ত খোলা থাকবে না কোথাও। এমন কি যে সব রুটি মাংসের দোকানগুলো এ পর্যন্ত কোনো দিন ঝাঁপ বন্ধ করেনি—সেখানে অবধি রাবণের চুলোয় আঁচ পড়েনি আজ।

এই চলবে। চলবে বেলা চারটে পর্যন্ত। গাঁজা না পাওয়ার ক্ষোভে দ্রুত পায়ে চলছিল রায় মশায়। কিন্তু খানিকটা হাঁটবার পরে কেমন অদ্ভুত লাগতে লাগল, হঠাৎ রায়মশায়ের মনে হল সব যেন কেমন বেসুরো ঠেকছে।

বয়স ষাটের কাছাকাছি—এর মধ্যে কিনা দেখেছে রায় মশায়! সেই যেবার সুরেন বাঁড়ুজ্জে এলেন, ভারী গোলমাল হল শহরে, চলল বে-পরোয়া লাঠিবাজি—সে সব কি ভোলবার কথা! এক-একটা করে স্বদেশীর হাওয়া এসেছে ঘূর্ণিপাকের মতো, তচনচ করে দিয়ে গেছে সব—কত কাণ্ড হয়ে গেছে ওই অশ্বিনীকুমার হলে! তারপর কুলকাঠির সেই হাঙ্গামা—উঃ, সে কি দিন! বাতাস থমকে গেছে—কেঁপেছে আকাশ—কোন্‌খান দিয়ে আগুন যে লকলকিয়ে উঠবে কে তা বলতে পারে!

তারপর সেই দুঃস্বপ্ন এল। দেশ দু' টুকরো। তাতেও কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না রায় মশায়ের। সোজা মানুষ—সোজা বুঝ-সমঝ্‌। আরে বাপু, হিন্দুস্থান হোক আর পাকিস্তানই হোক, আমার কি আসে যায়! জমিদার নই, তালুকদার নই—সরকারী চাকুরেও নই। আমার গয়নার নৌকো চলুক—সোয়ারী যাতায়াত করুক—নগদ পয়সা গুণে দিয়ে যাক। হিন্দু যাত্রী হোক, মুসলমান যাত্রী হোক, দক্ষিণের মগ-ফিরিঙ্গিই হোক—সকলের পয়সার চেহারাই একরকম। তার ওপর ইংরেজীই লেখা থাক আর ফার্শিই লেখা থাক—টাকায় ষোল আনা বুঝে পেলেই আমি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা গেল না। মাধবপাশ-লাখুটিরা-হিজলায় আবার সেই খুনোখুনি। গায়ের রক্ত-জল-করা সব খবর। ভয়ে এক মাস গয়না বন্ধ রেখেছিল রায় মশায়—এমন কি গাঁজার নেশাও ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা। শেষে গায়ত্রী পর্যন্ত ভোলবার জো। সবে হয়তো 'ওঁ ভূর্ভুব' পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ শোনা গেল হল্লা—হয়তো মুরগীচোর ভাম বেড়ালকে তাড়া করেছে কেউ; কিন্তু তাতেই গুরগুর শব্দ শুরু হয়ে গেছে বুকের ভেতরে—গায়ত্রী সোজা গিয়ে উঠেছে ব্রহ্মতালুতে।

যারা ভেবেছিল কিছুতেই নড়বে না, শেষ পর্যন্ত তারাও গিয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠল

এক্সপ্রেস স্টীমারে। রায় মশায়ের মনও ছট্‌ফট্‌ না করেছিল তা নয়। তবু রয়েই গেল। এই শহর, এই আকাশ-বাতাস, চোখ বুজে চেনা নদী-খালের প্রত্যেকটি বাঁক, কীর্তনখোলার টাটকা ইলিশ—এসব ছেড়ে কোথায় যাবে রায় মশায়? ঝাঁপ দেবে কোন্ অন্ধকারে?

চল্লিশ বছর আগে ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পেয়েছিল—কোটালী-পাড়া থেকে—পাস করেছিল গুরু ট্রেনিং। তারপর একটা ইস্কুলে গেল পণ্ডিতি করতে। কিন্তু বেশীদিন টিকল না সেখানে। সেক্রেটারীর ছেলেটা অত্যন্ত বাঁদর—হেড মাস্টারকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিড়ি খায়, অথচ একটা কথা বলবার জো নেই কারুর। রায় মশায়ের সইল না। একদিন ছেলেটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মনের সাধে বেতিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা।

মাস্টারি সেইখানেই খতম। তারপর কী করে যে এই গয়নার নৌকোর ব্যবসা ফেঁদে বসল নিজেরই ভালো করে মনে পড়ে না। তবু চল্লিশ বছর এই নিয়ে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়েছে সে। কত বড় বড় বাবু, কত উকিল-মোক্তার, কত চাষা-চোয়াড় মানুষ, কত মোলা-মৌলবী, কত স্বদেশী, কত খুনী। অসহ্য দুঃখে সারা রাত চোখের জল ফেলতে ফেলতে কতজন তার নৌকোয় পাড়ি দিয়েছে, তাসের আর গানের হররায় রাত কাবার করেছে কত লোক। রায় মশায়ের নৌকোয় পয়সা ছাড়া কিছুই অচল নয়। আর অচল পয়সার কথাই যদি বলো, তা হলে ভালো ভালো বাবুদের পয়সাগুলোই ভালো করে দেখে নিতে হয়েছে তাকে। সিসের সিকি কিংবা কানা আধুলি বাবুরাই পাচার করতে চেয়েছে সবচেয়ে বেশি।

এই খাল-নদীগুলো রায় মশায়ের রক্তনাড়ী—গয়নার নৌকোয় ডঙ্কার ডুম্ ডুম্ বুকের স্পন্দন, এই নৌকো তার প্রাণ। এর বাইরে তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ ছেড়ে কোথায় যাবে রায় মশাই? হিন্দুস্থান? যেখানে শুকনো খটখটে মাটি—রোদ আর ধূলোতে ধূ-ধূ মাঠ (এ সব বর্ণনা রায় মশায়ের কল্পনা নয়, দস্তুরমতো ভালো লোকের মুখে শোনা)—সেখানে কী করবার আছে তার? হিজল আর নারকেল সুপুরীর ছায়া যদি কাজলের মতো খালের জলে নুয়ে না পড়ে, যখন-তখন হাত বাড়িয়ে যদি বেত ফল সংগ্রহ করা না যায়, যদি খালের পাড়ের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দু-এক কুড়ি কাঁকড়া আর শলা চিংড়ি না জোগাড় করা যায়, আর সবচেয়ে বড় কথা, গয়নার নৌকো চালাবার মতো তরতরে জলের সন্ধান যদি না মেলে, তবে—

তবে যেমন করে জলের মাছ ডাঙায় উঠে ছটফটিয়ে মরে যায়, ঠিক সেই দশাই যে হবে রায় মশায়ের! তাই সাত পাঁচ ভেবে থেকেই যেতে হল এ দেশে। আর

নড়েই বা কী হবে? একটা ছেলে ছিল—পনেরো বছর আগে দেশ ছেড়েছে—তারপরে আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। আর স্ত্রী আছে ঘরে—দু চোখে ছানি পড়ে কিছুই প্রায় দেখতে পায় না। হিন্দুস্তান পাকিস্তান দুই-ই সমান তার কাছে।

মোটামুটি সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—আজ কেমন বেসুরো ঠেকছে। হরতাল। আর হরতাল। আগেকার দিনে হাজার ঝড়-ঝাপ্‌টার ভেতরেও মুসলমানের দোকান খোলা থাকত ঠিক। আজ মুসলমানই ঝাঁপ বন্ধ করেছে সকলের আগে।

কী ব্যাপার? না, বাংলা আমাদের ভাষা—বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা চাই

হাঁটতে হাঁটতে নতুন বাজারের খালের ধারে এসে পৌঁছুল রায় মশায়। পুরনো আমলে শ্মশান ছিল এখানে—এখন শ্যাওলাধরা আধভাঙা মঠের সারি। তার কাছেই গয়নার ঘাট।

কোনো কাজ নেই হাতে। সেই সন্ধ্যার সময় গয়না ছাড়বে—তার আগে পর্যন্ত ভারগ্রস্ত অবসর। কাজের মধ্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়া। তাড়া নেই সে জন্যে।

—বাংলা আমাদের ভাষা—

—বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

রায় মশায় উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কলেজের দিক থেকে শোভাযাত্রা আসছে একটা।

—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করো—

—বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

রায় মশায় তাকিয়ে রইল। বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন হোঁচট লাগছে মাথার মধ্যে। কাদের মুখে এ কী শুনছে সে! বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রায় মশায় দেখতে লাগল—একটি হিন্দু ছেলেও ওদের মধ্যে কোথাও আছে কিনা!

অথচ মাত্র বছর দুই আগে—

রায় মশায়ের একটা অভ্যাস ছিল বরাবর। সে যে এক সময় কোটালীপাড়া থেকে পেয়েছিল সংস্কৃত উপাধি—সে কথা লোককে মনে করিয়ে দিয়ে ভারী আত্মতৃপ্তি পেত। এক একদিন রাতে যখন গুমোট হয়ে থাকত, এমন কি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পর্যন্ত উঠত না খালের জল থেকে—তখন যাত্রীদের কেউ কেউ বায়না ধরত—দু-একটা শোলোক-টোলোক শোনান না রায় মশায়!

আর কথা নয়—সঙ্গে সঙ্গে সুর করে রায় মশাই আরম্ভ করে দিত। কোনো কোনো দিন গাঁজার নেশা যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে চড়ে বসত, দু-একটি রসিক যাত্রী থাকত নৌকোয় সেদিন আরো জমে উঠত।

যাত্রীরা বলত, ওসব ধর্মকথা ভালো লাগছে না রায় মশায়, রং[illegible] ধরুন।

[illegible]

রংদার। তার জন্যে ভাবনা কী! সংস্কৃত হল রাজপ্রাসাদ। তাতে যেমন দেউ আছে, তেমনি আছে বাই নাচের আসর। অতএব রায় মশায় শুরু করে দিত 'গা সপ্তশই', 'অমরু-শতক' কিংবা একরাশ উদ্ভট শ্লোক। একেবারে আদি অকৃত্রি আদিরস।

—ওতে হবে না রায় মশায়—বাংলায় ব্যাখ্যা করুন।

বাংলায় ব্যাখ্যা। শুরু হতেই কানে আঙুল দিত নিরীহ যাত্রীরা আর বাকি সকলের উৎকট অট্টহাসিতে খালের জল মুখরিত হয়ে উঠত।

সেবারেও রায় মশাই মাঝরাতে গাঁজার ঝোঁকে স্তোত্র শুরু করে দিয়েছিল হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে ধমক উঠল একটা। বিরক্ত হয়ে মৌলবী উঠে বসেছেন একজন।

—ওসব চলবে না রায় মশায়, সেদিন আর নেই। উর্দু কিংবা ফার্সী গজল জান থাকে তো শোনাও। নইলে চুপ করে থাকো।

চুপ করে রইল রায় মশায়। অনেক দিন মুখ খোলেনি তারপর থেকে। মুখ খোলবার জন্যে তাগিদ দেবে, তেমন যাত্রীই বা কোথায় আর? ঠিক কথা—সেদিন আর নেই। সব বদল হয়ে গেছে।

গ্রাম মক্তব আছে। তার মৌলবীর সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। কথায় কথায় মনের দুঃখটা একদিন বেরিয়ে পড়ল তার কাছে। মৌলবী ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, আছে বটে ও-রকম দু-চারটে কাঠ মোল্লা। তা মন খাবাপ করছ কেন সেজন্যে?

—না, মন খারাপ করছি না।—রায় মশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল একটা: সবই যখন বদলে যাচ্ছে, তখন আমাকেও বদলাতে হবে বইকি। দু-একটা উর্দু-ফার্সী শিখিয়ে দাও আমাকে। কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে—রাতে কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি না।

অগত্যা গোটা কয়েক বয়েৎ আর গজলের পাঠ দিলেন মৌলবী। বিচিত্র সুর—অজানা ভাষা। উচ্চারণ হয় না—সুরের মধ্যে উঁকি দেয় মহিম্ন স্তোত্র। তা হোক, যেমন দিন তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে বইকি নিজেকে। গয়নার নৌকো চেনা পথ ধরে তেমনি যাতায়াত করে। তবু থমথমে মাঝরাতে—ঘন হিজল-বনের কালো ছায়ার তলা দিয়ে চলতে চলতে যখন শরীরে ছমছমানি লাগে, চল্লিশ বছরের অভ্যাস একটা অসহ্য আবেগের মতো আছড়ে পড়ে গলার কাছে, তখন ঘুমন্ত যাত্রীদের চমক দিয়ে হঠাৎ সুর টেনে বয়েৎ শুরু করে রায় মশায়: 'কদরে গোল বুলবুল্ বেদানম্ ইয়া চবেরী—'

গোড়ার মুখে যাত্রীরা কেউ হেসে উঠত। কিন্তু এখন আর হাসে না। দু'-চারজন নাম দিয়েছে 'রায়-মৌলানা'। একজন ঠাট্টা করছিল, অতটাই যদি এগোলে, তা হলে [illegible] কলমাটাও পড়ে নাও রায় মশায়। ওটুকু আর বাকী থাকে কেন?

[illegible] হয়ে থাকত রায় মশায়। কিন্তু এখন সয়ে গেছে। [illegible]

অতোই সহজ হয়ে আসছে উর্দু গজল : 'ইন্‌সানোকে লিয়ে আজ ইন্‌সান্ চাহিয়ে।' এমন কি সুরও লেগেছে রায় মশায়ের গলায়। বয়েস বাড়লে মাথার চুল পাকে, তাকে ঠেকানো যায় না ; তেমনি দুনিয়ার হাল-চাল বদলে চলে তার নিজের নিয়মেই। কী করে তাকে রুখবে রায় মশায় ? যা সহজ—যা আসবেই, সহজ ঔদার্যেই আসবার পথ করে দাও তার। সংস্কৃত ছেড়ে একদিন ইংরেজী শিখতে হয়েছিল—তেমনিভাবেই উর্দু-ফার্সীও শেখা গেল না হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন নিজেকে বদল করে নিয়ে চলেছে—গানের বাণী কিংবা তার সুরেও যদি বদলের পালা এসে থাকে, তবে কেন তাকে মেনে নেবে না রায় মশায় ?

কিন্তু এ আবার কী ? বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ ?

রায় মশায় একটা ভাঙা মঠ থেকে একখণ্ড থান ইট টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বাংলা ভাষা ! কে কবে মাথা ঘামিয়েছে তার জন্যে ? কিছুদিন আগেও তো কয়েকটা মুসলমানী পুথি-পত্র খুলে চোখ প্রায় আকাশে উঠেছিল রায় মশায়ের। বাংলা ভাষায় সেগুলো লেখা—অন্তত হরফ থেকে তাই-ই মনে হয়। কিন্তু তার অর্ধেকেরও বেশি বোঝবার কোনো উপায়ই নেই। অপরিচিত শব্দগুলো যেন সরকারী তোষাখানার সামনে সঙ্গীন্ তোলা সিপাইয়ের মতো হাঁক ছাড়ছে : হুকুমদার !

অথচ আজ—

কাউনিয়ার দিক থেকে কেদার ঘোষ আসছিল। রায় মশায়কে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে আস্তে আস্তে এগোল তার দিকে।

—কী খবর রায় মশায় ? গয়নায়ও হরতাল নাকি ?

রায় মশায় চমকে মুখ ফেরালো। বললে, আমার গয়না তো ছাড়বে সন্ধ্যের পর। বিকেল চারটেয় মিটবে হরতাল।

—বলা যায় না, হাওয়া বড় গরম।

—কী হয়েছে ?

আর একখানা ইট টেনে নিয়ে কেদার ঘোষ রায় মশায়ের পাশে বসে পড়ল : এই মাত্র খুব খারাপ খবর এসেছে ঢাকা থেকে। গোলাগুলি চলেছে।

—গোলাগুলি !—পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল রায় মশায়ের। হিজলা-নাখুটিয়া-মাধবপাশা ! মানুষের সমস্ত মুখগুলো বদলে দানবের মতো হয়ে গেছে। ফকির বাড়ি আর বিবির মহল্লার দিকে আগুনের রঙে রাঙা হয়ে উঠছে আকাশ। অমানুষিক ভয়ে রায় মশায় বললে, গোলাগুলি ! দাঙ্গা— ?

—দাঙ্গা নয়, সে-সব আর হবে না। পুলিসে গুলি চালিয়েছে।

—হিন্দুদের ওপর ?

—না, মুসলমানের ওপর।

মুসলমানদের ওপর গুলি চালিয়েছে পুলিস! রায় মশায় হাঁ করে রইল কিছুক্ষণ। দুনিয়া বদলাচ্ছে—বড় বেশি তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে! এই অসম্ভব দ্রুত গতির সঙ্গে কী উপায়ে পাল্লা দেবে রায় মশায়? পাকিস্তানে মুসলমানদের ওপর গুলি চালাচ্ছে পুলিসে? এও কি বিশ্বাস করতে হবে?

—গুণ্ডার দল বুঝি?

—না। কলেজের ছাত্র—পথের মানুষ—

রায় মশায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। কলেজের ছাত্র! তারাই তো দেশের জঙ্গী-জোয়ান, তাদের হাতেই তো হাঁসিল হয়েছে পাকিস্তান। কতবার কত 'জুলুস" নিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে দেখেছে রায় মশায়। দীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা—সোজা মেরুদণ্ড, নির্ভীক পদক্ষেপ। হাতের আর এক মুঠিতে ঝাণ্ডা, আর এক মুঠিতে যেন বজ্র নিয়ে তালে তালে পা ফেলেছে তারা।

—পাকিস্তান কায়েম করো—

সেই বজ্রবাহীর দল—পাকিস্তানী ঝাণ্ডা আর তরুণের ডাণ্ডা হাতে সারা দেশের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে, আজ তাদের ওপরেই পুলিসে গুলি চালাচ্ছে! স্বপ্ন ছাড়া এ আর কিছুই নয়!

কেদার ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: কী যে হচ্ছে বুঝতেও পারছি না। আগে দোকানের নাম ছিল 'স্বরাজ ভাণ্ডার'—বদলে করেছি 'পাকিস্তান স্টোর্স'। এর পর জল কোথায় যে গড়াবে কে জানে!

রায় মশায় নিথর হয়ে রইল। আর একটা দল আসছে বোধ হয়—অথবা সেইটেই ঘুরে চলেছে খালের ওপর দিয়ে। ঝড়ের ডাকের মতো শোনা যাচ্ছে দূর থেকে: পুলিস জুলুম বন্ধ করো। বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ—

কেদার ঘোষ পাংশু মুখে বললে, যাই দেখি দোকানে। বন্ধ তো করেই রেখেছি, আরো গোটা দুই তালা লাগিয়ে দিইগে। কে জানে লুটপাট শুরু হবে কিনা!

নির্জন শ্মশানে সারি সারি শ্যাওলা ধরা পুরনো সমাধি। কয়েকটা গাছের ছায়া—স্যাঁতসেঁতে মাটি। রায় মশায় ইতস্ততঃ চোখ বুলিয়ে মঠগুলোর ওপরের লেখা পড়তে চেষ্টা করল। খানিক দূরে বড় একটা ওঁ লেখা যাচ্ছে, কিছুই পড়া যাচ্ছে না ওই ছাড়া। চোখের দৃষ্টি কি ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে তার—ছানি নামছে? হঠাৎ রায় মশায়ের মনে হল প্রত্যেকটা সমাধি থেকে এক একটা কালো ছায়া উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন—যেন কতগুলো অদৃশ্য [illegible] মতো তাদের দৃষ্টি এসে পায়ে [illegible] তার। [illegible] ওই তিন চূড়ো উঁচু মঠটার ওপর দাঁড়িয়ে [illegible] করছেন

অশ্বিনী দত্তের একজন নামকরা শিষ্য—দেশের জন্যে কম করেও কুড়ি বছর জেল খেটেছিলেন তিনি। গম্ভীর গম্ভীর গলায় তিনি যেন জানতে চাইছেন: কী হচ্ছে রায় মশায়—চারদিকে কী হচ্ছে এসব?

কী উত্তর দেবে রায় মশায়? দেখেছে চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার রক্তমাখা দেহ—দেখেছে অনেক পিকেটিং আর হাঙ্গামা, শুনেছে মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান। কিন্তু এমন নতুন স্বদেশীর কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল? দেশ দু ভাগ হওয়ার পরে দেশের ভাষাকে ভালবাসতে শিখল মানুষ—রক্ত দিতে শিখল তার জন্যে! মুখের ভাত নয়—মুখের বুলির জন্যে এমন করে যারা ঝড় তুলতে পারে—কোথায় ছিল তারা এতদিন? কেন এতকাল তারা স্বদেশীর ডাকে এগিয়ে আসেনি—কে দায়ী তার জন্যে?

রায় মশায়ের শরীর শিরশির করতে লাগল। অনেক দূর থেকে এখনো শোনা যাচ্ছে ঝড়ের সেই গর্জনটা। আর এই কালো কালো ছায়ার তলায়—এই স্যাঁতসেঁতে মাটির ভেতরে যেন একরাশ মৃতের জিজ্ঞাসা তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী বলবে রায় মশায়—কী জবাব দেবে কাকে?

বাজারের পথ নির্জন—একটি মানুষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু শূন্যতার মধ্যে লাল ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরছে একটা। রহমৎপুরের রাস্তার এধারে যেখানে রিক্সাওয়ালাদের বড় একটা আড্ডা ছিল—সেখানে একটা চাকা ভাঙা রিক্সা কাত হয়ে আছে, আর কোথাও কিছু নেই। যেন তার চারদিকে মধ্যরাতের স্তব্ধতা নেমে এসেছে একটা।

রায় মশায় সভয়ে উঠে দাঁড়ালো। কেমন ঝিম ঝিম করছে শরীর—কেমন টিপ টিপ করছে মাথার ভেতরে। সকাল থেকে এক কলকেও গাঁজা জোটেনি। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এটা। কিন্তু গাঁজার নেশার চাইতেও তীব্রতর একটা নেশার প্রভাব পুঞ্জিত হচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে: একটা আশ্চর্য আচ্ছন্নতা সঞ্চারিত হয়ে পড়েছে তার সারা শরীরে।

গয়নার নৌকোয় আশ্রয় নেওয়াই নিরাপদ এখন।

মাল্লা-মাঝির দল যারা শহরে নেমে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসছে একে একে। নিয়ে আসছে নানারকম অস্বস্তি জাগানো সংবাদ।

—ঢাকায় হুলুস্থুলু কাণ্ড হচ্ছে। বিস্তর খুনোখুনি চলছে। এখানে মিছিল ভেঙে দিয়েছে—অনেক ধর-পাকড় করেছে। কী যে হবে শেষতক্—কেউ বলতে পারে না।

অসাড় একটা আড়ষ্ট শরীর নিয়ে চুপ করে পড়ে রইল রায় মশায়। এখনি তার পালাতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। সারাটা শহর যেন বারুদ দিয়ে ঠাসা—যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আর সেই বিস্ফোরণে তার এই গয়নার নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে—তার এক চিলতে কাঠও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না সহজে।

—হারামীর বাচ্চারা !—কে যেন কাকে গাল দিয়ে উঠল। একটা তীব্র জ্বলন্ত আক্রোশ লোকটার গলায়। সেই দাঙ্গার দিনগুলো। আকাশে-বাতাসে আগ্নের উত্তাপ। সামান্য একটু আওয়াজ কানে এলেই হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে যেতে যায়!

—এর বদলা চাই!—কোথা থেকে ক্ষিপ্তভাবে কে যেন চিৎকার করে উঠল। দু হাতে কান দুটো চেপে রইলো রায় মশায়। বিবির মহল্লায় আবার কি আগুন লাগল নাকি? খালের জলে কী ভেসে যাচ্ছে ওটা? মরা কুকুর না মানুষের লাশ?

দু পাশের গয়নার নৌকোয় নানা উত্তেজিত আলোচনা। টুকরো টুকরো শব্দ। না—ওর একটা বর্ণও সে শুনতে রাজী নয়। কোনো প্রয়োজন নেই তার—কোনো স্বার্থও নেই। এই শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে সে বাঁচে—নিস্তার পায় এই অগ্নিবলয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে।

মাথার ভেতরে সেই আচ্ছন্নতা—সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অবসাদ। রায় মশায়ের চোখেব পাতা দুটো ভাবী হয়ে আসতে লাগল।

—উঠুন—উঠুন কর্তা। আর কত ঘুমুবেন?

রায় মশায় উঠে বসল ধড়মড় করে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে।

—হোটেল তো খুলেছে। খেতে যাবেন না? এখুনি তো গয়না ছাড়তে হবে।

ঘোলা ঘোলা চোখ মেলে চেয়ে দেখল রায় মশায়। তারই গয়নার মাঝিরা ডাকাডাকি করছে তাকে।

—শহরের অবস্থা কী?—প্রথমেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

—ভালো নয় কর্তা। কাছারীর ওদিকে খুব গণ্ডোগোল হয়েছে। আপনি যা হয় দুটি খেয়ে এসে চট্‌পট্‌ গয়না ছেড়ে দিন। বেশি রাত হলে—

বিষাদ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রায় মশায়।

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না আজ। চিঁড়ে-মুড়ি আছে, চলে যাবে ওতেই।—রায় মশায় একবার ইতস্ততঃ করল: তামাকের দোকান বুঝি খোলেনি?

মাঝিরা হাসল।

—সরকারি দোকান—ও কি আজ আর খোলে?

রায় মশায় দপ্‌ দপ্‌ করা কপালটা দু হাতে টিপে ধরল। আর একটা—আরো একটা দীর্ঘ—বিলম্বিত রাত। বুকের রক্ত অস্থিরতার ঢেউ ভাঙছে। এই রাতে কী যে ঘটতে পারে তা অনুমানেরও বাইরে। অথচ এই দুঃসহ মানসিকতার মধ্যে কোথাও তার বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা নেই—এতটুকু অবলম্বন নেই আত্মতুষ্টির!

—ডঙ্কা বাজাও, ডাকো লোক—বিকৃত মুখে রায় মশায় বললে।

দুম দুম করে ঘা পড়ল ডঙ্কায়।

—সাহেবের হাট—সাহেবের হাট। চলে আসুন—

রায় মশায় কান পেতে শুনতে লাগল। কেমন অপরিচিত আর অলৌকিক মনে হচ্ছে ডঙ্কার আওয়াজটা। কালবৈশাখীর মেঘের মতো শহরের আকাশ। নতুন বাজারে দু একটা দোকানে আলো জ্বলেছে বটে, তবু যেন প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এই ডঙ্কার আওয়াজটা যেন স্তব্ধ স্তিমিত শহরের ওপর একটা অস্বাভাবিক আলোড়ন তুলছে আজ।

তবু যাত্রী এল। অন্ধকার শ্মশান-খোলার ভেতর দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো দুটি-একটি করে উঠে আসতে লাগল নৌকোয়। আবছা চোখ মেলে দেখতে লাগল রায় মশায়। কিছু চেনা, কিছু আধ চেনা, কিছু অচেনা।

আজ সব কিছুই ব্যতিক্রম। অন্যদিন নৌকোয় উঠেই গল্প জমায়—তিন মিনিটের মধ্যে গুলজার করে তোলে। কিন্তু আজ যেন শহরের ওই জমাট বৈশাখী মেঘটাকে সবাই বয়ে এনেছে মনের ভেতরে। দু-একটা টুকরো টুকরো কাজের কথা—সেও যেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে।

বারুদ ঠাসা এই শহর। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন বিস্ফোরণের সময়টা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। রায় মশায় ছটফট করে উঠল। পালাতে হবে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—ডঙ্কা দাও, নৌকো ছাড়ো।

ডুম-ডুম-ডুম। সাহেবের হাট—সাহেবের হাট—

গয়নার নৌকো নোঙর তুলল—লগির খোঁচ পড়ল মাটিতে। কয়েক হাত এগিয়ে যেতেই দু'দিকের দুখানা দাঁড়ে ঝিঁকে লাগল। এইবার সমস্ত নৌকোকে পেছনে ফেলে জাহাজের মতো চলবে গয়না—তর্ তর্ করে জল কাটবে—দশ মিনিটের মধ্যেই ছাড়িয়ে যাবে শহরের চৌহদ্দি, জেলখানার উঁচু প্রাচীর আর বড় বড় পিপুল গাছের ছায়া।

রায় মশাই চোখ বুজে বসে রইল।

দশ মিনিট নয়, তার বেশি। এক ঘণ্টা? দেড় ঘণ্টা? আবার কি দু'চোখে অবসাদের ঘুম জড়িয়ে এসেছিল তার? কে যেন ডাকছে। চমকে চোখ মেলল রায় মশায়!

—রায় মশায় ঘুমুচ্ছেন?

—না, ঘুমুচ্ছি না।—জবাব দিয়ে রায় মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে নৌকোর মধ্যে। যে ডাকছিল তাকে চিনতে দেরি হল না। সাহেবের হাটের মিঞা বাড়ির ছোট ছেলে আবু—এখানে কলেজে পড়ে। কখন তার নৌকোয় উঠল? সে তো দেখতে পায়নি।

আবু বললে, ঘুম আসছে না রায় মশায়—একটা গান-টান ধরুন।

—গান?—রায় মশায় গোটা দুই ঢোক গিলল পর পর। আজকের রাতেও কি কেউ গান গাইবার ফরমাশ করতে পারে? সমস্ত গান এখন গিয়ে আটকেছে গলার ভেতরে।

আবু বললে, লাগিয়ে দিন, লাগিয়ে দিন। সব মনমরা হয়ে আছে—জমিয়ে দিন একটু।

রায় মশায় তাকিয়ে দেখল দুধারে। শহর অনেক পেছনে পড়ে গেছে। তরল অন্ধকারে একদিকে সুপুরীর বন স্তব্ধ পুঞ্জিত—অন্য দিকে ধানের মাঠ।

গলা খাঁকারি দিয়ে রায় মশায় শুরু করলে, 'ইন্‌সানোকে লিয়ে আজ ইন্‌সান্ চাহিয়ে'—

—উঁহু, ও নয়, ও নয়!—মাঝপথে বাধা দিলে আবু, মানুষ আমরা চাই বটে, কিন্তু উর্দুতে নয়। দেশের মানুষকে ডাকতে চাই দেশেরই ভাষায়।

রায় মশায় থমকে গেল।

আরো তিন-চারটি ছেলে গয়নায় উঠেছে আবুর সঙ্গে। কলেজের ছাত্রই খুব সম্ভব। সমস্বরে গলা তুলল তারা: হাঁ—হাঁ—দেশের ভাষায়।

—দেশের ভাষা? রায় মশায় অন্ধকারে চোখ মেলে কী একটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। চাকা কি উল্‌টো মুখে ঘুরছে আবার? পাকিস্তানের চেহারা কি বদলে যাচ্ছে রাতারাতি? এত কষ্ট করে শেখা উর্দু-ফার্শী কোনো কাজেই লাগবে না তবে? এক বছর পরে রায় মশায় আবার সংস্কৃতকে ফিরে মনে আনতে চাইল। আবার গলায় আনতে চাইল সেই পুরনো স্বর:

"ধীরে সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
গোপী-পীন-পয়োধর—"

তিন-চারটি গলায় আবার ভেসে উঠল সমবেত প্রতিবাদ: না রায় মশায়, সংস্কৃতও না।

তা হলে? তা হলে আর তো কিছু জানা নেই রায় মশায়ের। আর কোনো গান তো নেই তার গলায়। রায় মশায় বিমূঢ় হয়ে রইল।

আবু বললে, রায় মশায়, সংস্কৃত শিখেছিলেন সংস্কারে, উর্দু শিখেছিলেন দায়ে। কিন্তু প্রাণ থেকে যা শিখেছিলেন, সেই বাংলা ভাষার গান আমাদের শোনান। সংস্কৃত হিন্দুয়ানীর ছাপ্ মারা—উর্দুর চেহারা মুসলমানী। কিন্তু বাঙালী বাঙালীই—সে হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়। তার গান আমাদের সকলের গান।

বাংলা গান! রায় মশায় এবারেও একটা কথা বলতে পারল না। শুধু তাকিয়ে

রইল অন্ধকার সুপুরি বনের দিকে—শুধু কান পেতে শুনতে লাগল দাঁড়ের আওয়াজ, খালের কালো জলের কলোচ্ছ্বাস।

আবু বললে, রায় মশায়, অবিশ্বাস করছেন কেন? মুসলমান এগিয়ে না এলে সংস্কৃতের বাঁধন থেকে বাংলা মুক্তি পেত না—ইতিহাসে সে কথা আছে। আজ আবার মুসলমানই কি বেড়ী পরাবে তার পায়ে? সে কখনোই হতে পারে না। কোনো ভাবনা নেই রায় মশায়, আপনারা যদি গাইতে না পারেন, তবে আসুন, আমরাই তার সুর ধরিয়ে দিচ্ছি!

তীক্ষ্ণ জোরালো গলায় আবু গান ধরলে:

ও আমার বাংলা ভাষা গো—

শুধু আবু নয়,—বাকী তিন-চারটি ছেলেও গলা মিলিয়ে দিলে তার সঙ্গে:

ও আমার বাংলা ভাষা গো—

গয়নার নৌকোর সমস্ত যাত্রী একসঙ্গে উঠে বসল—দুলে উঠল নৌকো, মাল্লাদের হাত থেকে খসে পড়ল দাঁড়। চমকে উঠল অন্ধকার সুপারীর বন—শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মতো দূর-দূরান্তে বয়ে চলল গান।—

'ও আমার বাংলা ভাষা গো—
তুমিই আমার মনের আলো,
তুমিই আমার প্রাণের আশা গো'—

—ধরুন, ধরুন রায় মশায়—আবু প্রায় আদেশের সুরেই বললে, গেয়ে যান আমাদের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা—কিছুক্ষণ ভীরু গুঞ্জন। তারপরেই সকলের গলা ছাড়িয়ে রায় মশায়ের তীব্র কণ্ঠে বেজে উঠল: তুমিই আমার প্রাণের ভাষা গো—

—গয়না কার? থামাও বলছি—

সামনে কুদ্‌ঘাট। সেখান থেকে প্রায় আর্ত চিৎকার উঠেছে একটা। এসে পড়েছে জোরালো টর্চের আলো। দুজন পাহারাওলা নিয়ে রাউণ্ডে বেরিয়েছে দারোগা।

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল রায় মশায়—দম আটকে যেতে চাইল সীমাহীন আতঙ্কে।

—কার গয়না?—আবার সিংহ-গর্জন দারোগার।

—আমার।—প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললে রায় মশায়।

—তোমার? তুমিই তো গান গাইছিলে—না? দারোগার দাঁত কড়মড় করে উঠল: তা বেশ, নামো নৌকো থেকে। থানায় যেতে হবে তোমাকে।

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে রায় মশায়ের। থানায় যাওয়ার অর্থ কী বুঝতে বাকী নেই। আরো বিশেষ করে আজকের এই বজ্রগর্ভ রাত্রিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো থেকে বেরিয়ে এল আবু আর তার সঙ্গীরা। দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আবুর চোখ।

—কেন যাবেন উনি থানায়? গান গেয়েছি আমরা—আমাদের সঙ্গে ওঁকে গাইতে বলেছি। কি দোষ হয়েছে তাতে?

দারোগার গলার স্বর নেমে এল।

—এ গান গাওয়া ঠিক নয়।

—কেন ঠিক নয়? গান গাওয়া কি বে-আইনি?

—না। তবু এই গান—

—এ গান কি বাজেয়াপ্ত?—আবু অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইল: যদি বাজেয়াপ্ত গান না হয়, তাহলে কোন্ সাহসে আপনি আমাদের বাধা দিতে আসেন?

—হক্ কথা!—নৌকোর আরো আট-দশটি নিরীহ যাত্রী সাড়া দিয়ে উঠল সমস্বরে: ঠিক।

দারোগা অসহায়ভাবে তাকালো। কুড়িজন লোক রুখে দাঁড়িয়েছে। কুড়িজন মানুষের গলা থেকে ঠিকরে পড়ছে দুঃসহ ক্রোধ—দুঃসহতর ঘৃণা।

নিরুপায়ভাবে একবার দাঁত কড়মড় করলে দারোগা। তারপরে বললে, আচ্ছা—যাও—

দু'খানা দাঁড়ে ঝিঁকে পড়ল, আবার খালের কালো জলের ওপর দিয়ে তরতরিয়ে ছুটে চলল গয়না। আশ্চর্য, এতক্ষণের স্তব্ধ গুমোট ভাবটা যেন কেটে গেছে এই মুহূর্তে—কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া, সুপুরীর বন, খালের জল যেন মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠেছে।

অনেক পিছে পড়ে গেছে কুদ্ঘাটা। দারোগার টর্চের আলোটা দেখা যাচ্ছে না আর।

আবু বললে, থামলেন কেন রায় মশায়, চলুক।

এবার শুধু আবুরা নয়, শুধু রায় মশায় নয়—আরো সাত-আটজন গেয়ে উঠল সমস্বরে। খালের জল—ধানখেত—রাত্রি—আকাশ—সব যেন অবিচ্ছিন্ন ঐকতানে পরিণত হল একটা।

'ও আমার বাংলা ভাষা গো—
তুমি আমার মনের আলো,
তুমিই আমার প্রাণের আশা গো—'

এতগুলো মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে রায় মশায়ের গলাকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া গেল না এবার।

মেঘরাগ

রণজিৎকুমার সেন

বন্ধুবরেষু

এক

কাছাকাছির মানুষ যারা, তারা শুনলেই আশ্চর্য হয়।

—বলেন কি, আপনি ছাউনি-হিলে থাকেন!

—কেন ক্ষতিটা কী?—পাল্টা প্রশ্ন করেন কৌশিক ঘোষ।

—ক্ষতি কী! আরে ওখানে যে রাতদিন কুয়াশা আর মেঘ, মেঘ আর কুয়াশা! সাতদিনে একবার সূর্যের মুখ দেখা যায় কি না সন্দেহ। মন হাঁপিয়ে ওঠে না?

কৌশিক ঘোষ ধীরে-সুস্থে একটা বর্মা চুরুট ধরান। তারপর ধীরে-সুস্থেই জবাব দেন, না—কিছুমাত্রও নয়।

—আর ঘন-জঙ্গল।—যারা এতেও কৌশিক ঘোষকে বিচলিত করতে পারে না, তারা আরো ভয়াবহ বর্ণনার সাহায্যে কৌশিক ঘোষকে ভীত করবার চেষ্টা করে: কালো কালো পাইনের ছায়ায় চারদিক অন্ধকার। ভূতুড়ে চেহারার পুরনো বাড়িগুলো রাতের বেলায় যেন থম থম করে; ভুট্টা পাকবার সময় নেমে আসে ভালুক—

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌশিক ঘোষ জবাব দেন: বলে যান।

তার সরলার্থ এই পর্যন্তই যথেষ্ট, এইবারে থামুন। তারা থেমেও যায়। তার-পরই নতুন উদ্যমে শুরু করে: কলকাতা থেকে চেঞ্জে এসেছেন—দু-চারদিন মেঘ-জঙ্গল বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু ক'দিন পরেই মনে হবে দম আটকে আসছে—ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার রাস্তা খুঁজবেন তখন। ও-সব রোমান্স যে তখন কোথায় যাবে—খুঁজেও পাবেন না।

নিজের শাদা চুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কৌশিক ঘোষ: আমার মাথার দিকে তাকিয়ে কি এই কথাই মনে হচ্ছে যে এখনো রোম্যান্টিক হওয়ার মতো বয়েস আছে আমার? তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই তো বলেছেন আপনারা—এবার আমার কথাটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিই। আমি ছাউনি-হিলে চেঞ্জার বটে—কিন্তু সে আজ পাঁচ বছর ধরে।

—পাঁচ বছর!

বিস্ময়ের একটা সমবেত ঐক্যতান শোনা যায়।

—পুরো পাঁচ বছর, দু-এক মাস বেশিই হতে পারে বরং। আর বিশ্বাস করুন—কখনো-সখনো দু-চার ঘণ্টার জন্যে দার্জিলিং যাওয়া ছাড়া ছাউনি-হিল থেকে আমি নড়িনি। এর মধ্যে শীতকালে স্নো পড়তে দেখেছি একবার—একবার বর্ষায় রাস্তা গেল

ভেঙে, তখন প্রায় দ্বীপে বাস করেছি, তিনদিন খাবার জোটেনি, এমন কি এক-টুকরো শুকনো পাঁউরুটিও নয়। তবু ছাউনি-হিলের পাথর কামড়েই পড়ে আছি—পড়েও থাকব—যতদিন না এ-পারের পাট একেবারে সম্পূর্ণ চুকে যায়।

শ্রোতারা এইবারে নীরব।

উৎসাহিত হয়ে কৌশিক ঘোষ বলতে থাকেন : মাত্র চার হাজার টাকায় পাইন-বনের মধ্যে একটা বাংলো যা কিনেছি—সত্যি বলতে কি, ডিভাইন! দিব্যি আছি মশাই। একজন কুক্-কাম-সার্ভেণ্ট্, কুকুর ডেভি, বেবি আর আমি। টাটকা মাখন পাই মশাই, আপনাদের দার্জিলিং-এর কেভেণ্টার লাগে না তার কাছে। নিজে মুরগী পুষেছি—লেগ্ হর্ণ, রোড্ স্টার।

তা ছাড়া শাক-সব্‌জী? যা চান। বাঁধা-কপি, বিন, গাজর, লেটুস, স্যালাড, রাইশাক—হোয়াট্ নট্? আপনাদের সকলকে নেমন্তন্ন করছি—চলে আসুন না দিন কয়েকের জন্যে। দেখবেন, শরীর মন দুই-ই বদলে গেছে একেবারে।

এর পরে শ্রোতারা আর কথা বাড়ায় না। খাঁটি মাখন, তাজা সব্‌জী—সবই মিলতে পাবে ছাউনি-হিলে। সে-লোভে সাতদিন কি দশদিন নয় থাকাও গেল ওখানে। কিন্তু তারপর? ওই ধোঁয়াটে আকাশটা যেন বুকের ওপরে চেপে বসতে চায়—সাতদিন ধরে একটানা ক্লান্তিকর বৃষ্টি যেন আত্মহত্যা করার প্রেরণা দিতে থাকে। রাত্রে নিথর জঙ্গলগুলোর দিকে তাকালে সমস্ত লোমকূপগুলো শিউরে শিউরে উঠতে থাকে—মনে হয় প্রকৃতির অন্ধ-আদিম একটা হিংস্রতা ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে—রাত আরো গভীর হলে শেক্সপীয়ারের সচল অরণ্যের মতো এগিয়ে এসে মানুষের ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

পাঁচ বছর! পাঁচ বছর ওখানে যে পড়ে থাকতে পারে সে হয় অতি মানব, নইলে পাগল। আর তা নইলে কোনো ক্রিমিন্যাল্—ফাঁসির কাঠগড়া এড়াবার জন্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিয়েছে ওখানে।

কিন্তু তাদের ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কৌশিক ঘোষ উঠে দাঁড়ান।

—আচ্ছা, আপনারা তবে বসুন, আমি এগোই। কয়েকটা জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে বাসস্ট্যাণ্ডে। আমাদের বাস আবার চারটের মধ্যেই ছাড়ে কিনা। মেল নিয়ে যায়।

শ্রোতারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

একজন বলে, নিশ্চয় জিওলজিস্ট্—বুঝলেন! ওদের নানা ধরনের বাতিক থাকে। আর সত্যি বলতে কি, ও নেশা যার ধরেছে মশাই, তার আর নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলে—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর! নুড়ির

পরে নুড়ি ঘাঁটছে, ঘর-দুয়োর ভর্তি করে ফেলেছে পাথরে, খালি ভাবছে এই বুঝি হাতের মুঠোর ভেতরে একটা দুর্মূল্য কিছু পেয়ে গেলাম। আর হিমালয়ও তো মশাই একেবারে আন-এক্সপ্লোরড্ বলতে গেলে। কত ঐশ্বর্য ওর ভাণ্ডারে আছে—কে তার সন্ধান রাখে! আজ ওকে ঠাট্টা করছেন, একদিন হয়তো এমন কতগুলো রেয়ার-স্টোন আবিষ্কার করে বসবে, যার ফলে রাতারাতি লাখোপতি। বিনা মতলবে কেউ কি আর ছাউনি-হিলে পড়ে থাকে?

আর একজন বলে, থামো হে, থামো। জিওলজিস্ট্ হলে চেহারা অন্য রকম হত!—যেন জিওলজিস্টের একটা বিশেষ ধরনের চেহারা আছে, আর সে চেহারাটা তার একান্ত করে চেনা, এমনি অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলতে থাকে: তা ছাড়া ছাউনি-হিলে তো দামী দামী পাথর একেবারে হাঁ করে বসে আছে! ব্যাপার তা নয়, লোকটা ধার্মিক। যোগ-টোগ সাধনা করে।

—যোগ-সাধনা?—তৃতীয় জন সবিস্ময়ে হাঁ করে: যোগ-সাধনা করলে চুরুট খাবে কেন, হুঁকো টানবে। উঁচু-দরের যোগী হলে হয়তো গাঁজার কলকে থাকবে সঙ্গে।

—আচ্ছা থিয়োরী তো আপনার!—অপর ভদ্রলোক কুপিত হন: যোগেরও ইভলিউশন হচ্ছে মশাই। যত রিটায়ার্ড আই-সি-এস্ ব্যারিস্টার আজ-কাল 'ইয়োগ'-চর্চা করছেন। বুড়ো বয়সে যখন বিলিতী ওষুধে আর ধরছে না, তখন ওঁরা শুরু করেছেন যোগ-চর্চা, শীর্ষাসন-ভুজঙ্গাসন আর শবাসন করে খিদে বাড়াতে চাইছেন। তাঁদের মুখে তো এক-একটা দেড় গজ লম্বা পাইপ দেখতে পাই।

—বাজে কথা রাখুন মশাই। ও যোগ-টোগ কিছু নয়। স্রেফ্ পাগলের খেয়াল। কিছুমাত্র স্যানিটি থাকলে কেউ ওখানে পড়ে থাকতে পারে? এবং পুরো পাঁচ-পাঁচটি বছর?

ছাউনি-হিলে ফেরবার পথে বাসে বসেও ঠিক এই কথাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন কৌশিক ঘোষ। কী অদ্ভুত অবাস্তর কল্পনা নিয়ে এই পাঁচটা বছর তাঁর কেটে গেল! কি পেলেন তিনি—কীই বা পেতে চান?

বাসে একমাত্র বাঙালী যাত্রী তিনি—বাকী সব ক'জন নেপালী আর ভুটানী। নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনা করছে তারা, টুকরো টুকরো তাঁর কানে আসছে, অথচ সবটা মিলিয়ে কোন সম্পূর্ণ অর্থ তিনি দাঁড় করাতে পারছেন না। পুরু ওভার-কোটের আবরণে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে নিয়ে যেন আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করে বসে আছেন কৌশিক ঘোষ।

দার্জিলিঙ থেকে ঘুমের মেঘরাজ্যে এসেছে গাড়ি—থেমেছে কয়েক মিনিটের জন্যে। সহজ অনাড়ম্বর জীবন চারদিকে। গলায় কাচের মালা, নাকে ফুল পাহাড়ী-মেয়ে বসেছে সব্জীর দোকান সাজিয়ে—কয়েকটা কপি, কিছু স্কোয়াশ, দুটি আলু, সামান্য একগোছা রাই-শাক আর কাঁচা-লঙ্কা। ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছে মুরগী। কয়েকজন ভুটিয়া বসেছে একটা চায়ের দোকানে—চা-খাওয়া চলছে কাঁসার গ্লাসে। এ-পাশে একজন আধবুড়ো স্যাকরা এক-মনে নীচু হয়ে কাজ করছে, ঠুক ঠুক আওয়াজ উঠছে হাতের ছোট বাটালি থেকে—একটা রুপোর হাঁসুলীতে কী সব খোদাই করে চলেছে বুড়ো। বাস্-এর শব্দে শুধু একবারের জন্যে তাকিয়ে দেখল। মাথার গোল-টুপিটা জরাজীর্ণ, গায়ের কোটটা কতকাল আগে সস্তায় কিনেছিল কে জানে। ঘোলাটে লাল চোখ ক্লান্তিতে অবসন্ন—সংসারে ওর কি কোনো অবলম্বন নেই যে এই বয়সে ওকে সাহায্য করতে পারে?

অবলম্বন। কৌশিক ঘোষ চোখ বুজলেন। ওর মধ্যে নিজেরও প্রতিফলন কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছেন বইকি তিনি। আজ নিজেও তিনি একা—সম্পূর্ণভাবেই একা। স্ত্রী নেই, ছেলে বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়েছে অনেক দিন, এক মেয়ে বিয়ে করেছে এক মাদ্রাজী ক্রীশ্চানকে আর—

আর ছোট মেয়ে রুচি।

বছরে কয়েক মাস রুচি এসে কাছে থাকে—জীবনের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে ওইটুকুই বন্ধন কৌশিক ঘোষের। নইলে তো পৃথিবীর কাছ থেকে একেবারে মুছে গেছেন তিনি—সেই আর্নল্ড্ বেনেটের 'বেরিড্ অ্যালাইভ'-এর গল্পের মতো। একজন কৌশিক ঘোষ একদা বর্মায় থাকতেন, রেঙ্গুন-মান্দালয়-পেগুর বাঙালী সমাজকে জমিয়ে রাখতেন উদার আহারের নিমন্ত্রণে, বসাতেন গানের আসর আর জমা নিতেন সেগুন বন—সে মানুষ হারিয়ে গেছেন।

কেন এমন করে কলকাতার কাছ থেকে সরে এলেন কৌশিক ঘোষ? কেন সইতে পারলেন না? কিসের প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত এসে বাসা বাঁধলেন ছাউনি-হিলের এই কুয়াশাঘন নির্জনতায়? কিসের জন্যে দু'ঘণ্টা দার্জিলিঙে গেলেও ক্লান্তি অনুভব করেন তিনি?

সে কথা—

বাসের ভেঁপু বাজল, যে-সব যাত্রী চা খেতে নেমে গিয়েছিল একে একে উঠে এল তারা। শুধু ড্রাইভারই এখনো আসেনি। একটি অল্প-বয়েসী নেপালিনীর পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টেনে চলেছে। ড্রাইভারের দোষ নেই, মেয়েটির মুখখানা সুন্দর, হাসিটি আরো সুন্দর। ভারী চমৎকার টোল খাচ্ছে পাকা

আপেলের মতো গোলাপী গাল দুটোতে। কৌশিক ঘোষের বুকের ভেতরটা দুলতে লাগল অল্প-অল্প।

আবার হর্ন বাজল। কণ্ডাক্টার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

যাত্রীদের একজন গলা বাড়িয়ে নেপালী-ভাষায় ডাকল: আজকের মতো চলে এসো হে বীর বাহাদুর। একদিনেই সব কথা শেষ করে ফেললে যে! কালও তো আবার বলবার আছে।

পানওয়ালী মেয়েটি নিঃসংকোচ গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। ওরা এত সহজে লজ্জা পায় না।

ড্রাইভার বীর-বাহাদুর ফিরে তাকালো। চোখে উদ্ধত দৃষ্টি।

কণ্ডাক্টার বললে, আর দেরী কোরো না—মেলের দেরী হয়ে যাচ্ছে। ডাকবাবু রাগারাগি করবে। খবরের কাগজের জন্যে ডাকঘরে সব হত্যা দিয়ে বসে আছে এতক্ষণে।

—চুলোয় যাক খবরের কাগজ—বিড় বিড় করে বকল বীর বাহাদুর। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার সৌখিন উলটো চুলগুলোকে ফেলে দিলে পেছন দিকে। তারপর পকেট থেকে নীল-গগল্‌সটা বার করে চোখে পরে নিয়ে তড়াক্ করে উঠে বসল বাসে। গাড়ি ছাড়ল।

একদিকে পাহাড়ের খাড়াই—অন্যদিকে অতল-স্পর্শ খাদ। তারও অনেক নীচে রংপু নদীর ক্ষীণ ধারাটা চোখে পড়ে কি পড়ে না। আকাবাঁকা পথ দিয়ে কখনো পাইন বনের ছায়ার তলায় তলায় কখনো বা চায়ের বাগান পাশে রেখে বাস এগিয়ে চলল।

বর্ষা হয়ে গেছে গত তিন দিন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কৌশিক ঘোষ। পাহাড়ের বুক চিরে এদিক-ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝর্ণা, পথের ওপরে ছোট-বড় পাথর নামিয়ে দিয়েছে কোথাও কোথাও। দূরে-দূরের ঝর্ণাগুলোকে আশ্চর্য উজ্জ্বল আর শুভ্র বলে মনে হচ্ছে। হিমালয় দেবতাত্মা নয়—দেবতাও নয়, সে যেন স্বর্গের কামধেনু। তার হাজার হাজার স্তনবৃন্ত থেকে ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ছে দুধের ধারা: ঊর্ধ্বমুখী পৃথিবী গো-বৎসের মতো তৃষিত হয়ে তাই পান করে চলেছে। উপমাটা নিজের কাছেই ভারী ভালো লাগল কৌশিক ঘোষের।

পকেট থেকে আর একটা চুরুট বের করে ধরালেন তিনি। এই পথ দিয়ে কতদিন তিনি যাতায়াত করেছেন, এর প্রত্যেকটি বাঁক তাঁর চেনা, চোখ বুজে বসে থেকেও বলে দিতে পারেন এই মুহূর্তে কত ফার্লঙের হিসেব লেখা আছে মাইল-পোস্টের গায়ে। কিন্তু চেনা হয়েও সব যেন চেনা হয় না। এই পাহাড়—এই অরণ্য, এই পথ—এরা

যেন তাঁর কাছে চিরদিন কোনো এক অস্পষ্ট কাব্যের পাণ্ডুলিপি। প্রত্যেক দিনই নতুন করে একটা অর্থ তিনি আবিষ্কার করেন, কিন্তু কোন্‌টা যে তার সত্য অর্থ, আজ পর্যন্ত সেটা তাঁর জানা হল না।

সমুদ্রের সঙ্গে কৌশিক ঘোষের পরিচয় বহুকালের। প্রথম যৌবনে যেবার রেঙ্গুন পাড়ি দিয়েছিলেন—সেই থেকেই। কিন্তু সমুদ্রকে তাঁর ভালো লাগে না। তার সকাল-সন্ধ্যা রাত্রি-দিনের রূপ তিন দিনের মধ্যেই চেনা হয়ে যায়—কোথাও আর বৈচিত্র্য থাকে না কিছুমাত্র। সবটা মিলে সমুদ্র কেমন জান্তব—একটা অন্ধ-চঞ্চলতা—নিরবচ্ছিন্ন উতরোল চিৎকার। যে মনীষী বলেছিলেন সারাজীবন সমুদ্র দেখেই তিনি নিমগ্নচিত্তে কাটিয়ে দিতে পারেন কৌশিক ঘোষ তাঁর সঙ্গে একমত নন। সমুদ্র আর সাহারা দুই-ই এক।

কিন্তু ছাখো পাহাড়কে। কী আশ্চর্য উদার—কী মহিমান্বিত। স্তরে-স্তরে থরে-থরে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। কত বিচিত্র-বর্ণের ফুল ফোটায়, কত অপরূপ অরণ্যে ছায়া-নীল হয়ে থাকে, কত ঝর্ণায় তার অফুরন্ত গানের পালা। ঋতুতে ঋতুতে রূপ বদলায়। কখনো ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো পাইনের পাতা—তারপরেই হয়তো তুষার ঝরানোর পালা। হিমালয়ের দিকে তাকালেই যেন তন্ময় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে কৌশিক ঘোষের। মনে হয়ঃ জীবনে যা পাওয়া গেল না, এইখানেই তা নিঃশব্দ পুঞ্জিত হয়ে আছে কোথাও; যে পরম উপলব্ধিকে বারে বারে খুঁজে বেড়িয়েছেন সারা জীবন ধরে, তা সঞ্চিত আছে এইখানেই। অপেক্ষা করতে হবে—খুঁজে নিতে হবে।

তারই জন্যে এই পাঁচ বছর কাটল এখানে। আরও কত দিন কাটবে? ষাট বছর বয়স হয়ে গেল, আর কতকাল চলবে এই প্রতীক্ষার পালা? পাহাড়ের বুক থেকে এক মুঠো কুয়াশার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কৌশিক ঘোষ কি পাবেন সেই পরমাশ্চর্যের সন্ধান?

গাড়ি জঙ্গলের পথ ধরল। দু পাশে এখন নিবিড় গম্ভীর পাইনের অরণ্য। হঠাৎ এই জঙ্গলটাকে যেন প্যাগান যুগের একটা প্রকাণ্ড মন্দির বলে মনে হয়। এ যেন কোনো গ্রীক সম্রাটের কীর্তি। সারি সারি গাছের গুঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় স্তম্ভের মতো—যতদূর চোখ চলে নিবিড় থেকে নিবিড়তর ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেছে তারা; এই শূন্য বিশাল মন্দিরে আজ আর কেউ আলো জ্বালে না, যজ্ঞের আগুন জ্বলে না বেদীর উপর, পুরোহিতের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না। অতীতের কোনো বিরাট শবাধার একটা। তবু এমন হতে পারেঃ কোনো এক নিথর-রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এর ভেতর থেকে বেজে উঠতে পারে কোনো অতিলৌকিক কণ্ঠস্বর—দূরে

কাছে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় কেঁপে উঠতে পারে বিশাল ঘণ্টার ধ্বনি—বিরাট ধূপাধার থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ সুরভিত ধোঁয়া উঠে আকীর্ণ করে ফেলতে পারে এই আকাশকে—

গাড়ি থামল। একদল নেপালী মেয়ে পাথর ভাঙছে সামনে। রাস্তা সারাই হচ্ছে।

কৌশিক ঘোষ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মেয়েদের মুখের ওপর। স্বাস্থ্য আর সরলতা। ওরা কি কিছু জানে, কিছু কি টের পায়? হিমালয়ের মর্মচারী আত্মার ছোঁয়াচ ওদের জীবনে কখনো কি নেমে আসে? ওরা কি কখনো ভাবে—

আবার এক ঝলক হাসির আওয়াজ। কে যেন একটা রসিকতা করছে। মেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ছে। কী সহজেই হাসতে পারে। ঝর্ণার মতো নির্বারিত আর অকুণ্ঠ।

গাড়ি আবার নড়ল। আর একটা বাঁক ঘুরে এসে দাঁড়াল একটা গ্রামের কাছে। অধিকাংশ যাত্রী নেমে গেল এখানেই। এই গ্রাম থেকেই তারা সকালে ছানা আর মাখন বেচতে যায় দার্জিলিঙের বাজারে, ফিরে আসে সন্ধ্যার বাসে।

এর পরে আর তিন মাইল রাস্তা, তার পরেই ছাউনি-হিল। গ্রাম নয়—গ্রামের সুখ-দুঃখ মন্দ ভালো নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ জীবন নেই তার। সে শহর নয়—ইতস্তত ছড়ানো বাড়িগুলোয় শূন্যতার সাধনা। এক আশ্চর্য জগৎ ছাউনি-হিল। একটা অতীত তার ছিল—তার কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। একটা ভবিষ্যৎ তার হতে পারত—কিন্তু তাও আর গড়ে উঠল না। প্রায়-নিরর্থক বর্তমানের মধ্যেই সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কি সে পাবে—কেমন করেই বা পাবে, সে উত্তর তার জানা নেই। কৌশিক ঘোষেরও না।

দুই

তবু একটি পোস্ট্ অফিস আছে ছাউনি-হিলে। টেলিগ্রাম নেই—কিন্তু ট্রাঙ্ক টেলিফোনের ব্যবস্থা রয়েছে একটা। আশ-পাশের চা-বাগান থেকে দু-একটা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কখনো কখনো হয়, তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় কিছু পোস্ট্কার্ড বিক্রি, আর ডাক বন্ধ করা, ডাক খোলা ছাড়া কোনো কাজই নেই পোস্ট্ মাস্টারের।

এখানে যে বদলি হয়ে আসে, দু বেলা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই তার। মেশবার মতো লোক বলতে তো গোনা-গুনতি জন সাতেক। অক্‌জিলিয়ারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার, খাসমহলের জন দুই বাঙালী কর্মচারী আর জন তিনেক ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক। ডাক্তারের কাজ অজস্র, হাসপাতালে

দুবেলা তো আছেই, তার ওপরে আবার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়াতে হয় সব সময়ে। খাসমহলের লোক ফিতে আর চেন কাঁধে করে কোথায় কোথায় ঘোরে, সে শুধু তারাই জানে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক প্রায়ই তাদের নিবিড় জঙ্গলে ডুব মারে—পাত্তাই পাওয়া যায় না সহজে।

শুধু বিকেলে প্রায় সবাই জড়ো হয় একসঙ্গে। ডাক্তার, তার একটি আধা বাঙালী আধা নেপালী কম্পাউণ্ডার, খাসমহল আর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা। সকলেরই এক গরজ—একটি উদ্দেশ্য। ছাউনি-হিলের এই নির্বাসনে বিকেলের খবরের কাগজটি নিয়ে আসে কলকাতাকে—নিয়ে আসে পৃথিবীর খবর। এখানকার বিড়ম্বিত মানুষগুলো ওরই মধ্য দিয়ে নিজের অত্যন্ত পরিচিত জীবনের স্পর্শ পায়। মাত্র একজন ছাড়া কেউই এখানে স্ত্রী নিয়ে থাকে না, তাদের উৎকণ্ঠিত চোখগুলো মেল্-ব্যাগের মধ্যে দু-একখানা বেসরকারী লেফাফার উৎসুক সন্ধান করে ফেরে।

দূর থেকেই পড়ন্ত আলোয় দেখা যাচ্ছিল ডাকঘরের সামনে একদল মানুষের অধৈর্য প্রতীক্ষা। ডাক্তারের দীর্ঘ দেহ আর নীল কোটের উপরে তার শাদা উঁচু কলার দুটো দূর থেকেও উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে।

বাস এসে থামল।

—এত দেরী কেন?—পোস্ট্ মাস্টার অশোক মুখার্জি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

একটা শুঁটকি মাছের পুঁটলি নিয়ে ড্রাইভার বীর বাহাদুর বাস থেকে নামল। বললে, কী করব বাবু! সবাই কাজকর্ম সেরে আসবে, তবে তো!

অশোক চটে বললে, সবাইয়ের কাজকর্মের জন্যে তো সরকারী ডাক বসে থাকতে পারে না।

বাঁ হাত দিয়ে কপালের ব্যাক-ব্রাশ চুলগুলো ঠিক করতে করতে বীর বাহাদুর বললে, সে আপনি মালিককে বলবেন—আমি হুকুমের চাকর।—তার স্বরে দুর্বিনয়, পানওয়ালী মেয়েটি এখনো মন জুড়ে আছে তার।

—তাই বলতে হবে!—অশোক আরো বিরক্ত হল: সরকারের টাকাও নেবে আর যখন খুশি যাবে-আসবে ও সব চলবে না। দেখছ না, ভদ্রলোকেরা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন?

বীর বাহাদুর জবাব দিল না। মাছের পুঁটলি নিয়ে নিচে নিজের বস্তির দিকে পা বাড়াল।

কৌশিক ঘোষ নামতেই একটা পুলকিত কোলাহল উঠল উপস্থিত সকলের মধ্যে।

—এই যে দাদু, অতগুলো কী আনলেন বগলদাবা করে? ভালো কিছু আছে নাকি?—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেঞ্জারের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

—কেক আছে কিছু। কয়েকটা প্যাস্ট্রি।

—চমৎকার।—ডাক্তার হাসল: তা হলে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন?

কৌশিক ঘোষও হাসলেন: নিশ্চয়।

—কখন যাব?

—যখন তোমাদের খুশি।

—দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ সন্ধ্যের পরেই?

—বেশ তো, বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।—বাস্-স্ট্যাণ্ডে চাকর অপেক্ষা করছিল, তার হাতে প্যাকেটগুলো তুলে দিয়ে কৌশিক বললেন, আমি ডাক নিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে বাবুরাও যাবে। চা-টার বন্দোবস্ত করে রাখবি।

স্বল্পভাষী নেপালী চাকর কোনো জবাব দিলে না। একবার মাথা নেড়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে এগিয়ে চলল।

খাস্ মহলের কর্মচারী সরোজ বললে, দাদু আমাদের মরুভূমিতে ওয়েসিস্। বলতে গেলে দাদুর জন্যেই আমরা এখানে টিঁকে আছি, নইলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হত অনেক দিন আগেই।

ততক্ষণে নেপালী কাঞ্ছা ডাক নিয়ে পোস্ট্ অফিসের বারান্দায় তুলেছে। সকলে পা বাড়ালেন সেদিকেই। খবরের কাগজ মেলব্যাগে আসে না—দার্জিলিঙের এজেণ্ট্ ওগুলোকে আলাদা বাণ্ডিলে বেঁধে দেয়। ইতিমধ্যেই হাতে হাতে বিলি হয়ে গেছে সেগুলো। সব রকমই আছে। স্টেট্সম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার, যুগান্তর। এখানে নানা জন নানা কাগজ রাখেন, এক্সচেঞ্জ করে পড়বার সুবিধে হয়।

—কৃপ্‌লানীর স্টেটমেণ্ট দেখেছেন আজ?—খবরের কাগজে চোখ রেখেই ডাক্তার বললেন, কী কন্‌ফিউজিং! শ্যামও রাখবে—কুলও রাখবে! এদিকে অপোজিশন করবি, ওদিকে আপোষের ব্যবস্থা! আরে দু-নৌকোয় পা দিয়ে কখনো পলিটিক্স্ হয়!

ডাক্তার একদা রাজনীতি করত। সেই উনিশ শো তিরিশ সালে কলেজে পড়তে পড়তে জেলও খেটেছিল মাস তিনেক। সেই থেকে তার পলিটিক্সে অনুরাগ। এখানকার অনিচ্ছুক ক্লান্ত মানুষগুলোর কাছে সে যথাসাধ্য চলতি রাজনীতির ভাষ্য করতে চেষ্টা করে! শ্রোতারা উৎসুক নয়—খানিক পরেই তারা হাই তুলতে আরম্ভ করে দেয়।

ডাক্তার বলে, হোপ্‌লেস্! একেবারে কূপমণ্ডুক! খালি চাকরী করতেই শিখেছে এরা।

শুধু মাঝে মাঝে ডাক্তারের মেজাজ বেশ জমে ওঠে। যুদ্ধ-ফেরত নেপালী ক্যাপ্টেন আছে একজন। লোকটা মাতাল, কোটের পকেটেই বোতল থাকে, যখন-তখন সেইটে মুখের কাছে ধরে খানিক গিলে নেয় নির্জলা। রাজনীতির বিশেষ কিছু বোঝে না, তবু ডাক্তারকে চটিয়ে দেবার জন্যে তার দুটো একটা বুলিই যথেষ্ট।

—পলিটিশিয়ান বলতে হয় হিট্‌লারকে। আরেঃ বাপ! কী তাগদ—ক্যায়সা হিম্মৎ! আজ দুনিয়ায় ওই রকম গোটকয়েক লোকই চাই।

—কী বললেন?—ডাক্তার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন: হিটলার কী করেছেন জানেন? শুনুন তাহলে—ডাক্তারের অনর্গল বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়।

ততক্ষণে হয়তো নেশার ঝোঁকে লক্ষ্মীপ্যাঁচার মতো ঝিমুতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন। একটি বর্ণ সে বোঝেনি, বোঝবার জন্যে কোনো গরজও নেই। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে বলে, যাই বলুন ডাক্তারবাবু, হিটলার হচ্ছে একটা মরদের মতো মরদ।

এর পরে ডাক্তার দ্বিগুণ বেগে শুরু করে। নিজেও জানে এ তার স্বগতোক্তি—হয়তো একটা কথাও ক্যাপ্টেন শুনতে পাচ্ছে না। তবু ক্যাপ্টেনকে ডাক্তারের দরকার। তার মনকে খোঁচা দিয়ে উত্তেজিত করে তোলার মতো অন্তত একটি উপকরণ না থাকলে তারই বা চলে কী করে?

আজ ক্যাপ্টেন হাজির নেই, অতএব কৃপ্‌লানী সম্পর্কে ডাক্তারের মন্তব্যে কেউ প্রতিবাদ করল না। তার বদলে উৎসাহিত হয়ে উঠল খাসমহলের চ্যাটার্জি। এক সময়ে নাকি কালীঘাটে বি-টিমে সে সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে খেলত, সুতরাং তার ঝোঁক সম্পূর্ণ অন্য দিকে।

—নাঃ, এবারে ফুটবল খেলার কোনো স্ট্যাণ্ডার্ডই নেই। দেখুন না, মোহনবাগান ধাঁ করে একটা গোল খেয়ে বসে রয়েছে। কী আশ্চর্য, একটা টিমের ওপরও নির্ভর করা যাবে না! একটা খেলোয়াড় নেই যে গোল মাউথে গিয়ে স্কোর করতে পারে! আমি বলছি শৈলেশদা—ডুরাণ্ড কিংবা রোভার্স কাপে বাংলার কোনো টিমের চান্স তো নেই-ই, এবারে আই-এফ্‌-এ শীল্ড হয় মহীশূর নইলে বম্বেতে চলে যাবে।

—যাক্—ভালোই হবে!—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্‌ রেঞ্জার শৈলেশ দে মোটা-সোটা লোক—ছাত্র-জীবন থেকে টাগ্‌-অব্‌ ওয়ারের পিলার হওয়া ছাড়া আর কোনো খেলা-ধুলোয় যোগ দেননি তিনি। পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে নাকে এক টিপ গুঁজে দিয়ে শৈলেশ বললেন, একেবারে চলে যায় তো আরো ভালো হয়। বাপ্‌ রে, ফুটবল খেলা নয়তো যেন কম্যুনাল্ রায়ট! খেলার মাঠে মারামারি করছে, হাটে-

বাজারে, ট্রামে-বাসে মারামারি করছে, এমন কি ভাইয়ে ভাইয়ে পর্যন্ত হাতাহাতি হয়ে যাচ্ছে। ফুটবল খেলা কি ভদ্রলোকের জিনিস? ও আপদ দেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হবে, মানুষ ততই শান্তিতে থাকতে পারবে!

—ছিঃ—ছিঃ শৈলেশদা!—চ্যাটার্জির হয়ে সরোজ প্রতিবাদ জানালো।

—ছিঃ—ছিঃ আবার কী?—শৈলেশ দে নাক-মুখ কুঁচকে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাঁচি সামলালেন। তারপর বললেন, ফুটবল খেলা যদি ভদ্রসমাজের ব্যাপার হয়, তাহলে বিহারী কুস্তি আর কী দোষ করল? ওদের আহীরদের ভেতরে কুস্তি দেখেছ? একজন আর একজনকে চিৎ করলেই ব্যাপারটা থামল না, তখন দুই পালোয়ানের সাপোর্টারেরা তাদের পেল্লায় লাঠি দিয়ে পরস্পরকে কাত করতে চেষ্টা করে। চার-ছ'টা খুন যখন-তখন। ভাগলপুরে একবার সে কুস্তি দেখতে গিয়ে আমি পালাতে পথ পাই না। কলকাতার ফুটবলও ওই স্তরেই পৌঁছেছে—বরং আরো খারাপ।

কৃপ্‌লানীর ব্যাপারে যখন সমর্থন পাওয়া গেল না, তখন ডাক্তার শৈলেশ দেরই পক্ষ নিলেন। খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বললেন, যা বলেছেন।

চ্যাটার্জি করুণ মুখে চুপ করে রইল।

শৈলেশ বললেন, তার চেয়ে ছাখো তো, কলকাতায় কোনো বাংলা ফিল্মের খবর আছে কি না। আসছে মাসে যখন যাব দেখে আসব সেই সময়।

—আর এক বছর ধরেই তো আসছে মাসে কলকাতায় যাওয়ার কথা বলছেন শৈলেশদা। কবে আর সেই আসছে মাস আসবে?—ডাকের ব্যাগ থেকে চোখ তুলে অশোক হাসল।

এইবার শৈলেশের চুপ করবার পালা। গোলগাল প্রসন্ন মুখে ব্যথার ছায়া ঘনিয়ে এল। স্ত্রৈণ মানুষ শৈলেশ—ছাউনি-হিলে বদ্‌লী হওয়ার পরে তাঁর অবস্থা হয়েছে মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো। অথচ স্ত্রী অবস্থাপন্ন সরকারী চাকুরের একমাত্র মেয়ে—নিউ দিল্লীর আবহাওয়ায় মানুষ। একবার ছাউনি-হিলে তাঁকে এনেছিলেন শৈলেশ, তারপর সাতদিনের দিনই ট্রাঙ্ক কল্ পেয়ে তাঁর ভাই এসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেছে। স্ত্রী বলেছেন, বাপ রে কী জঙ্গল! দিনদুপুরেই চারদিকে ছমছমে অন্ধকার। আলো নেই—মানুষজন নেই—থাকা যায়?

শৈলেশ তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, জঙ্গলের চাকরিই এই। ট্রান্স্‌ফার করে দিলে সুন্দরবনে বাঘ-ভালুকের সঙ্গেই তো গিয়ে থাকতে হবে।

স্ত্রী বলেছেন, সে তুমি যেয়ো, তোমাকে দেখলে বাঘ-ভালুকেও ভয় পায়। আমি জঙ্গলে থাকতে পারবো না। তোমাকে বিয়ে করে বনবাসে থাকতে হবে এ জানলে

বিয়ের রাত্রে আমি বেঁকে বসতাম।

ভারী মনোবেদনা পেয়েছিলেন শৈলেশ। দুটো কারণে। প্রথমত তাঁর শরীর সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অন্যায় কটাক্ষ ছিল স্ত্রীর কথায়। দ্বিতীয়ত তিনি যেখানে থাকবেন, স্ত্রী সেইটেকেই স্বর্গলোক বলে ধরে নেবেন—এমনি একটা প্রত্যাশাও তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

শৈলেশ অনুমান করতে পারেন, স্ত্রী এক ধরনের অবজ্ঞা পোষণ করেন তাঁর সম্বন্ধে। দুঃখও পান। তবু রাগ করতে পারেন না স্ত্রীর ওপরে। নিঃশব্দে নিজের ভেতরেই ব্যথাটাকে বহন করে চলেন।

আজ এক বৎসর বিরহ-যন্ত্রণায় কাল কাটাচ্ছেন। ছুটি পাচ্ছেন না কিছুতেই। গতবার পূজোর ছুটিতে যাবেন—সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ফরেস্টের একটা অংশ নিয়ে গোলমাল বাধল। কোন্ চা-বাগান নাকি তার প্রাইভেট ফরেস্টের মধ্যে সরকারী জমি এন্‌ক্রোচ করে নিয়েছে। তাই নিয়ে এন্‌কোয়ারী, নানা হাঙ্গামা—সেই থেকে আর বেরুতেই পারছেন না। ক্রমাগত ছুটির চেষ্টা করছেন, আর আশা আছে, আসছে মাসে তিনি কলকাতায় যাবেন।

অশোকের কথায় শৈলেশের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—যাব হে যাব, ছুটির দরখাস্ত তো করাই রয়েছে।

চিঠি যা এসেছিল, এর মধ্যেই তার অর্ধেক বিলি হয়ে গেছে। যা হয়নি, কাল সকালে পিয়ন তা পাড়ায় পাড়ায় দিয়ে আসবে। শৈলেশ উঁকি মেরে দেখলেন। সামান্য কটি চিঠির ভেতরে তাঁর নামের একখানাও লেফাফা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। স্ত্রী চিঠি লেখেননি।

রুচির একখানা চিঠি পেয়েছেন কৌশিক ঘোষ। সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড। বাবা, তুমি ভালো হয়ে থেকো। ভালো করে খেয়ো। তোমার মুরগীদের কুশল তো? আমার ক্লাস বন্ধ হতে আরো পাঁচ-সাতদিন দেরী আছে। ছুটি হলেই তক্ষুনি তোমার কাছে চলে আসব।

ইতিমধ্যে পোস্টমাস্টার অশোক হাতের কাজগুলো সব মিটিয়ে ফেলেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে আসছিল—কাঞ্ছা একটা লণ্ঠন এনে জেলে দিয়েছিল টেবিলে। লণ্ঠনের শিখাটাকে প্রায় নেবানোর মুখে এনে অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তালা দিলে পোস্ট্ অফিসে।

কৌশিক ঘোষ স্টেট্‌সম্যানটা ভাঁজ করে বগলে নিলেন, তারপর বললেন, নাও চলো সবাই।

—সত্যিই কি যেতে বলছেন নাকি দাদু?

—মিথ্যে করে বলব নাকি ?

শৈলেশ একটু অপ্রস্তুত হল : আমরা ঠাট্টা করছিলাম। এতদূর থেকে কষ্ট করে কেকগুলো বয়ে এনেছেন, আমরা গিয়ে আর ওগুলোর সর্বনাশ নাই বা করলাম।

কৌশিক হেসে বললেন, এমন কিছু দুর্মূল্য বা দুর্লভ জিনিস নয় ওগুলো। আজ আনা হয়েছে, কালও আবার কাউকে দিয়ে আনানো চলতে পারে। তোমরা সবাই আনন্দ করে আমার ওখানে চা খাবে, সেইটেই আমার পক্ষে সবচেয়ে বড লাভের ব্যাপার।

ডাক্তার মাথা চুলকোতে লাগল : হাসপাতালে আমার একটু কাজ ছিল—

কৌশিক ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন : এসো হে এসো, তোমার আর বেশি ওস্তাদি করতে হবে না। গিয়ে তো সব বসে বসে খবরের কাগজের প্রত্যেকটা লাইন মুখস্থ করবে ! সেটা একটু পরে হলেও কোন ক্ষতি নেই, এখন চলো আমার সঙ্গে।

দলটা রওনা হল।

কী-ই বা করা এ-ছাড়া ? এই রকম মধ্যে মধ্যে এক-একদিন সন্ধ্যায় এর-ওর ওখানে গিয়ে জমিয়ে বসা। তা ছাড়া কোনো কাজ নেই—বিষণ্ণ শীতার্ত সন্ধ্যায় নিজেকে নিয়ে বসে বসে মন্থন করা ছাড়া আর করণীয় নেই কিছুই। চারদিকে বিবর্ণ অন্ধকার নামতে থাকবে—পাহাড়ের চূড়োগুলো কালো আকাশে হেলান দিয়ে কতগুলো দৈত্যের মতো ঘুমিয়ে পড়বে, পাইনের জঙ্গল এক এক ঝলক হাওয়া লেগে অদ্ভুত রহস্যময় স্বরে মর্মরিত হয়ে উঠবে। তখন এই রাত যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে বুকের ওপরে চেপে বসতে চাইবে, ভাবতে ইচ্ছে করবে—তৃণাঞ্চিত কোমল সমতলের মাটি, তার উষ্ণ-মধুর উত্তাপ, জীবনের চাঞ্চল্য আর মানুষের কোলাহল, আর—

সেই দীর্ঘশ্বাসটাকে ভোলবার জন্যে কিছুক্ষণের এই আড্ডা। এক-আধ বাজী তাস খেলা কোনো কোনো দিন। তারপরে রইল ছাউনি-হিলের মৃত নিঃসঙ্গ রাত্রি, আর ভয়ার্ত প্রহর-যাপনের পালা।

দু'ধারে অন্ধকার ঘন-কজ্জলিত হয়ে এসেছে। জঙ্গলের কোলে কোলে যেন সৃষ্টির আদিম-তমিস্রা। কৌশিক ঘোষের বাংলোয় যেতে অনেকখানি পথ পেরুতে হয়, প্রায় আধ মাইল ভেতরে যেতে হয় বাসের রাস্তা থেকে। এককালে ভালোই ছিল রাস্তাটা, কিন্তু বহুকাল ধরে উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে নুড়ি বেরিয়ে পড়েছে সর্বত্র। ঝর্ণার ওপর কাঠের কালভার্টগুলো পচতে শুরু হয়েছে, ভেঙে পড়বে কিছুদিন পরেই।

টর্চের আলো পথের ওপরে ফেলে দলটা চলছিল। কোথা থেকে জোরালো মোটরের আলো এসে পড়ল সকলের গায়ে। হর্নের আওয়াজও শোনা গেল একটা।

—এ রাস্তায় গাড়ি কোথায় যাচ্ছে? আমার বাংলোর পরে তো আর পথ নেই।—বিস্মিত হয়ে বললেন কৌশিক ঘোষ।

—তাহলে হয়তো আপনার কাছেই আসছে কেউ?

—আমার কাছে?—কৌশিক ভ্রূকুঞ্চিত করলেনঃ আমার বাড়িতে কে আর আসবে? সে রকম তো কোনো সম্ভাবনা নেই।

গাড়িখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল ওঁদের দিকেই। তারপর হাত দশেক সামনে এসে থেমে দাঁড়ালো। গলা বাড়ালো একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বাঙালী ছেলে। ডাক দিয়ে বললে, দয়া করে শুনবেন একটু?

গাড়ির পাশে গিয়ে সবাই দাঁড়ালেন। কালো রঙের প্রকাণ্ড মোটর, জিনিস-পত্রে বোঝাই। ক্যারিয়ারটা আধখানা খুলে আছে; তাতেও কুলোয়নি, ছাতের সঙ্গে দড়ি-দড়া দিয়ে গোটাকতক হোল্ড অল্ বেঁধে নিতে হয়েছে। গুটি তিনেক মহিলা গাড়িতে—জন দুই পুরুষ।

বাঙালী ছেলেটি বললে, বারো নম্বর বাংলো কোথায় বলুন তো?

—বারো নম্বর বাংলো? মানে ডাক্তার চক্রবর্তীর 'বিজন-বাস'?

—আজ্ঞে তাই হবে। অমনিই একটা কিছু নাম আছে বোধ হয়। আমরা তাঁরই আত্মীয়—সেখানে থাকব বলে এসেছি।

—সে তো এ রাস্তায় নয়।—অশোক বললে, এটা ডাইভারসন। আপনারা ঘুরে মেন রোডে চলে যান, সেখান থেকে কয়েক ফার্লং এগিয়ে বাঁদিকে শ'খানেক ফুট নিচে 'বিজন-বাস'।

বাঙালী ছেলেটি ক্লান্ত হাসি হাসলঃ এ যেন গোলোক-ধাঁধা। সবাই বলছে আমরা ছাউনি-হিল এরিয়ায় ঢুকে পড়েছি, অথচ কোথাও যে বাড়ি-ঘর আছে তাই মনে হচ্ছে না। যে দিকে তাকাচ্ছি খালি অন্ধকার আর অন্ধকার—!

—সন্ধ্যেবেলায় এমনিই মনে হয় বটে!—কৌশিক ঘোষ হাসলেনঃ বাড়িগুলো ঠিক পথের ধারে নয় কিনা। তাছাড়া বেশির ভাগই খালি পড়ে আছে। সন্ধ্যে-প্রদীপও জ্বলে না। সেই জন্যেই এই রকম মনে হচ্ছে। দিনের বেলায় আর এ রকমটা লাগবে না। তা এক কাজ করুন। বড় রাস্তা দিয়ে খানিক এগোলেই দেখবেন পাশাপাশি কয়েকটা দোকানে আলো জ্বলছে। ওদের জিজ্ঞেস করবেন—ওরাই দেখিয়ে দেবে এখন।

—উঃ, কী জায়গাতেই নিয়ে এলে মেজদা! যেন আফ্রিকার জঙ্গলে এসে পৌঁছেছি।—ভেতর থেকে একটি তরুণীর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—কাল সকালে বোধ হয় এত খারাপ লাগবে না।—কৌশিক ঘোষ আবার

জবাব দিলেন।

ছেলেটি শুকনো গলায় বললে, ধন্যবাদ। দেখি খুঁজে। আমরা তো প্রায় দিশেহারা হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনাদের টর্চের আলো দেখে ভরসা করে এগিয়ে এলাম। কতক্ষণে যে বাংলোর সন্ধান পাব, তাই বুঝতে পারছি না।

—না, না, আর বেশি ঘুরতে হবে না। যে-ভাবে বললাম, ওই রকম করে চলে যান। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

—ধন্যবাদ।—ছেলেটি আবার বললে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে বললে, আপনারা ?

—আমরা আপনাদেরই প্রতিবেশী। ছাউনি-হিলেই থাকি।—শৈলেশ জবাব দিলেন।

—যাক, ভালোই হল। বারো নম্বরে আমরা উঠেছি। একটু খোঁজ-খবর নেবেন দয়া করে। এখানে আমাদের আবার কিছুই জানা-শোনা নেই—আপনারা যদি দয়া করে একটু সাহায্য করেন—

—কিচ্ছু ভাববেন না—কৌশিক আশ্বাস দিলেন: কাল সকালে গিয়েই আমরা পৌঁছুব। শুধু সাহায্য কী বলছেন, নতুন কেউ এখানে এলে আমরা তাদের রীতিমতো বিব্রত করে তুলি।

—অনুগ্রহ করে বিব্রতই করবেন তবে—সেই তরুণীটির গলা শোনা গেল আবার। চশমার একজোড়া সোনালী ফ্রেম গাড়ির ভেতর থেকে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল।

—বেশি উৎসাহ দেবেন না আমাদের, বিপদে পড়বেন—সরোজ মন্তব্য করল।

সবাই হেসে উঠল। যে ছেলেটি গাড়ি চালাচ্ছিল, তার পীড়িত মুখেও হাসি ফুটে উঠল এবার। ব্যাক্ করে গাড়িটা বড় রাস্তার দিকে ফিরে গেল—পেছনের লাল আলোটা দেখা যেতে লাগল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

সবাই আবার চলতে আরম্ভ করল।

শৈলেশ বললে, কোত্থেকে এল বলুন তো ?

অশোক বললে, আমি বলতে পারি। গাড়িতে জলপাইগুড়ির নম্বর।

—কখনো জলপাইগুড়ির লোক নয়।—চ্যাটার্জি মাথা নাড়ল।

—কী করে জানলে ?

—আমি জানি। নিশ্চয় ওরা কলকাতা থেকে আসছে।

—কলকাতার চেহারা কি গায়ে লেখা থাকে নাকি ?—ডাক্তার হাসল।

চ্যাটার্জি বললে, অনেকটা। মফস্বলের মেয়ে হলে ও-রকম মাঝে পড়ে টকাস্ টকাস্ করে কথা কইত না। তাছাড়া জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির লোক বন-জঙ্গলকে

ভালো করেই চেনে—অন্ধকার দেখলেই তারা এমন করে ঘাবড়ে যায় না। নিশ্চয় কলকাতার লোক—যাকে বলে 'ড্যাঙ্কি'।

—অত স্পেকুলেশন করে কী হবে? কাল সকালেই জানা যাবে সমস্ত।—ডাক্তার বললেন।

তা বটে—কাল সকালেই জানা যাবে। তবু সকলের মনেই অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এখানে নতুন কেউ আসার অর্থ ই যেন মরুভূমিতে মেঘের খবর। পাহাড়ের এই নির্জন কারাবাসে যাদের একঘেয়ে শ্রান্ত দিনচর্চা, তাদের কাছে কোনো নতুন মানুষ এলেই একটা আশ্চর্য প্রত্যাশায় তারা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলো যেন তাদের সর্বাঙ্গে একটা তপ্ত জীবন্ত পৃথিবীর খবর বয়ে এনেছে—নিয়ে এসেছে তৃষ্ণার জল।

কৌশিক ঘোষ বললেন, তাহলে বছরের প্রথম চেঞ্জার এই এল!

ডাক্তার বললেন, হয়তো এই-ই শেষ। পাশে দার্জিলিং থাকতে এখানকার অন্ধকারে কে আর সাধ করে পড়ে থাকতে আসবে! তা ছাড়া ক্লাব নেই, সিনেমা নেই—

অশোক জুড়ে দিলে: দামী দামী জামা-কাপড় পরে বেরুলে সেগুলো দেখবার লোক নেই! এখানে কি আর ওদের পক্ষে থাকা সম্ভব!

—যা বলেছ!—শৈলেশ জুড়ে দিলেন। একটা ব্যক্তিগত ক্ষোভের সুর গুমরে উঠলো তাঁর গলার ভেতর থেকে: খাস কলকাত্তাইদের এ জায়গা ভালো লাগবে কেন?

বাঁ-দিকে পাইন বনের মধ্যে কৌশিক ঘোষের বাংলোর দোতলায় আলো জ্বলছে। অতিথিরা আসবে, বাইরের সিঁড়ির কাছে একটা পেট্রোম্যাক্স জেলে দিয়েছে চাকরটা—এই আরণ্যক পরিবেশে ওই আলোটাকে কেমন রসাভাসের মতো মনে হচ্ছে। এক ঝলক তীক্ষ্ণ আলোয় লনের হাইড্রেন্‌জিয়ার গুচ্ছ তোড়া-বাঁধা মুক্তোর মতো ঝলমলিয়ে উঠছে।

কৌশিক ঘোষের কুকুর দুটো লনে মানুষের এক সার দীর্ঘায়িত ছায়া দেখে তার-স্বরে অভ্যর্থনা জানাল। কৌশিক ঘোষ সস্নেহে বললেন, ডেভি, বেবি আমরা—আমরা!

তিন

প্রায় রাত নটার সময় ওরা চলে গেল।

একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন কৌশিক। প্রকাণ্ড ল্যাম্পটার আলোতেও মস্ত ঘরখানার সবটা উদ্ভাসিত হয়নি। তিন দিকে দেওয়াল-

জোড়া বইয়ের শেলফে এখানে-ওখানে এলোমেলো ছায়ার টুকরো। কৌশিক ঘোষ একবার বইগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। নানা জাতের বইয়ের বিচিত্র সংগ্রহ। এ-ঘরে যে-কেউ পা দেবে, সেই-ই বলবে বইয়ের মালিকের কোনো জিনিসেই অরুচি নেই। ডিটেক্‌টিভ্‌ বই, ইংরেজী কাব্য, উপন্যাস, ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান। এককালে নির্বিচারে বিলিতী বই কিনতেন কৌশিক ঘোষ। সবই যে পড়তেন তা নয়—কেনাটাই ছিল তাঁর বিলাস। এখানেও তিনি তাঁর বইগুলোকে সঙ্গে করে এনেছেন—মায়া কাটাতে পারেননি। মাঝে মাঝে দুটো-একটার দু-চারখানা পাতা ওলটান, কিন্তু পড়তে আর পারেন না। বইয়ের ভেতরে একাগ্র হওয়ার মন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

দেওয়ালে গুটিকয়েক ছবি। একখানা রেঙ্গুনে তোলা গ্রুপ ফটো—একবার দুর্গাপুজোয় তিনি সেক্রেটারী ছিলেন—তারই স্মৃতি বহন করছে ওখানা। তাঁর স্ত্রীর ফটো আর একখানা। একটি তাঁর বড় মেয়ে আর তাঁর মাদ্রাজী স্বামীর ছবি—বিয়ের পরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। আর খান দুই ল্যাণ্ডস্কেপ্‌—এই ছাউনি-হিলেরই বর্ণরূপ। তাঁর ছোট মেয়ে রুচি এঁকেছে।

এত বই—এত মানুষের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে কী আশ্চর্য শব্দ-কোলাহল। তবু—তবু কী নির্জন! ওরা চলে যাওয়ার পরে আরো নির্জন মনে হচ্ছে ঘরটাকে। নিজেকে তাঁর প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে—যা তুমি চেয়েছো, তা কি এখানে তুমি পাবে? শূন্যের মধ্য থেকে মুঠো বাড়িয়ে শূন্যতাই শুধু তুমি কুড়িয়ে নিতে পারো—তার বেশি আর কিছুই নয়।

এর চেয়ে কলকাতায় থাকলেই ভালো হত। কলকাতা—

নাঃ—অসম্ভব! কৌশিক ঘোষ চমকে উঠলেন। ও-কথা কোনোমতেই ভাবা চলে না আর। তার ওপরে চিরদিনের মতো ছেদ পড়ে গেছে। ছাউনি-হিলের বাইরে কোনো পৃথিবীই আর অবশিষ্ট নেই!

স্মৃতির মধ্যে ডুব দিলেন কৌশিক ঘোষ। পনেরো বছরের অতীত ইতিহাস ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ছাউনি-হিল নামই তার অতীত পরিচয় বহন করছে। একদা এই পাহাড় ছিল ঘন-অরণ্যে ছাওয়া, এখানে ছিল হরিণ আর ভালুকের অবাধ রাজত্ব। পাহাড় ভেঙে বেপরোয়া খুশিতে পাগলা ঝর্ণা নামত, শানাই ফুল শিশিরের ছোঁয়ায় ফুটে উঠত নিজের আনন্দে। কিন্তু অরণ্যের এই আদিম-শান্তি বেশিদিন রইল না। দলে দলে ইঞ্জিনীয়ার এল একদা, এল নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। ডিনামাইটে পাথর উড়ল, বন কাটা পড়ল, ক্যাণ্টনমেণ্ট বসল এখানে।

ছাউনি-হিল তখন জম-জমাট। সৈন্যদের ব্যারাক, অফিসারদের কোয়ার্টার।

প্যারেড্ চলে, চাঁদমারী হয়, ক্লাবে সাহেব অফিসারদের স্ত্রীরা বল্‌ড্যান্স্ করে। বেশ কয়েক বছর এইভাবেই কাটল। তারপরে নাকি দেখা গেল আশপাশের চা-বাগানগুলোর সঙ্গে ছাউনি-হিলের মিলিটারীদের প্রায়ই গোলমাল বাধছে। আরো দেখা গেল, কাছেই নেপাল-বর্ডার থাকায় অন্যায় করেই লোকগুলো সেই বর্ডার পার হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই।

নানা ঝঞ্ঝাটে শেষে একদিন ক্যান্টনমেণ্ট উঠে গেল এখান থেকে। সব মিলে সৃষ্টি হল একটা বিরাট শ্মশান। ব্যারাকগুলো ভেঙে পড়তে লাগল—যেন একটা পোড়ো-বাড়ির শহর হয়ে দাঁড়াল জায়গাটা। সরকার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন: ছাউনি-হিলের বাড়ি আর জমিগুলো নিলাম করা হবে।

এলাহাবাদ না লক্ষ্ণৌ—কোথাকার ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সের এক প্রফেসার ছিলেন—ডাক্তার মজুমদার তাঁর নাম। ব্যাচেলার লোক, নানা অসম্ভব কল্পনা নিয়ে দিন কাটাতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে তিনি ছাউনি-হিলের দিকে আকৃষ্ট হলেন। ভাবলেন এইখানে তিনি একটি আদর্শ স্বাস্থ্য-নগরী গড়ে তুলবেন।

অতএব মাত্র হাজার পনেরো টাকায়—বলতে গেলে জলের দরেই তিনি এখানকার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি কিনে ফেললেন। তারপর শুরু করলেন সাজাতে। বাড়িগুলোর সংস্কার করে তাদের চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। ব্যারাক নাম্বার টেন হয়ে দাঁড়াল: 'স্বপ্নবীথি', সিঙ্গল্ মেনস্ কোয়ার্টার হল 'বন্ধু-মিলনী', অফিসার্স কোয়ার্টার নাম্বার ফিফ্‌টিন হল: 'শৈল-নিবাস'। রোড্ নাম্বার ওয়ান হল 'ছায়াপথ', রোড্ নাম্বার ফাইভ্ হয়তো হয়ে দাঁড়াল: 'হনিমুন পাথ', চাঁদমারী অঞ্চলের নাম দিলেন, 'পিস্ অ্যাভিনিউ'।

মনের মতো করে স্বাস্থ্য নিবাস সাজিয়ে ডাক্তার মজুমদার দেশের লোককে তার দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাশে দার্জিলিং কার্শিয়ং কালিম্পং থাকতে লোকে ছাউনি-হিলের দিকে ফিরেও তাকালো না। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ডাক্তার মজুমদার আরো অনেক টাকা খরচ করলেন। তাঁর দু-চারজন বন্ধু দু-এক দিনের জন্যে বেড়াতেও এলেন। দিন দুই এদিক-ওদিক পায়চারি করে তাঁরা বললেন, দিব্যি জায়গাটি, দার্জিলিংয়ের চেয়ে ঢের ভালো। এখানে থাকলে শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না।—এই বলে তাঁরা দার্জিলিঙে ফিরে গেলেন।

এমন সময় যুদ্ধ ঘনিয়ে এল। বর্মা, আরাকান, তারপর কলকাতা। প্রথমে বোমা নামল বজবজে। সেখান থেকে কলকাতার বুকের ওপর। লো-ফ্লাইটে নেমে খিদিরপুরের ডকে দিন-দুপুরে মেশিন-গানিং করে গেল জাপানীরা।

পালাও পালাও রব শুরু হল কলকাতায়। দিনের আলো শ্মশানের রোদের মতো খাঁ খাঁ করে, রাত্রির অন্ধকার ঘোমটা-ঢাকা আলো নিয়ে তৈরী করে অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন। সাইরেনের ডাকিনী-কান্না রক্ত হিম করে আনে। এইচ-ইর বিস্ফোরণ আর অ্যাক্-অ্যাক্ ব্যাটারীর ফ্ল্যাশ—স্নায়ুগুলোকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে দিতে চায়।

সেই সময় অনেক অকৃত্রিম কলকাতা-বিলাসীর হঠাৎ মাতৃভূমিকে মনে পড়ল —দেশজননীর দুর্বার আকর্ষণ আর সামলাতে পারলেন না তাঁরা। তিন পুরুষ ধরে বেড়ে ওঠা পোড়ো-ভিটের জঙ্গল আবার কাটা গেল, গোটা কয়েক সাপ মরল, কিছু ইঁদুর, বাদুড়, চামচিকে, ছুঁচো বাস্তুহারা হল। খইয়ের খোলার গরম বালি থেকে যেমন খই ছিটকে পড়তে থাকে, তেমনি ভাবেই কলকাতার কায়েমী-অস্থায়ী স্থাবর-অস্থাবরেরা দিকে দিকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়লেন।

সেটা শীতকাল। হ্যাপি ক্রিসমাস্। কপি-কড়াইশুঁটি-গলদা চিংড়ীর মরশুম। ক্রিকেটের মাঠ, ডগ রেস্, সার্কাস, নন্-স্টপ রেভ্যু, নানা একজিবিশন। কিন্তু সব যায় এখন। নানা রঙের মরশুমী ফুলের মতো এই কলকাতা আর থাকবে না। বৌবাজারের মোড়ে এক বিরাট পিপুল গাছের তলায় বসে হুঁকো টানতে টানতে জবচার্ণক যে শহরের পত্তন করেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তা ধুলো ধুলো হয়ে মিশে যাবে মাটিতে। আর এক বিশালতম ফতেপুর সিক্রীর মতো মুখ ভ্যাংচাবে ইতিহাসকে। তারপর মাথা তুলবে প্রকৃতি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা দেবে অরণ্য। আর চার্ণকের প্রেতাত্মা সেই জটিল গহন অরণ্যের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলে ঘুরে বেড়াবে। পালাও—পালাও। দিল্লী, দার্জিলিং যেদিকে চোখ যায়।

দুরন্ত শীত দার্জিলিঙে। তাতে কী হয়েছে। ইন্সেনডিয়ারী বমে পুড়ে মরার চাইতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঢের ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল উপেক্ষিতা ছাউনি-হিল। যারা আর কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোটাতে পারলেন না, তাঁরা ছুটে এলেন এখানে। একটি বাংলোও কোথাও আর খালি রইল না। বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলল, প্রত্যেকটি নিরালা বনপথ সরগরম হয়ে উঠল, নানা রঙের শাড়ি-স্যুট-শাল ঝল্মল্ করতে লাগল এদিক-ওদিক। রেডিয়োর গুঞ্জন, গানের আওয়াজ, হাসির কলতান, পাইন বনের ভেতরে টুকরো-টাকরা প্রেমকাব্য। টিলার মাথায় একটা ক্লাব পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল—একটুখানি সমতল খুঁজে নিয়ে শুরু হল টেনিস-ব্যাডমিণ্টন। বেশ কয়েকটি আইবুড়ো মেয়ে ঝর্ণার ধারে, শানাই ফুলে ভরা ছায়ার নীচে তাদের শিকার পর্যন্ত ধরে ফেলল। মজুমদারের স্বপ্ন আশার চাইতেও অনেক বেশি সার্থক হল—হু-হু করে বিক্রী হয়ে গেল বাড়িগুলো।

কিন্তু ছাউনি-হিলের ক্ষণ-যৌবন বেশিদিন টিকল না। কলকাতা দাঁড়িয়ে রইল যথাস্থানেই। যুদ্ধ তাকে দুটো-একটা নখের আঁচড় দিয়েই ছেড়ে দিলে এ-যাত্রা। অতএব এক এক করে বাড়িগুলো খালি হতে লাগলো, একটি একটি করে নিবতে লাগল আলো, একে একে শূন্য হয়ে এল পাইন বনের পথ। দামী সিগারেটের টুকরো, লিপ্‌স্টিকের ধ্বংসাবশেষ, নিউ মার্কেটের এক-আধ পাটি শৌখিন স্লিপার, বিলাতী বইয়ের রঙিন মলাট, হেরিং মাছ আর মাখনের টিন, বিদেশী ক্রিমের কৌটো আর হেয়ারপিন, বৃষ্টির পর বৃষ্টির ধারায় ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে এল।

আরো দু-এক বছর জের চলল কিছু কিছু। কিন্তু নদীর উৎস মুখ বুজে গেলে যেমন করে তার বান একটু একটু করে মন্দা হয়ে আসে—তেমনি করে থেমে এল চেঞ্জারের স্রোত। এখন দার্জিলিং বেড়াতে এলে কেউ কেউ একবার ছাউনি-হিলে আসেন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য, কিংবা বড়জোর একটি রাত শুব্ধ অন্ধকার আর কুয়াশা ছাওয়া আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে অস্বস্তিভরে কাটিয়ে যান, সকালের সোনালি আলো পাইন বনের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দেবার আগেই তাঁদের মোটর পৌঁছে যায় দার্জিলিঙে। তাঁদের শূন্য বাগানে পাহাড়ি গোলাপের ঝাড় অযত্নে ফুল ফুটিয়ে ঝরে যায়—নেপালী কীপাররা যেটুকু পারে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে, পেঁয়াজ স্কোয়াশের লতা তোলে—পোষে মুরগী।

সেই স্বর্ণযুগেই কৌশিক ঘোষ প্রথম এসেছিলেন এখানে। সেই যুদ্ধের তাড়াতেই। কিন্তু আর ফিরে গেলেন না। কলকাতায় দার্জিলিঙে ব্যাঙ্কে কিছু সঞ্চিত আছে—তাতেই কুলিয়ে যায়—রুচিরা বা সংক্ষেপে রুচির আর্ট স্কুলে পড়ার খরচাও তাতে মেটে। কলকাতায় রুচি মামার বাড়িতে থাকে—অতএব ওদিকের সমস্যা নিয়ে কৌশিক ঘোষকে ভাবতে হয় না।

তবু—তবু এই ভাবে কতদিন কাটবে?

বেশ আছেন—সে কথা ঠিক। আজও দার্জিলিঙে জনকয়েক অপরিচিত ভদ্রলোককে সে কথা তিনি শুনিয়ে এসেছেন উঁচু গলায়। তবু সব সময় জোর পান না। এক-একদিন রাত্রে ঝর ঝর করে তীক্ষ্ণ শীতল বৃষ্টি নামে—বাইরে পাইন বনের ক্ষুব্ধ আলোড়ন বাজতে থাকে, বাংলো থেকে হাত ত্রিশেক দূরে মুখর হয় ঝর্ণাটা, বেবি কিংবা ডেভি ককিয়ে ওঠে একবার। তখন কেমন খারাপ লাগে কৌশিক ঘোষের। কী অসহ্য অন্ধকার—কী কালো অরণ্য—কী দুর্বহ নির্বাসন! বইয়ের শেলফগুলোর এখানে-ওখানে ছায়ার পুঞ্জ যেন তাঁরই মনের সঞ্চিত রাশি রাশি অবসাদের মতো চোখের সামনে দুলতে থাকে।

তখন মনে পড়ে—কলকাতা থেকে কেন পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। ছিঃ—ছিঃ,

কী লজ্জা—কী লজ্জা! কৌশিক সেটাকে ভুলতে চান—ভুলতে চানও না। আত্ম-পীড়নের একটা তিক্ত আনন্দ নিয়ে সেই দুঃস্বপ্নকে আস্বাদন করেন বার বার।

ওই একটি আঘাত! একটি আঘাতেই কী করে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে!

টেবিল থেকে তুলে নিলেন পাইপটা। একটা ইটালীয়ান কম্বল কুড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিলেন নিজের পায়ের ওপর। ধীরে ধীরে পাইপ ধরিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন ল্যাম্পটার সেডের ওপরে বসে-থাকা গঙ্গা ফড়িংটার দিকে। তারপর—

রেঙ্গুনের কৌশিক ঘোষ অনেক করেছেন জীবনে। না—সে আদর্শ ভালো ছেলের জীবন নয়। তাঁর স্ত্রীকে তিনি সুখী করেননি—করতেও চাননি। কৌশিক ঘোষ জানতেন তিনি আগুন—তাঁর কাছে পতঙ্গেরা এসে পড়বে অনিবার্য নিয়মেই। চুম্বকের আকর্ষণে পিন আপনিই লাফিয়ে ওঠে—সে অপরাধ চুম্বকের নয়।

জীবন একটা ফুলের বাগান—তার চার দিকে থরে থরে ফুটে আছে ডালিয়া—গোলাপ-গন্ধরাজ! তুলে নিতে জানলেই হল। সমাজের মালী একজন আছে বটে, কিন্তু বুড়ো হয়েছে সে, চোখে ছানি পড়েছে তার। একটু বুদ্ধিমান যে—এমন মালিকে ফাঁকি দেওয়া কী আর শক্ত কাজ তার পক্ষে! বর্মী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-পাঞ্জাবী-মাদ্রাজী-বাঙালী—সব এক। দরকার শুধু একটুখানি হাতের কাজ। অন্তত কলকাতায় এসে বাসা বাঁধবার আগে পর্যন্ত এই ধারণাই তাঁর ছিল।

তাঁর নজর পড়ল রুচির প্রাইভেট টিউটারের ওপরে।

মেয়েটির বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি—স্কুলের টীচার। কিন্তু এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি এখনো মাস্টারনী হয়ে ওঠেনি—স্কুলের ছাত্রীর ছাপ রেখেছে মুখে। গলাটা এখনো মিষ্টি—হাসিটা এখনো তীক্ষ্ণ এবং উচ্ছলিত।

কৌশিক ঘোষ দেওয়ালের স্থির-চিত্ত টিকটিকির মতো লক্ষ্য রাখছিলেন। একদিন রুচি গিয়েছিল নিমন্ত্রণে। একা বাড়িতে মাস্টারনীর সঙ্গে দেখা হল তাঁর।

কৌশিক ঘোষ সুযোগ ছাড়লেন না। নিজের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস তাঁর। তিনি জানতেন, তাঁকে খেলিয়ে তুলতে হয় না। তাঁর শিকার উঠে আসে একটিমাত্র হ্যাঁচকা টানেই।

ভণিতা বেশিক্ষণ করতে হল না। সূচনা করতেই উচ্ছ্বসিত গলায় হেসে উঠল মেয়েটি। বললে, আর বলতে হবে না—বুঝেছি।

কৌশিক ঘোষের খটকা লাগল। হাসিটা ঠিক চেনা ঠেকল না।

কৌশিক বললেন, তা হলে চলো—কাল সিনেমায় যাই একসঙ্গে।

মেয়েটি বললে, সে তো ভালোই—দু বছরের মধ্যে সিনেমা দেখিনি। কিন্তু কোন্

সীটে বসাবেন—ফার্স্ট ক্লাসে তো ?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—একটু থতমত খেয়ে কৌশিক বললেন, শুধু ফার্স্ট ক্লাসে কেন, বেস্ট্‌ সীটে।

—তারপর বড় হোটেলে নিয়ে খাওয়াবেন তো ? সেই রকমই তো রেওয়াজ।

কৌশিক একটু সন্দিগ্ধবোধ করলেন।

—খাওয়াব বইকি। যেখানে খেতে চাও—যা খেতে চাও।

—তা হলে—মেয়েটি একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম করল : ওখানেই নিয়ে যাবেন কিন্তু। আমার একজন ক্লাস-ফেণ্ডের কাছে শুনেছি ওরা সবচেয়ে ভালো ডিনার খাওয়ায়—আট-দশটা কোর্স। আমি কোনদিন ওসব খাওয়ার সুযোগ পাইনি—চোখেই দেখিনি। নিয়ে যাবেন তো ?

—তাই নিয়ে যাব।

—আর প্রেজেণ্ট্‌ কী দেবেন ? শুনেছি কেউ ব্রোচ্‌ পায়, কেউ ইয়ারিং, কেউ শাড়ি, কেউ বা ঘড়ি। আমার ঘড়ি নেই, একটা ঘড়ি দেবেন তো ?

কৌশিক ঘোষের কেমন গোলমাল বোধ হল। মেয়েটিকে বেশ নিরীহ গো-বেচারী সাধারণ বাঙালীর মেয়ে বলে ভেবেছিলেন—একটু ডিগ্‌নিটিও আশা করেছিলেন বই-কি। ভেবেছিলেন বাদামের মতো আস্তে আস্তে খোসা ছাড়াতে হবে। কিন্তু এ যে বলবার আগেই পা বাড়িয়ে আছে ! আর শুধু পা বাড়ানো নয়—কী নির্লজ্জের মতো দর-দাম করছে ! কৌশিক ঘোষ নিজেই লজ্জা পেলেন এবার।

বললেন, বেশ, তাই দেব তোমায়। শাড়ি-ইয়ারিংও দেব।

যেন চুক্তি-স্বাক্ষরিত হচ্ছে এমনি গম্ভীর হয়ে মেয়েটি বললে, কথা তা হলে পাকা ?

—নিশ্চয়ই।

—এর আর নড়চড় হবে না ?

—কোনোমতেই না।

—ভালো করে বলুন।—মেয়েটির চোখ দুটো চকচক করে উঠল : গাছে তুলে দিয়ে আবার মই কেড়ে নেবেন না তো ? কাল সন্ধ্যেয় আপনার জন্যে সিনেমার সামনে আমি হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকব, অথচ শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন না—এমন একটা কিছু হবে না তো ?

—আজ অবধি কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্‌ আমি ফেল্‌ করিনি।—কৌশিক ঘোষ মেয়েটির হাতের দিকে হাত বাড়ালেন। মেয়েটি হাত সরিয়ে নিল না—এমন কি, তিনি সে হাতে একটু চাপ দেবার পরেও না। অনেকক্ষণ পরে হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, তা হলে আমি আসি। কিন্তু কালকের কথার যেন নড়চড় না হয়।

সে-রাত্রে কৌশিক ঘোষ স্বাভাবিকভাবেই খেলেন, স্বাভাবিকভাবেই ঘুমুলেন। বুকের মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নেই—রক্তে কোনো উত্তেজনাও না। সে-সব পাট চুকে গেছে অনেক দিন আগেই। জঙ্গলের শিকারী যেমন ফাঁদে জানোয়ার পড়বার আওয়াজ পেয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যায়, তেমনি করে রাত কাটালেন—কাটালেন পরের দিনটাও।

একটু সেজেই বেরুলেন সন্ধ্যেবেলায়। কিছু বেশি টাকা নিলেন পকেটে। মেয়েটা এমনি চেহারায় বেশ ভালো মানুষ হলে কী হয়—আসলে পাকা খেলোয়াড়। কিছু না খসিয়ে ধরা দেবে না।

চৌরঙ্গীতে এসে যখন বিলিতী সিনেমার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন, তখন মেয়েটি লবিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য—সেই শাদামোটা শাড়ি নয়, বেশ সেজে এসেছে আজকে। একটু প্রসাধনও করেছে মনে হচ্ছে যেন। সিনেমা-হাউসের এই নেশা-ধরানো আলোয়, এয়ার-কন্‌ডিশনের এই মৃদু শীতলতার আমেজে, আর চারদিকের এই নানা রঙের ঝলকানির ভেতরে অনেক ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে ওকে—যেন দশ বছর বয়েস কমে গেছে।

মেয়েটাই এগিয়ে এল ওঁর দিকে।

—তবে সত্যিই এলেন!

—কথা দিয়েছি, আসব না?—অত্যন্ত মধুমাখা হাসি হাসলেন কৌশিক।

—আমার কিন্তু বড় ভয় করছিল।

—এর পরে আর করবে না।—কৌশিক নিবিড় প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন: দুদিনেই আমাকে চিনতে পারবে।

—তবে একটু দাঁড়ান, আলাপ করিয়ে দিই—।—গীতা, এদিকে আয়—

কৌশিক চমকে উঠলেন। গীতা আবার কে? আজকের সন্ধ্যায় এই মেয়েটির সঙ্গেই তাঁর সম্পূর্ণভাবে আলাপ হওয়ার কথা—কোনো গীতা-গায়ত্রীর প্রশ্ন তো ছিল না।

রুচির টিউটারের সমবয়সী আর একটি মেয়ে এগিয়ে এল কোত্থেকে। কালো কটকটে চেহারা—চোখে শেলের চশমা—কপালে ভ্রূকুটি।

মাস্টারনী হেসে বললে, গীতা—ইনি কৌশিক ঘোষ। দেখছিস কি—চমৎকার লোক। আরে, মাথার পাকা চুল দেখেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বয়েসে আমার দু'গুণ হলে কী হয়—মনে ওঁর রসের ঝর্ণা বইছে। বুড়ো হয়েও উনি তরুণ। আমাকে ভীষণ ভালোবেসেছেন। আরে—অবাক হচ্ছিস যে? ভারী প্রেমিক লোক—ভাখ্‌ না যে বয়েসে লোকে নাতি-নাতনী নিয়ে সার্কাস দেখতে যায়—সেই বয়সে

উনি আমাকে দেখাতে এনেছেন 'অ্যালোন উইথ্ ইউ'! শুধুই সিনেমাই দেখাবেন তা-ই নয়, তারপরে ডিনার খাওয়াবেন। কালকে প্রেজেন্ট্ করবেন একটা দামী ঘড়ি, পরশু শাড়ি আর ইয়ারিংও পাব। হিংসে হচ্ছে? কী করবি—বল্। পারিস তো তুইও একটা জুটিয়ে নে গীতা—ওঁর ওপর নজর দিস্ নে। খবরদার—বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কিন্তু।

বলেই, সেই তীক্ষ্ণ উচ্ছলকণ্ঠে 'লবি' কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল। উচ্ছ্বসিত কৌতুকের —নির্মল আনন্দের লহরিত হাসি। চারদিকের মানুষ চমকে ফিরে তাকালো তার দিকে।

আর কৌশিক ঘোষ? কী মারাত্মক একটা নাটকে কোন ভয়াবহ নির্বোধের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেটা আবিষ্কার করলেন। পকেটে রিভলবার থাকলে সেই মুহূর্তেই হয় মেয়েটাকে খুন করতেন, নইলে আত্মহত্যা করতেন তিনি।

কী করে যে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এখনো তা ভালো করে মনে পড়ে না। শুধু গীতাকেই যে ও কথাগুলো শুনিয়েছে তা নয়—আশপাশ থেকে বহু কৌতুকভরা চোখেরই ব্যঙ্গবাণ অনুভব করেছিলেন কৌশিক। তাঁর ট্যাক্সি যখন ভবানীপুর পাড়ি দিচ্ছে, তখনো তাঁর মনে হচ্ছিল ওই হাসির শব্দটা পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে তাঁর!

কী নিষ্ঠুর—কী ভয়ঙ্কর মেয়ে! হাতের মুঠো থেকে সিনেমার টিকিট দুটো বের করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে টের পেয়েছিলেন—এবার থেকে তাঁর টিকিট কেনার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল!

বাড়ি ফিরে দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। কী ভয়াবহ আত্মদর্শন! বুড়ো হয়ে গেছেন কৌশিক ঘোষ—একেবারে দেউলে হয়ে গেছেন। আজকের রঙ্গমঞ্চে একমাত্র বিদূষক ছাড়া আর কোন্ ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতে পারেন?

কৌশিক ঘোষ আচ্ছন্নের মতো সোফার ওপরে এলিয়ে পড়লেন। নিজের অস্তিত্বের প্রধান পীঠস্থান থেকেই আজ তিনি বিকেন্দ্রিত, বিচলিত। জীবনের মালঞ্চে এই মুহূর্তে অসংখ্য ফুল ফুটছে—ভবিষ্যতেও ফুটবে। কিন্তু তারা আর ধরা দেবে না তাঁর হাতে। নিষ্ঠুর কৌতুকে হাতের কাছে নেমে এসেই রূপকথার চম্পা-পারুলের মতো উঠে যাবে আকাশের দিকে। আর এই প্রহসন দেখতে যে দর্শকের দল জড়ো হয়েছে —কৌশিক ঘোষ শুনতে পাবেন তাদের হাসি আর হাততালির আওয়াজ।

এর পর?

নিজেকে তো তাঁর বিশ্বাস নেই। লোভে বরাবর শান দিয়েই এসেছেন তিনি—কখনো তাকে খাপে পুরে রাখতে শেখেননি। অজীর্ণ রোগীর মতো আজও চারদিকের

প্রলোভন তাঁকে ডাকছে, তার হাত থেকে তো আত্মরক্ষার উপায় নেই !

ভুল করবেন—জেনেশুনেও করবেন। তার বিনিময়ে এর চাইতেও যে ভয়াবহ অপমান আসবে না—সে কথাই বা কে বলতে পারে ?

অতএব নির্বাসন।

ছাউনি-হিল। এর চাইতে ভালো জায়গা কী হতে পারে আর ?

বাড়ি কিনেছিলেন এক কৌশিক ঘোষ—যিনি এখানকার পাইন বনের ভেতরে ক্ষুধিত চোখ মেলে ঘুরে বেড়াতেন—খুঁজতেন টুকরো টুকরো প্রেম-কাব্যের শ্লোক। কিন্তু পাকাপাকিভাবে যিনি বাস করতে এলেন—তিনি একটা নির্বাপিত হাউই।

একরাশ বেদান্ত-দর্শন পড়বেন। আত্মশুদ্ধি করবেন। আর এখানকার নির্বারিত নির্জনতায় ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন অসহ্য অপমানে কলঙ্কিত সেই সন্ধ্যাটার কথা।

কিন্তু আজও তা পারলেন কই কৌশিক ঘোষ ? আজও মনের ভেতরে তারা একরাশ ক্বমির মতো কিলবিল করে। দু ঘণ্টা একনাগাড়ে যোগশাস্ত্রের বই পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন হয়তো, মনে মনে আওড়াতে থাকেন : 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ'। আর তখনি হয়তো চোখে পড়ে তরুণী একটি পাহাড়ী মেয়েকে। মাথায় একটা ভারী বোঝা নিয়ে নামছে খাড়া-উৎরাইয়ের পথ—এক একটা ধাপ নামবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লোলিত হয়ে উঠছে উগ্র যৌবনশ্রী।—থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আবেগ ঠিকরে এসেছে গলার কাছে—বুকের মধ্যে শুনতে পেয়েছেন ঝড়ের ডাক।

বাড়ি ফিরেছেন সঙ্গে সঙ্গেই। দাঁড়িয়েছেন আয়নার সামনে। নিজের চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ—গ্র্যাণ্ড হোটেল উপন্যাসের সেই নর্তকীকে মনে পড়ে গেছে তাঁর। চুল সব শাদা হতে চলেছে, কিন্তু এখনো কেন মনকে বশ মানাতে পারছেন না তিনি ?

তবু চেষ্টা করছেন বইকি। এই পাঁচ বছরে সংযতও হয়েছেন অনেকখানি। আর এই বাংলোটিও এ-দিক থেকে আদর্শ তাঁর পক্ষে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—ঘন পাইন বনের মধ্যে একেবারে বিচ্ছিন্ন। যদি এইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়—চাকরটা যদি বাড়িতে না থাকে, তাহলে হয়তো তিনদিনের মধ্যেও সে-খবর কেউ জানতে পারবে না !

হঠাৎ চমকে উঠলেন। কে যেন ডাকছে।

কেউ নয়—তাঁরই চাকরটা। বিকারহীন মুখে মনের কোনো প্রতিলিপি ধরা পড়ে না।

জানতে চাইল : খাবার তৈরী হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দিয়ে দেব হুজুর ?

—আজ এই টেবিলেই নিয়ে আয়।—কম্বলটাকে পায়ের ওপর আরো খানিক নামিয়ে দিয়ে কৌশিক বললেন, এখন আর নিচে যেতে ইচ্ছে করছে না।

চার

অশোকের ঘুম ভাঙে খুব ভোরে—অন্ধকার থাকতেই। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই। এ যে কতদিনের অভ্যাস সে তার ভালো করেও মনে পড়ে না। খুব ছেলেবেলায় বাবা ঘুম থেকে ডেকে ওঠাতেন, মুখস্থ করাতেন স্তব, পঞ্চকন্যা আর দশমহাবিদ্যার নাম। তারপর এক্সারসাইজ, তারপরে পড়া। বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল, ভোরের আবছা আলোয় সেখানে পায়চারী করে করে পড়তে থাকত অশোক—অন্তত মাইল তিনেক হাঁটা হয়ে যেত তাতে। তারপর রোদ যখন ধারালো হয়ে উঠে চোখে মুখে ঘা দিত, তখন ঘরে ফিরে যাওয়ার পালা।

বাবা বলতেন রোজ সূর্য ওঠার আগে সমস্ত কাজ শেষ করে পড়ায় যে মন দিতে পারে, তার উন্নতি ঠেকাতে পারে না কেউ। দুনিয়ায় যারা বড় হয়েছে, তারা সবাই আর্লি-রাইজার। ছাখ্ না রবীন্দ্রনাথকেই। শান্তিনিকেতনে পাখি জাগবারও অনেক আগে জেগে ওঠেন তিনি—তাঁর চোখের সামনেই আস্তে আস্তে শুকতারা ডুবে যায়। সকলের আগে তাঁর প্রার্থনা শেষ হয়ে যায়—ভারতবর্ষের সব লেখকের আগে তিনি লিখতে বসেন। তাই তাঁর লেখাও সকলকে ছাড়িয়ে যায়। আর যারা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়? তারা বড় জোর কেরানীগিরি পর্যন্ত এগোতে পারে, ত্রিশ বছরে তাদের ক্রনিক্ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয় আর চল্লিশ বছরে হয় ডাইবেটিস্। তারা শুধু সংখ্যা বাড়ায়—মানুষ বাড়াতে পারে না একটিও।

প্রাতরুত্থানের এত গুণ? শুনে রোমাঞ্চ হয়েছে অশোকের। মনে মনে কল্পনা করেছে সে-ও তাহলে নির্ঘাত রবীন্দ্রনাথ হবে একদিন। একটু বয়েস বাড়লে দু-চারটে কবিতা লিখেছে—ছাপাও হয়েছে কাগজে। আই. এস্-সি. পড়বার সময় তো দস্তুরমতো আধুনিক একটা সাহিত্য গোষ্ঠীতে গিয়ে ভিড়েছিল, মনে হয়েছিল তাদের ওপরেই সাহিত্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। ছন্দের ওপরে রোলার চালিয়ে, 'মাতরিশ্বা দিন' 'অনিকেত প্রেম' 'বিপ্রকর্ষ বিবিক্ত আত্মা' আর 'তবুও হটেনটট্ আকাশের বৈমনস্য অনুক্ত দূর পার্থেননে' এইসব লিখে পাঠকদের যেমন চকিত করেছিল, উচ্চকিত নিজে হয়েছিল তার চাইতেও বেশি। ঘরের দেওয়ালে বোদ্‌লেইরের এই পংক্তিগুলো তার টাঙানো থাকত: "No cherchez plus mon coer ; les fetes l'ont mange." 'অর্থাৎ আমার হৃদয়কে আর খুঁজো না; বুনো জন্তুরা তাকে খেয়ে ফেলেছে।'

রবীন্দ্রনাথ নয়—ওটা ব্যাক্-ডেটেড্। রবীন্দ্রত্তর কিছু হওয়া চাই। হয়তো

হয়েও যেত, যদি না নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা হোঁচট্ খেতো বি. এস্-সি. প্র্যাক্টিক্যালে। বাবা ক্ষেপে গেলেন। ভবিষ্যতে যে দিকপাল হবে, সে কিনা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভিড়ল ফেল করা ছাগপালের সঙ্গে? বাবা বললেন, এমন গর্দভ ছেলেকে পড়ার খরচ জুগিয়ে তিনি তাঁর 'হার্ড-আর্নড্ মানি' অপচয় করতে রাজী নন। যে-সব মাসিক পত্রিকায় ভজন ধরে সে পাগলের প্রলাপ লিখে থাকে, তার সেই পাগ্লা-গারদের বন্ধুরাই তবে তার পড়ার খরচ যুগিয়ে যাক।

তারা যোগাবে খরচ! তাদেরই অনেকের খরচ যোগাতে হয় অশোককে। একবার মনে মনে দস্তুরমতো বিদ্রোহ জেগে উঠল তার, ভাবল সব ছেড়ে সাহিত্য-সাধনায় লেগে যায়। কিন্তু তাতেও মন সাড়া দিল না। চোখের সামনেই এমনি একটি আত্মত্যাগী বন্ধুকে দেখেছে সে! সাহিত্যের জন্যে বাড়িঘর সব ছেড়েছে—শুধু ছাড়েনি ধার করাটা। ছোকরার লেখার হাত ভালো, তার চেয়ে হাত আরো ভালো পরের টাকা আর জিনিসপত্র মেরে দেবার। অশোকেরই একটা সখের কলম বেমালুম লোপাট করে দিয়েছে। উপায় কী, বায়ু-ভক্ষণ করে তো আর সাহিত্য-চর্চা হয় না!

তার অবস্থা দেখেই হয়ে গেছে অশোকের। তিনদিন অত্যন্ত চটে থেকে, গোটা তিনেক আরো দুর্বোধ্য কবিতা লিখল সে। সে কবিতা এজ্‌রা পাউণ্ড্‌কেও চমকে দেবার মতো। ডাডায়িস্ট্‌দের উদ্দেশে কবিতাগুলো সে উৎসর্গ করল, তারপর সোজা হেঁটে গিয়ে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে একটা পরীক্ষা দিয়ে বসল।

ঝরঝরে ইংরেজী, ঝক্‌ঝকে মেধা, প্রচুর পড়াশোনা। অশোক পাস করল ভালো করেই। চাকরীও জুটল একটা। বাবা বিরূপ মুখে বললেন, শেষকালে পোস্ট্-অফিসে! কোনো ফিউচারই নেই। তবু লেগে থাক। ও-সব যাচ্ছেতাই পদ্য লেখা বন্ধ করে যদি মন দিয়ে একজামিনগুলো পাস করতে পারিস, তবে চাই কি একদিন পি. এম জি. হয়ে যাবি!

পি. এম জি!

অশোকের হাসি পেলো। বাবা কখনো হাল ছাড়েন না, তাঁর নজর সব সময়ে আকাশের দিকে। কিন্তু চাকরীতে ঢুকে তাকে কবিতা আপনিই ছাড়ল। কিছুদিন শিক্ষানবিশীর পরেই তাকে এক এক ধাক্কায় এমন এক একটি পোস্ট্-অফিসে পাঠাতে লাগল, যেখানে বোদ্‌লেইর তো দূরে থাক, সময় কাটাবার জন্যে একখানা চলনসই পত্রিকা পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। ডাকে সেখানে সাপ্তাহিক আর অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা আসে, বই যা আসে, তারা পঞ্জিকার পাতা থেকে সংগৃহীত উপন্যাস আর যৌনতত্ত্ব।

ভিজে সল্‌তের আগুন আর কতদিন জ্বলে? কিছুদিন চেষ্টা করে অশোক হাল

ছাড়ল। নিজে যা রোজগার করে, তা থেকে কিছু কিছু বই আগে কিনত—বাবা রিটায়ার করার পরে তা-ও আর হয়ে ওঠে না। হাজার প্রাতরুত্থানের অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও সে ভদ্রলোক কিন্তু আড়াইশো টাকার কেরানীগিরির ওপরে আর উঠতে পারেননি।

পড়া গেল—লেখা গেল। তারপর একদিন অশোক আবিষ্কার করল বাংলা কবিতার মোড় ফিরে গেছে। এমন একটা সুর তাতে এসেছে—যা তার চেনা নেই। অশোক তার সঙ্গে মানাতে পারল না মনকে—খাপ খাওয়াতে পারল না কলমকে। সুতরাং যথানিয়মে আরো অনেকের মতোই বাঙালী পাঠকের কাছে অশোকের স্বল্প-পরিচিত নাম চিরদিনের মতো মুছে গেল।

আগে অল্প-স্বল্প দুঃখ হত—এখন আর তা হয় না। নিজের লেখার কথা ভাবলে হাসিই পায় এখন। শুধু কখনো কখনো মনে হয়, কাজকর্মের ফাঁকে একটা উপন্যাস লিখে ফেললে মন্দ হয় না। এই ছাউনি-হিলকেই গল্পের পটভূমি করা যাক—কৌশিক ঘোষকে করা যাক তার নায়ক। কিন্তু তাও হয়ে ওঠে না। এতদিন ধরে অশোক এই সত্যকে নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করেছে যে, যারা বলে নির্জনতাই সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল, তারা মিথ্যে কথা বলে। নির্জনতা সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয় না—তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে, ডুবিয়ে দেয় একটা শিথিল অবসাদের ভেতরে। নাচ শুরু করতে হলে চাই অর্কেস্ট্রা, তারই তালে তালে দুলে উঠবে শরীর—ঘূর্ণি জাগবে রক্তে। তেমনি চারপাশের জীবনের দশটা বাদ্যযন্ত্রে যদি ঝঙ্কার ওঠে, তবেই মনের ভেতরে উদ্বোধিত হয়ে ওঠে সৃষ্টির নটলীলা। কিংবা আগে জীবনের তার-গুলোতে এসে বাইরের আঘাত লাগুক—তারপরেই গান বাজবে।

না—নির্জনতায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। হয়তো একমাত্র বিভূতিভূষণ লিখতে পারেন 'পথের পাঁচালী', কিন্তু ও-কাজ অশোকের নয়। ও-রকম শান্ত রসের কারবারে তার রুচি নেই—তার ঝড়ের ডাক চাই। অনেক চঞ্চল মনের ছোঁয়া না লাগলে তার মন সাড়া দেয় না।

তাই অশোক প্রায় পুরোপুরিই পোস্টমাস্টার। আগে নানা উন্নাসিকতাই ছিল—লোকের সঙ্গে মিশতেই পারত না। এখন প্রসন্ন ঔদার্য এসে গেছে। সকলের সঙ্গে সহজ হতে পারে, সকলকে সয়ে যায়। কানের কাছে অদ্ভুত ধরনের সাহিত্য-আলোচনা শুনেও তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় না। যে যা নিয়ে খুশি থাকতে চায় থাকুক—গায়ে পড়ে মানুষকে ঘা দিয়ে লাভ কী? আর দেশের এই সব নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির সাধারণ মানুষকে নিয়েই যখন তাকে দিন কাটাতে হবে, তখন কেন আর নিজের চারদিকে অসামান্যতার গণ্ডী টেনে রাখা!

আজও ভোরের আলোয় গায়ে একটা লম্বা কোট চাপিয়ে পোস্ট অফিসের সামনের রাস্তায় অশোক পায়চারী করছিল। দূরে পাহাড়ের মাথাগুলো লাল হয়ে উঠেছে, এদিকে পাইন বনের ওপরে একটুখানি ছায়া পড়েছে তার—যেন কালো মেঘের কোণায় রোদের রঙ। ও-দিকে একটা চা-বাগান নেমেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে—তার উপর কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। চা-বাগানটাকে দেখাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড মৌচাক, আর এক ঝাঁক মৌমাছির মতোই কুয়াশাটা চক্র দিয়ে ফিরছে তার ওপরে।

অশোকের মনে কবিতা গুন্‌গুন্ করতে লাগল। এখনো করে মধ্যে মধ্যে। লেখা ছেড়ে দিয়েছে—সম্পূর্ণ করে আসে না। ভেসে বেড়ায় টুকরো টুকরো হয়ে।

অশোক আওড়াতে লাগলো :

একটি প্রবালদ্বীপ কাল রাতে জন্ম নিলো দক্ষিণ সাগরে
হে সূর্য দিয়েছ তারে রক্তিম-চুম্বন—
সমুদ্র-বাসর থেকে যে-শঙ্খ শোনালো বার্তা তার
হে সূর্য আমার রক্তে অনিকেত সেই প্রেম দাও—

—নমস্কার !

চকিত হয়ে ফিরে তাকালো অশোক।

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে—প্রকাণ্ড ওভার-কোট তার গায়ে। ভাব দেখে মনে হয় যেন দক্ষিণ মেরুতে সীল মাছ শিকার করতে এসেছে। সঙ্গে বছর কুড়িকের একটি মেয়ে—তারও গায়ে ফিকে-নীল রঙের লম্বা কোট। মেয়েটির চশমার কাচে রোদের রক্তিম আভা পড়েছে—মুখে যেন আবির ছড়িয়ে রয়েছে একরাশ।

অশোক হেসে প্রতি-নমস্কার জানালো।

ছেলেটি বললে, আমরা—

অশোক বললে, জানি। বারো নম্বর বাংলোয় উঠেছেন আপনারা। ডক্টর চক্রবর্তীর বাড়িতে।

—ও। তা হলে—

—হাঁ, কালকে সন্ধ্যেবেলাতেই দেখা হল আপনাদের সঙ্গে। অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—অশোক হাসল : বাড়িটা ঠিকমতো খুঁজে পেয়েছিলেন তাহলে ?

—তা পেয়েছিলাম। আপনারা না থাকলে আরো কতক্ষণ যে ঘুরে মরতে হত কে জানে ? যা অন্ধকার আর জঙ্গল চারদিকে ! একবার তো ভাবছিলাম, দূর ছাই, গাড়ি ঘুরিয়ে শিলিগুড়িতেই ফিরে যাই আবার।

—আশা করি, অত ভীতিপ্রদ আর লাগছে না এখন ?—অশোক আবার হাসল। ছেলেটিকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি মেয়েটির মুখের ওপরে গিয়েই পড়ল। শ্যামবর্ণের দীর্ঘ

চেহারার মেয়ে, সুন্দরী না হলেও দীপ্তিমতী, চোখ দুটি উজ্জ্বল। অশোকের একবার মনে হল, চশমাজোড়া এই মেয়েটির চোখে একেবারেই যেন মানায়নি।

জবাব মেয়েটিই দিলে।

—না, সকালটাকে নেহাত মন্দ লাগছে না। এমন কি, বেশ ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

—তা হলে থাকবেন দিন কতক?

—সেটা নির্ভর করে এখানে যে রকম প্রতিবেশী পাওয়া যাবে, তার ওপর।

অশোক বললে, ওটা উভয়ত। আমাদের সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমরা কেউ সুজন না হলেও দুর্জন নই অন্তত। আমাদের সঙ্গে যাঁরা থাকতে এসেছেন, তাঁদের কথা আমরা এখনো কিছুই জানি না।

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করলে।

—তার মানে কি বলতে চান যে আমরা খারাপ লোক হলেও হতে পারি?

আবহাওয়াটা কেমন যেন বেসুরো হয়ে উঠতে চাইল। ছেলেটি একটা ছোট ধমক দিয়ে বললে, বুলু!

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে অশোক সবটা সামলে নিতে চাইল: না—না, উনি আমার কথাটা ঠিক বুঝেছেন। এখানে কোন চেঞ্জার এলে আমরা স্থানীয় যারা, তাদের টেস্ট করে দেখি। পরীক্ষায় যদি তাঁরা উতরে যান, তখনই তাঁদের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকি।

—সে পরীক্ষাটা কি রকম?—মেয়েটির মুখে তখনও ভ্রূকুটি ভেসে বেড়াচ্ছে।

—আমরা গিয়ে দল বেঁধে তাঁদের বাড়িতে হানা দিই। অর্থাৎ সে-বাড়িতে নিজেরাই নিজেদের নিমন্ত্রণ করি। যদি তাঁরা কিছুই না খাওয়ান, বুঝে নিই—দুর্জন; যদি শুধু এক কাপ চা খাইয়েই বিদেয় করেন—বুঝে নিই লোক সুবিধের নয়। যদি চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুট পাই—বুঝে নিই, চলনসই। আর যদি—

—আর যদি?—মেয়েটির মুখ হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠছিল এবার। পাইন বনের ওপরে সূর্য এবার সোনালি আলো ছড়িয়েছে—সে আলো মেয়েটির চোখে-মুখে এসেও পড়েছে। বুলু নামটি এই মুহূর্তে বড় ভালো লাগল অশোকের; ভারী সহজে—বড় অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করা যায়—চিত্রা-সুচিত্রার মতো হোঁচট খেতে হয় না।

অশোক বললে, বুলু দেবী, বাকীটা সহজেই অনুমান করতে পারেন। যদি দেখি, শুধু চা-বিস্কুটই নয়, তার সঙ্গে লুচি, ডিম আর আলুভাজা আসছে, তা হলে আমরা সরবরে বলতে থাকি, এমন চেঞ্জার ছাউনি-হিলে আর কোনোদিন আসেনি, কোনোদিন আসবেও না।

এইবারে তিনজনেই হেসে উঠল। চকিতে নির্মল আর প্রসন্ন হয়ে উঠল সকালটা।

ছেলেটি বললে, বেশ তো চলুন তা হলে আমাদের ওখানেই। পরীক্ষা হয়ে যাক।

অশোক বললে, উঁহু, আমি একা নই। এখানে আমরা সবাই মিলে ওটা করি—কাজেই সকলের সঙ্গেই হবে। তার আগে আপনাদের পরিচয়—

—ঠিক কথা, ওটা শুরুতেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। আমি অনুপম রায়চৌধুরী—কেমিস্টের কাজ করি। আর এ আমার বোন বুলা—এ বছর সিক্সথ্ ইয়ারে।

অশোক বললে, আর আমি অশোক মুখুজ্জে। আমার কাছে রোজ আপনাদের আসতে হবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আমি এখানকার পোস্ট মাস্টার।

—ওইটে বুঝি আপনার পোস্ট অফিস?

—ঠিক চিনেছেন। তবে ওর চেহারা দেখে করুণাবোধ করবেন না। আমার এখান থেকে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের পর্যন্ত বন্দোবস্ত আছে।

—সত্যি নাকি?—বুলা বললে, তবে তো ভালোই হল। দরকার হলে জলপাই-গুড়িতে ফোন করা যাবে।

—তা যাবে। কিন্তু এতদূর যখন এলেনই একবার পায়ের ধুলো দিন না আমার ওখানে।

অনুপমের আপত্তি ছিল না, একবার বুলার দিকে তাকালো সে। বুলা বললে, আপনার কাছে নিজেদের গরজেই তো আসতে হবে সব সময়। আজ থাক। আপনি বরং চলুন আমাদের বাংলোয়। চা খাব একসঙ্গে।

—সর্বনাশ! সকলকে বাদ দিয়ে? তা হলে এখানকার কেউ আমায় আস্তো রাখবে না। ওই দেখুন না—আর একজন এসে পড়ছেন।

এদিকের একটা ছোট পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে নামছিলেন শৈলেশ। পরনে লুঙ্গি—গায়ে আলোয়ান, পায়ে চটি জুতো, হাতে দাঁতন।

—শৈলেশদা!—অশোক ডাকল।

একবার এদিকে তাকিয়েই শৈলেশ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেই পথেই ফিরে যেতে যেতে বলে গেলেন, আসছি একটু পরে।

বুলা বললে, ওকি! উনি পালালেন কেন?

অশোক হাসছিল: লুঙ্গি পরে আলাপ করবেন একটি মহিলার সঙ্গে? সেই লজ্জা ঢাকবার জন্যেই ফিরে গেলেন।

অনুপম হেসে বললে, এখানেও এ-সব ফর্মালিটি আছে নাকি আপনাদের ?

—নিজেদের ভেতর কিছু নেই। এখানকার রোমে আমরা সবাই রোম্যান। তবে বাইরে থেকে কেউ এসে আমাদের একেবার বর্বর না ভেবে বসেন সে জন্যে একটু সাবধান থাকতে হয় বইকি।

কথা বলতে বলতে তিনজনেই এগিয়ে চলেছিল। প্রথম আলোয় ছাউনি-হিলকে সত্যিই আর খারাপ লাগছে না। অকুণ্ঠ উদার প্রকৃতি চারদিকে। ঘন নীল পাহাড় আর নিবিড় সবুজ অরণ্য। ঠিক মুখোমুখি দূরের একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় দু-টুকরো শাদা মেঘ যেন ঘুমিয়ে আছে—রোদের আলোয় উজ্জ্বল রেশমী রঙ ধরেছে তারা। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লাল রঙের বাংলোগুলো ছবির মতো সাজানো—বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপের মতো মনে হয় তাদের। পথের দু ধারে অজস্র পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। রাস্তার ধুলোর ওপর কালো-হলদে রঙের একদল চাতক পাখী ঝেড়ে ঝেড়ে ধূলিস্নান করছে।

অনুপম বললে, সত্যিই লাভ্‌লি জায়গা।

বুলা সায় দিলে, বাস্তবিক। সারা জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে এখানে।

অশোক বিব্রতভাবে হাসল: সে সারা জীবন সাত দিনের বেশি নয়। তার পরেই পালাতে চাইবেন।

বুলা বললে, নির্জনতা আমার ভালো লাগে।

অশোক বললে, কিছু মনে করবেন না, একটা উপমা দেব। সে ভালো-লাগাটা কি রকম জানেন ? দুবেলা যারা নিয়মিত ভালো জিনিস খায়, তাদের একদিন চাল-ছোলাভাজা খেয়ে মুখ বদলানোর মতো। কোনোটাই বেশিদিন বরদাস্ত হয় না—নির্জনতাও নয়, ছোলা-বাদামও না।

অনুপম বললে, খুব ক্ষেপে গেছেন মনে হচ্ছে।

—ক্ষেপিনি, আত্ম-দর্শন হয়েছে। বন-জঙ্গল সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে রোম্যান্টিক—যারা কখনো একটা সন্ধ্যাও জঙ্গলে কাটায়নি। যদি টেরাইয়ের কোনো ভয়াবহ ফরেস্টে একটা ছোট ডাকবাংলোয় একটিমাত্র রাত তাদের থাকতে হত, যদি বাইরে থেকে আসত হাতীর ডাক আর বাঘের গায়ের গন্ধ, তা হলে—

মাঝখান থেকে কথাটা কেড়ে নিলে বুলা: আমি গিয়ে সোজা হাতীর পিঠে চেপে বসতাম।

অশোক কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুলার তত্ত্বের দিকে মন ছিল না। একটু দূরেই একটা বুনো লতা থেকে একগুচ্ছ বেগুনী ফুল নিচে ঝুলে পড়েছে, বুলা সেদিকেই এগিয়ে গেল।

—কী চমৎকার ফুলগুলো!

অশোক সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, যাবেন না—যাবেন না!

বুলা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কেন, কী হয়েছে?

—এখানে ঘাসবনের ভেতরে জোঁকের উৎপাত।

—জোঁক! কী সর্বনাশ!—বুলা লাফিয়ে উঠল, সভয়ে তাকালো পায়ের দিকে: ধরেনি তো! জোঁককে আমি ভীষণ ভয় পাই।

অশোক হা-হা করে হেসে উঠল।

—দেখলেন তো? এখানে সারা জীবন থাকার মোহটা কী ভাবে প্রথমেই হোঁচট খেলো একটা?

বুলা বললে, জোঁক ভারী বিশ্রী জিনিস। মামার বাড়িতে একবার একটা ধরেছিল আমাকে। সেই থেকে জোঁক দেখলেই গা শিরশির করে আমার। অনেক আছে বুঝি এখানে?

—অঢেল্। একটু বর্ষার জল পড়লে তো আর কথাই নেই—চারদিক থেকে লিক্ লিক্ করে ওঠে।

—ও!—বুলা চুপ করে গেল।

অনুপম বললে, ভয়ানক দমে গেলি যে। জোঁকের ভয়ে একেবারেই মিইয়ে গেলি দেখছি।

বুলা বললে, মোটেই নয়। আমার ওই ফুলগুলো নিতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে।

অশোক বললে, তবে দাঁড়ান—আমি এনে দিচ্ছি।

বুলা বললে, আপনাকে জোঁকে ধরবে না?

অশোক হেসে বললে, না। ওরা আমাদের পোষা।

অশোক একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এল।

বুলা বললে, কী সুন্দর—কী মিষ্টি দেখতে!—মুখের কাছে ফুলগুলোকে এগিয়ে এনে বললে, কিন্তু কোনো গন্ধ নেই তো।

—ওটা পাহাড়ী ফুলের সাধারণ নিয়ম। ঠিক পাহাড়ের মতোই। বাইরেটা সহজেই দেখা যায়, কিন্তু ভেতরের খবর কিছুতেই মেলে না।

—তাই নাকি?—বুলা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সামনের বাঁক ঘুরে দেখা দিলেন কৌশিক ঘোষ। সার্টের ওপরে মোটা শাদা স্লিপ-ওভার, পরনে ফিকে ছাই-রঙের ট্রাউজার—হাতে একটা মোটা লাঠি। ছুটো ঠোঁটে চুরুটটা চেপে ধরে ধূমায়িত ছন্দে এগিয়ে আসছেন। এদের দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অশোক বললে, এইবার আমাদের ছাউনি-হিলের গ্রাণ্ড্ ওল্ড্ম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা—কৌশিকরঞ্জন ঘোষ—আমাদের দাদু। আমাদের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ সবকিছুর তত্ত্বাবধান উনিই করেন। আর এঁরা হচ্ছেন অনুপমবাবু আর বুলা দেবী—ভাই-বোন—বারো নম্বর বাংলোয় উঠেছেন।

অনুপম হেসে বললে, নমস্কার দাদু। এখন আমরা আপনারই অতিথি। আমাদের ভালো-মন্দের দিকেও কিছু কিছু নজর দিতে হবে আপনাকে।

একবারের জন্যে কৌশিক ঘোষের মুখের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া ভেসে গেল একটা। এই দাদু ডাকটা অনেক দিন ধরেই তিনি শুনেছেন—গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ম্যান কথাটাও এতদিন তাঁর খারাপ লাগেনি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল ঠিক এই সময়েই ও-কথাটা না বললেও যেন ক্ষতি ছিল না।

পরক্ষণেই মুখের ওপর প্রসন্নতা টেনে এনে কৌশিক বললেন, আমি আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।

বুলা বললে, সে তো সৌভাগ্য—চলুন। কিন্তু দাদু, আমাদের আর 'আপনি' বলে পর করে রাখা কেন? 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

দাদু! আর একবার ছোট্ট একটা কাঁটার খোঁচা খেলেন কৌশিক ঘোষ। তারপরেই সহজ হয়ে বললেন, বেশ—বেশ, তাই হবে।

মনের দিক থেকে কেমন নিরুৎসাহ বোধ করল অশোক। এতক্ষণ নেহাত মন্দ লাগছিল না—অনুপম সঙ্গে থাকতেও বুলার সঙ্গে যেন একটা ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তার। কিন্তু মাঝখানে এসে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে রসভঙ্গ করলেন কৌশিক।

অশোক বললে, তা হলে এবার আমি ফিরি।

অনুপম বললে, ফিরবেন কেন—আসুন না। ওই তো বাংলো দেখা যাচ্ছে আমাদের।

অশোক বললে, না—না থাক, আমার কাজ আছে।

বুলা হাসল: ওঃ, সেই—ভয়? কিন্তু এখন আর ভাবনা কি আপনার? সঙ্গে তো দাদুই রয়েছেন। দাদু একাই মেজরিটি—সুতরাং—

—কিন্তু আমার একটু কাজ আছে যে—

—কাজ আবার কী?—বুলা ভ্রূভঙ্গি করলে: আপনার পোস্ট অফিসের চেহারা তো দেখেই এসেছি। নিন—চলুন, পাঁচ মিনিট বসবেন।

অগত্যা। বুলার চোখের দিকে একবার চোখ পড়ল অশোকের: চলুন।

সত্যিই সামনে বারো নম্বর বাংলো। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে খানিকটা পাথর-বাঁধা পথ বাড়িটার গেটের দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা পাথুরে হলেও চওড়া —একখানা গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে তার ওপর দিয়ে। যুদ্ধের সময় এখানে বাস করতে এসে মনের মতো করে বাড়িখানাকে সাজিয়েছিলেন ডক্টর চক্রবর্তী। নানা রকম ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন, পুঁতে দিয়েছিলেন আপেল আর কমলালেবুর চারা। ফুলগাছগুলো কিছু কিছু টিকে আছে এখনো—বাঁচিয়ে রেখেছে কীপারটা। আপেল আর কমলালেবুর গাছ দুটো বেশ বড় হয়েছে এতদিনে। আপেল হয়, কিন্তু ভয়ঙ্কর টক—একমাত্র কীপারের সর্বভুক ছেলেটা ছাড়া আর কেউ দাঁত দিয়ে কাটতে পারে না—লেবুগুলো মিষ্টি। এখনো ফল ধরেনি—ফুলে ফুলে মনোরম হয়ে আছে।

তিনজনে যখন বাড়িতে এসে পৌঁছুলেন, তখন সামনের লনে, দু'পাশে ফুটন্ত মরশুমী ফুলের ভেতরে খানকয়েক বেতের চেয়ার পড়েছে। একটি প্রৌঢ়া আর একটি আধ-বয়েসী মহিলা সকালের মিষ্টি রোদে বসে আছেন সেখানে। মাঝ-বয়েসী মহিলাটির পাশেই মাটিতে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা উলের গুটি—কী যেন বুনে চলেছেন তিনি।

অনুপম পা দিয়েই ডাকল: মা—মাসীমা এঁরা দেখা করতে এসেছেন।

দুটি মহিলাই চকিত হয়ে উঠলেন—যিনি উল বুনছিলেন, তিনি ঘোমটাটাকে একটুখানি টেনে দিলেন মাথার ওপরে। প্রৌঢ়া বললেন, আসুন—আসুন।

অনুপম প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললে, আমার মা। ইনি মাসীমা। আর এঁরা হচ্ছেন কৌশিক ঘোষ—

বুলা বললে,—এখানকার দাদু। গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান।

কৌশিক হাসতে চেষ্টা করলেন। মেয়েটাও তো আচ্ছা! ওই শব্দ দুটোকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না!

অনুপম বললে, ঠিক কথা—উনি এখানকার দাদু। সকলের অভিভাবকই বলতে গেলে। আর ইনি অশোক মুখুজ্জে—পোস্ট্ মাস্টার।

অনুপমের মা বললেন, ভারী খুশি হয়েছি—আপনারা এসেছেন বলে। এ তো একেবারে নির্বান্ধব দেশ। আপনাদের ভরসাতেই থাকা। ও কি—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন।

কৌশিক শব্দ করে বসে পড়লেন। অশোক আসন নিলে সসঙ্কোচে।

বুলা বললে, শুধু ওঁদের বসালে তো হবে না মা, আমি ওঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করে এনেছি কিন্তু।

মা বললেন, এখানে আর নেমন্তন্ন! পাওয়াই বা যায় কী—খাওয়াবিই বা কী!

বুলা একবার তির্যক ভঙ্গিতে অশোকের দিকে তাকালো : কিন্তু তাই বলে শুধু চা খাইয়েই পার পাবে না মা। যে শুধু এক পেয়ালা চা খাওয়ায়, ওঁরা মনে করেন সে অত্যন্ত খারাপ লোক—ভবিষ্যতে তার ত্রিসীমাও মাড়ান না ওঁরা।

অশোক লজ্জিত হল : আমি বুঝি তাই বলেছি ?

—তাই বলেননি ?—বুলা হেসে উঠল : আপনার কথার এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ হওয়া তো সম্ভব নয় অশোকবাবু।

বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দিলে অনুপম : কী বাজে কথা আরম্ভ করলি বল্ তো ! চট্‌পট ভেতরে যা—ওঁদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে আয়।

বুলা চলে গেল।

একবার বুলা, আর একবার অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কৌশিক। অনেক দূর থেকে আসা বাঁশির সুরের মতো কী একটা যেন শুনতে পেলেন তিনি মুহূর্তের জন্যে। সেটা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তার অর্থটা কারো কাছে ধরা দেয়নি এখনো, অথচ—

কৌশিক ঘোষের মনে হল, আজ সকালে এখানে না এলেই তিনি ভালো করতেন।

অনুপমের মা বললেন, আমরা দুজনে এখানে বেশি দিন থাকব না, দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাব। থাকবে ছেলে-মেয়ে দুটো। আপনারাই দেখাশোনা করবেন।

কৌশিক একবার অশোকের দিকে তাকালেন। সূর্যের আলোয় অনেক বেশি যেন উজ্জ্বল দেখালো অশোকের মুখ। নাকি ওটা তাঁরই চোখের ভুল ?

অনুপম কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ ডাকল : দাদু ?

কৌশিক চমকে উঠলেন।

—কী বলছিলেন ?

—আবার বলছিলেন কেন ?—অনুপম হাসল : দাদু যখন একবার পাতিয়ে নিয়েছি, তখন সত্যি সত্যিই দাদু। আমাদের এবার থেকে নাম ধরেই ডাকবেন—ভয়ানক রাগ করবো নইলে।

জোর করেই অস্বস্তিভরা হাসি কৌশিক মুখের ওপরে টেনে আনলেন : আচ্ছা—আচ্ছা তাই হবে।

অনুপম বললে, আমি ভাবছিলাম, ইন্‌ডিজেনাস্ ড্রাগের কথা।

—কি রকম ?—অশোক আর কৌশিক উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন একসঙ্গেই।

—আমাদের দেশে অনেক দুর্লভ গাছপালা রয়েছে, যাদের নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন রিসার্চ হয়নি। যেমন ধরুন 'সর্পগন্ধা'—সবে আমাদের চোখ পড়েছে তার

ওপর। এ-রকম বহু রয়েছে এখনো। এগুলো নিয়ে গবেষণা করলে অনেক দুর্মূল্য জিনিস আবিষ্কার করা যেতে পারে। অথচ সম্রাট হিমালয়ের ভাণ্ডার আজ পর্যন্ত মানুষের একেবারে অচেনা। আমার ইচ্ছে, হিমালয়ান-হার্বস্ নিয়ে কিছু কাজ করি।

—সে তো চমৎকার কথা।—কৌশিক চকিত হয়ে উঠলেন।

অনুপম উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, সেইজন্যেই ছাউনি-হিলে এসেছি—নিছক বেড়াতে নয়। আর আমার বোন বুলাও এম এস্-সি. পড়ছে, ওরও বেশ কৌতুহল আছে এসবে। কিছু করতে পারা যাবে মনে করেন ?

এবার উৎসাহের পালা অশোকের।

—কেন যাবে না ? এই পাহাড়ীরাই কত জরি-বুটি শিকড়বাকড়ের সন্ধান রাখে। সব সময়েই কি আর ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটি করে ওরা ? কত জিনিস আছে—কত করবার আছে। লেগে পড়ুন—আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

এই কথাটা তিনিও বলতে পারতেন—ভাবলেন কৌশিক। কারণ সেই মুহূর্তেই দুটো খাবারের প্লেট হাতে করে বুলা এসে দাঁড়াল।

পাঁচ

বীর বাহাদুর সকাল সকাল ডাক এনেছে আজ।

বাসের আসল মালিক হলেন লামা সাহেব—এ অঞ্চলের ছোটখাটো জমিদার একজন। লোকটি তিব্বতী—বহুকাল এ-দেশে আছেন, তবু পুরোপুরি এ-দেশের সঙ্গে মিশতে পারেননি। জাতিতে বৌদ্ধ—অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। তাঁর পুজোর ঘরে অসংখ্য বৌদ্ধ-দেবদেবীর ছবি, সারি সারি পুঁথি আর বিচিত্র মূর্তিগুলোর সমাবেশ দেখলে মনে হয় যেন তিব্বতের কোনো বৌদ্ধমঠের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এটা।

শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক লামা সাহেব। কারো সঙ্গে উপযাচক হয়ে মেশেন না ; বিশাল তরী-তরকারী আর আপেলের বাগান, মৌমাছির চাষ আর চা-বাগানের কিছু শেয়ারের মধ্যেই তাঁর দিন কাটে। আশেপাশে এই যে চেঞ্জারেরা আসে যায়, তাদের কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। নিজের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ।

ছাউনি-হিল থেকে যে বাসখানা দার্জিলিঙে যায়, তিনিই তার স্বত্বাধিকারী। অশোক গিয়ে তাঁকে জানিয়েছিল, এভাবে খেয়ালখুশি মতো গাড়ি চালালে সরকারী পোস্ট্ অফিসের কাজ চলবে না।

শুনে, লামা কড়া হুকুম জারী করেছেন বীর বাহাদুরকে। বলে দিয়েছেন, যে করেই হোক সাড়ে চারটের মধ্যেই মেল নিয়ে পৌছুতে হবে ছাউনি-হিলে।

তাই আজ সকাল সকাল ডাক এসেছে।

কাল পরশু দুটো দিনই মেঘলা গেছে—সেই সঙ্গে চলেছে অল্প অল্প বৃষ্টি। যেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে কেঁদেছে ছাউনি-হিল। কিন্তু ভারী সুন্দর আজকের বিকেলটি। রোদের আলোয় বর্ষাধোয়া পাহাড় ঝিলমিল করছে।

যথানিয়মে প্রায় সবাই এসেছে ডাক নিতে। শুধু ডাক্তার অনুপস্থিত আজকে।

খবরের কাগজ খুলেই চ্যাটার্জী বললে, আবার ড্র করে বসেছে এরিয়ান্সের সঙ্গে। নাঃ—মোহনবাগানের আর কোনো চান্স্‌ই নেই। আমি আর ওদের সাপোর্ট করবো না।

সরোজ বললে, তবে কাকে সাপোর্ট করবে?

—মোহামেডান স্পোর্টিং।

—মোহামেডান স্পোর্টিং!

—কিম্বা কাস্টমস্‌। নইলে ডালহৌসি। নয়তো কুমারটুলী। বি-জি প্রেস—বেনিয়াটোলা যেটাই হোক। এ-বি-সি-ডি—কোনো ডিভিসনেই আপত্তি আমার নেই। মোদ্দা মোহনবাগান আর নয়—চ্যাটার্জীর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

—এটা বৈরাগ্যের প্রথম ধাপ চ্যাটার্জীদা!—সরোজের হাসি শোনা গেল।

শৈলেশ বললেন, সিনেমার কথা বলো হে চ্যাটার্জী—সিনেমার কথা বলো। জীবন নিয়ে যেখানে ফুটবল খেলা হয়, সেইখানেই তো আসল স্পোর্টস্‌ হে!

সরোজ বললে, যা বলেছ! সে খেলায় স্কোরার হচ্ছে মেয়েরা।

শৈলেশ দে বললেন, ঠিক ধরেছিস, তোর ব্রেন আছে দেখছি। আর গোল-কীপার কে?

—তাও কি বলতে হবে? ওটা হতভাগা পুরুষদের জন্যেই বরাদ্দ। গোল সামলাতে সামলাতে প্রাণান্ত—তবু কোন্‌ ফাঁকে দুটো-একটা যে ঢুকে যায় ঠাহরই পাওয়া যায় না।

অশোক ডাক কাটছিল। একখানা পেটমোটা খাম ছুঁড়ে দিলে সরোজের দিকে।

—নে হতভাগা, তোর গোল সাম্‌লা। বৌয়ের চিঠি এসেছে।

শৈলেশ মিইয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ। মুখে কিছু বললেন না, কাতর দৃষ্টিতে ডাকের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইলেন। না—আজও কিছু নেই তাঁর। অফিসের গোটা দুই খাম এসেছে—তাতে কী আছে না খুলেই অনুমান করা চলে।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আমি যাই—আমার কাজ আছে।

—কী হল শৈলেশদা? এমন সাতসকালে ফেরার তাড়া কেন?

—একটা জরুরি হাতের কাজ ফেলে এসেছি—বলেই শৈলেশ বেরিয়ে গেলেন। সরোজের ওই পেটমোটা খামটা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। পর পর দুখানা চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু একখানারও জবাব এল না স্ত্রীর কাছ থেকে। বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছেন শৈলেশ, অথচ বনে-জঙ্গলে চাকরী করেন তিনি—তাঁর চেহারা একটা ভালুকের মতো! এ উপেক্ষা তাঁর পাওনা।

ছুটি পাওয়া যাবে আজ হোক, কাল হোক। কিন্তু ছুটি নিয়েই বা লাভ কী? যে-স্ত্রীর মনে তিনি এতটুকুও জায়গা পাননি, তার কাছে গিয়ে মনের যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না শৈলেশের। তার চেয়ে এই ভালো তাঁর পক্ষে। এই ভালো, ছাউনি-হিলের নির্বাসন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে জড়িয়ে ধরুক একটা বিষধর সাপ—বসিয়ে দিক ছোবল; নইলে ভালুক এসে ঝাপটে ধরুক করাল আলিঙ্গনে। কিংবা যা হওয়ার একটা কিছু হয়ে যাক। এ-ভাবে আর বাঁচতে উৎসাহ হয় না শৈলেশের।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে জল এল।

চ্যাটার্জী এখানে নিজের স্ত্রী আর ছেলেপুলে নিয়ে থাকে—তার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। এবার ক্ষুণ্ণচিত্তে সে কুন্তি আর বকসিংয়ের বিবরণ পড়তে লাগল।

দুখানি চিঠি আছে বারো নম্বর বাংলোর—সর্ট করতে করতে অশোক দেখতে পেলো। একখানা সাহেব কোম্পানির গম্ভীর চেহারার খাম—অনুপমের নামে—নিশ্চয় ওতে ওর হার্বাল্ রিসার্চ সম্পর্কে খবরাখবর আছে কোনো। এর মধ্যেই পাহাড় থেকে লতাপাতা নিয়ে কী সব কাজ আরম্ভ করেছে অনুপম। আর একখানায় বুলুর নাম—মেয়েলি হাতের টান স্পষ্টই বোঝা গেল। ওর কোনো বান্ধবীর লেখা খুব সম্ভব।

বারান্দায় গিয়ে চিঠিটা পড়ে ফিরে এল সরোজ। মুখ উদ্ভাসিত।

কেমন একটা সংকোচে অশোক বারো নম্বরের চিঠি দুটো একপাশে সরিয়ে রাখল, তারপর নিজের কুণ্ঠা চাপা দেওয়ার জন্যে সম্ভাষণ করলে সরোজকেই।

—কি রে, খুব যে খুশি দেখছি! ব্যাপার কী?

—ব্যাপার কিছু নয়—পুরো আট পাতা প্রেমপত্র পড়বার পরিতৃপ্তি মুখে এঁকে সরোজ বললে, নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু তুমি কি বারো নম্বরের চিঠি নিয়ে ধ্যান করছ অশোকদা?

মাত্র সাত-আটটা দিন কেটেছে অনুপমরা আসার পরে। আর এর ভেতরে অশোককে কয়েকবার বারো নম্বর বাংলোয় যেতে হয়েছে—বেড়াতে হয়েছে বুলাদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা থেকে এর মধ্যেই একটা অর্থ তৈরী হয়ে গেছে—এটা অশোক

কল্পনাই করতে পারেনি।

অশোক চমকে উঠল, লাল হয়ে গেল মুখ : কী বলছিস স্টুপিড ?

—আমি কিছুই বলছি না অশোকদা—একটা মিটিমিটি হাসি সরোজের মুখে : তবে অনুমান করছি।

—কিসের অনুমান ?

—একটা ভালো ফীস্টের।—চ্যাটার্জি বেরিয়ে গেছে দেখে সরোজ বলে চলল : সত্যি বলছি অশোকদা—অনেকদিন একটা রোমান্স-টোমান্স ঘটছে না দেখে মনটা ভারী মিইয়ে গিয়েছিল। আশা হচ্ছে, তুমি একটা জমিয়ে তুলছ। তা তোমার রুচিটা মন্দ নয় অশোকদা—বুলা মেয়ে হিসেবে ভালোই। একটু বেশী বকবক করে এই যা—তা সে ওদের জাতীয় চরিত্র। যাই হোক—আমরা সমবেত প্রার্থনা করছি এই বলে যে—

সরোজের কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অশোক—বুকের ভেতরে দপ দপ করছিল হৃৎপিণ্ড। আশ্চর্য, কত সহজে মানুষ সমাধান করে নেয়—ব্যাখ্যা করে বসে কত অবলীলাক্রমে! আর সঙ্গে সঙ্গেই রসিকতা তৈরী—মুখে আর কিছু আটকায় না। দুইয়ের সঙ্গে দুই মেলাবার কি অসাধারণ ক্ষমতা!

কিন্তু সরোজ যখন প্রার্থনা পর্যন্ত পৌঁছুল, তখন আর থাকতে পারা গেল না। সক্রোধে একটা খালি মেল-ব্যাগ বাগিয়ে তুলল মাথার ওপর।

—এই স্টুপিড্—চুপ কর্। ছিঃ—ছিঃ—বাইরের লোক—ক'দিনের জন্যে এখানে এসেছেন, আমরা ওঁদের নিয়ে এই রকম নোংরা ডিস্কাশন করি জানলে কী ভাববেন বল্ তো ?

—নোংরা কিসে হল ? রোমান্সই তো জীবনের আসল রস অশোকদা। যখন তার এমন একটা সুযোগ এসেই গেছে তখন তা ছেড়ে দেবেই বা কেন ?

—তুই ভারী ভাল্গার হচ্ছিস সরোজ। তোকে একটা থাপ্পড় দেওয়া দরকার।

—কিন্তু তুমিও বড্ড পিউরিটান হয়ে যাচ্ছ অশোকদা। এ-সব রোগ আগে তোমার ছিল না।

অশোক হাসল : পিউরিটান নয়—অন্য জিনিস।

—সে কি রকম ?

—"Un lien saccage!"

—ও আবার কী ?—সরোজ হাঁ করল।

—ফ্রেঞ্চ্। ওর মানে হল একটি বিধ্বস্ত ভূমি।

—কী বিধ্বস্ত ভূমি ?

—আমার হৃদয়। ওখানে আর কোন রোমান্সের জায়গা নেই।

সরোজ হেসে উঠল: তুমি এককালে কবিতা লিখতে অশোকদা—আজও রোগ তোমার কাটেনি। কবিরা নিজের হৃদয়কে মরুভূমি বলেই আরাম পায়। তারা বার বার ডেকে বলতে থাকে, ওগো সুন্দরীরা, তোমরা কেউ এসো না আমার কাছে, আমি শূন্য—আমি শ্মশান! কিন্তু যেই একটি বেদুইন কন্যা সেই মরুভূমিতে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে ওঠে: এসো—এসো, তুমিই আমার মানসী—তোমার জন্যেই এতকাল আকুল প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি।

অশোক বললে, চুপ কর্‌ ইডিয়ট, নিজের কাজে যা। দেখছি বাইরে থেকে কোনো ভদ্রলোকের তোদের এখানে আসাই উচিত নয়। একদম বুনো হয়ে গেছিস তোরা। ওসব বাজে কথা থাক। দাদুর খবর কি রে? দিন তিনেক যে দেখছি না।

সরোজ বললে, দাদুর মেয়ে এসেছে যে পরশু। খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে বোধ হয়। দাদু আবার যে রকম ভোজনবিলাসী—

—কে এসেছে—রুচিরা?

—হাঁ—হাঁ, সেই তালধ্বজ!

—ছিঃ—ছিঃ সরোজ।

আমার স্পষ্ট কথা অশোকদা। দাদুর চেহারাটা তো বয়েসকালে ভালোই ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা এমন কদাকার হল কী করে? যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, তেমনি উঁচু উঁচু দাঁত। অত ফর্সা রঙ বলে আরো খারাপ দেখায়—নাম দিতে ইচ্ছে করে: মেম পেত্নী!

—থাম্‌ বর্বর! নিজের বৌ ছাড়া কাউকে বুঝি চোখে লাগে না?

সরোজ বললে, নিজে কবি হয়ে এ-কথা বললে অশোকদা! তুমি এটা বিলক্ষণ জানো, বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোনো মেয়েকে অপ্সরী বলে ভ্রম হয়। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে—রুচিরা সেই সীমার বাইরে। নাম শুনলে যেমন লোভ হয়, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি দ্বিগুণ অরুচি জন্মে যায়।

—কী জ্বালাতনে পড়লাম বল্‌ তো! পালা বলছি সরোজ—পালা এখান থেকে— অশোক মেল ব্যাগ তুলে সত্যিই তাড়া করল এবার।

সরোজ পালালো।

কিছুক্ষণ একা চুপ করে বসে রইল অশোক। বাস্তবিক, বুলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এমনি স্তরেই কি পেঁাছেছে যে তা নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা শুরু করে দেওয়া যায়? ভাবতেই নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হল তার। প্রথমত বুলাকে নেহাত মন্দ লাগে না বলেই প্রবল বেগে ভালো লাগতে হবে, এতটা দুর্বল মন নয় অশোকের।

দ্বিতীয় কথা হল, বুলার কাছে এর বেশি এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না কখনো—কারণ দুজনে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের জীব। সব শেষ কথা হল—অকারণ পুলকে রোমান্স তৈরি করবার মতো উৎসাহ কোনোদিনই অশোকের নেই—এই বনে বাস করেও এখনো সে অতখানি বুনো হতে পারেনি। পুরুষে মেয়েতে একটুখানি সহজ সম্পর্ক দেখলেই এরা যে কী ভাবে তার একটা অর্থ খুঁজে বের করে—সেটা ভাবতেও খারাপ লাগে।

তবু—তবু—সব কথার ওপরেও আর একটা কি যেন কথা অশোকের মনের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। একরাশ ছায়া—একরাশ কুয়াশা। সরোজের কথায় তার রাগ হচ্ছে, কিন্তু খুব খারাপ তো লাগছে না। একটা মিষ্টি আমেজের মতোই আস্বাদন করতে ইচ্ছে হচ্ছে বারবার। নাঃ—এসব ভালো কথা নয়।

একবার ভেবেছিল, নিজের হাতেই আজ বারো নম্বর বাংলোর চিঠি দুটো দিয়ে আসবে—যেমন আরো কয়েকবারই দিয়ে এসেছে। কিন্তু কেমন ভয় পেয়ে গেল আজকে। বাইরে একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে—ঘরের ভিতরে নামছে অন্ধকার। কাঞ্ছা একটা লণ্ঠন জেলে এনেছিল, সেটাকে কমিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে রইল অশোক।

ডাক নিতে পোস্ট্ অফিসের দিকেই আসছিল অনুপম। সারাটা দিন হিমালয়ের গাছপালা সম্পর্কে বই পড়ে কাটিয়েছে সে—বুলার তাড়াতে উঠে পড়তে হল।

অনুপম অবশ্য বলেছিল, আপনারা সবাই মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করবেন—নতুন জায়গায় আমরা একেবারে একা—এক আধটু সঙ্গ দেবেন আমাদের—

কিন্তু সে নিছক বলবার জন্যেই বলা। নইলে একা থাকতেই ভালো লাগে অনুপমের—মনের দিক থেকে তার সঙ্গীর প্রতি বিশেষ কোনো প্রলোভন নেই। ছাউনি-হিলের মানুষগুলোও তা বুঝেছে। দেখা হলে হৃদ্যতা রাখে, কিন্তু গায়ে পড়ে উপদ্রব করে না কেউ। হঠাৎ গিয়ে পড়লে সে এমন বিব্রতভাবে মোটা মোটা বইগুলো বন্ধ করে ফেলে যে দস্তুরমতো মায়া হয়।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই বেরিয়েছিল অনুপম। বেশ একটা কৌতূহলজনক অধ্যায় সে পড়ছিল, সেখান থেকে এভাবে উঠে আসবার কিছুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না।

অন্যমনস্কভাবে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা লতা নয় ? পাহাড়ের ঢালুতে একটা ঝর্ণার ওপরে ঝালরের মতো দুলছে সেটা। খুব ইন্টারেস্টিং চেহারা। ওই রকম কী একটা লতার সম্বন্ধেই কি এক্ষুণি সে পড়ছিল না ?

অনুপম লতাটা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করল।

ঠিক হাতের কাছে নয়, একটু নিচে নামতে হবে। ঝর্ণার পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে সন্তর্পণে নামবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু পাথরগুলো শ্যাওলা ধরা—পা পিছলে যেতে চাইছে বারবার!

—সর্বনাশ—করছেন কি!

অনুপম চমকে পা তুলে নিলে। নির্জন পথে যেন ভূতুড়ে গলা শুনল একটা।

—শুনছেন, নামবেন না ওখানে। পাথরগুলো ভিজে—তার ওপর আলগা হয়ে আছে। যদি একবার একটা সরে যায়, তা হলে দেড়শো ফুট নিচে খাদে গিয়ে পড়বেন।

ভূতুড়ে আওয়াজ নয়—মানুষেরই স্বর। একটি মেয়ের গলা।

অনুপম দেখতে পেলো এবার। পাশেই শ্যামলতা আর শানাই ফুলে ছাওয়া ছোট একটা টিলা একটা টেবিলের মতো উঁচু হয়ে আছে। সেই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। অদ্ভুত রোগা, অদ্ভুত ফর্সা, অদ্ভুত লম্বা। তার সারা শরীর বিকেলের সোনালী আলোয় একটা আশ্চর্য রঙ ধরেছে—মনে হচ্ছে যেন সোনার পাত দিয়ে সে গড়া। পরনের লাল শাড়িটা চুনীর মতো জ্বলজ্বল করছে তার। হাতে তুলি, সামনে ইজেলের ওপর ক্যানভাস—মেয়েটি ছবি আঁকছিল।

যেন চোখকে বিশ্বাস করা যায় না—এমনিভাবে অনুপম দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেয়েটি হেসে বললে, আপনি বারো নম্বর বাংলোয় থাকেন—তাই নয়?

অনুপম আশ্চর্য হয়ে বললে, আপনি—

—আমার বাবাকে আপনারা চেনেন। তাঁর নাম কৌশিক ঘোষ।

—তা হলে আপনি—

—রুচিরা। রুচি বলেই ডাকতে পারেন আমাকে।

রুচি এবার আঁকার সরঞ্জামগুলো একটা ঝুলিতে ভরে ফেলল। তারপর ছবিসুদ্ধ ইজেলটাকে তুলে নিয়ে বললে, কী খুঁজছিলেন ওখানে?

অনুপম বললে, একটা লতা।

—লতা! কী করবেন?

অনুপম লজ্জিত হয়ে বললে, একটু কাজ আছে।

রুচি তখন টিলা থেকে নেমে এসেছে। অত্যন্ত সহজভাবে বললে, তা হলে এগুলো একটু ধরুন—আমি এনে দিচ্ছি।

—আপনি পারবেন কেন? এক্ষুণি তো বলছিলেন ভিজে পাথর, পা পিছলে যেতে পারে—

—এখানকার পাহাড়ের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের পরিচয়—উঁচু-উঁচু দাঁত বের করে রুচি হাসল : আমরা ওঠা-নামা করতে জানি। বলুন না—কী আপনার দরকার।

অনুপম আরো লজ্জিত হল : এখন থাক, পরে হলেও চলবে। এমন বিশেষ কিছু তাড়া নেই। কিন্তু—ইজেলের দিকে তাকিয়ে অনুপম বললে, বেশ তো ছবি আঁকেন আপনি। ওটা কী করছিলেন ?

—একটা ল্যাণ্ড্স্কেপ্। আমি কলকাতায় আর্টস্কুলে পড়ছি কিনা।

দুজনে তখন চলতে আরম্ভ করেছে। অনুপম বললে, আর্টিস্ট্দের আমার ভারী হিংসে হয়।

—কেন বলুন তো ?—শাদা কোটরের ভেতর থেকে রুচির ম্লান চোখ চকচক করে উঠলো।

—ড্রয়িংয়ের হাত ভারী খারাপ আমার। একটা বুন্সেনস্ বার্ণার পর্যন্ত ঠিক করে আঁকতে পারিনি কোনো দিন। ঠিক পান্তুয়ার মতো হয়ে যেত দেখতে।

রুচি উচ্ছ্বলিত হয়ে হেসে উঠল।

মেয়েটার উঁচু উঁচু দাঁত—হাসিটা একটু কর্কশও বটে। তবু বিকেলের এই সোনালী আলোয়—সম্পূর্ণ নির্জন এই পথে—শ্যাম লতা, শানাই ফুল আর গোটা কয়েক বড় বড় গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে—বেলাশেষের পাখির ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে-হাসি অনুপমের খারাপ লাগল না। মেয়েটির শরীরের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য আর পরনের লাল শাড়িটা কেমন আলাদা ব্যক্তিত্বের মতো মনে হল অনুপমের।

খানিক দূর এগিয়েই মেয়েটি থামল। বাঁ দিকে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ছোট একটা পায়ে-চলা পথ দেখিয়ে বললে, আসুন না।

—এই জঙ্গলের মধ্যে ! কোথায় ?—অনুপম চমকে উঠল।

—জঙ্গলে নয়—আমাদের বাড়িতে।

—কিন্তু ওটা তো আপনাদের বাড়ির রাস্তা নয়।

—শর্ট কাট। পাহাড়-বনে আমরা থাকি—অনেক রকম সোজা পথের খবর রাখতে হয় আমাদের। চলুন না একবার—বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অনুপম।

—আজ থাক।

রুচি বললে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এই জংলা পথে একা পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমাকে ? বেশ তো !

—আমি না এলে তো আপনি একাই যেতেন।

—তা যেতাম। কিন্তু যখন আপনি এসেই পড়েছেন, তখন আর সুযোগ ছাড়ব

কেন? আসুন না।

—তবে চলুন।—অনুপমের স্বর বিপন্ন শোনালো।

—শুধু নিজের জন্যেই আসতে বলছি তা নয়।—রুচির দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল: দুদিন থেকে বাবার শরীরটা ভালো নেই—সর্দিজ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। বেরুতেও পারেন না—একা একা বসে থাকতেও ওঁর ভালো লাগছে না। আমাকে অবশ্য জোর করেই বাইরে পাঠালেন, বললেন, কেন ঘরে বসে থাকবি—একটু ঘুরে আয়। তবে আপনারা কেউ ওঁর কাছে গেলে সত্যিই ভারি খুশি হবেন।

—দাদুর জ্বর হয়েছে? জানতাম না তো!—অনুপম রুচির সঙ্গে বাঁ দিকের পায়ে-চলা পথটা ধরল: তবে চলুন, একবার দেখা করেই আসি।

রুচির রূপ নেই—রুচি সুন্দরী নয়। তাই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েও কোনো কুণ্ঠা আসে না—ট্রেনের সহযাত্রীর মতোই স্বচ্ছন্দে আলাপ করা চলে। সে পুরুষ না মেয়ে এ কথা পর্যন্ত মনে রাখবার দরকার হয় না।

পথের দুদিকেই ঘন পাইনের বন। এত নিবিড় যে সূর্যের আলো পর্যন্ত সহজে আসতে পায় না। নিচের মাটি থেকে গাছের গুঁড়িগুলো পর্যন্ত ভিজে স্যাঁতসেঁতে—গাছের গায়ে সবুজ শ্যাওলার জট ঝুলছে, যেন কোন্ আদিম যুগের জটা বুড়ীর বন। অনুপমের গা ছমছম করে উঠল।

রুচি বললে, এই জঙ্গলে ভালুক আসে।

অনুপম থমকে গেল: বলেন কি!

—ভয় নেই, এখন নয়। তারা আসবে ভুট্টা পাকবার সময়।

—মানুষকে কিছু বলে না?

—পারতপক্ষে নয়। মানুষ ওদের যতটা ভয় পায়, মানুষকে ওরা ভয় পায় তার চাইতে ঢের বেশি।

অনুপম একটা নিঃশ্বাস ফেলল: ভরসা হচ্ছে না।

রুচি বললে, আমিই একবার দেখেছি একটা। কালো রঙ—গলায় শাদা কলার—চেহারাটা বেশ। দেখে ভারী ভালো লাগল।

—ভালো লাগল!—অনুপম শিউরে উঠল: তেড়ে এল না?

—না। বেশ মন দিয়ে ভুট্টা খাচ্ছিল তখন। আমাকে আক্রমণ করার চাইতে খাওয়াটাই ওর বেশি ভালো লাগছিল নিশ্চয়।

অনুপম জবাব দিল না। শুধু ত্রস্ত দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলে আশেপাশে। কালো কালো গাছের গুঁড়ি—গায়ে সবুজ শ্যাওলার আভরণ। চারদিকে খাপলা অন্ধকার—মাথার ওপর নাগশিশুর মতো কতগুলো লতানো অর্কিড্ দুলছে। জটা বুড়ীর

বনই বটে।

রুচির কথায় সে চকিত হয়ে উঠল।

রুচি বললে, ওই দেখুন বাংলো—এসে পড়েছি। কত সোজা রাস্তা—বলুন তো!

পোস্ট্ অফিসে যাবার আগে পুল-ওভারের ওপর কোট পরছিল ডাক্তার। এমন সময় বাংলোর বারান্দা থেকে ক্যাপ্টেনের ডাক শোনা শোনা গেল: ডাক্তার, ডাক্তার!

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললে, ব্যাপার কী? হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছ কেন?

—কথা আছে ডাক্তার।—ক্যাপ্টেনের গলার আওয়াজ করুণ শোনাল।

ডাক্তার তাকিয়ে দেখল। ক্যাপ্টেনের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। মুখে কতগুলো এলোমেলো কালো কালো রেখা, বয়েসের ছাপ নয়, অমিতাচারের চিহ্ন। এককালে শক্তিমান পুরুষ ছিল—এখন ঘুণ ধরেছে। অতিরিক্ত নেশা করে—চোখে ঘোলা লাল্চে রঙ—দাঁতগুলোয় হলুদ রঙের পাতলা আস্তর পড়ে গেছে। মোটা ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে না—খুব সম্ভব স্নায়ুর দুর্বলতার লক্ষণ।

যুদ্ধের উচ্ছিষ্ট ক্যাপ্টেন। একটা পোড়া তুবড়ীর খোলস। পেনসনের সামান্য কিছু টাকা পায়—সেটা যায় মদের পেছনেই। দার্জিলিং থেকে এক-আধটা সচিত্র বিলাতী পত্রিকা কিনে আনে—সব সময়ে বগলে থাকে সেগুলো। ক্যাপ্টেন ইংরেজী পড়তে পারে না বললেই হয়, তবু, ওর একটা সঙ্গে রাখা চাই। সে যে একদা ক্যাপ্টেন ছিল, সে যে এখানকার সাধারণ নেপালীদের চাইতে অনেকখানি বিশিষ্ট—ওই ইংরাজী পত্রিকাটাই যেন সে স্বাক্ষর বহন করে।

জীর্ণ আর্মি ওভারকোটের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন। টলছিল অল্প অল্প।

—আবার ড্রিঙ্ক্ করে এসেছ খানিকটা?—রাজনীতি করা পিউরিটান ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করল।

—জাস্ট এ সিপ ডক্—জাস্ট এ সিপ! ক্যাপ্টেন যুদ্ধফেরত লোক, তাই ডক্টর বলে না, সামরিক পরিভাষায় বলে: ডক্।

—জাস্ট এ সিপ? এর পরে যখন লিভার ফেটে যাবে, টের পাবে তখন।

ক্যাপ্টেন মাতালের হাসি হেসে উঠল: তখন আর টের পাব কি ডক্—সব টের পাওয়ার বাইরে চলে যাব যে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই অ্যাম ওয়েটিং ফর। নাও—চলো এখন—

—কোথায় যেতে হবে?

—তোমার পেশেণ্ট আছে।

—পেশেণ্ট ! কে ?

—মাই সিস্টার ! মানে আমার বোন।

—তোমার বোন ?—ডাক্তার আশ্চর্য হল : এত দিন তো জানতাম তোমার তিন চুলোয় কেউ নেই। এর মধ্যে আবার একটা বোন জোটালে কোত্থেকে ?

—ইট ইজ এ স্যাড স্টোরি ডক্—ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল : সে অনেক কথা। পরে সব তোমায় বলব।

—আচ্ছা, চলো তা হলে। পোস্ট অফিসটা ঘুরে—

—না না, পোস্ট অফিস নয়।—ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে উঠল : ভারী রেস্টলেস্ হয়ে পড়েছে। তুমি একবার গেলে হয়তো খানিক ভরসা পাবে !

—জ্বালালে !—বিরক্ত মুখে ডাক্তার বললে, কী হয়েছে তোমার বোনের ?

—গেলেই বুঝতে পারবে। চলোই না—

ক্যাপ্টেনকে ঠেকাবার জো নেই—আরো বিশেষ করে যখন মাতাল হয়ে এসেছে। ঘরে চাবি দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। ভাবল পাঁচ মিনিটেই সেরে আসবে কাজটা।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দুজনে পাহাড়ী বস্তির দিকে নামতে লাগল। ছাউনি-হিলের আর এক রূপ এখানে। ঝকঝকে বাংলো নয়—ফুলগাছের বাহার নয়—লতানে গোলাপের ঝাড় গেটগুলোকে আলো করে রাখেনি। বাংলোর কীপার, পথের কুলি, ছোট দোকানদার আর দশ রকম সাধারণ মানুষের উপনিবেশ। এরা ছাউনি-হিলের খিড়কির বাসিন্দা।

গায়ে গায়ে দারিদ্র্য-জীর্ণ বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তারই ভেতর ক্যাপ্টেনের আস্তানা। ক্যাপ্টেন নিজের মর্যাদার কথা ভেবে বাড়িটাকে একটু বিশিষ্ট চেহারা দিতেই চেষ্টা করেছে। বাইরের বারান্দায় কাঠের রেলিং—তাতে শাদা রঙ। ঘরের দরজায় সস্তা ছিটের পর্দা, দুখানা চেয়ার, একটা টেবিল—এদিক-ওদিক স্বল্পাবৃতা মেম-সাহেবদের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার।

বারান্দায় ডাক্তারকে বসিয়ে ক্যাপ্টেন ভেতরে গেল। একটু পরেই বললে, এসো।

দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাম্বিসের একখানা খাটের ওপর মোটা একটা ভুটিয়া কম্বল গায়ে চাপিয়ে, আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে তার পেশেন্ট। ডাক্তার যখন ঢুকল, তখন মুখে একটা কালো রুমাল চেপে ধরে সে কাশছিল।

চক্ষের পলকেই ডাক্তার বুঝতে পারল সব। ওই দৃষ্টি—অন্ধকার চোখে অস্বস্তি

উজ্জ্বলতা, ওই রকম মুখের চেহারা আর ওই কাশির আওয়াজ—এদের একটি মাত্র অর্থই আছে!

যক্ষ্মা!

ক্যাপ্টেন বললে, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এসো।

ক্যাপ্টেনের বোন রুমালে মুখটা মুছে বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল। হাত তুলে নমস্কার করে বললে, আসুন ডাক্তারবাবু। বসুন এই চেয়ারে।

পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। একটু পাহাড়ী টান নেই।

দূরত্ব বাঁচিয়ে চেয়ার টেনে বসল ডাক্তার। সম্পূর্ণ অনাবশ্যক জেনেও প্রশ্ন করল: কী হয়েছে আপনার?

মেয়েটি হাসল: বুঝতেই তো পারছেন। দাদাকে বললাম, মিথ্যে আপনাকে বিরক্ত করে কোনো লাভ নেই, তবু ডেকে আনল—কথা শুনল না।

ক্যাপ্টেন বললে, আঃ, সাইলি!

সাইলি বললে, কেন চেপে রাখতে চাইছ ভাই? ডাক্তারের চোখকে কি আর ফাঁকি দিতে পারবে? কী বলেন ডাক্তারবাবু—আমাকে দেখেই কি বুঝতে পারেননি আপনি?

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না, আশ্চর্য চোখ মেলে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। নেপালী মেয়ে—তবু কী করে চেহারায় যেন সমতলের ধাঁচ এসে পড়েছে। চোখা নাক—টানা টানা বড় বড় চোখ—লম্বাটে মুখের গড়ন। বাঙালী না হোক—আসামী মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায় নিশ্চয়। সবচেয়ে বড় কথা—মেয়েটি এক সময় রূপসীও ছিল। আজকের ভাঙা কাঠামোর দিকে তাকিয়েও সে রূপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। গায়ের শাড়িটা বাঙালী মেয়ের ধরনে পরা, মাথায় কাঁপানো চুল—আর আশ্চর্য, এর মধ্যেও কপালে কুঙ্কুমের টিপ পরতে সে ভোলেনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বললে, অসুখের ব্যাপারটা ডাক্তারকে ভাবতে দেওয়াই ভালো, ও নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব রোগীর নয়। কতদিন ভুগছেন এ রকম?

—প্রায় দেড় বছর। তবে আর বেশিদিন নেই বলেই গ্রামে ফিরে এসেছি।—সাইলি হাসল। সে-হাসিতে ক্ষোভ-দুঃখ কিছুই নেই—একটা নিশ্চিন্ত নির্বেদ ছড়ানো।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করল।

—এ-সব কথা বলবার সময় এখনো আসেনি। তাছাড়া আপনি যা ভাবছেন তা নাও হতে পারে। প্লুরিসিতেও এ-রকম হয়।

—প্লুরিসি!—সাইলির ঠোঁটে একবার কৌতুকের হাসি দেখা দিল। সান্ত্বনাটা এমনি ছেলেমানুষি যে, বলে যেন নিজেই লজ্জা পেল ডাক্তার।

—তবে হাতটা দেখুন—যেন কৌতুকচ্ছলেই সাইলি হাত বাড়িয়ে দিলে। সেই মুহূর্তেই ডাক্তার অনুভব করল ভারী সুন্দর হাতখানা, মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও এখনো আশ্চর্য নিটোল! লাল কাচের চুড়ি রক্তের রেখার মতো দেখালো।

কিন্তু সবে তো ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে মেয়েটি। হঠাৎ ভারী বেদনা বোধ হল ডাক্তারের। এত তাড়াতাড়ি মরে যাবে—এত তাড়াতাড়ি?

হাতটা একবার ছুঁয়েই ছেড়ে দিল ডাক্তার। দপ দপ করছে চঞ্চল নাড়ী। জ্বর একশোর কাছাকাছি।

ডাক্তার বললে, একবার হাসপাতালে চলো ক্যাপ্টেন—একটা ওষুধ লিখে দিই।

—ওষুধ?—দু'চোখে কৌতুক ছড়িয়ে সাইলি জানতে চাইল।

—ওষুধ বইকি। বিনা ওষুধে রোগ সারবে?—ক্যাপ্টেন চটে উঠল।

—আচ্ছা বেশ। আনো তা হলে ওষুধ।—সাইলি এলিয়ে পড়ল বালিশে। যেন তার শিশুর মতো ভাইটির এটুকু ছেলেমানুষিতে বাধা দিতে চায় না।

করুণার্দ্র গলায় ডাক্তার বললে, কিছু ভাববেন না, ভালো হয়ে যাবেন।

—বেশ।

ডাক্তারের কেমন অপরাধী লাগছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো ক্যাপ্টেন—আমার তাড়া আছে। আচ্ছা—নমস্কার।

—নমস্কার।—চোখ বুজেই সাইলি দু'হাত কপালে ঠেকালো।

পথে বেরিয়ে দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে চড়াই ভাঙতে লাগল। তারপর জড়ানো গলায় ক্যাপ্টেন বললে, ডক্!

—বলো।

—বাঁচবে?

—ডোণ্ট্ বি ননসেন্স ক্যাপ্টেন। মরার প্রশ্ন এত তাড়াতাড়ি কেন?

—কী জানি!—ক্যাপ্টেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার চুপচাপ। ডাক্তার কী যেন ভাবছিল। তাকে চকিত করে ক্যাপ্টেন বললে, ডু ইউ নো ডক্—মাই সিস্টার ওয়াজ এ ফিল্ম স্টার?

—ফিল্ম স্টার?—ডাক্তার চমকে উঠল: সে কি!

—তা হলে গোড়া থেকেই বলি। আমার বোন দার্জিলিঙে থেকে লেখাপড়া করত। তখন আমার দাদা বেঁচে—দার্জিলিঙে তার একটা কিউরিয়োর দোকান ছিল—অবস্থা ভালোই ছিল আমাদের। দাদা একটা অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেল—আমি গেলাম ওয়ারে, আমাদের অবস্থায়ও ভাঙন ধরল। যাক সে সব কথা। যা বলছিলাম, তাই বলি।

আমার বোনকে তুমি আজ দেখলে ডাক্তার—যখন ও মরতে চলেছে। কিন্তু ওর যখন পনেরো-ষোল বছর বয়েস, তখন যদি দেখতে! অমন সুন্দরী মেয়ে দার্জিলিঙে আর ছিল না। আর দুর্ভাগ্য দেখো, সেই সময় ও একজন বাঙালী চেঞ্জারের প্রেমে পড়ল।

ডাক্তার উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

—বিয়েতে আমাদের আপত্তি ছিল। দাদা তো সে ছোকরাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিল যে দোকানের আশপাশে সে যদি আর ঘোরাঘুরি করে তাহলে সোজা কুক্‌রি দিয়ে তার গলা কেটে দেবে। কিন্তু ছোকরাকে ঠেকালে কী হবে ডক্—মাই সিস্টার ওয়াজ ম্যাড আফটার হিম। দুজনে পালিয়ে গেল একদিন।

গেল কলকাতায়। কিন্তু ছোকরাটা একেবারে বাঁদর—মোরওভার, ম্যারেড। আমার বোনকে নিয়ে সে বাড়িঘর ছাড়ল। খেতে দেবে কী—নিজেরই খাওয়ার সংস্থান নেই! শেষ পর্যন্ত আমার বোন ফিল্মেই চান্স নিলে। একটা বাংলা বইতে নামলে, দু-তিনখানা নেপালী আর হিন্দী বইতেও অভিনয় করল। টাকা আসতে লাগলো মন্দ নয়। আর সেই টাকায়—দ্যাট প্যারাসাইট্ বসে বসে মদ গিলতে লাগল, ছুটতে লাগল রেসের মাঠে।

ডাক্তার ব্যথিত হয়ে বললে, তোমার বোন তাকে তাড়িয়ে দিলে না কেন?

—ওই তো মজা ডাক্তার—দ্যাট্ ইজ দি মিস্ট্রি অফ্ এ উয়োম্যান্! অন্ধের মতো ভালবাসতো, এমন কি যখন মারধোর করতো, তখনো চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না। কী বলব ডক্—আমি যদি ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারতাম—

ক্যাপ্টেন দাঁতে দাঁত ঘসল একবার।

অস্বস্তিভরে ডাক্তার বললে, তারপর?

—সোজা গল্প। শি গট্ টি বি। অ্যাণ্ড দ্যাট্ রাস্কেল? একদিন ওর টাকা-গয়না সব নিয়ে রাতারাতি উধাও হল। ও যে কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি হবে তারও উপায় রাখল না। সবচেয়ে অদ্ভুত কী জানো ডক্? এখনো মেয়েটা ওই স্কাউণ্ড্রেলকেই ভালোবাসে।

ডাক্তার জবাব দিল না—শুধু একবার তাকালো আকাশের দিকে। পাইন বনের ওপর সন্ধ্যার ছায়া নামছে—পাহাড়ের মাথায় থমকে থাকা মেঘে বিষণ্ণ অস্তরাগ।

ক্যাপ্টেন বললে, কখনো কখনো বাঙালীদের আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় ডক্—আই হেট দেম লাইক্ এনিথিং! আমার বোনের মতো মেয়েকে পেয়েও যে ভালোবাসতে পারল না, এত ভালোবাসার বদলেও কশাইয়ের মতো গলায় যে ছুরি

বসালো—হি ইজ্ এ ডগ! শুধু ওকে নয় ডক্—সমস্ত বাঙালীকেই আমার ইচ্ছে হয়—

ক্যাপ্টেন থেমে গেল। বললে, এক্সকিউজ মি ডক্। ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছিলাম। আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাইনি।

ডাক্তার ক্লিষ্ট গলায় বললে, আমি কিছু মনে করিনি ক্যাপ্টেন। আমার অবস্থা তোমার মতো হলে আমিও ওই কথাই ভাবতাম।

সামনে আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে। এককালের দেশপ্রেমিক ডাক্তারের মনোবেদনা আর করুণায় ভরে উঠতে লাগল। কত দুঃখ—কত চোখের জল—কত সাইলি!

কে কতটুকু করতে পারে কার জন্যে?

টর্চের আলোটা মুখে পড়তে অশোক চমকে উঠল।

—কে?

খিল্‌খিল্ করে হাসির আওয়াজ শোনা গেল: ভূত দেখলেন না কি? আমি।

তাই। বুলাই বটে। মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো—গায়ে সেই ফিকে নীল ওভারকোট। হাতে ছোট একটা টর্চ নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—ঘর অন্ধকার করে এমন ঘাপটি মেরে বসেছিলেন কেন?—বুলা জানতে চাইল।

—নিজের ঘরে বসে থাকব না তো যাব কোথায়?—অশোক জবাব দিলে। তারপর বিব্রত হয়ে বললে, কিন্তু একেবারে ভেতরে চলে এলেন যে? অফিস থেকে ডাক দিলেই তো পারতেন!

—আহা-হা—কী আমার অফিস! দেড়খানা ঘরের একখানায় অফিস—বাকী আধখানা পোস্ট মাস্টারের কোয়ার্টার। এরও আবার প্রাইভেসি আছে নাকি?

অশোক বললে, তবু একেবারে ভেতরে চলে এলেন! বলুন তো কোথায় আপনাকে বসতে দিই এখানে। চলুন—চলুন—অফিসে চলুন।

—না, এখানেই বসব আমি।—বুলার স্বরে জেদ ফুটে বেরুল।

বসব তো বটে, কিন্তু বাস্তবিক, জায়গা কই বসবার? বুলা অতিশয়োক্তি করেনি। দেড়খানা ঘরই নিঃসন্দেহ। তবে অশোকের অংশ আধখানারও কম। তারও প্রায় সবটা জুড়ে আছে অশোকের তক্তপোষ—একটা বইয়ের শেল্‌ফ, চায়ের সরঞ্জাম, জামা-কাপড়ের আল্‌না, একটা ছোট টিপয়ের মতো টেবিল। অতিথিকে বরণ করবার মতো ঐশ্বর্য আছে মাত্র একটি—একখানা ইজি-চেয়ার।

ততক্ষণে ঘরের আলোটা বাড়িয়ে দিয়েছে অশোক। বুলা সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়ার উপক্রম করছে দেখে সে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

—বসবেন না, ওটায় বসবেন না।

—কেন, ওটার কী অপরাধ?

—ওর ক্যান্‌ভাস খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ব্যালান্সের অনেক ক্যাল্‌কুলেশন করে বসতে হয়—নইলে যে-কোনো সময় সবসুদ্ধ নিয়ে নামতে পারে।

বুলা বললে, যাক। পোস্ট্‌ অফিস দেখলাম, পোস্ট্‌ মাস্টারের ঐশ্বর্যও দেখতে পাচ্ছি। অতিথিকে তা হলে বুঝি দাঁড়িয়েই থাকতে হবে?

—কিছু মনে না করেন তো—অশোক বললে, আমি বরং চেয়ারটা ম্যানেজ করছি, আপনি এই খাটে এসে বসুন।

—কেন, ব্যালান্সের কৃতিত্ব দেখাতে চান বুঝি? থাক—সে বাহাদুরীর দরকার নেই। দুজনেই স্বচ্ছন্দে বসতে পারি খাটের ওপর।

বুলা তাই বসল। অশোক ভারী সংকুচিত হল মনে মনে। একটু আগেই শোনা সরোজের কথাগুলো গুঞ্জন করে গেল কানের কাছে। না—যে-কোনো মেয়েকে দেখলেই তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে হবে—ছাউনি-হিলের এই লোকগুলোর মতো এমন কুসংস্কার নেই অশোকের। তার মুশকিল এই, জিনিসটা এদের কারো চোখে পড়লে—

কিন্তু চুপ করে থাকবে বা চুপ করে থাকতে দেবে—বুলা সে জাতের মেয়েই নয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, রান্নাটা স্বপাকই চলে বুঝি?

—ঠিক ধরেছেন!

—ওই কুকার আর স্টোভ বুঝি তার ব্যবস্থা?

—অনুমান নির্ভুল আপনার!

—ভালো রাঁধতে পারেন?

—খেতে যখন পারি, তখন ভালোই রাঁধি নিঃসন্দেহে।

—খেতে পারার আশ্চর্য শক্তি আপনাদের আছে—বুলা হাসল: সে দাদাকে দেখেই বুঝতে পারি। কিন্তু মিথ্যে এমন কষ্ট করে মরছেন কেন? স্ত্রীকে নিয়ে এলেই তো পারেন।

—স্ত্রী নিরুদ্দেশ।

—মানে?—বুলা ভয়ানক চমকে উঠল।

—মানে তিনি যে এখনো কোথায় আছেন, অথবা আদৌ জন্মেছেন কিনা—তাই এখনো জানতে পারিনি।—অশোক হাসল।

—তার মানে বিয়ে করেননি?

—এবারেও আপনার অনুমান নির্ভুল মিস্‌ রায়চৌধুরী।

—কী মিস্ মিস্ করেন ?—বুলা বিরক্ত হল : শুনলেই মনে হয় যেন আমি টেলিফোন-অপারেটর কিংবা হাসপাতালের নার্স। হলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হইনি যখন, তখন স্বচ্ছন্দে বাঙালীমতে নাম ধরেই ডাকতে পারেন।

—আচ্ছা, তাই ডাকব।

বুলা বললে, হাঁ—তাই ডাকবেন। কিন্তু যা বলছিলাম। বিয়ে করেননি ?

—না।

—আপনি একটা অপদার্থ—বুলা সুনিশ্চিত মতামত জানালো।

—যা বলেছেন। অমন সোজা কাজটাও করে উঠতে পারলাম না সেইজন্যে।

বুলা তখন লণ্ঠনের গায়ে একদল পোকার পরিক্রমা দেখছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, এবার তাহলে আর দেরী করবেন না—বিয়ে করে ফেলুন।

—তাতে আপনার স্বার্থ কি ?

—নেমন্তন্ন খাবো।

—কিন্তু তখন আপনাকে পাবো কোথায় ? দুদিন পরেই তো চলে যাবেন—ছাউনি-হিলের কথা আর মনেও থাকবে না।

বলেই অশোক কুন্ঠিত বোধ করল। কেমন আবেগের রেশ এসে গেছে গলায়। কিছু ভেবে বসবে না তো আবার ?

কিন্তু বুলা নিরাসক্ত।

—কাগজে পার্সোন্যাল কলমে বিজ্ঞাপন দেবেন—'বুলা দেবী, আমি বিয়ে করছি। নেমন্তন্ন খেতে চান তো অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।'—বলে হাসিতে বুলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অশোকও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটার জোর এল না। প্রসঙ্গটাকে বদলে নিতে চাইল।

—রাত হয়ে গেছে—একা একা এলেন যে ?

—তাতে কি। দেখলাম, এখানে ভয় করার কিছু নেই, এখানকার মানুষই আমাদের দেখে ভয় পায়। যাক সে সব। দাদা কোথায় বলুন তো ?

—অনুপমবাবু ? তিনি তো আসেননি।

—আসেননি ? তবে গেল কোথায় ? বুলা এবার চিন্তিত হয়ে উঠল : চিঠি নিয়ে যায়নি ?

—না তো। আপনাদের দুটো চিঠি এসেছে, আমি আলাদা করে রেখেছি। ভেবেছিলাম, কাল সকালে কাহার হাতেই পাঠিয়ে দেব।—অশোক উঠল, অফিস-ঘর থেকে নিয়ে এল চিঠি দুটো।

চিঠির দিকে একবার তাকিয়েই বুলা সে-দুটোকে নিজের হাত-ব্যাগে পুরে নিলে। তারপর সন্দিগ্ধ গলায় বললে, আমি সেই দেড় ঘণ্টা আগে দাদাকে পাঠিয়েছি—মুখ থেকে বই কেড়ে নিয়ে। ওর জন্যে কতগুলো নোট করতে হচ্ছিল আমাকে—তাই নিজে আর বেরুলাম না। বলে দিয়েছিলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে। এখানে আসেনি—গেল কোথায় তা হলে? রেয়ার হার্বস্ খুঁজতে খুঁজতে বন-জঙ্গলে ঢুকে পড়ল নাকি?

অশোক বললে, সে কি! তা কি সম্ভব?

বুলা বললে, দাদাকে জানেন না—ওর পক্ষে সবই সম্ভব।—বলেই উঠে দাঁড়াল: আমি চললাম।

—কোথায় যাচ্ছেন?

—দাদাকে খুঁজি। দেখি কোন্ দিকে গেল।

—এই রাতে কোথায় খুঁজবেন? হয়ত গল্প করতে বসেছেন কোথাও। যথাসময়ে বাড়ি ফিরে যাবেন—ভাববেন না আপনি।

—দাদা বসবে গল্প করতে? এই দশদিনেও ওকে চেনেননি?—বুলা উঠে পড়ল: ভারী ভয় করছে আমার। যাই, খুঁজে দেখি—

অশোক ব্যস্ত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, অফিস-ঘর থেকে কাঞ্ছার সাড়া পাওয়া গেল। চিঠি গোছাতে গোছাতে এতক্ষণ কান পেতে শুনছিল আলোচনা।

কাঞ্ছা বললে, আমি দেখেছি। 'মাথি'তে গেছেন।

—মাথি? সে আবার কোথায়?—বুলা আঁতকে উঠল।

অশোক হাসল: 'মাথি' অর্থে ওপরে কৌশিক ঘোষের বাড়িতে। অর্থাৎ নির্ভুলভাবে অনুপমবাবু দাদুর ওখানে গিয়ে গল্প জমিয়েছেন।

কাঞ্ছা আবার সাড়া দিলে: জু! ঘোষ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে গেছেন।

অশোক হেসে উঠলো: শুনলেন তো? ঘোষ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে গেছেন অনুপমবাবু। আপনি আপনার দাদাকে যতটা আন্-প্রাক্‌টিক্যাল ভেবেছিলেন তিনি তা নন।

—ঘোষ সাহেবের মেয়ে! কে সে?—বুলার ভ্রূ সংকীর্ণ হয়ে এল।

—রুচি। কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়ে। পরশু এসেছে এখানে।

—ও!—কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বুলা বললে, একটা উপকার করবেন অশোকবাবু? আমাকে একবার নিয়ে যাবেন ঘোষ সাহেবের বাংলোয়?

বুলার মুখের চেহারা দেখে অশোক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা সহজ লঘু সুর বাজছিল এতক্ষণ—কী করে যেন কেটে গেল সেটা। কোথা থেকে যেন মেঘ ঘনিয়ে

এল এক টুকরো।

অশোক বললে, স্বচ্ছন্দে। চলুন।

সেই লাল কম্বলটা পায়ের ওপর টেনে নিয়ে সোফায় বসেছিলেন কৌশিক ঘোষ। ঘরের কোণে শেডের ঢাকনা দেওয়া ল্যাম্পটা তেমনি আলো ছড়াচ্ছে, বুক-সেল্‌ফগুলোর কোণায় কোণায় তেমনি ছায়ার স্তব্ধতা।

অনুপম বিব্রত হচ্ছিল। বারবার ভাবছিল, তার ওঠা উচিত। কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারছে না। যেন নিজের সঙ্গেই কৌশিক কথা কয়ে চলেছেন।

—বিজ্ঞানের কথা বলছ? তার ওপরেই বা ভরসা কোথায়? আজ পর্যন্ত কোনো জিনিসেরই কি স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পেরেছে! সব কিছুকেই তো মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে সে।

—আজ্ঞে সে তো ঠিকই।—অনেকক্ষণ পরে যেন বলবার মতো কথা খুঁজে পেলো অনুপম: বিজ্ঞান মাত্রই অসমাপ্ত। তবে—

—তবে নেই। এটা নিশ্চয় যে বিজ্ঞান কোনো দিনই কোনো কথার জবাব দিতে পারবে না।—কৌশিক পাইপে একটা টান দিলেন: সে যতই খুঁজবে ততই দিশেহারা হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা বিরাট ধাঁধার ভেতরে নিজেকে নিয়েই কানামাছি খেলবে, অথচ সত্যের সোজা রাস্তা কোনোদিনই দেখতে পাবে না। সে রাস্তায় যেতে হলে যুক্তি চলবে না, ল্যাবরেটরী চলবে না, মাইক্রোস্কোপ চলবে না। মনের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে খুঁজতে হবে তাকে—বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পেতে হবে। এ-সব কি তোমরা মানো অনুপম?

অনুপম ক্লান্তভাবে হাসল। মানা-না-মানার প্রশ্ন তার কাছে এ-সব নয়। এ ধরনের কথা একবার দুবার নয়, এত হাজার বার সে শুনছে যে তার প্রতিবাদ করতেও আর ইচ্ছে হয় না অনুপমের। পক্ষীরাজ ঘোড়া বলে কিছু নেই—ঘোড়ার কখনো ডিম হয় না, কিংবা সাপের মাথায় মণি কোনো কারণেই সম্ভব নয়—এ-কথাগুলো যেমন বাচ্চাদের বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই, তেমনি বিজ্ঞানও যে কোনোদিন হাল ছেড়ে দিয়ে ভগবানের অধ্যাত্ম লীলায় আত্মসমর্পণ করবে না—এ-কথা বুড়ো মানুষকে বলবার অর্থ নেই কিছু। অনর্থক ওঁদের মনোবেদনাই বাড়ানো হয় ওতে। এ-সব ক্ষেত্রে মাথা নাড়াটাই একমাত্র ভদ্র এবং করণীয় পদ্ধতি।

দ্বিতীয়বার চা নিয়ে রুচিরা ঘরে ঢুকল।

—বাবা কি অনুপমবাবুকে যোগশাস্ত্র বোঝাচ্ছ এখনো?

—যোগশাস্ত্র বইকি। যোগ হল আত্মস্থ হওয়ার উপায়—তারপরেই আসে ভগবৎ

উপলব্ধি। আগে অজ্ঞান দূর করা চাই, তারপরে বিজ্ঞান আসবে। বিজ্ঞান মানে অবশ্য সায়েন্স নয়—বিশেষ জ্ঞান। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরী থেকে সে অনেক দূরে।

—বাবা, এবার তোমার অনুপমবাবুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত! আমি পাঁচ মিনিটের কড়ার করে ওঁকে এনেছিলাম। তোমার এ-সব আলোচনা হয়তো ওঁর ভালো লাগছে না—হয়তো বিরক্তি বোধ করছেন—

—বিরক্তি! বিলক্ষণ!—অনুপম চকিত হয়ে উঠল: না—না, বেশ ভালো লাগছে আমার।

—ভালো তো লাগবেই।—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কৌশিক বললেন, মনকে বেশ মানানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাই যোগ চাই—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'! এই দ্যাখো না—ভালো কথা আমরা বলতে পারি অনেক, ভালো হতেও চাই —কিন্তু পারি কি? কোথা থেকে পাপ আসে, আসে লোভ—কিছুতেই আর নিজের মনকে বশে আনা যায় না!

বলতে বলতে বদলে গেল কৌশিকের গলার স্বর। এতক্ষণ তত্ত্ব-আলোচনা করছিলেন, হঠাৎ যেন সেখানে এল ব্যক্তিগত বেদনার আভাস। এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল: চৌরঙ্গির সেই সিনেমা—সেই কুৎসিত অপমানে কলঙ্কিত তীক্ষ্ণ সন্ধ্যা—খানিকটা তীক্ষ্ণ নির্মমতম হাসির আওয়াজ—

তারপর এই ছাউনি-হিলে—

প্লেট্ থেকে খানিক চা চলকে গায়ে পড়ল তাঁর। কৌশিক চমকে উঠলেন।

আর তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে বেবি-ডেভির মিলিত অভ্যর্থনা শোনা গেল।

—কে এল?

উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই: দাদু, আমরা।

ঘরে ঢুকল অশোক আর বুলু।

—এই যে বুলা, এসো—এসো—কৌশিক উঠে বসতে চেষ্টা করলেন: তবু ভাগ্যি এ বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ল তোমার। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার মেয়ে রুচি।

—নমস্কার।—শুকনো গলায় বুলা বললে, পরিচয় হয়ে সুখী হলাম।

রুচি বড় বড় দাঁত বের করে হাসল: আপনার কথা বাবার কাছে শুনেছি। আজ আপনার দাদার সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, কাল আপনাদের ওখানে যাব একবার।

—বেশ তো, যাবেন।—তেমনি শুকনো ভঙ্গিতেই বুলা জবাব দিলে।

কৌশিক বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন দিদি—বোসো।

অশোক বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুলার আশ্চর্য কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। অশোক উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বুলা বললে, দাদা, এই তোমার রেস্‌পন্‌সিবিলিটি? এই তোমার পোস্ট অফিসে আসা?

অনুপম কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। ত্রস্ত হয়ে বললে, না ভাবছিলাম, এখনি ফিরে যাব।

—দু ঘণ্টা ধরেই ভাবছিলে?

গলাটা এত উগ্র যে, ঘরের সবাই বিহ্বল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরে রুচিই সহজ করতে চাইল অবস্থাটা।

—ওঁর দোষ নেই কিছু। আমরাই ওঁকে আটকে রেখেছিলাম।

বুলা বললে, না, ওরই দোষ। ওর মনে রাখা উচিত ছিল, বাড়িতে আমাকে একা ফেলে রেখে এসেছে। এবং বাড়ির আধ মাইলের মধ্যেও দ্বিতীয় লোক নেই কোনো।—তীব্র দৃষ্টিতে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বুলা বললে, দাদা, তোমার আলোচনা কি শেষ হয়েছে? না আরো ঘণ্টা দুই বসবে?

অনুপম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—না—না, আমি এখুনি যাচ্ছি।

—অশোকবাবু?—আর একটা তীক্ষ্ণ আহ্বান এল বুলার।

রুচির শাদা মুখখানা আরো শাদা হয়ে গেছে—অল্প অল্প কাঁপছে কৌশিকের ঠোঁট। একটা কিছু যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না।

অশোক একবার তাঁদের দিকে তাকালো, আর একবার তাকিয়ে দেখল অদ্ভুত বিরক্তিতে বিকৃত বুলার মুখের দিকে। একটু আগেই ভালো লাগছিল, কিন্তু এখন অস্বাভাবিক কদর্য মনে হল বুলাকে।

অশোক বললে, আমি বরং একটু বসি।

—তবে তাই বসুন।—বুলার গলা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল: চলো দাদা।

ভাই বোন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে ডেভি-বেবির আর্তনাদ উঠল আর একবার। রুচি টেবিলের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যে চায়ের পেয়ালায় একটা মাত্র চুমুক দিয়েছিল অনুপম, তার দৃষ্টি সেদিকেই। কৌশিক তাকিয়ে রইলেন শেল্‌ফের কোণায় কোণায় পুঞ্জিত ছায়ার দিকে—যেন তার মধ্যেই তিনি নিমগ্ন হয়ে গেছেন। আর অশোক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভাবতে লাগল, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতখানি নাটকীয়তা সৃষ্টি করার কী দরকার ছিল বুলার!

শেষ পর্যন্ত কৌশিক বললেন, অশোক !

—বলুন।

—আমাদের কোনো চিঠি আসেনি ?

—না।

এ শুধু একটা কিছু আরম্ভ করে অস্বস্তির ঘোরটা কাটানো। কিন্তু তার পরে ? তার পরে কি বলা চলে—কোন্ কথা দিয়ে জের টানা চলে এর ?

অগত্যা জোর করে হেসে অশোক বললে, রুচি দেবী, কী নতুন ছবি আঁকলেন এবার দেখি !

ছয়

দার্জিলিং যাওয়ার বাসটা একটু সকাল সকালই ছাড়ে। তাই ব্যস্ত হয়ে আসছিল ডাক্তার।

আসতে আসতে ডান দিকে একটা ছোট টিলার ওপর নজর পড়ল ডাক্তারের। একটি দীর্ঘদেহিনী মেয়ে সেখানে স্থির হয়ে একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরে যেদিকে সূর্য ওঠে, তার নজর সেদিকেই। যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে নিজের মধ্যে।

ডাক্তার চিনল। কৌশিক ঘোষের মেয়ে রুচিরা।

একটু পরেই একরাশ কুয়াশা এসে রুচির শুভ্র দেহটাকে আরো গভীর শুভ্রতার মধ্যে মুছে দিলে। ডাক্তারও আর দাঁড়ালো না, এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে।

সাইলি ! এই তিন-চারদিন ধরে মেয়েটা যেন মাথার মধ্যে একটা পাথরের মতো জমাট হয়ে রয়েছে। ফিল্ম স্টার। নানা ছবিতে নেমেছে—কত সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের সঙ্গে অসঙ্কোচে করেছে প্রেমের অভিনয়। ওপথে যারা যায় তাদের কারো সম্পর্কেই কোনো শ্রদ্ধা নেই ডাক্তারের—তারা কী রকম জীবন-যাপন করে সে সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ বর্ণনাই শুনেছে ডাক্তার।

তবু—

তবু পিউরিটান্ ব্যাচেলার ডাক্তারের মনের মধ্যে দোলা লেগেছে। এককালে সুন্দর ছিল মেয়েটি—আশ্চর্য সুন্দর। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে তার মাথার কাছে। এত তাড়াতাড়ি ? সবে তো ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে সে—বাঁচতে পারে, আরো অনেক দিনই তার বাঁচা উচিত। এখুনি ফুরিয়ে যাবে সে ? সেই নিটোল সুন্দর হাতখানাকে কিছুতেই তো ভোলা যাচ্ছে না।

আরো একটা কথা। ডাক্তার এককালে দেশসেবা করত। জাতিকে নিয়ে সে গর্ব করতে ভালোবাসে,—'বঙ্গ আমার জননী আমার' আওড়াতে তার মন ভরে ওঠে কখনো কখনো। ক্যাপ্টেনের সেই কথাগুলো এখনো তার কানের ভেতর বেজে চলেছে : আমার বাঙালীদের ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় ডক্—আই লাইক টু হেট দেম—

এতবড় অভিযোগ সহ্য করা যায় না। এর একটা প্রায়শ্চিত্ত ডাক্তার অন্তত করবেই।

কোনো টি-বি হাসপাতালে পাঠানোর প্রশ্ন আর ওঠে না। টাকার ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়া এমন একটা হোপলেস্ কেস্ নিয়ে কে বেড আটকে রাখতে রাজী হবে? দেশজোড়া অসংখ্য অসহায় যক্ষ্মারোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে এমন অন্যায় কথা ভাবতেও পারে না ডাক্তার। যে মরবার সে তো মরবেই—আর একজন সময়ে চিকিৎসা হলে যদি বা বাঁচতে পারত, তার পথ সে রোধ করবে কেন!

তার নিজের হাতে সব এইবার। বাঁচাতে পারবে না—টি-বি স্পেশ্যালিস্ট সে নয়—ওসব দামী দামী ওষুধ কেনবার সামর্থ্যই বা কার আছে? ক্যাপ্টেনের পকেট তো গড়ের মাঠ—যা সামান্য কিছু পায় সেটা মদেই খরচ হয়ে যায়। শুধু নার্সিংয়ের ওপরেই যা কিছু করা যাবে এখন। আর অল্পস্বল্প দু-একটা সাধারণ ওষুধ খাইয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া চলে অন্তত।

কাল ডাক্তার বলেছিল, আমি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলব মিস্ সাইলি।

সাইলি সেই নির্বেদ হাসি হেসেছিল, কোনো জবাব দেয়নি।

ডাক্তার বলেছিল, শুধু ওষুধে নয়—মনের জোরেও অনেক সময় অসাধ্য রোগ সেরে যায় মানুষের। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলেও সে বেঁচে উঠতে পারে।

—কিন্তু বেঁচে কী লাভ?—একটা শান্ত জিজ্ঞাসা সাইলির।

—আবার সব নতুন করে শুরু করা চলে।—ডাক্তার বলে ফেলেছিল : বিশেষ করে আপনার। ইয়োর লাইফ্ ইজ টু ইয়ং ইয়েট্।

সাইলি শুধু নিজের নিটোল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল ডাক্তারের দিকে : দেখুন তো ডাক্তার—আজ আমার পাল্স্ কী বলে।

ইঙ্গিতটা বুঝেছিল ডাক্তার। তবু কিছুতেই যেন হার মানতে চায়নি। হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছিল, যতক্ষণ দরকার—তার চাইতেও বেশি। তারপর বলেছিল, কালকের চাইতে ভালোই চলছে আজ—আরো ভালো চলবে ভবিষ্যতে।

সাইলি চোখ বুজে পড়ে ছিল। আর জবাব দেয়নি।

সামনে সমুদ্র দেখেও তার ক্ষ্যাপা ঢেউকে রুখবার যেন চ্যালেঞ্জ নিয়েছে ডাক্তার।

চেষ্টা সে করবে। লাভ নেই, তবুও করবে।

বাসটা প্রায় ছাড়বার মুখে ডাক্তার এসে পৌঁছুল। বীরবাহাদুরকে টাকা আর ওষুধের ফর্দ দিয়ে একটা বড় ডাক্তারী ফার্মের নাম বাতলে দিলে। তারপর ফিরে আসবে, এমন সময় অশোক ডাক্তারের পথ আটকালো।

—কী ডাক্তার, আজকাল বিকেলে যে এদিকে আর মাড়ান না! খবরের কাগজের নেশা হঠাৎ কেটে গেল নাকি? কাঞ্ছাকে দিয়ে কাগজ পাঠাতে হয়—ব্যাপার কী?

ডাক্তারের মুখ হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠল। অশোকের দিকে সে তাকালো না—দৃষ্টিটা মেলে রাখল পাহাড়ী পথের বাঁকের আড়ালে—যেখানে বাসটা এক ঝলক ধুলো উড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

ডাক্তার বললে, একটা পেশেণ্ট নিয়ে বড্ড ব্যস্ত আছি। রোজ বিকেলে যেতে হয় —দেরীও হয় ফিরতে। তাই আর আসবার সময় পাই না।

অশোক বললে, আপনারা সবাই যে আমাকে ত্যাগ করলেন! শৈলেশদা বৌদির চিঠির অপেক্ষায় প্রায় ধরাশয্যা নিয়েছে—বাড়িতে বসে খালি মুরগী গোনে। চ্যাটার্জী আর সরোজ চেন কাঁধে নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। দাদুর অসুখ—আজ প্রায় সাতদিন তাঁর পাত্তা নেই। এদিকে আপনিও টাকা কামিয়ে বেড়াচ্ছেন দাদা —আমি বাঁচি কী নিয়ে?

ডাক্তার আরো সংকুচিত হল: টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। আমাদের ক্যাপ্টেনের বোন।

—ক্যাপ্টেনের বোন? র‍্যাদার ইণ্টারেস্টিং! ওর আবার কোনো জন্মে ভাই-বোন ছিল নাকি? আমরা তো ভাবতাম ও স্বয়ম্ভু!

ডাক্তার বললে, সে অনেক কথা, আরেকদিন বলব। এখন চলি ভাই—অনেক কাজ আছে।

ডাক্তার যেন পালিয়ে বাঁচল। একটু পরেই ছাই রঙের কোট আর উদ্ধত শাদা কলার মিলিয়ে গেল কুয়াশার আড়ালে।

অশোক কেমন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কোথায় যেন কী হয়েছে—ছাউনি-হিলে আর সুর মিলছে না। নিজের মনের মধ্যেও একটা ঝাপ্সা অস্থিরতা ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কারণ পরশু সন্ধ্যায় কৌশিক ঘোষের বাড়িতে—

কেন অমন ব্যবহার করল বুলা? কী বলতে চায়? রুচি পথ থেকে অনুপমকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে কী দরকার ছিল অতখানি অভদ্রতা করবার?

—নমস্কার অশোকবাবু!

অশোক যেন পেছন থেকে ঘা খেল একটা। তাকিয়ে দেখল, বুলাই বটে।

ওভারকোট নয়—একটা উলের নীল ব্লাউজ তার গায়ে, পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি। সকালের সূর্যহীন বিষণ্ণতা সারা শরীরে জড়িয়ে এনেছে বুলা।

—নমস্কার।—অশোক জবাব দিল। কিন্তু খুব প্রসন্ন হয়ে নয়।

—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।

অশোকের উৎসাহ ছিল না, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারল না। হাঁটতে লাগল বুলার সঙ্গে।

নিজের ভেতর অস্বস্তির পীড়ন বেশিক্ষণ বইতে হল না তাকে। বুলাই শুরু করল।

—সেদিন খুব চটে গেছলেন আমার ওপর?

—না না—চটব কেন?—অশোক বিব্রত হয়ে জবাব দিলে।

পথের পাশ থেকে একটা সানাই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বুলা বললে, কিন্তু চটা উচিত। কেন ওরকম আমায় করতে হল তা জানেন?

অশোক জবাব দিল না। শুধু চোখ তুলে তাকালো একবার।

বুলা বললে, আপনি দাদাকে চেনেন না। যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো সময় ওকে ট্র্যাপ্‌ করতে পারে। এমন দুর্বল মানুষ সংসারে আর নেই!

হঠাৎ অশোকের অত্যন্ত হাসি পেলো। রুচি ট্র্যাপ্‌ করবে অনুপমকে! যে-রুচির দিকে তাকালে নারীজাতি সম্বন্ধেই অরুচি ধরে যায়, সরোজের দেওয়া 'তালধ্বজ' নামটাই যার একমাত্র উপযুক্ত বিশেষণ, অনুপমের মন সে ভোলাবে শেষ পর্যন্ত!

আর তা ছাড়া দু বছর হল অশোক বদলী হয়ে এসেছে এখানে। এর মধ্যে বহুবারই তার রুচির সঙ্গে দেখা হয়েছে—আলাপ পরিচয়ও হয়েছে যথেষ্টই। তাতে করে অশোক অন্তত এইটুকু বুঝেছে যে নিজের সম্পর্কে রুচি সম্পূর্ণ সচেতন। সে যে কুৎসিত, অসহ্য কদাকার—একথা তার নিজেরও অজানা নেই। আঁকার হাত রুচির ভালো। দেহে কোথাও সৌন্দর্যের চিহ্ন নেই, তাই মনের সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে রুচি ছবি আঁকে। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বলা চলে: আপনার ড্রয়িংয়ের হাতটি তো ভারী সুন্দর—ভারী চমৎকার আপনার কালার সেন্স! কিন্তু এ-কথা কোনোদিন, কোনোমতেই বলা চলে না: আজ এই শাড়িটাতে কি সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে, বড় ভালো লাগছে দেখতে। এমন কি, কেউ যদি কোনোদিন তাকে বলে: তোমাকে আমি ভালোবাসি, তা হলে অন্তত রুচি তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না!

অশোক বললে, কিন্তু রুচিকে দেখে কি ঠিক—

—বললাম তো, দাদাকে আপনারা চিনবেন না। অদ্ভুত মানুষ! কী যে দুর্বল—কী যে হেল্‌পলেস্‌! যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো সময় ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যারেজ-

রেজিস্ট্রারের অফিসে উঠতে পারে।

ঠিক এই কথাটা বুলার মুখে এর আগেও কয়েকবার শুনেছে অশোক। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, অনুপমকে নিরীহ জানলেও অতখানি গো-বেচারী সে কোনোমতেই ভাবতে পারে না। খালি মনে হয়, যেন নিজের মনের মতো করে বুলা সৃষ্টি করছে অনুপমকে —সে যা নয়, সেই ব্যক্তিত্বটাই আরোপ করছে তার ওপরে। অশোকের কেমন অদ্ভুত লাগে বুলাকে। সব সময় যেন একটা কল্পিত শত্রু সে দেখতে পাচ্ছে কোথাও, আর তাকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে রয়েছে আকাশে।

কেমন যেন মোহভঙ্গ হয়েছে অশোকের। ছাউনি-হিলের নিঃসঙ্গ প্রবাসে হঠাৎ আসা একটি তরুণী তার মনকে যেটুকু দোল দিয়েছিল, সেটা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছে এখন। আজ আর বুলার মধ্যে সে বিস্মিত হওয়ার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না— কোথাও আবিষ্কার করতে পারছে না কোনো অপরিচিত বিচিত্রকে। পৃথিবীতে আরো অনেক মেয়ের মতো বুলাও একটি মেয়ে। একদা বুদ্ধিদীপ্ত কবি অশোক যেমন সহজ মুগ্ধতার জাল থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়েছিল, আজও যেন তেমনিভাবে বুলা সম্বন্ধে আত্মস্থ হচ্ছে আবার।

সরোজই ঠিক বলেছিল, মেয়েটা বড্ড বেশি কথা বলে।

অশোক বললে, ক্ষমা করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। অনুপমবাবুর এতদিনে বিয়ের বয়েস হয়েছে নিশ্চয়ই?

—কী আশ্চর্য, তা হবে না কেন?—বুলা বললে, কিন্তু আমার কথাটা কী—জানেন? আমার দাদা সায়েন্টিস্ট—একেবারে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক। আমরা আশা করব তার উপযুক্ত সঙ্গিনী এমন একজন হবে—যাকে বলা যেতে পারে মাদাম কুরী। কোনো সাধারণ একটা মেয়ে এসে দাদার গুড্‌নেসের সুযোগে কাজ গুছিয়ে নেবে—এ আমি কখনোই সইব না!

—কিন্তু অসাধারণকে খুঁজতে খুঁজতে—অশোক বললে, মাপ করবেন, শেষ পর্যন্ত সারা জীবন ওঁকে একেবারে উপোস করে কাটাতে না হয়।

হঠাৎ বুলার চোখ ধ্বক্ ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

—দরকার হলে তাই কাটাতে হবে!

—বলেন কি!—অশোক কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

—হাঁ, তাই।

—কিন্তু তাতে কী লাভ হবে শেষ পর্যন্ত?

—লাভ-ক্ষতি বলতে পারব না।—বুলার চোখ একটা অপরিচিত হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলতে লাগল: আমি চাই আমার দাদা সব চেয়ে বড় হয়ে উঠবে—এ ম্যান ইন্ এ

মিলিয়ন। একটা অযোগ্য-সঙ্গিনী শেকল হয়ে তার পায়ে জড়িয়ে থাকবে, তাকে এতটুকু এগোতে দেবে না—এ কখনোই হতে পারে না!

বুলার ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর চোখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বুঝতে চেষ্টা করল অশোক। ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সমস্ত মনটা তার সংশয়ের ভারে জর্জরিত হয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে অশোক বললে, অপরাধ নেবেন না, আপনাকেও তো একদিন চলে যেতে হতে পারে?

—কেন?—বুলার স্বর উগ্র।

অশোক থতমত খেয়ে বললে, অর্থাৎ আপনিই যে খুব বেশিদিন দাদার কাছে থাকবেন তার কী মানে আছে? আপনাকেও নিশ্চয় একদিন—

—না। দাদাকে যতদিন কোনো সত্যিকারের স্ত্রী জুটিয়ে দিতে না পারি, ততদিন নিজের কথা ভাবতে আমি রাজী নই।

—সেই স্ত্রীটির জন্যে যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয়?—বলেই ত্রস্ত হয়ে উঠল অশোক। সন্দেহ হল, এখনি হয়তো বুলা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু বুলা রাগ করল না। আস্তে আস্তে বললে, দরকার হলে তা-ই করব।

বিস্মিত ভাবনায় অশোকের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শুধু এই পাহাড়েই নয়; জীবনের প্রান্তে প্রান্তে—মনের কোণায় কোণায় এমন কুয়াশা জমে আছে, যেখানে এখনো সূর্যের আলো পড়ে না; এমন জটিল দুর্গম অরণ্য আছে যা চিরকাল ম্লান অন্ধকারেই তলিয়ে রইল।

—কী ভাবছিলেন? বুলা জানতে চাইল।

—কিছুই না।

আবার চুপচাপ। পথের ধারে বৃষ্টি-ধোয়া শ্যাম লতার বন। বুলার হাতের সানাই ফুল দুলছে লীলা-কমলের মতো। বৃষ্টি আর কুয়াশার পরে মেঘের কোলে রোদের রঙ ধরেছে, কিন্তু সূর্য এখনো সম্পূর্ণ দেখা দেয়নি। বিষণ্ণ ছাউনি-হিলের ওপরে একটা রক্তিম পাণ্ডুর ছায়া দুলছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা মিষ্টি ঘণ্টার শব্দ উঠল। যেন যান্ত্রিক আওয়াজ নয়—একরাশ ঝর্ণা জলতরঙ্গ বাজিয়ে তুলল পাহাড়ের বুকের মধ্যে, শান্ত শুব্ধ সকালটিকে সুরের মাধুর্য দিয়ে আচ্ছন্ন করে দিলে।

বুলা চমকে বললে, ও কিসের আওয়াজ?

—লামার মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।

—লামা কে?

—এখানকারই একজন ভদ্রলোক। ভারী ধার্মিক মানুষ—বৌদ্ধ। পাহাড়ের

জন্ম দেখতে পাচ্ছেন না—ওই গাছগুলো ছাড়িয়ে একটা আপেলের বাগান আছে, তার পেছনেই ওঁর বাড়ি।

বুলা বললে, বেশ লাগছে ঘণ্টার শব্দটা।

অশোক সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

ছাউনি-হিলের ওপর রক্তিম পাণ্ডুর ছায়া দুলছে। পাহাড়ের বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের ঝঙ্কার। দুটো একটা পাখির কলধ্বনি। বুলা একবার অশোকের দিকে তাকালো, অশোক তাকালো বুলার দিকে। বুলার চোখ দুটোকে আর চেনা যাচ্ছে না—কেমন একটা স্বচ্ছ পর্দা নেমে এসেছে তাদের ওপর।

বুলা হঠাৎ অশোকের একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিলে। ফিস্‌ফিস করে বললে, অশোকবাবু!

শিউরে উঠে অশোক বললে, বলুন।

—এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

—বেশ তো, থাকুন।—চারিদিকে তাকিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কথা ভাবল অশোক, পারল না। বুলা বললে, কোথায় থাকব?

অশোক নিজেই কথাটা বললে, না তার কানে কানে আর কেউ ওটা বলে দিল, অশোক টের পেল না। মৃদু গভীর গলায় বললে, বেশ তো থাকুন আমার কাছেই!

কথাটা শেষ হতে না হতেই বুলা ছুঁড়ে দিল অশোকের হাতটা। এত জোরে, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে যে, অশোকের মুখের ওপর যেন বুলার একটা চড় পড়ল এসে।

—পাহাড়ে থেকে থেকে আপনারা সত্যিই বুনো হয়ে গেছেন—মেশা যায় না আপনাদের সঙ্গে।—সাপের ছোবলের মতো তিক্ত তীক্ষ্ণ শব্দ একটা। চকিতে অশোক তাকিয়ে দেখল—হনহন করে সে সম্পূর্ণ উলটো দিকে হেঁটে চলেছে এবার, হাতের সানাই ফুলটা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে।

নীচ থেকে আবার একরাশ কুয়াশা কুণ্ডলিত হয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। অশোক অনুভব করল, বুলার ভেতরেও এই আলো আর কুয়াশার একটা খেলা শুরু হয়ে গেছে।

সাত

ডাক্তার জানতে চাইল : আসব ?

পর্দার ওপার থেকে সাড়া এল : আসুন।

বালিশে একটা কনুই রেখে, গলা পর্যন্ত লাল কম্বলটা টেনে দিয়ে আধ-শোয়ার মতো বসেছিল সাইলি। ডাক্তার ঢুকতেই উঠে বসবার চেষ্টা করল। ডাক্তার বললে, বসবার দরকার নেই। শুয়েই থাকুন।

—শুয়ে তো আছিই সারাদিন।—সাইলি মলিন হাসি হাসল : একটু বসি এখন।

ডাক্তার সামনের চেয়ারটায় আসন নিলে। তারপর কনকনে খানিকটা বাতাসের ছোঁয়ায় চমকে উঠল হঠাৎ।

—ও কী করেছেন ! খুলে রেখেছেন কেন জানলাটা ?

—অনেকখানি আলো আসছে ডাক্তারবাবু—আর অনেকখানি হাওয়া। দেখুন—কতদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে !

—কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে।

—ঠাণ্ডায় আমার আর ভয় নেই ডাক্তারবাবু—কতটুকু আর ক্ষতি করবে !

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ডাক্তার, সাইলির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। মনে হল : সেই ভালো। পৃথিবীর সব রঙ মুছে যাওয়ার আগে চোখ ভরে একবার আলো দেখে নিক মেয়েটা, সব বাতাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের বুকের ভেতরটা ভরে নিক হাওয়ায়।

—ক্যাপ্টেন কোথায় ?—একটু পরে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

—সকালের বাসে দার্জিলিং গেছে—পেন্‌সন্‌ আনতে।

—তার মানে একরাশ মদ গিলে ফিরবে সন্ধ্যাবেলায়।

সাইলি হাসল। সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি।

—কী আর করবে ? একটা কিছু নিয়ে তো ওর থাকা চাই।

—বিয়ে-থা করুক, ঘর-সংসার করুক।—উপদেশের ভঙ্গিতে বললে ডাক্তার। কিন্তু কথাটা এত বেসুরো শোনালো যে নিজের কানেই খারাপ লাগল তার। ক্যাপ্টেনের অভিভাবক সে নয়।

—বিয়ে ও করবে না। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মেয়েদের ওপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে। বলে, দেখেছি জাতটাকে। ছিঃ ছিঃ—ওদের নিয়ে ঘর করা যায় ! আর

আমাকে বলে, যেগুলো ভাল হয়, সেগুলো হয় আবার তোর মতো বেকুব। কী হবে ঝামেলা বাড়িয়ে? বেশ তো আছি।

সত্যিই বেশ আছে এরা—ডাক্তার ভাবল। একজন পুরুষ জাতকে ঘৃণা করে—আর একজন মেয়েদের ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে আছে। আর তিলে তিলে মরে যাচ্ছে দুজনেই। টি-বি-তে আর অ্যাল্‌কোহলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, কোটের কলার তুলে দিল ডাক্তার। দূরের পাহাড়ের মাথায় রোদ জ্বলছে, নীচের সবুজ অরণ্যে থমকে আছে কুয়াশা। লামার মন্দির থেকে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ। ওই ঘণ্টার ধ্বনিটা আশ্চর্য গভীর আর অর্থবহ বলে মনে হল ডাক্তারের।

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল ডাক্তার। তারপর ফিরে এল নিজের জগতে।

—আজ সকালে টেম্পারেচার কত?

—সেই একশো এক।

একটু কাত হয়ে বসল সাইলি আর জানলা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়ল মুখে। রুক্ষ চুল লাল হয়ে উঠল, শীর্ণ শুকনো মুখের উপর কৃত্রিম রক্তের উচ্ছ্বাস দুলে উঠল খানিকটা। শী ইজ টু ইয়ং—টু ইয়ং ফর ডেথ্‌।

—ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক মতো?

—খাচ্ছি। কিন্তু খেলেই বা কী হবে ডাক্তারবাবু? আপনি নিজেই জানেন—

দুটো বিষণ্ণ চোখ সাইলির মুখের উপর কিছুক্ষণ মেলে রাখল ডাক্তার। তারপর আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁ, জানি। জানি—জীবনটা কত দামী জিনিস। আর জানি কী তার শক্তি—কিছুতেই সে হার মানে না।

—আর যখন হেরে বসে আছে?—সাইলি ঠিক হাসল না, মৃদু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোণায় বাঁক নিলে একটু। ডাক্তারের মনে পড়ল, দার্জিলিঙে কেম্‌ব্রিজ পর্যন্ত পড়েছিল সাইলি, তারপর পৃথিবীটাকে অনেক বেশি সে দেখেছে, অনেকখানি বুঝতে পেরেছে। বড্ড তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গ হয়েছে তার।

—হারতে সে জানে না।—ডাক্তার পকেট থেকে চুরুট বার করতে যাচ্ছিল, সেইখানেই মুঠো করে ধরল হাতটা। যেন নিজের বিশ্বাসটাকেই কঠিনভাবে আঁকড়ে রাখতে চাইছে।

—তার মানে আমি বাঁচব?

—আপনাকে বাঁচতেই হবে।

সাইলির ঠোঁটের বাঁকা রেখাগুলো মিলিয়ে গেল, করুণ বেদনা ঘনিয়ে এল

—ডাক্তারবাবু, আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে কী লাভ ? দাদা রাগ করে—তাই ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু আমি তো জানি—

—না, আপনি জানেন না।—ডাক্তারের স্বর শক্ত হয়ে উঠল : আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আপনাকে আমি বাঁচাব।

—কিন্তু বেঁচে আমার কী লাভ ? আমি তো বাঁচতে চাই না।

সাইলির রুক্ষ চুলে লাল আলোর ঝলক—শীর্ণ মুখের উপর রক্তের সেই কৃত্রিম উচ্ছ্বাস। লামার মন্দিরে সেই গভীর গম্ভীর ঘণ্টার শব্দ। ডাক্তার প্রায় নিঃশব্দ কোমল গলায় বললে, আমার লাভ আছে।

সাইলির চোখ চমকে উঠল। একবার নড়ে উঠল সে। ভয়ের ছায়া দুলে গেল মুখের উপর দিয়ে।

—ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। সবল, উত্তপ্ত একখানা হাত একবার রাখল সাইলির কপালে। তারপর অনেক কথা যেন এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে এমনিভাবে কিছুক্ষণ করুণ আর তৃষার্ত দৃষ্টি মেলে রাখল সাইলির চোখে। পাথর হয়ে বসে রইল সাইলি।

এক মিনিটেরও কম।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো ডাক্তার। মুখ ফিরিয়ে বললে, আবার কাল আসব। তোমাকে আমি বাঁচাবোই।

দু'হাতে চোখ ঢাকল সাইলি। তারপর মুখ গুঁজল বালিশে। কাঁদছে।

সে কান্নায় বাধা দিলে না ডাক্তার। ফিরে এল বিছানার কাছে। জানলাটা বন্ধ করে দিলে, তারপর লাল কম্বলটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে সাইলির। আবার বললে, কাল আমি আসব।

ডাক্তার বেরিয়ে গেল। আর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সাইলির মনে হতে লাগল : কলকাতার ফিল্ম-স্টুডিয়োতে যেন আবার একটা নতুন ছবিতে অভিনয় করতে নেমেছে সে। সেই ভয়, সেই উত্তেজনা, রক্তের ভিতর সেই ঢেউ ; চারদিকটা কেমন অবাস্তবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—একরাশ তীব্র আলো আশপাশ থেকে তার উপরে এসে পড়েছে, মোটা গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে : মনিটার !

দিন তিনেক কোনো ঘটনা ঘটল না অশোকের পোস্টমাস্টারির জীবনে। বুলার দেখা পাওয়া গেল না—অনুপমেরও না। অনুপম এমনিতেই অসামাজিক—নিজের বই আর কতগুলো লতাপাতার মধ্যে ডুবে থাকে। ভদ্রতা রাখত বুলাই। কিন্তু তিনদিন ধরে বুলাও আর আসছে না।

খুব সম্ভব দাদার কাজে সে সাহায্য করছে—নোট তৈরী করেছে তার জন্যে। সেই ভালো। একটা আলাদা বৃত্তের মধ্যে ওরা বাস করে—সে ওদের নিজস্ব জগৎ। সেখানে আর কাউকে যেমন ওরা চায় না, তেমনি ওদের ভেতরে যারা গিয়ে পড়বে তারাও শান্তি পাবে না কেউ। নিজেদের নিয়েই ওরা থাকুক।

কিন্তু ওরা না এলেই বোধ হয় ভালো করত ছাউনি-হিলে। এই পাহাড়—এই মেঘ—এই ঝর্ণা—এরা সবাই মিলে একটা আলাদা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানকার মানুষ এর মধ্যে মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের. এখানকার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। কিন্তু ওরা এখানে একান্ত বেমানান। নিজেরাই শুধু বাইরে থেকে এসেছে তা নয়—বাইরের একটা জটিল মনকেও ছড়িয়ে দিয়েছে ছাউনি-হিলের হাওয়ায় হাওয়ায়।

ওদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের এখানে না থাকাই ভালো। এই পাহাড়ে ওরা অনধিকারী। ছন্দ ভেঙে দিয়েছে—সুর কেটে দিয়েছে।

ডাক নিয়ে চলে গেছে সবাই। সরোজ, শৈলেশ, চ্যাটার্জি—সকলেই। শুধু ডাক্তার আসেনি—কৌশিকও না। বারো নম্বরের আজও খান দুই চিঠি ছিল, অশোক আগেভাগেই সে-দুটো পাঠিয়ে দিয়েছে কাঞ্চার হাত দিয়ে। বুলা এসে এখানে হাজির হয়—তা আর সে চায় না। মেয়েটাকে দেখলে এখন তার শুধু ভয় করে না—অস্বস্তিও বোধ হয়। সেই ছেঁড়া সানাই ফুলের সকালটি তার মনের উপরে চেপে বসে আছে।

আজ শুধু একটা আশাপ্রদ খবর আছে। দুখানি চিঠি পেয়েছেন শৈলেশ। একখানা স্ত্রীর কাছ থেকে—আর একখানা ছুটির মঞ্জুরী।

শৈলেশের প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজ বলেছে, দাদা—খাওয়াও।

শৈলেশ ছেলেমানুষের মতো লজ্জা পেয়ে বলেছেন, কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

চ্যাটার্জি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে একটা।

—কলকাতায় পুরো লীগের খেলা চলেছে এখন। শৈলেশদা মজা করে খেলা দেখবে। খবরের কাগজ আর রেডিয়ো ছাড়া কোনো সান্ত্বনাই রইল না আমাদের।

শৈলেশ বহুদিন পরে সরস হয়ে উঠেছেন : আরে রেখে দাও খেলা। খেলা তো নয় যেন কম্যুনাল রায়ট। ও কি ভদ্রলোকের জিনিস ? দেদার নতুন ফিল্ম এসেছে কলকাতায়—প্রাণ ভরে ছবি দেখব !

—বৌদিকে নিয়ে নিশ্চয়ই ?—সরোজের জিজ্ঞাসা।

—আলবৎ। সস্ত্রীকো ধর্ম্মাচরেৎ !—খুশিতে জলজলে মুখে শৈলেশ বলছেন : তোমাদের মতো স্বার্থপর নাকি আমরা ?

অশোক বসে বসে শৈলেশের পরিতৃপ্ত মুখের কথাই ভাবছিল। কয়েক দিন পরেই শৈলেশ চলে যাবেন—এক মাসের ছুটি আপাতত—তারপরে হয়তো ট্রান্সফার হয়ে যাবেন, আর হয়তো ফিরেই আসবেন না ছাউনি-হিলে। আর অশোককে কতদিন এখানে পড়ে থাকতে হবে কে জানে! এই দীর্ঘ বিলম্বিত মন্থর দিনগুলো, এই মেঘ বৃষ্টি—

নাঃ, সত্যিই আর থাকা যায় না ছাউনি-হিলে। এবার তাকেও বদলির চেষ্টা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কলকাতার একটা সুদূর আকর্ষণে তার নাড়ীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

শেল্‌ফ থেকে কবিতার বই টেনে নিলে অশোক। খুলতেই কয়েকটা লাইন ভেসে উঠল চোখের সামনে। গভীর নিরাশা আর একান্ত শূন্যতা যেন একরাশ কালো হরফের মধ্য দিয়ে ঠিকরে এল চোখের সামনে:

"Ce pays noun ennuine, O' Mort ! Appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l' encre—"

'এই দেশ আমাদের ক্লান্ত করে তুলছে—হে মৃত্যু, আমাদের প্রস্তুত করো। রাত আর সমুদ্র যেন কালির মতো নিবিড় কালো—'

এই দেশ ক্লান্ত করে তুলছে—হে মৃত্যু! কিন্তু অশোক তো মৃত্যুকে চায় না। পরের লাইনে আসতেই তার চোখ থমকে গেল:

"Nos Coeurs que tu connais sont remplis de rayons !"

'হে বন্ধু, তবু তুমি তো জানো, সূর্যের আলোয় আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।'

—অশোকবাবু।

বুলার ডাক। ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠে দাঁড়ালো অশোক। ঠিক এই মানুষটিকেই সে কোনোভাবে প্রত্যাশা করেনি।

—আসুন।

বুলা পোস্ট্‌ অফিসের দরজায় পা দিলে। কোটের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপে বাঁধা একটা ক্যামেরা ঝুলছে। চোখে নীল গগল্‌স্‌।

বুলা বললে, আমি আসব না—আপনি আসুন।

—তার মানে? ছবি তুলতে এলেন নাকি? কিন্তু আমাকে ছাড়া কি আর সাব্‌জেক্ট্‌ পেলেন না ছাউনি-হিলে?—জোর করে সহজ হতে চাইল অশোক। বুলা যদি পারে, সেও পারবে।

বুলা ভ্রূ কোঁচকালো।

—আপনার ছবি তুলে ফিলিম নষ্ট করতে আমার বয়ে গেছে। একটা কোট-ফোট চাপিয়ে চটপট চলে আসুন। অনেক দূরে যেতে হবে। দাদা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে।

—দার্জিলিঙে বেড়াতে যাচ্ছেন ? তা আমাকে কেন ? যান না—ঘুরে আসুন।

—আঃ, বড্ড তর্ক করেন আপনি। পোস্ট্ অফিসের লোক আপনারা—পাব্‌লিকের সঙ্গে আর্গুমেণ্ট্ করা যে আপনাদের কোডে বারণ সেটা খেয়াল নেই বুঝি ? নিন, চলুন। হোল্-ডে প্রোগ্রাম।

—সে কি ! সব কাজ ফেলে !

—রবিবারে আবার কী কাজ ? বুলার সুন্দর মুখে বিরক্তির ছায়া পড়ল : ভেবেছেন, আপনার শেল্‌ফ্ আমি লক্ষ্য করিনি ? বসে বসে তো খালি ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ্ কবিতার বই পড়বেন। আল্‌সেমির চূড়ান্ত ! উঠুন শীগ্‌গির—

—স্টোভে ভাত চাপিয়েছি যে !

—সে রাজভোগ তো রোজই খাচ্ছেন, একদিন নয় বাদই পড়ল। ভয় নেই, উপোস করিয়ে রাখব না।

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু ! এমন বাজে লোক তো দেখিনি ! শুনুন—তিন মিনিট টাইম দিচ্ছি। এই ঘড়ি ধরলাম—তিন মিনিটের এক সেকেণ্ড বেশি দেরী হলে আপনার সাধের পোস্ট্ অফিসের সমস্ত কাগজপত্তর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। কোনো অপ্‌শন নেই।

—দেখুন, দার্জিলিং আমার একদম ভালো লাগে না।—বিব্রত ভাবে অশোক শেষ চেষ্টা করল : দয়া করে—

বুলা মণিবন্ধের ছোট্ট ঘড়িটির দিকে তাকালো।

—আধ মিনিট প্রায় হল। আর দু মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড। এর মধ্যে যদি তৈরী না হন তাহলে যত কাগজপত্র—

—সর্বনাশ, আমার চাকরি শেষ করবেন দেখছি !—অশোক সভয়ে বললে, দাঁড়ান দেখছি।

ঠিক দু মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ডে হল না, আরো মিনিট পাঁচেক লাগল। পিয়নকে ডেকে চাবিটা দিয়ে, স্টোভ নিবিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল অশোককে। একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল।

—ভাতটা গেল !

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচের রাস্তার দিকে নামতে নামতে বুলা বললে, আহা কী

দুঃখের কথা ! নিজের হাতের রান্না করা ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধর এমন অমৃত ফস্‌কে গেল আজকে। কিচ্ছু ভাববেন না। একটা মস্ত বেড়াল ঘুরঘুর করছে দেখলাম, সে-ই ম্যানেজ করে নেবে এখন।

গাড়ির সামনে অনুপম দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। হেসে বললে, ঠিক ধরে এনেছে তো আপনাকে !

—কী করা যায় বলুন ? আমার অফিস রেইড্‌ করতে যাচ্ছিলেন বুলা দেবী। চাকরির মায়াতেই আসতে হল।

অনুপম খুশি হয়ে বললে, খুব ভালো হয়েছে। চলুন।

অনুপমের পাশে দরজা খুলে উঠতে যাচ্ছিল অশোক, বুলা বললে, বাঃ, বেশ তো ! আমি একা বসে থাকব পেছনে। সে হবে না—ব্যাক্‌ সীটে আসুন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা করল অশোক। কিন্তু দ্বিধাটাকে অশোভন করে তোলার আগেই উঠে বসল পেছনে। বসল যথাসম্ভব দরজার ধার ঘেঁষে, যথাসম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে। অনুপম স্টার্ট দিলে গাড়িতে।

চিন্তার মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ তুলছিল অশোকের। সেই সানাই ফুল ছিঁড়ে ফেলার দুর্বোধ্য সকালটি। লামার মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ। বুলার মুখ লাল হয়ে উঠছিল, চোখ জলছিল অল্প অল্প—তার অর্থ আজও অশোক সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। আর কৌশিক ঘোষের বাড়িতে সেই বিশ্রী কাণ্ডটা। অতটা উগ্র, অতখানি উত্তেজিত হয়ে সেদিন ওঁদের ও-ভাবে অপমান করবার কোনো দরকার বুলার ছিল না। বুলাকে সে বুঝতে পারে না। রৌদ্র আর কুয়াশার একটা দুর্বোধ্য লীলা চলেছে এই মেয়েটির মনের ভেতর।

বুলা বললে, দাদা, আমার পাঁচ টাকার কথা যেন মনে থাকে।

হাসিমুখ ফেরালো অনুপম।

—সত্যি। অশোকবাবু যে আমার পাঁচটা টাকার ক্ষতি করিয়ে দেবেন ভাবতেই পারিনি।

বুলা বললে, বা রে, নইলে যে আমার টাকা যেত।

অশোক উৎকর্ণ হয়ে বললে, মানে ? আমি কী ক্ষতি করলাম অনুপমবাবুর ?

বুলা হেসে উঠল, দাদার সঙ্গে বাজী রেখেছিলাম। দাদা বলেছিল, অশোকবাবু কিছুতেই আসবেন না, তুই দেখে নিস। আমি বলেছিলাম ঠিক ধরে আনব তুমিও দেখে নিয়ো। দাদা বললে, পাঁচ টাকা বাজী।

—এই ব্যাপার ?—ছেলেমানুষির খুশিতে ভরা বুলার মুখের দিকে একবার তাকালো অশোক : জানলে আমি কখনো আসতাম না।

বুলা বললে, সে আর বলতে হবে না। আপনাকে খুব ভালো করে চিনে নিয়েছি আমি। আমার ক্ষতি করতে পারলে আপনি আর কিছুই চাইবেন না।

কথাটা বুলা হয়তো ভেবে বলেনি—ওর কোনো অর্থ নেই, কেবল বলবার জন্যেই বলা। তবু কেমন বেসুরো লাগল অশোকের কানে। সেই সানাই ফুল ছিঁড়ে ফেলা সকালটা। কতগুলি দুর্বোধ মুহূর্ত।

অশোক হাসতে চেষ্টা করল।

—ক্ষতি আপনার করাই উচিত। যে ভাবে আপনি আমার পোস্ট্ অফিসে রেইড্ করেছিলেন—

—বেশ করেছি। যে রকম লোক আপনি!

—খুব খারাপ লোক বুঝি?

সামনের পাহাড়ী পথের ওপর চোখ রেখে অনুপম বললে, কী হচ্ছে বুলু? ঝগড়া করবার জন্যেই কি তুই অশোকবাবুকে ডেকে আনলি?

—দাদা, তুমিও ওঁর দলে? পুরুষ জাতটাই এমনি কম্যুনাল!

স্বল্পভাষী অনুপম জবাব আর দিল না। তার চোখের দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হচ্ছে, সমস্ত মন এখন ব্রেক আর স্টিয়ারিঙের ওপর। বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে। ছাউনি-হিলের এরিয়া শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে জঙ্গল। পথের একদিকে পুরনো গ্রীক মন্দিরের থামের মতো জাপানী পাইনের সারি উঠেছে—ছড়িয়ে রেখেছে শীতল ঘন ছায়া। অল্প অল্প হাওয়ায় তার শুকনো কর্কশ পাতায় আওয়াজ উঠছে খরখরিয়ে। আর একদিকে টাইগার ফার্নের ঝোপ, থোকা থোকা ফুল, এলোমেলো বড় বড় গাছ। গ্রীন পিজিয়ন ডাকছে ডালে ডালে। এখান ওখান থেকে ছোট ছোট সর্পিল ঝর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়েছে—পথের উপর দিয়েই নেমে চলেছে রূপালি স্রোত।

হালকা আলোচনার খেইটা হারিয়ে গেল।

খানিক পরেই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বুলা।

—দেখুন—দেখুন—কী চমৎকার—

দেখবার মতোই বটে। একরাশ ফুলের পাপড়ি উড়ছে চারদিকে। যেন নানা রঙের সীজন ফ্লাওয়ারকে ছিঁড়ে মুঠোয় মুঠোয় উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। প্রজাপতি।

—ইস্, কী সুন্দর—কী সুন্দর!—বুলার খুশি উচ্ছলিত হয়ে উঠল: এসব দেখলে সত্যিই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

—বেশ তো, লিখুন না।

—সর্বনাশ, আমি লিখব কবিতা! একটা চিঠিই লিখতে পারি না ভালো করে। মানুষ যে কী করে এত কথা বানায় আর এমন সাজিয়ে সাজিয়ে লেখে—সে আমি

ভেবেই পাই না। তাই আপনাকে আমার হিংসে হয়।

—আমাকে হিংসে কেন?

—আপনি কবি।

অশোক চকিত হল।

—আমি কবি? এ খবর শুনলেন কার কাছ থেকে?

প্রজাপতির ঝাঁক ফিকে হয়ে এসেছে। আবার পাইন বনের ঘন গম্ভীর ছায়া, পথের ওপর আছড়ে পড়া ঝর্ণার ঝিলিমিলি। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে, সামনে আঁকাবাঁকা পথের ওপর সজাগ চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছে অনুপম। গাড়ির পেছনে তার দৃষ্টি রাখবার সময় নেই, কানও না। বরং পথের ধারে ধারে তার সন্ধানী চোখ রেয়ার হার্ব্‌সের খোঁজ করে চলেছে।

বুলা হেসে উঠল।

—ইচ্ছে করলেই কি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন? সরোজবাবু বলেছেন আমাকে।

সরোজ! একটা চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল অশোকের মন। সরোজকে ঠিক বিশ্বাস নেই। মুখ আলগা—যখন যা খুশি বলে ফেলে। আরো কিছু বলেছে নাকি বুলাকে? তার কাছে এসে যে-সব আবোল-তাবোল বকছিল, তার কোনো আভাসও দিয়েছে নাকি ওর কাছে?

অনিশ্চিত ভাবে একটু চুপ করে রইল অশোক। তারপর:

—আমি এখন আর কবিতা লিখি না।

—কেন লেখেন না?

—সে মনটাই বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছি।

—কী করে হারালেন?

আশ্চর্য ছেলেমানুষি প্রশ্ন। অথবা বুলার মনটাই বৈজ্ঞানিক। সব জিনিসকেই স্থূলভাবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝতে চায়। অশোক হাসল।

—কী করে হারিয়েছি বলতে পারব না। কিন্তু কবিতা আর আসে না। এখন ভাবি, একটা উপন্যাস লিখব কোনো সময়।

—উপন্যাস লিখবেন?—বুলার চোখ চকচক করে উঠল: লিখবেন আমাদের কথাও?

অশোক লঘু ভঙ্গিতে বললে, আপনাকেই না হয় সে উপন্যাসের নায়িকা করা যাবে।

—আমাকে নায়িকা? নায়িকা হওয়ার মতো কী গুণ আছে আমার?

—সে আপনি কেমন করে জানবেন ? নিজেকে কি কেউ দেখতে পায় ?

আবার চুপচাপ। একটা জবাব সহজভাবে বুলা দেবে—অশোক আশা করেছিল। কিন্তু বুলা কী ভাবছিল কে জানে—বাইরে চোখ মেলে বসে রইল কিছুক্ষণ। গাড়ি জঙ্গলের পথ ছাড়িয়ে উঠে এল ছ নম্বর বস্তির সামনে। বাঁ দিকের রাস্তা চলে গেছে ঘুম হয়ে দার্জিলিং, ডানদিকের রাস্তা এঁকেবেঁকে কালিম্পংয়ের যাত্রী।

গাড়ি এগিয়ে চলল ঘুমের দিকে। একপাশে খাড়া পাহাড়ের আড়াল, তার একদিকে অতলান্ত খাদ। সেই ফগ্-মাখানো শূন্যতার দিকে তাকালে মাথা ঘুরে আসতে চায়। সেই মহাশূন্যতার মধ্যে বাতাসের অদ্ভুত ধ্বনি উঠছে—যেন রুদ্র সৌন্দর্যের তারযন্ত্রে ঝঙ্কার তুলছে হিমালয়।

বিনা হর্ণে একটা বাস এমন আচমকা সামনে এসে পড়ল যে বিহ্বল অনুপম ব্রেক কষল প্রাণপণে। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল একটা, চিৎকার করে উঠল বুলা—দু হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল অশোককে। ডান পাশের খাদের এক হাতের মধ্যে গিয়ে গাড়ি থমকে দাঁড়ালো। মৃত্যুর হাতখানা ঠিক মাথার উপর নেমে এসেই পলকে সরে গেল।

এক মিনিট। দু মিনিট।

বাস দাঁড়ালো না—বেরিয়ে গেল দ্রুতগতিতে। দাঁড়ানো সুবুদ্ধির নয় ভাবল বাসের ড্রাইভার। পাথর হয়ে বসে থাকা অনুপম বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপাল মুছে ফেলল, এই শীতেও ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছিল সেখানে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বিবর্ণ হাসি হাসল : একটুর জন্য।

নিজেকে সামলে নিয়ে সরে বসেছে বুলা। কিন্তু সম্পূর্ণ ছাড়েনি অশোককে। তখনো ভরসা পায়নি, উষ্ণ, নরম ভয়ার্ত মুঠোর মধ্যে একখানা হাত চেপে ধরেছে অশোকের।

অশোকও হাসতে চেষ্টা করল : হাঁ, আর একটু হলেই একসঙ্গে সবাই মিলে ওপারে যাত্রা করা যেত।

অশোকের হাতে বুলার মুঠিটা কেঁপে উঠল একবার।

—দাদা, ফিরে চলো।

অনুপম বললে, সে কি ! দার্জিলিং যাব না ?

—না। দরকার নেই।

এবার অশোকের হাত বুলার হাতে এসে মিলল। নরম আঙুলগুলোতে আস্তে চাপ দিলে অশোক।

বললে, ভাবনা নেই। এক যাত্রায় দুবার অ্যাক্সিডেন্ট্ ঘটে না।

াং পর্যন্ত দুজনের হাত আর খুলল না। একটা নিঃশব্দ সন্ধির মতো মিশে রইল একসঙ্গে।

দার্জিলিঙের কথাই ভাবছিল অশোক।

সেই মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন সুর কেটে গিয়েছিল। বেড়ানো হল, খাওয়া হল, কিন্তু কেমন যেন ছায়া ঘনিয়ে রইল সব কিছুর ওপর।

তারপর বটানিক্‌স্।

আশ্চর্য নির্জন ছিল বটানিক্‌স্। ফুল আর গাছ আর ছায়া, আর রৌদ্র মেঘের আনাগোনা। অনুপমের মন এখানে এসে যেন মুক্তি পেয়েছিল খানিকটা, নিজের চেনা জগতের ভেতরে এসে গাছপালার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল সে—রাশি রাশি ল্যাটিন নামের মধ্যে তার কৌতূহলী চোখ মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। খানিক পরে বুলা বলেছিল, আর তো পারা যায় না দাদা! পা যে ব্যথা হয়ে গেল। তুমি এবার ঘোরো, আমরা এখানে এই বেঞ্চিতে বসি।

অনুপম বলেছিল, আচ্ছা বোস। আমি দশ মিনিট ওই রক্ গার্ডেনটা একটু ঘুরে আসি।

অনুপম চলে যাওয়ার পর অশোক আর বুলা বসেছিল পাশাপাশি। চারদিক আশ্চর্য নির্জন—আশ্চর্য সুন্দর। শুধু পাইনের পাতার মর্মর শব্দ। বুলা বলেছিল, অশোকবাবু—

—অশোক!

—কে? ভাবনা থামিয়ে চমকে অশোক ফিরে তাকালো।

ডাক্তার।

—খবর কী ডাক্তার? আসুন।

—কাগজটা নিতে এলাম। চিঠিপত্র আছে নাকি কিছু?

—বসুন, দিচ্ছি—দ্রুত সরে গেল অশোক—নিজের মনের ছায়া পড়েছে মুখে, ডাক্তারের দৃষ্টি এড়ানো দরকার।

উঠে গিয়ে অফিস থেকে অশোক ডাক্তারের ডাক নিয়ে এল। খুঁজতে এবং গুছিয়ে নিতে দেরী হল মিনিট পাঁচেক। এসে দেখল, ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছে—কেমন নিবিড় চিন্তায় মগ্ন। অশোকের মনে হল, ভালোই হয়েছে—ডাক্তার তার দিকে লক্ষ্য করেনি।

অশোক বললে, এই নিন।

পরমাশ্চর্য ব্যাপার, কাগজটা পেয়েই লুব্ধের মতো ডাক্তার তাঁজ খুলল না।

সেটা কোলের ওপর ফেলে রেখে, ঘরের ম্লান আলোর মধ্যে মুখের ধোঁয়া রিং করে করে ছেড়ে দিতে লাগল।

অশোক বললে, কী ভাবছেন?

ডাক্তার বললে, বোসো, কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ছেঁড়া ইজিচেয়ারটায় ব্যালান্স করে অশোক বসল: কী হয়েছে?

—তুমি ফিল্ম স্টার মিস্ আলেয়ার নাম শুনেছ?

—ফিল্ম-স্টার!—কথাটা অশোক যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ভূতের মুখে রাম-নামের চাইতেও কথাটা ভয়াবহ মনে হল তার। ডাক্তার চাইছে ফিল্ম-স্টারের খবর! জীবনে দু-তিন বারের বেশি যে সিনেমা দেখেছে কিনা সন্দেহ!

—আপনি ফিল্ম-স্টারের কথা বলছেন দাদা?

ডাক্তার ধোঁয়ার রিঙের দিকে চোখ রেখেই বললেন, হুঁ—আলেয়া দেবী।

—আলেয়া দেবী!—অশোক হা হা করে হেসে উঠল: দাদা, এখানে আপনাকেই তো সবচেয়ে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বলে জানতাম। শেষকালে আপনারও এই অধোগতি! আপনিও কিনা আলেয়ার পেছনে ছুটতে শুরু করে দিলেন! আমরা আর কার ওপরে ভরসা রাখি বলুন তো।

ডাক্তার কিন্তু কুণ্ঠিত হল না। গভীর বিষণ্ণতায় তার চোখ মুখ ভরে গেছে।

—তুমি তার ফিল্ম দেখোনি?

—না। কাগজে দু-একবার হয়তো নাম দেখে থাকব। যতদূর মনে হচ্ছে, খুব উজ্জ্বল কোনো তারকা নয়।

—ওঃ!—ডাক্তার চুপ করে রইল।

—কী হয়েছে বলুন তো দাদা? যেন রহস্যের খাসমহল সৃষ্টি করছেন একটা।

ডাক্তার একবার বাইরের দিকে তাকালো। ছাউনি-হিলে বিকেলের ছায়া। পোস্ট্ অফিসের সামনে একটা শীর্ণ ডালিম গাছে একরাশ ফুল ধরেছে। সিগারেটটায় আরো দুটো একটা টান দিয়ে, শেষ হওয়ার আগেই সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে ডাক্তার বললে, ফিল্মের মেয়েরা খুব খারাপ হয়—তাই না?

অশোক হাসল: আপনি কি ওদের জন্যে স্যাল্ভেসন আর্মি খুলছেন ডাক্তার?

—ঠাট্টা কোরো না। ওরা কি খুব খারাপ হয় বাস্তবিক?

—দাদা, এসব কূট প্রশ্ন আমাকে কেন? সাধারণ ভালো-মন্দের স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে মানুষকে আমি দেখি না। তবে চল্তি অর্থে যদি বলেন, ওদের অনেকেই সেদিক থেকে খুব নির্মল থাকে না—এটা অনেকের মুখেই শুনেছি।

—ওরা কি ভালো হতে পারে না?

—পারে বইকি। মানুষ তো ভালো হতেই চায়।—অশোক খানিকটা বাঁধা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে, শুধু ভালো হওয়ার সুযোগ দিতে হয় মানুষকে—সেইটেই আসল কথা। এক যারা শারীরিক ডিফেক্‌ট নিয়ে জন্মেছে, কিংবা মনস্তাত্ত্বিক কারণে যারা পুরো ক্রিমিন্যাল হয়ে দাঁড়িয়েছে—তারা ছাড়া সবাই-ই ভালো হতে পারে দাদা —একেবারে আপনার-আমার মতো ভদ্রলোক হতে পারে। কিন্তু আমি মিথ্যেই বকে মরছি, এ-সব আমার চাইতে ঢের বেশি করে জানেন আপনি।

—ফিল্ম-স্টারকে বিয়ে করা চলে ?

—দাদা !

অশোক যেন আছড়ে পড়ল আকাশ থেকে।

—সত্যিই কি আপনি বিয়ে করবেন নাকি ? ফিল্ম-স্টারকে ?

—তাই ভাবছি।

—মিস্ আলেয়াকে ?

—সেই রকমই তো ইচ্ছে।

—কোথায় পেলেন তাকে ?—ডাক্তার কি ঠাট্টা করছেন তাকে ? অশোক ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ডাক্তারকে যতখানি সে জানে ঠিক এই ধরনের ঠাট্টার অভ্যাস তো তার নেই।

ডাক্তার সংক্ষেপে বললে, মেয়েটা ক্যাপ্টেনের বোন।

—অ্যাঁ !

ছেঁড়া ইজি চেয়ারটাকে অনেকখানি ব্যালান্স করে বসে ছিল অশোক, এবার সে ব্যালান্স আর রাখতে পারল না। পট্ পট্ করে একটা আওয়াজ হল—সময়মতো তড়াক করে দাঁড়িয়ে না উঠলে ছিঁড়ে নীচে পড়তে হত তাকে।

ডাক্তার বললে, তার নাম সাইলি।

—মাই গড্ ! দাদা—এ যে রীতিমতো নাটক !

—তাই বটে !—ডাক্তার বাইরের ডালিম গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল, কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে এসেছে তার চোখের দৃষ্টি। অশোক লক্ষ্য করে করে দেখল সে মুখে পূর্বরাগ নেই—রোমান্স্ নেই—কোনো রক্তের চঞ্চলতাও নেই। শুধু বেদনার কোমল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মুখ।

অশোক বললে, তা হলে বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

—হয়তো হবে না। হয়তো কেন, না হওয়ার সম্ভাবনাই ষোলো আনা। মেয়েটার টি-বি। সব শেষ করে দিয়ে এখানে এসেছে।

—দাদা ?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কী জানো অশোক? তবু যেন কোথাও আশা আছে একটা। বাঁচবে না ঠিকই—তবুও বেঁচে যেতে পারে। কত অলৌকিক ঘটনাই তো ঘটে—ঘটুক না আরো একটা। সংসারে তাতে তো কারো কোনো ক্ষতি নেই। —ডাক্তারের গলার স্বর ভিজে ভিজে হয়ে এল: তুমি বিশ্বাস করবে, গত দু'দিন থেকে মেয়েটা বেশ ইম্‌প্রুভ করছে?

অশোক টেবিলের কোণা ধরে মূঢ়ের মতো চেয়ে রইল।

ডাক্তার বলে চলল, এমনও হতে পারে—আর তাই হওয়াই সম্ভব—হয়তো নেভবার আগে ওটা শেষ দীপ্তি। কিন্তু উল্‌টোটাও কি সম্ভব হয় না অশোক? শি ইজ টু ইয়াং—শি ইজ টু গুড্‌। একবার ভুল করেছিল, কিন্তু আজও সে ভুল শোধরাবার সময় আছে। এত তাড়াতাড়ি ওকে মরতে দেব কেন অশোক? কেন মরতে দেব?

কেন মরতে দেব? সে কথা ঠিক। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি আমরা? সমস্ত কামনা, সমস্ত আকুলতা—এমন কি সমস্ত বিজ্ঞান দিয়েও? সারা দেশের মানুষের আকুল ভালোবাসা দিয়েও কি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে ঠেকাতে পেরেছি আমরা?

—চেষ্টা করুন দাদা।—অশোক বলতে পারল কেবল। এক সময়ে নারী সম্পর্কে সে বোদলেয়ারের শিষ্য ছিল, কিন্তু আজ সে কথা সে আর ভাবতেও পারে না।

—চেষ্টা করব বইকি।—ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠল: জগতে অনেক মিরাক্‌ল ঘটে গেছে অশোক, আজও আর একটা ঘটতে বাধা নেই। আমি হাল ছাড়ব না।—দরজার দিকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, লেট্‌ মি ট্রাই!

অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে ডাক্তারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তারপর আরো প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেলে মনের বিমূঢ় অবস্থাটা স্বাভাবিক হয়ে এলো অশোকের। অদ্ভুত এই ছাউনি-হিল! এর একটা নিজস্ব প্রভাব আছে—আছে সহজ অকৃত্রিমতা। মানুষের মনে এ মিরাক্‌লের আশা নিয়ে আসে—এর ঘন গভীর অরণ্য যেন আদি সৃষ্টির অসংখ্য বিস্ময়কর বস্তুকে নিজের মধ্যে রেখেছে প্রচ্ছন্ন করে। যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে সেখানে। সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা অতিকায় মন্দির—এর স্তব্ধ রহস্যঘনতার আড়াল থেকে যে-কোনো সময় কোনো অশরীরী কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে গ্রীক-যুগের 'ওর‍্যাক্‌ল'!

আর ডাক্তার তারই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে চলেছেন!

সামনে মৃত্যু—অন্ধকার: **O Morte**! তার নির্ভুল আবির্ভাব। তবু ডাক্তারের মন বলছে—**"Sont remplis de rayons!"**

আশ্চর্য ! অনুপম তো এখানে দুর্মূল্য লতাপাতার গবেষণা করে বেড়াচ্ছে। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে পড়া হিমালয়ের আশ্চর্য বনৌষধি শুধুই কি গল্প-কাহিনী ? তার মধ্যে কোথাও কি কোনো সত্য নেই ? তেমনি একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারে না অনুপম—বাঁচাতে পারে না সাইলিকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অশোক উঠে দাঁড়ালো।

ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। মাথাটায় ঝিম ধরেছে। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের খানিকটা সর্বাঙ্গে মেখে নিতে ইচ্ছে করছে। কোথাও ঘুরে আসা যাক।

কোথায় যাবে ? যেখানে হোক। এই ছাউনি-হিলে নির্জন জায়গার অভাব নেই। যেখানে খুশি যে-কোন একটা ঝর্ণার কাছে চুপ করে বসে থাকা যায়, দেখা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ সানাই ফুল, লতানে গোলাপ আর হাইড্রেন্‌জিয়ার বুকে পাহাড়ী মৌমাছি আর প্রজাপতির আনাগোনা, মনকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে দূরের পাহাড়ে ঘুমন্ত বনের ওপর স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ানো মেঘগুলোতে।

হাঁটতে হাঁটতে এমনি একটা জায়গাতেই এসে বসল অশোক।

ছাউনি-হিলের ক্ষণ-যৌবনের দিনগুলিতে কে যেন এর নাম দিয়েছিলেন "লাভার্স পার্ক"। নামটা সেদিন একেবারে মিথ্যেও ছিল না, অশোকের মনে হল। অনেক টুকরো টুকরো রোম্যান্টিক কবিতা সেদিন এখানে গুঞ্জন করেছে। কলকাতার ভিড়ে অনেক দূরে যারা ছিল, এখানে এসে মিলে গেছে তাদের মন। এখানকার ছায়া ছড়ানো গাছগুলো, ঝর্ণার জল, ক্বচিৎ কখনো এক-আধজন মানুষের আসা যাওয়া সব তারই অনুকূল।

একটা কালভার্টের উপর চুপ করে বসেছিল অশোক। নিচে পাথরে পাথরে নেচে চলেছে ঝর্ণা, কয়েকটা চাতক পাখা নেড়ে স্নান করে গেল। কালো রঙের বড় একটা পাখি লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হল ঝোপের ভিতর। ঝর্ণার একটানা স্রোতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অশোক ভাবতে লাগল, কী অসম্ভব দুরাশার পেছনেই ছুটেছে ডাক্তার ! সাইলিকে বাঁচাবে !

আশ্চর্য এই ছাউনি-হিল, আশ্চর্য এই অরণ্য, আশ্চর্য এখানকার মোহ। এখানে সব কিছু কল্পনা করা চলে, সব কিছুকে বিশ্বাস করা যায়। এ সমতলের জগৎ নয়—যেখানে পরিচয় আর সত্যের বাঁধনে জীবনটা বাঁধা—যেখানে মির‍্যাকলের কোনো সম্ভাবনাকেই মনে জায়গা দেওয়া যায় না। দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে এখানে কোন্‌ অলৌকিক অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না, এখানকার নিবিড় বনের মধ্যে কোথায় মৃতসঞ্জীবনী লতাটি একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়ে বসে আছে তার সন্ধান এখনো কেউ পায়নি।

ডাক্তারেরও আশা করতে দোষ নেই।

উপন্যাস লিখতে পারা যায় একে নিয়ে। নইলে মহাকাব্য। কিন্তু মহাকাব্য লিখবার শক্তি অশোকের নেই—উপন্যাসের চেষ্টাই সে করতে পারে বরং।

আর তখন দার্জিলিংয়ের কথা তার মনে পড়ল। সেই বটানিক্‌সের কথা।

সাজানো ফ্লাওয়ার বেডে অসংখ্য মণি-মানিক্যের মতো ফুলের উৎসব। ছোট এক টুকরো জলের ভিতর আধফোটা লাল শালুক।

বুলা বলেছিল, আমাকে উপন্যাসের নায়িকা করবেন ? কতটুকু জানেন আমার ?

—বেশি জানি না। আর সেইটেই তো সুবিধে। যত খুশি রঙ চড়াতে পারব কল্পনার ওপর।

বুলার হাতখানা পাশেই পড়ে ছিল অশোকের। প্রবল প্রলোভন সত্ত্বেও অশোক সে হাতখানাকে মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে পারল না। চলন্ত মোটর নয়—অ্যাক্‌সিডেন্টের ভয় আর নেই। সাহস হল না।

বুলা চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, জানেন আমাদের মা নেই।

অশোক চমকে উঠল।

—সে কি ! তবে সে প্রথম দিন—

—সৎমা। আমার দশ বছর বয়েসের সময় আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন।

অশোক শুনতে লাগল। বুলা তেমনি আস্তে আস্তে বলে চলল, নতুন মা ঘরে এলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই বাবা বুঝলেন কতবড় ভুল করেছিলেন তিনি। নতুন মা বাবাকে ভালবাসতে পারেননি কোনদিন—তাঁর মন অন্য কোথাও বাঁধা ছিল। তবু কেন যে তিনি বাবাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন আমি আজও জানি না।

অশোক অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। এ কাহিনী তার শোনবার বোধহয় দরকার ছিল না—বুলাও হয়তো না বললেই পারত। কিন্তু বাধাও দিতে পারল না। বুলা বলে চলল।

—বাবা মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ক্লাবে যাওয়ার নেশা তাঁর বড্ড বেশি বেড়ে উঠল—মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে মদের যে অভ্যেসটা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইটেই আবার নতুন করে ঝালিয়ে তুললেন। রাত্রে প্রায়ই বারোটা-একটায় ফিরতেন তিনি। তা-ও স্বাভাবিক অবস্থায় নয়।

বাবার তো ক্লাব ছিল, কিন্তু আমরা দুই ভাই বোন ? বাবাকে সামনে পেতেন না বলেই বোধ হয় নতুন মার যত জ্বালা, যত রাগ সব এসে আমাদের ওপরে পড়ত। দাদাকে তো দেখছেনই, কেমন শান্ত, নিরীহ মানুষ। অকারণেই নতুন মা তার ওপরে অত্যাচার আরম্ভ করলেন। খেতে দিতেন না, যখন-তখন মারধোর

করতেন। আমাকে অবশ্য বেশি ঘাঁটাতে সাহস করতেন না, আমার চোখ দেখেই হয়তো বুঝেছিলেন যে এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। তবে গালাগালিতে কোনো ত্রুটি ছিল না।

আমাকে যা খুশি বলুন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু দাদার ওপরে তাঁর উৎপাত মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। নিরীহ দাদা প্রতিবাদ করত না, ঘরের কোণে লুকিয়ে চোখের জল ফেলত। বাবাকে বলে কোন লাভ হবে না জানতুম—তিনি মাকে একটা কথা বলতেও সাহস পাবেন না। তাই ঠিক করলুম দাদাকে আমিই রক্ষা করব। আমরা দুজন ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই—বারো বছর বয়েসের সময়েই এই সত্যটা আমার মনের কাছে ধরা দিয়েছিল।

বুলা একটা মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—যে বয়েসে মেয়েরা প্রজাপতির মতো খেলা করে বেড়ায়, সেই বয়েসেই মনের ভেতর আমি গম্ভীর আর অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলুম। মনে হয়েছিল মা বেঁচে থাকলে যা করতেন, তাই আমাকেও করতে হবে। দাদাকে বাঁচাতে হবে যেমন করে হোক।

তারপর চরম কাণ্ড হল একদিন।

দাদা ম্যাট্রিক দেবে—ক'দিন বাদেই তার পরীক্ষা। ভালো ছাত্র—সিনিয়ার স্কলারশিপ পাওয়ার আশা রাখে। সন্ধ্যেবেলা সবে পড়তে বসেছে, এমন সময় নতুন মা এসে ফরমাস করলেন, তাঁকে তখুনি বাপের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে—ব্যারাকপুর।

শান্ত, ভালো মানুষ দাদারও সহ্য হল না। আপত্তি করলে।

নতুন মার চোখে আগুন ধরল। বাবার কুকুর-মারা চাবুকটা এনে দাদার পিঠের ওপর চালাতে আরম্ভ করলেন হিংস্রভাবে। পনেরো-ষোল বছরের ছেলের গায়ে কেউ ওভাবে হাত চালাতে পারে, অন্তত কোনো মেয়ে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। দাদা দু'হাতে মুখ গুঁজে চোরের মার সহ্য করতে লাগল।

কিন্তু আমি সইতে পারলুম না। আমার রক্ত অত ঠাণ্ডা নয়। দাদার টেবিল থেকে একটা কাচের ফুলদানি তুলে আমি নতুন মার দিকে ছুঁড়ে দিলুম। দু'হাতে কপাল চেপে বসে পড়ল নতুন মা—রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল আঙুলের ফাঁকে।

ভেবেছিলুম, বাবা ফিরে এলে অনেক দুর্গতি আছে অদৃষ্টে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই ঘটল না। নতুন মা নিজেই বোধ হয় সমস্ত জিনিসটাকে চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন।

আর সেই থেকেই নতুন মা আমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিলেন।

আমি বুঝেছিলুম, যা করবার আমাকেই করতে হবে। সেই থেকে বাঘিনীর মতো পাহারা দিয়েছি দাদাকে। নতুন মার চোখ অক্ষম হিংসায় ধক্ ধক্ করেছে;

আমার দিকে তাকিয়ে, প্রত্যেক দিন আমার মৃত্যু কামনা করেছেন হয়তো। দাদার গায়ে কখনো হাত তোলবার সাহস পাননি আর।

বুলা সম্পর্কে রহস্যের পর্দাটা সরে গেছে চোখের সামনে থেকে। অনেকগুলো সংশয়ের সমাধান হয়ে গেছে। খুলে যাচ্ছে কতকগুলো জট—যেগুলো অশোককে পীড়ন করছিল অনবরত।

বুলা বললে, সেই থেকে আজও আমি দাদাকে রক্ষা করে আসছি। জানেন, বাবা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন আমি নিজে অ্যাটর্নি ডাকিয়ে বাবাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিয়েছিলুম। আমি জানি—এ সব কথা শুনে আমার ওপরে হয়তো আপনার —কিন্তু এ ছাড়া আমাদের বাঁচবার—দাদাকে বাঁচানোর কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাইনি সেদিন।

বুলার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন। উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে গাল।

—আজও আমার দাদাকে পাহারা দিতে হয়। আজও কোনো মেয়ে দাদার কাছাকাছি এলে আমি তার দিকে সন্দেহের চোখ মেলে তাকাই। নতুন মা এখন শান্ত আর নিরুপায় হয়ে গেছেন, তিনি জানেন আজ তাঁর দু-মুঠো খাবার সংস্থানও আমাদেরই হাতে। কিন্তু তাঁর মতো অন্য মেয়ের তো অভাব নেই সংসারে। আমার নিরীহ ভালোমানুষ দাদাকে নির্যাতন করবার জন্যে কোথায় যে কে তৈরী হয়ে আছে—কে বলতে পারে। তাই—

বুলা হঠাৎ চুপ করে গেল। চেপে ধরল অশোকের হাত।

—অশোকবাবু, কতদিন দাদাকে পাহারা দেব আমি? কবে আমার মুক্তি?

—আপনি নিজে মুক্তি নিলেই মুক্তি। অনুপমবাবু এখন বড় হয়ে গেছেন, ওঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই।

—না না, আপনি জানেন না! দাদা যে কত দুর্বল, অসহায়—

বলতে বলতে বুলা হাত সরিয়ে নিলে। অনুপম আসছিল।

এই ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কথাগুলো ভাবছিল অশোক। বুলার মনে সামনের পাহাড়ের মতো আলো আর কুয়াশার দ্বন্দ্ব। কী বিচিত্র জটিলতার ভিতরে বাস করছে সে। সেখান থেকে নিজেও বেরিয়ে আসতে পারবে না কোনো-দিন—অনুপমকেও কি কোনোদিন মুক্তি দিতে পারবে?

বেলা ডুবে এসেছে—সন্ধ্যা নামছে গাছের মাথায় মাথায়। অশোক উঠে পড়ল। পাহাড়ী পথের বাঁক ঘুরতে হঠাৎ চমকে দাঁড়ালো সে।

ওপরের ছোট রাস্তাটা দিয়ে কারা উঠে আসছে? অনুপম আর বুলা?

না। অনুপম আর রুচিরা। সেই দীর্ঘ, শীর্ণ, অস্বাভাবিক শুভ্র শরীর। রুচিরা

ছাড়া কেউ হতেই পারে না।

অশোকের পা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুলা কি জানে? অসম্ভব। আর সেদিনের সেই ঘটনার পরেও কি—

আবছা অন্ধকারে গাছের আড়ালে রুচি আর অনুপম হারিয়ে গেল। খানিকটা ভ্রূকুটি ফুটে উঠল অশোকের কপালে। ছাউনি-হিলের উপন্যাস শুরু হয়েছে? না—সারা হয়ে এল?

অশোক দাঁড়িয়েই রইল।

আট

আবার দু'দিন কারো কোনো খবর নেই। শান্ত, নিরুত্তাপ—ছাউনি-হিল। বুলা-অনুপমের কোনো সন্ধানই নেই, ওরা যেন এখান থেকে মুছে গেছে। সরোজ আর চ্যাটার্জি গেছে জঙ্গল ইন্‌স্‌পেক্‌শনে। ডাক্তার হয়তো সাইলিকে বাঁচাবার অসম্ভব দুরাশায় তপস্যা করছে। অশোকের নিঃসঙ্গ দিন। উপন্যাসের খসড়াটাই করে ফেলবে নাকি?

একগাদা চিঠিপত্র আছে কৌশিক রুচির নামে। ওঁদের চাকরটাও নিতে আসেনি। সারা দিনের ক্লান্ত মনটাও কোথাও নিশ্বাস ফেলতে চায়। বারো নম্বর বাংলোর কাগজ আর চিঠিপত্র নিয়ে সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে পড়ল অশোক।

যথানিয়মে দ্বারপ্রান্তে বেবি-ডেভির অভ্যর্থনা। কৌশিক ঘোষের ডাক শোনা গেল : কে?

—আমি অশোক।

—এসো, ভেতরে এসো।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে অশোক স্তব্ধ হয়ে গেল।

কী আশ্চর্য, অনুপম বসে আছে! একটু দূরেই আর একটা চেয়ারে বসে আছে রুচি, তার শাদা কুৎসিত মুখখানাকে ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় একটা কঙ্কালের মুখের মতোই দেখাচ্ছে যেন। কৌশিক ঘোষ পাইপ টেনে চলেছেন—মাথার ওপর কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ধোঁয়ার রাশ।

অনুপম একবার অশোকের দিকে তাকালো—কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলো না। নিজে কী একটা বলছিল এতক্ষণ, তারই জের টেনে চলল।

—আমার বোনকে ম্যানিয়াকই বলতে পারেন। কী যে ওর মাথায় ঢুকেছে—আমার নাকি একটি মাদাম কুরী ছাড়া চলবে না। সেই অদ্বিতীয়াকে যতক্ষণ খুঁজে

না পাই, ততক্ষণ অতি সাবধানে থাকতে হবে আমাকে। এমন কি—

বাধা এল রুচির কাছ থেকে।

—ও কথা থাক অনুপমবাবু! আমরা জানতাম না। না বুঝে আপনার অনেক অসুবিধেই হয়তো করে ফেলেছি।

—কিছুই অসুবিধে করেননি। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অনেকগুলো দুর্মূল্য গাছপালার সন্ধান আপনি আমাকে দিয়েছেন, যার খোঁজ কারো থেকেই আমি পেতুম না।

আশ্চর্য দুঃসাহসী হয়ে উঠছে অনুপম, অশোক ভাবল। দার্জিলিঙের বটানিকস মনে পড়ল তার। বুলার পাগলামি? না অনুপমের অকৃতজ্ঞতা?

জীবনটা কী জটিল—কী অপূর্ব তার এক-একটা অধ্যায়!

রুচি ক্লান্ত ভাবে বললে, আমাদের এখানে না আসাই বোধ হয় আপনার ভালো।

—আসব না? কেন আসব না?—অনুপমের চোখ দপ্ দপ্ করে উঠল: আমি কি দুগ্ধপোষ্য? আমার বোন কি আমার গার্ডিয়ান? এখন দেখছি ওকে সঙ্গে এনেই আমার ভুল হয়েছে।

—আপনি না আনলেও কি উনি আসতেন না?—হঠাৎ কথাটা ছুঁড়ে দেবার লোভটাকে কোনোমতেই সামলাতে পারল না অশোক। একটা তিক্ত জ্বালা ছিল নিজের মধ্যে, সেইটেই যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে। কেমন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হল অনুপমকে। সে আর বুলার মাঝখানে অনুপমই তো দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মতো। নইলে তার এত কাছে এসেও এত দূরে থাকত না বুলা—নইলে নিজের জালে এমন করে ছটফট করতে হত না বুলাকে। অনুপম। সব কিছুর জন্যেই অনুপম দায়ী।

কিন্তু বলেই লজ্জা পেল অশোক। ভারী নগ্ন হয়ে কথাটা আঘাত করল তাকে। অনুপম বুঝতে পারল না।

—যা বলেছেন। কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না আমাকে। সব সময়ে যেন আঁচল চাপা দিয়ে রাখতে চায়। এ এক ধরনের ইন্‌স্যানিটি—কী বলেন?

অশোক জবাব দিল না। বিদ্রোহ? অকৃতজ্ঞতা? অনুপমের ওপর সত্যিই কি রাগ করা চলে?

রুচি বিমর্ষ হয়ে বললে, তা হোক। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কোনো ভুল বোঝবার সম্ভাবনা ঘটতে না দিলেই ভালো করবেন অনুপমবাবু।

কৌশিক চুপ করে ছিলেন, চুপ করেই রইলেন। যেন এ-আলোচনার মধ্যে থেকেও নেই তিনি। উদাস আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বইয়ের শেল্‌ফের আশেপাশে রাশি রাশি

ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। কী দেখছেন তিনিই জানেন, কী ভাবছেন তিনিই বলতে পারেন। অশোকের মনে হল, এই কদিনেই যেন বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছেন দাদু—শুধু শরীরে নয়—মনেও। হয়তো এঁর পরে ঠাট্টা করেও ওঁকে আর তারুণ্যের অগ্রদূত বলা যাবে না—বলা যাবে না ওর মনে নিঃশেষ রসের ঝর্ণা বইছে।

অনুপম বললে, দাদু, রুচিদেবী, অশোকবাবু—আপনাদের সকলকেই বলছি। কাল বিকেলে আমাদের ওখানে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আপনাদের ওখানে !—রুচি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। বিহ্বল রুচির দিকে তাকিয়ে অশোকের করুণা হল।

অনুপম কঠিন হয়ে বললে, হ্যাঁ, আমাদের ওখানেই। বুলার ব্যবহার দিনের পর দিন অসহ্য হয়ে উঠছে আমার কাছে। এর একটা প্রতিবাদ দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

কৌশিক কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তৎক্ষণাৎ ডেভি-বেবির ডাক শোনা গেল আবার। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় অশোক চমকে উঠল।

এবং, সে আশঙ্কা মিথ্যে হল না। বাইরে চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো, গায়ে ফিকে নীল ওভারকোট, হাতে টর্চ। বুলা ! আজ একা এসেছে। এই অন্ধকারে, একা, প্রায় দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে তার ভয় করেনি।

রুচির চোখের দিকে তাকিয়ে কারো কিছু বলবার ছিল না। কৌশিক ঘোষের হাত থেকে পাইপটা কার্পেটের ওপর খসে পড়ল, অশোক জমে গেল চেয়ারটার মধ্যে, আরো শাদা হয়ে গেল রুচির কাগজের মতো শাদা মুখখানা।

বুলা বললে, দাদা !

অনুপম বিদ্রোহীর মতো চোখ তুলল।

—কী হয়েছে ? অমন ছুটে এসেছিস কেন ?

বুলা বজ্রভরা গলায় বললে, এমন করে এখানে পালিয়ে এলে কেন ? আমাকে বলে এলেই তো হত। লুকোচুরি করার তো কোনো দরকার ছিল না।

মুখে যথাসাধ্য সাহস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে অনুপম বললে, লুকোচুরির কী দরকার আছে ? আমি যেখানে যখন খুশি যাব। তার জন্যে কি সব সময়ে তোর পারমিশন নিয়ে আসতে হবে ? তুই কি আমার গার্ডিয়ান টিউটর ?

রুচি আর্তস্বরে বললে, অনুপমবাবু, আপনি বাড়ি যান।

—সেই ভালো—অস্পষ্টস্বরে আওড়ালেন কৌশিক।

বুলা কান দিলে না। রুচির মুখের ওপর এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করে বললে, তোমার টেস্ট্ যে এর চাইতে অনেক ভালো—এমনি একটা ধারণা আমার

এতদিন ছিল।

—বুলা!

একটা সুতীক্ষ্ণ অর্থহীন জ্বালা চমকে গেল অশোকের সর্বাঙ্গে। বাড়াবাড়ি—অসহ্য বাড়াবাড়ি, কেন অনুপমের জন্যে সে এমন করে ক্ষেপে উঠেছে? কেন রাতদিন এই নির্বোধ পাহারাদারী? তার ঈর্ষাজর্জরিত নিরুপায় ক্রোধ বুলার ওপরেই ফেটে পড়তে চাইল।

—বুলা দেবী, আপনার নিজের টেস্টের কথাও একবার ভেবে দেখবেন। আমরাও আশা করেছিলাম যে, কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এর চেয়ে বেশি সংযমের পরিচয় আপনি দেবেন।

—শাট্ আপ্!—প্রেতিনীর মতো তীক্ষ্ণ গলায় বুলা অমানুষিক চিৎকার করে উঠল: কতগুলো পাহাড়ী জংলা—না আছে ডিসেন্সি—না আছে কাল্চার! এখানে আসাই আমাদের অন্যায় হয়েছে। দাদা, তুমি উঠবে কি না?

বুলার সমস্ত মুখে সেই আদিমতা। বটানিক্সের বুলা নয়—যে বুলা টুকরো করে ছিঁড়েছিল সানাই ফুলটাকে।

—অনুপমবাবু, আপনি যান—রুচি কাঁপতে লাগল থরথর করে।

অনুপম বললে, আমি যাব না। রুচি দেবীর কাছে সিটিং দেব আমি—উনি আমার একটা পোর্ট্রেট্ আঁকবেন।

—দাদা!

রুচি বললে, না—না, দোহাই আপনার, আপনি যান। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি অনুপমবাবু—মিথ্যে শাস্তি আমাদের আর দেবেন না।

বুলা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ভয়াবহ আসন্নতা তার সারা শরীরে উগ্র হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে যা হোক কিছু একটা সে করে বসতে পারে। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে অশোক উঠে দাঁড়াতে গেল।

আর তখনি বাইরে ডেভি-বেবি আবার চিৎকার তুলল। শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। নেপালী চাকরটা বললে, না—যেতে দেব না।

—আমরা যাবই।—চার-পাঁচটি পাহাড়ী মানুষের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ভেসে এল বাতাস কাঁপিয়ে।

ঘরের এই কুৎসিত ক্লেদাক্ত নাটকটাকে শেষ করে দেবার জন্যেই যেন কৌশিক ঘোষ বললেন, কী চায় ওরা দলবাহাদুর! আসতে দে ওদের—

বুলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তিন-চারজন পাহাড়ী ঢুকল ঘরের মধ্যে।

সকলের আগে একজন বুড়ো মতন ভুটিয়া।, তার কোলে কম্বলে জড়ানো একটি শিশু।

—মানে বাহাদুর!—কৌশিক আর্তনাদ করলেন।

মানে বাহাদুর বললে, হাঁ আমি। আসতাম না—দায়ে পড়ে আসতে হল। আজ এক বছর তুমি খরচা দাও না ঘোষ সাহেব—কোন খবরও রাখো না। রূপকুমারী রাস্তার পাথর ভেঙে তার ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছে দেড় বছর। কিন্তু কাল সে মারা গেছে। এখন তোমার ছেলেকে কে দেখবে ঘোষ সাহেব? তুমি একে নাও—। রাখতে চাও রাখো, নইলে ফেলে দাও ঝোরার জলে!

অনুপম উঠে দাঁড়িয়েছে—রুচি কাঠ হয়ে গেছে—অশোকের যেন দম আটকে আসছে। এমন কি বুলার পর্যন্ত একটা শব্দ উচ্চারণ করবার সাহস নেই।

তবুও শেষ পর্যন্ত অশোকই ঘোর ভাঙল।

—কী পাগলের মতো বকছ মানে বাহাদুর? কার ছেলে?

—কার আবার? ওই ঘোষ সাহেবের। আমাদের বস্তিতে রূপকুমারীর কাছে আসত যেত—বিয়ে করেছিল কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে। তারপর বাচ্চা হল, দু' ছ মাস টাকা দিয়ে আর দেয় না। কাল রূপকুমারী মারা গেছে। এখন—

অশোক বোবা ধরা গলায় বললে, অসম্ভব!

—ঘোষ সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করুন ডাকবাবু। উনি বলুন, এ ওঁর বাচ্চা নয়? বলুন, ধরম সাক্ষী করে আমাদের সামনে রূপকুমারীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেননি? —মানে বাহাদুরের চোখ পাহাড়ের হিংস্রতায় দপদপ করে উঠলো: অস্বীকার করুক ঘোষ সাহেব!

রুচি ভাঙা গলায় ডাকলো: বাবা!

কৌশিক দু হাতে মুখ ঢেকে সোফায় এলিয়ে পড়লেন। একটা কথাও বললেন না।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রুচি, যেন নিয়তির জন্য প্রতীক্ষা করল, তারপর নিজেই এগিয়ে এল মানে বাহাদুরের দিকে।

—দাও মানে বাহাদুর। আমার ভাইকে আমিই মানুষ করব।

আর তৎক্ষণাৎ বুলার হিংস্র হাসি একরাশ সাপের মতো ঘরের মধ্যে কিলবিল করে ছড়িয়ে পড়ল।

—চমৎকার! সুপার্ব! দাদা—সিটিং দেবে না এখানে?

অশোকের ইচ্ছে হচ্ছিল সে দু'হাতে বুলার গলা টিপে ধরে। দু'চোখে আগুন জ্বেলে সে বুলার দিকে তাকালো।

কিন্তু অনুপম ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—না, এখানে থাকার সত্যিই আর কোনো মানে হয় না। চল্—

পরদিন সকালেই অনুপম আর বুলা ছাউনি-হিল ছেড়ে চলে গেল। যাবেই—অশোক জানত। এর পরে এখানে আর একদিনও থাকা সম্ভব ছিল না ওদের।

শুধু একটুখানি ঘটনা ঘটল গাড়িটা চলে যাওয়ার আগে। পোস্ট অফিসের সামনে পথের ধারে সে দাঁড়িয়েছিল, গাড়িটা এসে থামল তার পাশেই। বুলা ডাকল : অশোকবাবু।

—বলুন।

—কাছে আসুন একটু।

অশোক কাছে এগিয়ে গেল। সকালের রোদ পড়েছে বুলার মুখে। সেই প্রথম দিনটির মতোই সূর্যের সোনা এসে ঝরেছে তার গালে কপালে। অশোকের ইচ্ছে করল, আবার কোথা থেকে একগুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে এনে বুলার হাতে দেয় সে।

বুলার চোখ চকচক করছিল। চাপা-গলায় বললে, অশোকবাবু!

—বলুন।

—আমাকে ক্ষমা করবেন।

—ক্ষমা করবার কিছু নেই।

—লামার মন্দিরের সেই ঘণ্টার আওয়াজটা আমার বড় ভালো লেগেছিল। আর দার্জিলিঙের দিনটা।

অশোক বললে, তা জানি।

—আপনার মনে থাকবে সে কথা?

—হয়তো থাকবে। কিন্তু আপনার থাকবে না।

বুলার দৃষ্টি জ্বলে উঠল : এ কথা কেন বললেন?

—ঠিক জানি না। আপনিও জানেন না। কেউই জানে না। তবু ওই ঘণ্টার আওয়াজটা আপনি ভুলে যাবেন—এটা নিশ্চয়। বটানিক্‌সের স্মৃতিও মুছে যাবে। বড় জোর মনে থাকবে, একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছিল, ঘটল না।

—সব মনে থাকবে, সব। কিছু ভুলব না—দেখে নেবেন।

—বেশ, অপেক্ষা করব। অশোক মৃদু হাসল : কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেবেন আমাকে?

—দেব, নিশ্চয় দেব।—বুলা আবার বললে ফিস্‌ফিস্ করে।

গাড়ির ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে নিল বুলা ধীরে ধীরে। একখানা হাত রাখল জানলায়, মৃদু স্পর্শ করল অশোক। গাড়ি স্টার্ট নিলে, তারপর এগিয়ে চলল দার্জিলিংয়ের দিকে। ছাউনি-হিল ওদের জায়গা দিতে পারল না।

শুধু অনুপমের গলা শোনা গেল একবার : আসি অশোকবাবু, নমস্কার—

প্রতিনমস্কারের সময় ছিল না, প্রয়োজনও না। একটু পরেই পাইন বনের বাঁকে মোটর অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু ভিজে ধুলোর গন্ধ কিছুক্ষণ ছড়িয়ে রইল চারদিকে।

বুলা চিঠি লিখবে না—অশোক জানে। লামার মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ যদি কোনো অলস অবসরে তার কানে বেজেও ওঠে, তবে তা মুহূর্ত-বিলাসের বেশী নয়। এক মিনিটের মধ্যেই বুলা তা ভুলে যাবে।

আশ্চর্য জীবন—তার জটিলতা! নিজের কাছ থেকে মুক্তি চায় বুলা; কিন্তু সে মুক্তি আসবে কোন্ পথে? কোন্ নিষ্ঠুর আঘাত তার নিজের বোনা জালটা ছিঁড়ে উদ্ধার করবে তাকে?

অশোক আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রোদ আর কুয়াশার লুকোচুরি চলেছে। চোখে পড়ল—বগলে কী কতগুলো নিয়ে পাহাড়ী বস্তির দিকে চলেছে ডাক্তার। অত্যন্ত ব্যস্ত—যেন জরুরি কোনো কাজে ছুটে চলেছে।

মিস্ আলেয়া।—একবার স্বগতোক্তি করলে অশোক। তবু এখনো আশা রাখে ডাক্তার—এখনো মির্‌য়াক্‌লের ভরসা আছে ওর। বাঁচবে না, তবু বাঁচতে পারে। টু ইয়ং। টু গুড্। এত তাড়াতাড়ি মরতে পারে না—মরা চলে না ওর! তাই বটে!

আর একবার থেমে গেল অশোক।

পাশেই পাহাড়ের একটা টিলা। সেই টিলার ওপর মূর্তির মতো একটি মেয়ে। যেন শুভ্র একরাশ কুয়াশার মধ্য থেকে এই মুহূর্তেই ওখানে জন্ম নিয়েছে মেয়েটি।

রুচি! রুচিরা!

কুয়াশা কেটে গিয়ে আবার সূর্যের আলো পড়েছে মেয়েটির ওপর। মুহূর্তের জন্যে মনে হল—এই পাহাড়ের নিঃসঙ্গ আত্মার মতো সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ওই রুচিরাই। কোথাও নেই সে—তার কোনো অস্তিত্বই নেই যেন। কাল রাত্রে যা ঘটে গেছে, তারপরে আর কোথাও কোনো ভিত্তি নেই তার। কৌশিক ঘোষের পাপের লজ্জা নীলকণ্ঠের মতো রুচিকেই পান করতে হয়েছে আকণ্ঠ।

অশোক দাঁড়িয়ে রইল। এত কাছে—অথচ রুচি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজের মধ্যে একটা অতল যন্ত্রণার সমুদ্রে যেন সে তমসা স্নান করছে।

অশোক তো কতবার—কতদিন রুচিকে দেখেছে। কিন্তু আজ মনে হল—কেন কে জানে মনে হল : ঐ মেয়েটিকেও আবিষ্কার করা চলে, হয়তো এর মধ্যেও কোথাও কোনো পরম দুর্লভ লুকিয়ে আছে। রুচির সমস্ত কুশ্রীতার আড়ালেও কি অনুপম তার সন্ধান পেয়েছিল?

অশোক ধীরে ধীরে টিলার ওপর উঠল। ডাকল : রুচি দেবী!

রুচি চমকালো না—ফিরে তাকালো। তার চোখে তখনো তমসা স্নানের কৃষ্ণতা। সে তাকিয়ে আছে—অথচ দেখতে পাচ্ছে না।

সামনে ইজেলের ওপর একটা ল্যাণ্ডস্কেপ্। কিন্তু রুচি সেটা শেষ করেনি। তার আগেই কী খেয়ালে একরাশ লাল-কালো রঙের আঁচড় টেনে তাকে বিকৃত করে দিয়েছে।

অশোক সস্নেহে বললে, ছবিটা নষ্ট করলেন কেন? আবার শুরু করুন।

রুচির ঠোঁট কাঁপতে লাগল। জল টলমল করতে লাগল চোখের কোণে। সকালের আলোয় দুটি সোনালি বিন্দুর মতো মনে হল অশ্রুকণা দুটো।

অশোক গভীর গলায় বললে, অনেকবারই নতুন করে শুরু করা যায়। শুরুর শেষ কোথাও নেই। ডাক্তারের মুখখানা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল: টু গুড্—টু ইয়ং!

অশোক বললে, ছবিটা নষ্ট করবেন না। একটা ছবি আঁকতে অনেক পরিশ্রম দরকার—দরকার অনেক সাধনা।

রুচি তাকিয়ে রইল অশোকের দিকে। অনেকক্ষণ।

"Sont remplies de rayons!"

সূর্যের নিসংকোচ আলোয় সমস্ত ছাউনি-হিল ধীরে ধীরে আকাশপর্ণী ফুলের মতো ফুটে উঠল।

রামমোহন

(নাটক)

জ্ঞান মজুমদার

বন্ধুবরেষু

লেখকের বক্তব্য

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন এবং কর্মশক্তি যেমন বিপুল, তেমনি বহুব্যাপ্ত। একখানা সামান্য নাটকের মাধ্যমে তার পরিচয় দিতে যাওয়া যে কতখানি দুরূহ ব্যাপার, কাজে হাত দিয়েই আমি তা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু নতুন ভারতবর্ষের যিনি অগ্রদূত, তাঁকে সাধ্যমতো স্মরণ করাতেও অনেকখানি লাভ আছে। সে লাভের সুযোগটুকু আমি হারাতে চাইনি—গোড়াতে এই আমার কৈফিয়ৎ। এই নাটক কতখানি অভিনয়যোগ্য তা জানি না, কারণ, নাট্যকার আমি নই ; কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যুগস্রষ্টা মানুষটিকে কিছু পরিমাণেও যদি ফোটাতে পেরে থাকি, তবেই আমি সার্থক হয়েছি।

রামমোহনের জীবন-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। সে তর্কের ক্ষেত্র ঐতিহাসিকের—আমার নয়। আমি সকলের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি এবং মোটামুটি একটা মধ্যপন্থা আশ্রয় করে এই নাটকের কাঠামো গড়ে তুলেছি। রামমোহন সম্বন্ধে যে-সমস্ত উপকরণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলির ওপর নির্ভর করে এবং ঐতিহাসিক সততাকে যথাসাধ্য রক্ষা করেই অগ্রসর হতে চেয়েছি। স্বাধীনতা নিয়েছি নামমাত্র এবং যেটুকুও নিয়েছি তা কল্পনাশ্রিত নয়—সম্ভাব্যতার (**probability**-র) ওপরেই নির্ভরশীল। কর্মী ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামমোহনের জীবন এত বিচিত্র ঘটনার দ্বন্দ্বে আলোড়িত যে সেগুলিকে উপযুক্তভাবে সাজাতে পারলেই তারা নাটকীয় হয়ে ওঠে। অপরিসীম প্রলোভন-সত্ত্বেও এমন বহু জিনিসকে আমি ব্যবহার করতে পারিনি—যেগুলি অবলম্বন করে আরো অন্তত তিনখানা নতুন নাটক রচনা করা চলে।

নাটক ইতিহাস নয়—সেই কারণে রামমোহনের অপরা জীবিত স্ত্রীকে এই নাটকে স্থান দিইনি। তাঁর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উমা দেবীই ছিলেন তাঁর সত্যিকারের সহধর্মিণী, তাঁর নেপথ্য অনুপ্রেরণা। তাঁর পিতৃদেব রায়রায়ান রামকান্ত এবং অগ্রজ জগমোহন সম্বন্ধেও এই-ই আমার বক্তব্য। আশা করি, এ অপরাধ মার্জনীয়।

রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সূচনাতেই আমি নাটকের যবনিকা টেনেছি। তারপরে আর অগ্রসর হওয়া নাট্যকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু এই পরবর্তী অধ্যায়ও রামমোহনের কীর্তি এবং গৌরবে সমুজ্জ্বল। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের দৌত্য এবং 'রাজা' উপাধি নিয়ে যেদিন অ্যালবিয়ন জাহাজে তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সে দিনটি ভোলবার নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে যত বাধাই সৃষ্টি হোক না কেন,

ইংল্যাণ্ড সেদিন পরম সমাদরেই তাঁকে গ্রহণ করেছিল। তাঁর রচনা, তাঁর কর্মশক্তি এবং তাঁর মনীষার সংবাদ ইতোমধ্যেই ইয়োরোপকে আলোড়িত করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো প্রাচ্যবাসীকে পাশ্চাত্ত্যের অন্তর কখনো এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেনি।

যে কোম্পানি দেশে তাঁর বাদশাহের দৌত্য স্বীকার করতে চায়নি, ইংল্যাণ্ডে সেই উদ্ধত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও তাঁর কাছে নত হল। দূতের সম্মান দিয়ে ভোজ-সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করল তারা। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক পণ্ডিত উইলিয়াম রস্কো, লেখক জন ফস্টর, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম প্রভৃতি তাঁকে সম্মান জানালেন। স্বাধীনতার তীর্থ **La France**-এও তিনি পেলেন বরণমাল্য।

সংগ্রামী রামমোহন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। পার্লিমেন্টের লর্ডসভায় রক্ষণশীল দলের ভারত-সংক্রান্ত বিরোধিতা রোধ করবার তিনি আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন। কর্ম এবং শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের আসন তুলে ধরেছেন ইয়োরোপের চোখের সামনে।

কিন্তু সে বিদেশেও তাঁর দেশ তাঁকে বঞ্চনা করল। দেশ থেকে প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ-সাহায্য তিনি পেলেন না—দিল্লীর বাদশা পাঠালেন না তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। জীবনের শেষ দিনগুলিতে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে লড়াই করতে করতে—বাড়িওলার তাগিদের অসহ্য অপমানে জর্জরিত হয়ে ১৮৩৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ব্রিস্টলের স্টেপল্‌টন গ্রোভে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

মহামানবমাত্রেই দেশের কাছ থেকে এমনি প্রতিদান চিরকাল পেয়ে আসছেন। রামমোহনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিক্ষায়, সমাজ-সেবায় এবং অর্থনৈতিক ও বিচার-বিভাগীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রামমোহনের যে অপরিসীম দান, তা বিস্তৃত আলোচনার বস্তু। নাটকে তার সামান্যমাত্র আভাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়—সে চেষ্টাও আমি করিনি। শুধু এইটুকুই স্মরণ রাখা দরকার যে রামমোহন শুধু আধুনিক বাংলাদেশেই নয়—আধুনিক ভারতবর্ষেরও স্রষ্টা। মিস্ কোলেট্ রামমোহনের জীবনী রচনা করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, **"Rammohun stands forth as the tribune and prophet of new India."** এই উক্তির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র আতিশয্য নেই, এই বিরাট পুরুষের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করলেই সে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে একজন ইংরেজ সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন, শুধু সেইটির পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট :

"The character of a nation is always in a great degree depended

upon the character of individuals. The names of such men as Shakespeare and Milton and Bacon and Newton, give a more distinct idea of England's mental greatness than could be produced by an elaborated essay on the subject and specimens of human nature when the character of English intellect is the subject of discussion. The single name of Rammohun Roy is cherished by the more enlightened of his countrymen with gratitude and veneration, because they feel how much they owe him. When foreigners speak with insulting contempt—as they often do—of the native intellect—the name Rammohun Roy is appealed to as an answer." (Bengal Herald, 17th January, 1841—J.K. Majumder-এর Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India-য় উদ্ধৃত।)

এই নাটক রচনায় যাঁরা নানাভাবে উপদেশ দিয়ে এবং সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আমাকে তিনি ব্যবহার করতে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশগুলিও আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্তী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং খ্যাতনামা অভিনেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্য রায়ের কাছেও নানাভাবে আমি ঋণী।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, ন্যায়রত্ন, স্মৃতিতীর্থ, পুরোহিত, নবকিশোর রায়, দেওয়ান, রামজয় বটব্যাল, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ রায়, ডেভিড্ হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী (মুনসী), অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দকিশোর বসু, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সার এডোয়ার্ড হাইড্ ইস্ট্, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, মতিলাল শীল, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, ভৈরবধর মল্লিক, নীলমণি দে, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ দত্ত, জয়কৃষ্ণ সিংহ, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক্, স্যার ফ্রান্সিস্ বেথি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজারাম, হরি, শবযাত্রী, পথিকেরা, সংকীর্তনের দল, বেয়ারা ও চাপরাশী।

তারিণী দেবী, অলকা (অলকমণি) দেবী, উমা দেবী, একজন পলাতকা সতী, নন্দকিশোর বসুর স্ত্রী ও পিসিমা।

সময়ঃ ১৭৯৪—১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ।

স্থানঃ লাঙ্গুলপাড়া, রঘুনাথপুর ও কলকাতা

প্রথম অঙ্ক

—এক—

[রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি। এই বাড়ির একটি প্রশস্ত ঘর। আনুমানিক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘরটি সেকালের রেওয়াজ মতো সাজানো। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যাবে, গৃহস্বামী অর্থভাগ্যে ভাগ্যবান। মুসলমানী কেতার সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি রুচিও নজরে পড়বে।

প্রৌঢ় রামকান্ত রায় শৌখিন কাজ করা বড় একখানা খাটে একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়া টানছেন। তাঁর কপালে চন্দনের তিলক, ফতুয়ার ওপর দিয়ে গলার তুলসী মালাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ পুরুষ।

একটা অপ্রিয় অনিশ্চিত আশঙ্কায় রামকান্তের ললাট কুঞ্চিত। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্বস্তিভরে তিনি গড়গড়ার নল নামিয়ে রাখলেন। খাট থেকে নেমে এলেন, ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর হাতে কুঁড়োজালি। মালা জপ করতে চেষ্টা করছেন, তবু পেরে উঠছেন না। খুব অস্থির।

রামকান্তের স্ত্রী তারিণী দেবী প্রবেশ করলেন। মধ্যবয়স্কা, রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও তাঁর আর একটি বিশেষত্ব প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যাবে। তাঁর চোখে মুখে একটা গর্বিত ব্যক্তিত্বের ছবি—দৃঢ় সংকল্পের আভাস।]

তারিণী। কী ভাবছ? (রামকান্ত ফিরে দাঁড়ালেন)

রামকান্ত। ভাবছি? (মৃদু বিষণ্ণ হাসলেন) আকাশ-পাতাল! চারদিক থেকে বিপদের কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে ফুলু। (গম্ভীর হয়ে গেলেন) জমিদারির অবস্থা তো জানো।

তারিণী। ভুরশুট পরগণার ইজারা?

রামকান্ত। সেও এক রকম করে চলে যেত—কিন্তু মুশকিল হয়েছে বর্ধমান রাজ-সরকারকে নিয়ে। প্রায় আশী হাজার টাকা পাবে, রাজসরকার থেকে নালিশ হলে জেলে যাওয়া ছাড়া আর পথ দেখছি না ফুলু।

তারিণী। এখনি ওসব কথা কেন ভাবছ? মহারাণী বিষ্ণুকুমারী তো তোমাকে খুব স্নেহ করেন।

রামকান্ত। হাঁ—তা করেন। কিন্তু তিনি আর ক'দিন? তাঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে কতদিন বাঁচবেন বলা শক্ত। তাঁর মৃত্যুর পরে কী হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাতে আমার ঘুম আসে না। জগৎটা যদি মানুষ হত, তা হলেও আমায় এত দুর্ভাবনা করতে হত না। বৈষয়িক বুদ্ধি একেবারে নেই। রামলোচনও নেহাৎ ছেলেমানুষ। ভরসা করবার মতো একজন কাউকেই কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

তারিণী। কেন, মোহন? অমন বিদ্বান্ ছেলে—

রামকান্ত। (থামিয়ে দিয়ে) বিদ্বান্—বুদ্ধিমান্! ওইখানেই আমার ভুল হয়েছে ফুলু, জীবনের সব চাইতে বড় ভুল! কি দরকার ছিল? জমিদারের ছেলে, বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেবার মতো বিদ্যাই ছিল যথেষ্ট তার পক্ষে। ছেলেকে পণ্ডিত করবার জন্যে পাঠালাম পাটনায়, আরবী-ফারসী শিখে ছেলে আমার "মৌলানা" হয়ে এল! তাতেও আমার শিক্ষা হল না, আমি তাকে সংস্কৃত পড়তে পাঠালাম কাশীতে। তার কী ফল হয়েছে তুমি নিজেও জানো। তারই ওপর তুমি আমায় নির্ভর করতে বলছ?

তারিণী। এ তোমার মিথ্যে ভাবনা। ছেলের পণ্ডিত হওয়াটা এমন কি অপরাধ যার জন্যে তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারছ না?

রামকান্ত। পণ্ডিত হওয়া অপরাধ নয় ফুলু। তোমার ছেলে ম্লেচ্ছ হতে চলেছে!

তারিণী। ম্লেচ্ছ! এ তোমারও বাড়াবাড়ি। ষোল বছরের ছেলে কি লিখেছিল না লিখেছিল—

রামকান্ত। কী লিখেছিল! (উত্তেজিত) তুমি দেখোনি সে খাতা, আমি দেখেছি। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা নিয়ে সে কী যুক্তিতর্ক আর কটু সমালোচনা! ভাবতে পারো ফুলু, রায়রায়ান কৃষ্ণচন্দ্রের বংশে এমন অনাচার! বিষ্ণুমন্ত্রে যাদের নিত্য উপাসনা, যাদের ওপর প্রভু রাজরাজেশ্বরের আশীর্বাদ—সেই বংশের ছেলে আজ বিগ্রহ পূজোর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়! কোরানের যুক্তি দিয়ে হিন্দুর দেবপূজোকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়!

তারিণী। সে অজ্ঞানের পাপকে তুমি তো ক্ষমা করোনি! সেদিন তাকে তো একরকম বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিলে।

রামকান্ত। হাঁ, দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শিক্ষা হবে। কিন্তু হয়নি। অতটুকু ছেলে দুর্গম হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে চলে গেল! সহায় নেই—সম্বল নেই—ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে কোন্ প্রান্ত থেকে কোথায় চলে গেল সে! দেখলাম, সত্যি সত্যিই রায়রায়ান বংশের ছেলে! যেমন শক্তি, তেমনি দুঃসাহস!

তারিণী। এ তো গৌরবের কথা!

রামকান্ত। গৌরব! না—না! ওই শক্তি—ওই সাহসই আমার ভয়! মনে হচ্ছে আমি ওকে রুখতে পারব না—একটা ঝড়ের হাওয়ার মতো সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি তারিণী—রায়রায়ান বংশের ওপর সর্বনাশ আসছে। আর তার জন্যে দায়ী কে জানো? দায়ী তোমার ছেলে রামমোহন।

তারিণী। এ তুমি কী বলছ?

রামকান্ত। ঠিক বলছি, ঠিক বলছি আমি। কেন এমন হল ? পরম বৈষ্ণব এই পরিবার ! আপদ-বিপদ-অমঙ্গল কতবার এসেছে, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ বিপদের মুখে হাল ধরে তুফান পার করে দিয়েছেন। আজ কেন চার দিক থেকে সব এমন করে ডুবতে চলেছে ? তারিণী, আমি জানি, আমি জানি ! বৈষ্ণবের ঘরে ম্লেচ্ছ জন্ম নিয়েছে, ধর্মের ভিত নড়ে উঠেছে—রাজরাজেশ্বর মুখ ফিরিয়েছেন। (আরো উত্তেজিত) যাবে তারিণী, সব যাবে।

তারিণী। কেন এমন করছ তুমি ? ক'দিনও হয়নি, ছেলে তিব্বত থেকে ফিরেছে। হয়তো মতি-গতি বদলে গেছে—

রামকান্ত। বদলে গেছে ? (তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন) কিন্তু আমাকে বলতে পারো, এই ক'দিনের মধ্যে একবারও সে মন্দিরে গেছে, একবারও প্রণাম করেছে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহকে ? মনকে মিথ্যে চোখ ঠেরে কোন লাভ নেই তারিণী ! রায় বংশে মুষল জন্মেছে তোমার ছেলে—সর্বনাশ হয়ে যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে ! (যাওয়ার উপক্রম করে ফিরে দাঁড়ালেন) তোমার বাবার অভিশাপ মনে আছে তারিণী ? সেই অভিশাপ আজ ফলতে চলেছে !

(রামকান্ত উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।
তারিণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।)

তারিণী। বাবার অভিশাপ ! না !

(কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর ডাকলেন

উমা—উমা—

(উমা দেবী প্রবেশ করলেন)

উমা। ডাকছেন মা ?

তারিণী। মোহন কোথায় বউমা ?

উমা। পড়ছেন।

তারিণী। পড়া—পড়া—দিনরাত পড়া ! সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যেই ডুবে আছে ! যাও, একবার আসতে বলো আমার কাছে। দরকারী কথা আছে। (উমা বেরিয়ে গেলেন) বাবার অভিশাপ ! না—না, অসম্ভব ! কখনো হতে পারে না !

[কুড়ি বছরের দীর্ঘকায় সুদর্শন রামমোহন প্রবেশ করলেন।]

রামমোহন। ডাকছিলে মা ?

(তারিণী চোখ তুলে তাকালেন)

তারিণী। এসো—বসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

(রামমোহন একটা নিচু আসন টেনে নিয়ে মার পায়ের কাছে বসলেন)

রামমোহন। কী মা ?

তারিণী। বর্ধমানের দেনার অবস্থা বোধ হয় সব শুনেছ ?

রামমোহন। শুনেছি বইকি। কিন্তু কাজটা বাবা ভালো করেননি। সরকার থেকে অতগুলো টাকা বাজে খরচ না করলে আজ এমন অবস্থায় পড়তে হত না। পরের টাকা-পয়সার ব্যাপারে সতর্ক থাকাই ভালো।

তারিণী। (ভ্রূকুঞ্চিত করলেন) তোমার বাবার কাজের সমালোচনা করে লাভ নেই মোহন। সে কথা থাক। কিন্তু তোমরা এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ। সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁকে কিছু সাহায্য তোমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত। তোমার দাদাকে তো জানোই—বিষয়বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। লোচনও ছেলেমানুষ। এ অবস্থায় তোমার দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি, বাবা !

রামমোহন। বেশ তো। তোমরা যা করতে বলো, তাই করব।

তারিণী। একবার মহলে যাও। দেখো, কিছু বাকী বকেয়া আদায়পত্র করে কোনো রকমে তাল সামলানো যায় কিনা !

রামমোহন। তাই হবে (উঠে পড়লেন, তারিণী বাধা দিলেন)—

তারিণী। একটু বোসো। (রামমোহন বসলেন, সামান্য দ্বিধা করে তারিণী বললেন) হয়তো জানো মোহন, তোমার সম্পর্কে তোমার বাবার একটা আশঙ্কা আছে।

রামমোহন। জানি।

তারিণী। সে আশঙ্কা নিশ্চয় মিথ্যে ?

রামমোহন। না।

তারিণী। (চমকে উঠলেন) না !

রামমোহন। সত্য চিরদিনই সত্যই থাকে মা সে বদলায় না।

(তারিণী খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন)

তারিণী। তাহলে তুমি বলতে চাও—চার বছর আগে যে বিশ্বাস নিয়ে তুমি ঘর ছেড়েছিলে, সে বিশ্বাস আজও তোমার অটুট ?

রামমোহন শুধু অটুট নয় মা। এই চার বছরে আমার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি আরো পাকা হয়েছে।

তারিণী। (চকিত) মোহন !

রামমোহন (আত্মগত) দেখলাম ভারতবর্ষকে। যেখানে গেছি—দেখেছি একটি মাত্র চেহারা ! অজস্র জাত, অসংখ্য সম্প্রদায়। সবাই হিন্দু—অথচ কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কেউ শাক্ত, কেউ রামায়েৎ, কেউ লিঙ্গায়েৎ, কেউ দাদুপন্থী, কেউ কবীরপন্থী, কেউ বৈষ্ণব,

কেউ গাণপৎ। বিচিত্র সব দেবতা, বিচিত্র তাদের কুসংস্কার!

তারিণী। কুসংস্কার! মানুষের ধর্মকে তুমি কুসংস্কার বলো!

রামমোহন। ধর্ম! কাকে তুমি ধর্ম বলো মা! তুমি যা মানো, অন্যে তা মানতে চায় না। অন্যের যা প্রথা, তোমার কাছে তা অবিশ্বাস্য। সারা ভারতবর্ষে হিন্দু নামে একটা জাত আছে বটে। কিন্তু কে সেই হিন্দু—তার উত্তর কে দেবে!

তারিণী। হুঁ!

রামমোহন। সারা দেশ খুঁজে দেখলাম—হিন্দু কোথাও নেই। আছে কতগুলো দল আর কতগুলো দেবতা! সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা নোয়াতে নোয়াতে জাতটার মেরুদণ্ড ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছে। সত্য নেই—আছে শুধু সংস্কার! প্রতিবেশী মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্কটা শুধু বিদ্বেষ আর ঘৃণার! মনে পড়ল: দেশ জুড়ে একদিন মহামিলনের বাণী শুনিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। দীপঙ্কর শীলভদ্রের পথ বেয়ে গেলাম বৌদ্ধের দেশ তিব্বতে। কৈলাসের পাহাড় আর মানস সরোবর ডিঙিয়ে সত্যকে জানতে গেলাম। কিন্তু সেখানেও দেখলাম এই বিকার! ধর্ম মিথ্যে হয়ে গেছে, যুক্তির মূল্য নেই! ভাবতে পারো মা, তারা একজন মানুষকে দালাই লামা সাজিয়ে তাকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতা বলে কল্পনা করে নেয়?

তারিণী। তুমি বলতে চাও কী? (তাঁর স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল)

রামমোহন। আমি বলতে চাই—একটি মাত্র পথে সব সমস্যার সমাধান আছে। হিন্দুর হোক—মুসলমানের হোক—ঈশ্বর একমাত্র; 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই এক অদ্বিতীয়ই সারা ভারতবর্ষকে একসঙ্গে মেলাতে পারে—হিন্দু মুসলমানের ভেদ ঘোচাতে পারে—দেশ জুড়ে একটি মহাজাতিকে গড়ে তুলতে পারে!

তারিণী। মোহন, চার বছর আগে মনে হয়েছিল, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সেদিনের কথাগুলো তাই উড়িয়েই দিয়েছিলাম! আজ দেখছি তোমার বাবাই ঠিক বুঝেছিলেন! রায়রায়ান বংশের ওপর সর্বনাশ ঘনিয়ে আনছ তুমি!

রামমোহন। সর্বনাশের কথা কেন উঠছে মা? আমি তো কোনো নতুন কথা বলছি না। এ যে আমাদের শাস্ত্রেরই বাণী—উপনিষদের কথা!

তারিণী। শাস্ত্র! কতখানি জানো তুমি শাস্ত্রের? আমি তোমায় বলছি মোহন,

এখনো সময় আছে। এখনো ফিরে এসো। দেশাচার-লোকাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ো না! সে অপরাধের জন্য কেউ তোমায় ক্ষমা করবে না—হয়তো আমিও না।

রামমোহন। তোমার ক্ষমা যদি না পাই মা, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমার আর নেই। কিন্তু সত্যিকারের যা ধর্ম, দেশাচার-লোকাচারের দাম কি তার চেয়েও বেশি?

তারিণী। (অধৈর্য) তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আবার বলছি, আগুন নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না! তার পরিণাম কারো পক্ষেই শুভ হবে না!

(রামকান্ত পুনঃপ্রবেশ করলেন। রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন)

রামকান্ত। ওঃ—তুমি! বোসো—বোসো!

(নিজে বসলেন, রামমোহন দাঁড়িয়ে রইলেন)

তারিণী। শুনছ, মোহন মহলে যেতে চাইছে।

রামকান্ত। বেশ, যাক। কিন্তু কোনো লাভ নেই তারিণী। আমি জানি—সব ডুববে। কিছুই থাকবে না—কিছুই না।

তারিণী তুমি কেন অমন করছ বলো দেখি? কেন এমন ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছো?

রামকান্ত। হাল আমি ছাড়িনি—যিনি ছাড়বার তিনিই ছেড়েছেন! রাজরাজেশ্বর মুখ ফিরিয়েছেন (হঠাৎ রামমোহনের দিকে তাকালেন) তুমি মানো সে কথা?

রামমোহন। না বাবা।

রামকান্ত। মানো না! কেন মানো না?

রামমোহন। পাথরের বিগ্রহ এক জায়গায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে বাবা! সে তো কখনো মাথা ফেরাতে পারে না!

রামকান্ত। (উত্তেজিত) শোনো তারিণী, শোনো। এর পরেও বলতে চাও অমঙ্গলের কিছু বাকি আছে? এর পরেও কি রায় বংশের মাথার ওপরে বাজ পড়বে না?

রামমোহন। আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন বাবা!

রামকান্ত। মিথ্যে! হিন্দু-ধর্মকে তুমি তুচ্ছ করবে, দেবতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে, তবু আমি উত্তেজিত হব না!

রামমোহন। কিন্তু—

রামকান্ত। আবার সেই কিন্তু! আমার সব কথায় 'কিন্তু' বলবার একটা বদ্-অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেছে তোমার। সব কিছুতেই তুমি প্রতিবাদ করতে চাও! কী ভেবেছ নিজেকে? দু-পাতা ফার্সী আর সংস্কৃত পড়ে সমস্ত শাস্ত্রকে এনে ফেলেছ তোমার মুঠোর মধ্যে?

রামমোহন। না বাবা, এতবড় অন্যায় দাবী আমার নেই। শাস্ত্র মহাসাগর—সারা জীবন চেষ্টা করলেও তার পার পাওয়া যাবে না। তবু আপনি যদি আমার সামান্য শাস্ত্রজ্ঞানের পরীক্ষা নিতে চান, সাধ্যমতো উত্তর দেব!

রামকান্ত। কী! তুমি আমায় শাস্ত্র-বিচারে আহ্বান করছ! (চেঁচিয়ে উঠলেন) মূর্খ, নাস্তিক—তোমার মতো ছেলে থাকার চাইতে না থাকাই ছিল ভালো! (রাগে কাঁপতে লাগলেন)

তারিণী। আঃ—কী হচ্ছে এ সব পাগলামি!

রামকান্ত। ও আমার কেউ নয় ফুলু—কেউ নয়!

তারিণী। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? সব কথা নিয়েই কি এত পাগলামি করতে হয়। বিস্তর বেলা হয়েছে, এখন চান করবে চলো।

রামকান্ত। (তারিণীর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে) আমি ঠিক জানি, তারিণী। শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য বাক্সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তাঁর কথা কখনো মিথ্যে হবে না।

(রামকান্ত এবং তারিণী চলে গেলেন,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রামমোহন।)

—দুই—

[রায়রায়ান রামকান্ত রায়ের বাড়ি।
অন্তঃপুরের একটি ঘর—রামমোহনের শয়ন-কক্ষ। স্তূপাকার ফার্সী ও সংস্কৃত পুঁথি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে খাট এবং অন্যান্য গৃহসজ্জা।
রামমোহনের স্ত্রী উমা এবং জগমোহনের স্ত্রী অলকা দেবীর মধ্যে কথা চলছে। উমা ভয় পেয়েছেন, অলকা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছেন।]

অলকা। তুই ওকে বুঝিয়ে বলতে পারিস উমা?

উমা। বাবা-মা যাকে বোঝাতে পারেন না দিদি, সে আমার কথা শুনবে কেন? তুমি কি চেন না ওঁকে?

অলকা। তা আর চিনি নে! এ ঘরে যখন পা দিয়েছিলাম, তখন তো ঠাকুরপো সাত বছরের। কিন্তু তখন থেকেই কী জেদ অতটুকু ছেলের। যা ধরত,

তাই করে ছাড়ত। কিন্তু এখন বড় হয়েছে—বুদ্ধিসুদ্ধিও হয়েছে। এখনো কি অত পাগলামি করলে চলে?

উমা। কেলেঙ্কারীও তো নেহাৎ কম হল না দিদি! রোজ রোজ এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। বাবার মুখের দিকে তাকানো যায় না, মাও যেন কেমন হয়ে উঠছেন দিনের পর দিন! কিন্তু কোনো কথা উনি শুনবেন না। বলেন, সত্য বলে যা জেনেছি, মরে গেলেও তা ছাড়তে পারব না। বাবার জন্যেও না—মার জন্যেও না!

অলকা। যা ধরবে তা চরম করে ছাড়বে—এই ওর স্বভাব। পাটনায় পড়তে যাবার আগে ঠাকুর-দেবতায় কী ভক্তিই ছিল ঠাকুরপোর! একবার সকালে সংস্কৃত রামায়ণ নিয়ে বসল। পড়া শেষ না করে কিছুতেই সে উঠবে না। সারা দিন বই নিয়ে না খেয়ে রইল—মারও খাওয়া হল না।

উমা। এখনও তো বই নিয়ে বসলে আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

অলকা। কিন্তু এত পড়ে পরে কী বুদ্ধি হল? মনে আছে, বাড়িতে সেবার কীর্তন হচ্ছে—মানভঞ্জন পালা! ও একেবারে কেঁদেই আকুল। কেষ্ট স্বয়ং নারায়ণ—তিনি কিনা শ্রীরাধার পা ধরবেন! কিছুতেই তা হতে দেবে না। শেষকালে ওকে আসর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দুপুর বেলা একা মন্দিরে বসে অঝোরে কাঁদত: ভগবান কি আমায় দেখা দেবেন না?

উমা। ওই ফার্সী পড়েই যে কাল হল দিদি!

অলকা। লেখাপড়া শিখলেই কি ছাই অমন হতে হবে? ফার্সী তো ঠাকুরও পড়েছেন, ওর দাদাও পড়েছে। তাই বলে এসব মুসলমানের মতো কথাবার্তা বলবে? নিশ্চয়ই মাথার দোষ হয়েছে ওর।

উমা। (কাতর) কী যে করব দিদি—কিছুই বুঝতে পারি না! মাঝে মাঝে ওঁর জ্বালায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

অলকা। আমার মনে হচ্ছে এখন ঠাকুরপোর চিকিৎসা করা দরকার। ভালো কবিরাজী তেল হলে উপকার হবে। এ শুধু বাতিকের ব্যারাম—মধ্যমনারায়ণ তেল পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে সব!

(রামমোহন ঢুকলেন)

রামমোহন। কার জন্যে মধ্যমনারায়ণ তেল বৌঠান? তোমার?

(উমা লজ্জিতভাবে জিভ কাটলেন, ঘোমটা টেনে পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে)

অলকা। আমার জন্যে কেন হবে! পড়ে পড়ে যারা মাথা গরম করে, তাদেরই ওসব দরকার। সত্যি ঠাকুরপো, এত লেখাপড়া করে দিনকে দিন তুমি কী

হয়ে উঠছ বলো তো ?

রামমোহন। (হাসলেন) জানোয়ার। কী বলো ? (বসলেন)

অলকা। ছিঃ ছিঃ ! মুখে তোমার কিছুই কি আটকায় না ? এত বিদ্বান হয়েই তুমি এমন অধঃপাতে গেছ !

রামমোহন। যা বলেছ। সংসারে মূর্খই সব চেয়ে নিরাপদ। সে যাক—এখন হুকুমটা কী বলো ? কী করলে খুশি হও ? ফরমাইয়ে।

অলকা। আমাদের খুশি করার ভাবনাটা এখন থাক। কিন্তু এতবড় পণ্ডিত হয়েও কি তুমি বোঝো না এমন করে বাবা-মার মনে দুঃখ দিতে নেই ? তাঁরা যা পছন্দ করেন না, সে-সব কি তাঁদের মুখের ওপর না বললেই নয় ?

রামমোহন। মায়ের পরই তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি বৌঠান। আজ তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও। আমাকে তুমি কি মিথ্যাবাদী হতে বলো ?

অলকা। না না, তা বলব কেন ? কিন্তু—

রামমোহন। এর মধ্যে তো কোথাও কিন্তু নেই। যা সত্য, তাকে প্রকাশ না করা নিজের বিবেকের কাছে মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়।

অলকা। তাই বলে ওঁদের দুঃখ দিয়ে—

রামমোহন। ওঁদের দুঃখের চাইতেও অনেক বড় দুঃখের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে যে সারা ভারতবর্ষের দুঃখ ! শপথ নিয়েছি—এর প্রতিকার আমি করবই। একটি জাতি—একটি ধর্মের মধ্যে দিয়েই সারা জাতটাকে আমি গড়ে তুলব ! 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শুধু আমার ধর্ম নয়, সে আমার ভারতবর্ষ বৌঠান !

অলকা। কিন্তু প্রচলিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ভালো ঠাকুরপো !

রামমোহন। শাস্ত্র ! ক'জন শাস্ত্র পড়েছে বৌঠান, ক'জন জেনেছে তার মর্ম ? শাস্ত্রের নামে কতগুলো সংস্কার ভূতের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে। যে দিকে তাকাই একটা মানুষ তো কোথাও দেখতে পাই না ! শক্তি নেই, বিচারবোধ নেই, সত্য-জিজ্ঞাসা নেই ! শুধু একদল ভূতে পাওয়া লোক বিকারের ঘোরে পথ হেঁটে চলেছে। শাস্ত্র—ধর্ম ! একজন কুলীন তিনশো বিয়ে করবেন তার নাম ধর্ম ! পাঁচ বছরের বিধবাকে পঁচানব্বুই বছরের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারবে, তাকে বলবে ধর্ম ! দরিদ্রনারায়ণকে একমুঠো খেতে না দিয়ে পাথর আর পেতলের মূর্তির গায়ে হীরে-জহরৎ চাপিয়ে বলবে—ধর্ম ! (উত্তেজিত) না, বৌঠান, না !

অলকা। ঠাকুরপো !

রামমোহন। (উঠে দাঁড়ালেন) এ আমি কিছুতেই সইব না। ধর্মের উদ্দেশ্য জাতকে বাঁচিয়ে রাখা : কিন্তু সে ধর্ম যখন জাতির গলায় ফাঁসি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ফাঁস ছিঁড়ে ফেলাই চাই বৌঠান!

অলকা। কিছুই বুঝছি না। খালি মনে হচ্ছে, তুমি একদিন সর্বনাশ ঘটাবে ঠাকুরপো!

রামমোহন। (হাসছেন) সর্বনাশ? না, বৌঠান! সত্য। তার সময় হয়ে গেছে —সে আসবেই। তাকে রোধ করা যাবে না! আমি তোমায় বলছি— দিন বদলাবে! ধর্মের নামে এই মূঢ়তার পালা চুকে যাবে। আর সে কাজের ভার নিয়ে আমাকেই হয়তো সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। (হাসলেন) সেই ভাবী যুদ্ধে যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকে কিছু রসদ চাই আপাতত। এখন সেরটাক চিঁড়ে আর গোটা কুড়িক কলা বের করো দেখি।

অলকা। সেরটাক চিঁড়ে! কুড়িটা কলা!

রামমোহন। জেনেশুনেও কেন লজ্জা দাও? জানোই তো ওর কমে আমার এই রাক্ষুসে পেটটার একটা কোনাও ভরতে চায় না? যাও—যাও। তখন থেকে বকিয়ে বকিয়ে তোমরা শুধু আমার ক্ষিদেটাকেই মারাত্মক রকম জাগিয়ে দিয়েছ।

(অলকা হেসে পা বাড়ালেন)

—তিন—

[প্রথম দৃশ্যের মতো। কাল রাত্রি। শুধু সেই বিছানাটিতে রামকান্ত রায় শুয়ে আছেন। তিনি অসুস্থ। এ তাঁর মৃত্যুশয্যা।

পাশে তারিণী। মাথার কাছে বসে অর্ধাবগুণ্ঠিতা অলকা বাতাস করছেন।]

তারিণী। উমা—উমা—(উমা ঢুকলেন) ওষুধটা হয়ে গেছে মা?

উমা। হাঁ মা—এখুনি নিয়ে আসছি। (চলে গেলেন)

রামকান্ত। কিসের ওষুধ?

তারিণী। কবিরাজ মশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, খেলে শ্বাসকষ্টটা কমে যাবে।

রামকান্ত। শ্বাসকষ্ট! না তারিণী—ওষুধে আর দরকার নেই। লজ্জা-অপমানের চাপে বুকটা আমার গুঁড়িয়ে গেছে। আমায় মরতে দাও—মরতে দাও তোমরা।

তারিণী। এখন চুপ করো তো একটু। (উমা একটা খল-নুড়িতে ওষুধ নিয়ে

এলেন) বিপদ যিনি দিয়েছেন, তিনিই উদ্ধার করবেন। (ওষুধটা মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন) নাও নাও—

[রামকান্ত খল-নুড়িটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন]

রামকান্ত। মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ? সব বুঝেও আমায় ভুল বোঝাতে চাও তুমি? উদ্ধারই যদি করতেন, তাহলে এই বুড়ো বয়েসে বাকি খাজনার দায়ে অমন করে আমায় জেলে যেতে হত না! অমন করে লোকের সামনে আমার উঁচু মাথা মাটিতে লুটিয়ে যেত না! আজ আমারই ঋণের দায়ে জগৎকে অমন ভাবে মেদিনীপুরের জেলে পচে মরতে হত না! তারিণী, রায়রায়ান কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর হয়ে যে মুহূর্তে জেলখানার জল আমায় মুখে দিতে হয়েছে—তখুনি আমার আত্মহত্যা করা উচিত ছিল!

তারিণী। কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। আজ দুঃসময় এসেছে, আবার সুদিন ফিরে আসবে।

রামকান্ত। তারিণী, কপাল নয়, তোমার বাবার অভিশাপ! বিধর্মী ছেলের পাপে সোনার সংসার আমার রসাতলে গেল! (উত্তেজিত) আরো যাবে—আরো যাবে! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পথে পথে তোমাদের ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে!

তারিণী। অদৃষ্ট যদি তেমন হয়, তাই হবে। কিন্তু যে বিধর্মী ছেলের জন্যে তোমার এত ভয়—সে তো আজ সংসারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখে না। (উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন) নিজের ভাগ্য নিয়ে সে দূর বিদেশে চলে গেছে। পশ্চিমে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তবু কেন নিমিত্তের ভাগী করছ তাকে?

রামকান্ত। চমৎকার তোমার যুক্তি তারিণী! বিদেশে চলে গেছে বলেই কি সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে তার? তুমি জান না—কিন্তু সব কথাই তো আমার কানে আসে। সামনে তবু খানিক চক্ষুলজ্জা ছিল তার। এখন দূরে সরে গিয়ে সে পুরোপুরি ম্লেচ্ছ হয়ে উঠেছে। জাতিভেদ মানে না, খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই—ধর্মের বিরুদ্ধে সমানে বিষ ছড়িয়ে চলেছে সে! এত বড় অন্যায়ের ভার মা বসুন্ধরাও সইতে পারেন না তারিণী—রায়রায়ান বংশ কোন্ ছার! সর্বনাশ আসছে—মহাপ্রলয় আসছে! বংশের সেই ভরাডুবি দেখবার আগেই তোমরা আমায় মরতে দাও! দোহাই তোমাদের, মরতে দাও আমাকে!

তারিণী। (শান্ত কঠিন কণ্ঠে) এই যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তাহলে একটা উপায়

তো এখনো আছে।

রামকান্ত। কী উপায় ?

তারিণী। ত্যাজ্যপুত্র করো মোহনকে। চুকিয়ে দাও সম্পর্ক। তার পাপ নিয়ে সংসার থেকে চিরদিনের মতো বিদায় হোক।

রামকান্ত। ত্যাজ্যপুত্র! সে কথা কি কতবার আমিও ভাবিনি ? কিন্তু মা হয়ে তুমি তা সইতে পারবে তারিণী ?

তারিণী। পারব। সন্তানের চেয়ে বংশের মর্যাদা আমার কাছে অনেক বড়।

রামকান্ত। কিন্তু—কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র করলেও সে যে এই বংশেরই সন্তান! আমার রক্ত তার শরীরে! সেই রক্তের পথ বেয়েই আসবে বিষ—জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। নিস্তার নেই—নিস্তার নেই তারিণী! না, ত্যাজ্যপুত্র করেও কোন ফল হবে না!

তারিণী। তবে তুমি কী করতে চাও ?

রামকান্ত। কিছুই না—কিছুই না! আমরা বৈষ্ণব—নারায়ণের পায়ে সব নিবেদন করে দিয়েছি। যা তাঁর ইচ্ছে, তাই হবে! কার বিচার করব আমি—কাকে ত্যাজ্যপুত্র করব ? আজ সংসারকে যিনি শাস্তি দিচ্ছেন—কাল তোমার ছেলেকেও তিনি বাদ দেবেন না!

তারিণী। তাই যদি বুঝে থাকো, তাহলে স্থির হও। তাঁরই ওপরে ছেড়ে দাও সব।

রামকান্ত। চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি কই ? চিন্তা তো একটা নয়! জগৎ জেলে—রামলোচন একেবারে নাবালক। যে ঝড় আসছে তার মুখে কে হাল ধরবে ? আমার মৃত্যুর পরে কে বাঁচিয়ে রাখবে বংশের কুল-মান-মর্যাদা ? তারিণী—আমি চলেছি। যাওয়ার আগে তুমি আমার একটা কথা রাখো—শেষ মুহূর্তে আমায় ভরসা দাও—

(তারিণীর হাত চেপে ধরলেন)

তারিণী। ওগো অমন করছ কেন ? (ব্যাকুল হয়ে) তুমি যা হুকুম করবে তা না মেনে কি আমি পারি ?

রামকান্ত। তাহলে কথা দাও, আমি যখন থাকব না, তখন এই হতভাগা সংসারকে রক্ষা করবার দায় তুমি নেবে ? (তারিণী নিরুত্তর) বলো—বলো! তুমি ছাড়া এ দুঃসময়ে আমার কেউ নেই। বলো আমার সঙ্গে সহগমন করে সারা পরিবারটাকে তুমি ভাসিয়ে দিয়ে যাবে না! সমস্ত দুর্বিপাকের মধ্যেও রায়রায়ান বংশকে তার মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। বলো তারিণী, বলো ?

তারিণী। সধবার সিঁদুর মাথায় নিয়ে সতীস্বর্গে যাবার সৌভাগ্য তুমি আমায় দিলে না! তা হোক, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। আমার বুকের রক্ত দিয়েও বংশের মান আমি বজায় রাখব!

রামকান্ত। আঃ! (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন) তারিণী, তারিণী—এইবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!

—চার—

[রামকান্ত রায়ের বাড়ির উঠোন। তিনদিকে দরদালান—মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি জুড়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে।

জিনিসপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। দুজন পুরোহিত অভিনিবেশ সহকারে কলার ডোঙা কাটছেন। বৃষোৎসর্গের একটা খুঁটি এক কোণায় পোঁতা আছে। প্রাঙ্গণের ডানদিকে রাজরাজেশ্বরের মন্দির। বাঁদিক থেকেই চরিত্রগুলি আসবে এবং বাঁদিক দিয়েই বেরিয়ে যাবে।

আগের দৃশ্যের কিছুদিন পরের কথা। রামকান্ত রায় লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্রাদ্ধের আয়োজন। নেপথ্য থেকে মধ্যে মধ্যে কলকণ্ঠ শোনা যাবে:

—কই হে তোমাদের রসগোল্লার ভিয়ান নামল?

—কলাপাতা ওদিকে—ওদিকে—

এগুলি থেকে থেকে শোনা যাবে অনিয়মিত ভাবে—তা ছাড়া অবিচ্ছিন্ন অর্থহীন কোলাহল—পটভূমি সৃষ্টি করার জন্যে।]

[সময় ১৮০৩ সাল—জুন মাস। বেলা: আন্দাজ গোটা দশেক]

প্রথম। লক্ষণ যে খুব ভালো ঠেকছে না হে ন্যায়রত্ন!

দ্বিতীয়। কেন, কী হল?

প্রথম। জেনে শুনেও যে ন্যাকা সাজছ! রামনগরের সমাজপতিরা কী বলে বেড়াচ্ছে শোনোনি? বিধর্মী মেজবাবু যদি বাপের শ্রাদ্ধ করেন তাহলে কেউ এ উপলক্ষে অন্ন গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়। আরে রেখে দাও—রেখে দাও ওসব। রায়রায়ানদের অবস্থা আজ যেমনই হোক, বনেদীয়ানা তো আছেই! ভোজের আয়োজন আর দান-সামিগ্রীর বহর দেখলে মাথা ঘুরে যাবে সকলের। সুড়সুড় করে পাতে এসে বসতে পথ পাবে না।

প্রথম। না হে, ব্যাপারটা এত সহজ হবে না। রামজয় বটব্যাল তো তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে চারদিক। আমরা শ্রাদ্ধ করতে এসেছি—শেষ পর্যন্ত আমাদের ধোবা-নাপিত বন্ধ না করে।

দ্বিতীয়। মা ঠাকরুণ জানেন এসব ?

প্রথম। জানেন না ? অমন বুদ্ধিমতী—অমন বিচক্ষণ—এ খবর কি আর তাঁর কানে আসতে বাকী থেকেছে ?

দ্বিতীয়। মেজবাবুকে কিছু বলেছেন নাকি ?

প্রথম। কিছুই তো বুঝছি না। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। মেজবাবুও সেই যে পশ্চিম থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছেন—এক হবিষ্যির সময় ছাড়া বাইরে পর্যন্ত আসেন না। মার সঙ্গে কথাবার্তা অবধি হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমার কিন্তু সুবিধে মনে হচ্ছে না ন্যায়রত্ন ! শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

দ্বিতীয়। কপাল ভাঙলে এমনিই হয় ! বাকী খাজনার দায়ে জেল খেটে, সেই অপমানে কর্তা মারা গেলেন। সে টাকার জামিন হয়ে বড়বাবু এখনো হাজতে পচছেন। মেজ ছেলের এই বিপরীত বুদ্ধি ! এত শোকে-তাপে মা ঠাকরুণ যে কী করে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন, তাই আশ্চর্য !

প্রথম। মা ঠাকরুণকে তুমি এখনো চেনোনি ন্যায়রত্ন ! পাথরের মতো শক্ত মানুষ ! দরকার হলে—(হঠাৎ থেমে গিয়ে) ওই যে—নাম করতে করতেই আসছেন। বাঁচবেন অনেক দিন।

দ্বিতীয়। যা শাস্তিতে আছে—অনেকদিন বাঁচাটা বড় সুখের নয় ওঁর পক্ষে।

প্রথম। চুপ—চুপ !

(তারিণী প্রবেশ করলেন। শোকশীর্ণা বিধবা। মুখে-চোখে স্থির সংকল্পের দ্যুতি।)

তারিণী। আপনাদের আর কত দেরী স্মৃতিতীর্থ মশাই ?

প্রথম। এদিকে সব তৈরি মা। এখনি কাজে বসতে পারবেন।

তারিণী। দান দক্ষিণার যা ব্যবস্থা হয়েছে তাতে কর্তার অমর্যাদা হবে না—কী বলেন ?

প্রথম। সে কথা আর বলতে মা ! রায়রায়ান বাড়ির কাজ—তার ওপর অমন মানী লোকের শ্রাদ্ধ ! কিন্তু (একটু গলা খাঁকারি দিয়ে) ব্যাপারটা কী জানেন মা ? রামনগরের সমাজপতিরা—

তারিণী। (বাধা দিয়ে) শুনেছি।

দ্বিতীয়। আমাদের ভয় হচ্ছে যদি কোনোরকম গোলমাল—

তারিণী। (সংক্ষেপে) কিছু হবে না। তাঁর শ্রাদ্ধে কোথাও একটু ফাঁক আমি রাখব না।

প্রথম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাহলেই নিশ্চিন্ত। তবে এই—নানারকম শুনছিলাম কিনা—

(মুণ্ডিতশির, উত্তরীয়ধারী রামমোহনের প্রবেশ। তাঁকে দেখে স্মৃতিতীর্থ থেমে গেলেন। রামমোহন একবার নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁদের এবং পরে সমস্ত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন মার কাছে)

রাম। সময় তো প্রায় হয়ে এল মা! এবার বসতে পারি।

প্রথম। আপনি আসুন। আমাদের সব তৈরি।

(শ্রাদ্ধের কিছু কিছু উপকরণ নিয়ে উমা এবং অলকা প্রবেশ করলেন। সাজিয়ে দিলেন।)

রামমোহন। তাহলে আদেশ দাও মা।

তারিণী। আদেশ দিলাম বাবা। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এবার তোমার হাতে জলগণ্ডুষ পেয়ে ওঁর জলে-যাওয়া বুকটা তৃপ্তি পাক।

(স্বর অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল, উমা ও অলকা আঁচলে চোখ মুছলেন)

রামমোহন। আমি তাহলে—(আসনের দিকে এগোতে গেলেন)

তারিণী। একটু দাঁড়াও—

(রামমোহন দাঁড়ালেন)

শোনো। তোমার দাদা কয়েদে। সেইজন্যে তোমার অগ্রজের অধিকার —তুমিই পিতৃশ্রাদ্ধ করতে চলেছ। বংশের সমস্ত বিধি মেনে—তার মর্যাদা রেখে তবেই এ কাজ তুমি করতে পারো। তাই আগে তোমার আরো কিছু কর্তব্য শেষ করে নাও—

রামমোহন। কী কর্তব্য মা?

তারিণী। এগিয়ে যাও ওই রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে। (মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দিলেন) এতদিন ধরে যা বলেছ, যা করেছ, মার্জনা চাও তার জন্যে।

রামমোহন। মা!

তারিণী। শ্রদ্ধাভরে রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলো—জীবনে আর কখনো ম্লেচ্ছাচার করবে না!

রামমোহন। ম্লেচ্ছাচার তো আমি করিনি মা। যে অপরাধ আমার নয়, তারই জন্যে কেন তুমি আমায় ক্ষমা চাইতে বলছ?

তারিণী। তর্কের সময় নয় মোহন। শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়েই তুমি পিতৃতর্পণে বসবে। এ আমার আদেশ।

রামমোহন। আদেশ! এ অন্যায় আদেশ মা!

(তারিণীর মুখ লাল হয়ে উঠল। অলকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন রামমোহনের কাছে)

অলকা। (চাপা গলায়) যাও, ঠাকুরপো যাও। এ সময় আর মাকে ক্ষেপিয়ে কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না!

ন্যায়রত্ন। মেজবাবু, যান। আমাদের সব তৈরি। আপনি এসে বসলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।

রামমোহন। কিন্তু—

অলকা। এর মধ্যে আবার কিন্তু কি! যাও শীগ্‌গির!

রামমোহন। যা আমি বিশ্বাস করি না—

অলকা। তুমি বড় একগুঁয়ে মানুষ ঠাকুরপো। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে এতে? (চাপা গলায়) শুধু দুটো মুখের কথা খরচ করলেই মা যদি খুশি হন—

রামমোহন। হাঁ, যাচ্ছি—

(ডানদিকে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর—)

রাজরাজেশ্বর, রাধারাণী, তোমরা আমার মায়ের ইষ্টদেবতা। আমি তোমাদের স্বীকার করি না—

তারিণী। (বজ্রাহত) মোহন!

রামমোহন। না—স্বীকার করি না! কিন্তু মা আদেশ করেছেন বলে তোমাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি! (নমস্কার করলেন)

অলকা। (আর্তস্বরে) কী হচ্ছে ঠাকুরপো!

রামমোহন। (ভ্রূক্ষেপও করলেন না) কোনো অপরাধ আমি কারো কাছে করিনি। তবু মা যখন বলেছেন, তোমাদের কাছে মার্জনা চাইছি আমি!

(সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শুধু দেখা গেল অসহ্য ক্রোধে তারিণী থর থর করে কাঁপছেন। রামমোহন ফিরে তাকালেন)

এইবার আমি শ্রাদ্ধে বসতে পারি মা?

(তারিণীর ঠোঁট নড়ে উঠল)

তারিণী। না! পারো না! কোনোদিন পারবে না!

অলকা। মা!

তারিণী। (চিৎকার করে) না—না! নাস্তিক, কুলাঙ্গার—এ শ্রাদ্ধে তোমার অধিকার নেই! আর—আর (কাঁপতে লাগলেন) এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তেই এ বাড়ি থেকে তুমি বেরিয়ে যাবে!

ন্যায়রত্ন। কী হচ্ছে মা ঠাকুরুণ! শান্ত হোন!

তারিণী। শান্ত হব! এর পরেও শান্ত হব! এ বংশের সম্মানের ভার স্বামী অন্তিম সময়ে আমারই হাতে দিয়ে গেছেন। মোহন—আমার আদেশ, এখুনি তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে!

উমা। (রামমোহনের কাছে গিয়ে কাতর ব্যাকুল গলায়) ওগো—কী করছ? যাও, মার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও!

রামমোহন। হাঁ—ক্ষমা চাইব। (তারিণীর দিকে এগিয়ে গিয়ে) কোনো অন্যায় আমি করিনি মা। কিন্তু নিরুপায় হয়েই তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছি—সেজন্যে আমায় ক্ষমা করো।

তারিণী। (মুখ ফিরিয়ে) আমি! আমি ক্ষমা করবার কে! বংশের অপমান—দেবতার অমর্যাদা—আমার ক্ষমা করবার তো অধিকার নেই! চলে যাও—চলে যাও তুমি—

রামমোহন। তাই যাচ্ছি। সত্যের অনুরোধে আজ তোমাকেও আমায় ছাড়তে হল মা। সে-জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু একটা কথা বলে যাই। পিতৃশ্রাদ্ধ আমি করবই। এ বাড়িতে না হোক—পৃথিবীতে জায়গার অভাব আমার হবে না। তোমাদের কোনো কুসংস্কারই আমার সে শ্রাদ্ধাধিকার কেড়ে নিতে পারবে না—

(রামমোহন চলে গেলেন)

অলকা। ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—

তারিণী। (দৃঢ় কণ্ঠে) যেতে দাও অলকা! ওর যাওয়াই দরকার!

(উমা আঁচলে মুখ ঢাকলেন। তারিণী শ্রাদ্ধের আসরের দিকে এগোলেন)

স্মৃতিতীর্থ মশাই, সর্বকনিষ্ঠ লোচনই তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ করবে। আমি এখুনি তাকে ডেকে আনছি—

—পর্দা পড়ল—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—এক—

[কয়েক বৎসর পরে।

শ্মশান।

পেছনে কিছু দূরে জগমোহনের চিতা সাজানো হচ্ছে। সাত-আটজন শববাহীকে দেখা যাচ্ছে ওদিকে, তারা চিতা সাজানোয় ব্যস্ত। ঢাক কাঁধে দুজন ঢাকী। দুজনের হাতে দুটো বড় বড় ধুনুচি—তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

যন্ত্রচালিতের মতো প্রবেশ করলেন অলকা—লাল শাড়ি পরা—এলোমেলো রুক্ষ চুল। সমস্ত কপালে তাঁর সিঁদুর লেপা। যেন ভৈরবীর মূর্তি।

তারিণী এবং উমা তাঁকে অনুসরণ করলেন।]

তারিণী। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) যাও মা! ভাগ্যবতী তুমি! স্বামীর চিতায় সতী

হয়ে জন্ম-এয়োতি হও ! অক্ষয় স্বর্গ হোক তোমার !

উমা। (অলকাকে জড়িয়ে ধরলেন—কান্নাভরা গলায় ডাকলেন) দিদি !

(অলকা জবাব দিলেন না—বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। অর্থহীন শূন্য তাঁর দৃষ্টি।)

তারিণী। এ সময় আর মায়া বাড়িয়ো না মেজবৌ ! ওর সৌভাগ্যের পথ চোখের জলে পিছল করে দিয়ো না ! বাপের মতোই অনেক জ্বালায় জগৎ আমার জ্বলে মরেছে। মা হয়ে ইহলোকে আমি কিছুই করতে পারিনি, পরলোকে ওকে তুমি শান্তি দিয়ো বৌমা !

(অলকা জবাব দিলেন না)

উমা। মা, বড় ঠাকুর চলে গেলেন, আজ দিদিও—(কেঁদে ফেললেন)

তারিণী। কত পুণ্য করলে মেয়েরা সতী হয়—এ কি কাঁদবার জিনিস মেজ বৌ ? আজ ওর পিতৃকুল-শ্বশুরকুল সব ধন্য হল। আশীর্বাদ করি বড় বৌমা, ঠাকুর তোমায় শক্তি দিন। (অলকা তেমনি পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন) মেজ বৌ, এসো।

উমা। যাই মা—

(কাঁদতে কাঁদতে অলকার পায়ের ধুলো নিলেন—অলকা কাঠের মতো একখানা হাত তুলে মুহূর্তের জন্যে উমার মাথায় ছোঁয়ালেন।)

তারিণী। এসো মেজ বৌ—

(তারিণী পেছনে একবারও না তাকিয়ে এগিয়ে চললেন। উমা তাঁকে কয়েক পা অনুসরণ করে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে ফেললেন। তারিণী ফিরে তাকালেন, তারপর সস্নেহে তার হাত ধরলেন)

এসো—

(তারিণী ও উমা চলে গেলেন। অলকা দাঁড়িয়ে রইলেন মূর্তির মতো। স্তব্ধতায় কাটল। পুরোহিত এগিয়ে এলেন)

পুরোহিত। মুখাগ্নি হয়ে গেছে। এবার আপনি আসুন—

অলকা। (যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন) অ্যাঁ ?

(দেখা গেল পিছনে চিতা জ্বলে উঠেছে)

পুরোহিত। আপনি আসুন—

অলকা। ওঃ ! চলুন—

পুরোহিত। এই কুশ নিন—

(অলকা নিলেন)

পুবমুখী হয়ে দাঁড়ান মা—(যন্ত্রের মতো ঘুরে দাঁড়ালো অলকা) এবার সংকল্প পড়ুন—(পুরোহিত পড়ে যেতে লাগলেন, অলকা সঙ্গে সঙ্গে বলে চললেন)

কার্তিকে মাসি, কৃষ্ণে পক্ষে, ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রা শ্রীমতী অলকামঞ্জরী দেবী অরুন্ধতী সমাচারত্বপূর্বক স্বর্গালোক মহীয়মানত্ব মানবাধি রণকলোমসম সংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাস-ভর্তৃ-সহিত মোদমানত্ব—

(একটি লোক দৌড়ে এসে পুরোহিতের কানে কানে কী বলল; পুরোহিত চমকে উঠল। চাপা স্বরে বললে)

অ্যাঁ। আসছে—নৌকা থেমেছে ঘাটে! তবে আর দেরী নয়, মন্ত্র এই পর্যন্তই রইল। (জোরে অলকাকে) মা, সংকল্প হয়ে গেছে। বলুন, 'ভর্তৃজ্বলচ্চিতা-রোহণমহং করিষ্যে'—

(অলকা প্রতিধ্বনি করলেন)

এবার অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমিজল-হৃদয়াবস্থিত অন্তর্যামিপুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা—

(লোকটি আবার কানে কানে কী বলল, পুরোহিত ব্যস্ত হয়ে)

হ্যাঁ—হ্যাঁ—এদের সাক্ষী করে আপনি চিতায় আরোহণ করুন—শবকে আলিঙ্গন করে বসুন। আর দেরী নয় মা—আর দেরী নয়—আসুন—

(অলকা চিতার দিকে চলে গেলেন; জনতার ভীড় তাঁকে ঘিরে ধরল। আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল জনতার ওদিক থেকে।)

পুরোহিত। (ভীড় ঠেলে বেরিয়ে চিৎকার করে) ওরে বাজা—বাজা! অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী! স্বর্গের সিংহদ্বার খুলে গেছে, সতী পতির সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন, বাজা—বাজা—

(উদ্দাম শব্দে ঢাক বেজে উঠল)

শববাহীরা। (সমস্বরে) জয়, সতী অলকামঞ্জরীর জয়—

পুরোহিত। বাজা—বাজা—আরো জোরে বাজা—

(প্রচণ্ড রোলে ঢাক বাজতে লাগল। ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। উঠতে লাগল ঘন ঘন জয়ধ্বনি। সবটা মিলিয়ে এক বীভৎস পরিবেশ রচিত হল। হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে এলেন অলকা—)

অলকা। পারব না—আমি পারব না—

শবযাত্রীরা। (সমবেত কোলাহল) পালায়—পালায়—সতী পালায়—

পুরোহিত। মা, কী করছেন, কী করছেন! সংকল্প করে—(হাত চেপে ধরলেন অলকার)

অলকা। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে) জানি না, কিছু জানি না। আমার সন্তানকে ফেলে আমি মরতে পারবো না। আমি শুনতে পাচ্ছি সে আমার জন্যে কাঁদছে। (আর্ত চিৎকারে) বাবা—আমি আসছি—আমি আসছি—তোকে ছেড়ে

কোথাও আমি যেতে পারব না—

(অলকা ছুটে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ থেকে)

পুরোহিত। (পাগলের মতো) ধর্‌—ধর্‌—পালাতে দিসনি। (দু-তিনজন শববাহী লাঠি নিয়ে ছুটল) ওদিকে বোধ হয় ম্লেচ্ছটা এসে পড়ল—সব পণ্ড হয়ে যাবে! ধর্‌—ধর্‌—ধর্‌—

(নেপথ্যে অলকার বুকফাটা আর্তনাদ) খোকা—খোকা আমার—উঃ!

পুরোহিত। (চেঁচিয়ে) বাজা,, যত জোরে পারিস. বাজা। সতী স্বর্গে যাচ্ছেন—স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন! অক্ষয় পুণ্য, তিন কুলের বৈকুণ্ঠ লাভ—

(শববাহীরা ধরাধরি করে অচেতন অলকাকে নিয়ে এল। মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে)

যাও—নিয়ে যাও—। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সতীকে স্বর্গে যেতেই হবে।

[অলকাকে নিয়ে সকলে চিতার দিকে অগ্রসর হল। ঢাকের উতরোল শব্দ কান বধির করে দিতে লাগল—ধুপের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। দূর থেকে দেখা গেল সকলে চিতাকে ঘিরে আছে—তাদের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা উঠছে]

পুরোহিত। (চিৎকার করে) রায়বংশ ধন্য হল—দেবী সতীলোকে গেলেন!

শববাহীরা। জয় সতী অলকমণির জয়—

[ঢাকের শব্দ। ধুপের ধোঁয়া—জয়ধ্বনি। কিছুক্ষণ।]

[দ্রুত রামমোহন প্রবেশ করলেন]

রামমোহন। বৌঠান—বৌঠান—

[থমকে থেমে পড়লেন—শববাহীরা ইতস্ততঃ নড়েচড়ে দাঁড়ালো, এ ওর কানে কানে গুঞ্জন করল। পুরোহিত আস্তে এগিয়ে এলেন।

রামমোহন ততক্ষণ মাটিতে বসে পড়েছেন দু হাতে মুখ ঢেকে। তারপর কান্নাভরা গলায় বললেন]

বৌঠান, ছেলেবেলা থেকে তোমায় যে মায়ের মত দেখে এসেছি! সেই তুমি এমন করে ছেড়ে গেলে! এতদূর থেকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলাম, তবু—তোমায় বাঁচাতে পারলাম না! (কেঁদে ফেললেন)

পুরোহিত। দুঃখ করে কী করেবেন মেজবাবু! স্বেচ্ছায় সতী স্বর্গে গেলেন—হাসি মুখে চিতায় উঠলেন। আহা, আজ বংশ পবিত্র হল—গ্রাম ধন্য হল—

রামমোহন। মিথ্যে—মিথ্যে! এ হত্যা—ধর্মের মদ খাইয়ে বর্বরের মতো নারীহত্যা! এতে বংশ উজ্জ্বল হবে না—সমস্ত হিন্দুধর্মের মাথার ওপর বাজ পড়বে!

(তীব্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন—প্রায় চিৎকার করে বললেন কথাগুলো)

পুরোহিত। আপনি ধর্মাধর্ম মানেন না মেজবাবু, তাই—

রামমোহন। চুপ করুন! শয়তান আপনারা—আপনারা খুনী! কিন্তু জানবেন—এ আর চলবে না! আজ এই প্রতিজ্ঞা আমি করে গেলাম—বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এ হত্যাকাণ্ড আমি বন্ধ করবই। দেশ থেকে এ নারী-মেধের পৈশাচিক আনন্দ আমি মুছে দেব! শুনে রাখো বৌঠান, আজ থেকে এই আমার জীবনের সাধনা। সতীদাহ বন্ধ আমি করবই—আমি করবই—

(উন্মত্তের মতো ছুটে চলে গেলেন)

পুরোহিত। বন্ধ করবে—সতীদাহ বন্ধ করবে! হা! হা! হা—

(পাগলের মতো হেসে চললেন)

—দুই—

[রায়রায়ান রামকান্তের লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি। সকাল। বারান্দায় তারিণী মালা জপ করছেন। একখানা আসনে বসেছেন তিনি। দেওয়ান প্রবেশ করলেন। বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন]

দেওয়ান। তাহলে প্রজাদের কী করব মা?

তারিণী। খাজনা না দেয়, উচ্ছেদ করুন।

দেওয়ান। আজ্ঞে সে তো বটেই, সে তো বটেই। ইচ্ছে করলেই সেটা করা যাবে। কিন্তু—

তারিণী। (ভ্রুকুঞ্চিত করলেন) আবার কিন্তু কী?

দেওয়ান। মানে বলছিলাম কী—এবার ওদিকটাতে অজন্মা হয়েছে, তাই কিছু মাপ-টাপ—

তারিণী। মাপ! খাজনা মাপ করলে আমার কী করে চলবে? কত কষ্ট করে সব সামলাতে হচ্ছে, তা কি আপনি জানেন না? এর পরে খাজনা মাপ করলে লাট পাঠাবেন কোথা থেকে? সব সুদ্ধু তখন নীলেমে চড়বে।

দেওয়ান। বুঝছি তো সব! (মাথা চুলকে) তা, লাটের খাজনা হয়ে যাবেই একরকম করে। কথাটা কী জানেন মা? এরকম অবস্থায় কর্তা কিছু মাপ করেই দিতেন, তাই আর কি—

তারিণী। দেওয়ানজী মশাই!

(তীব্র স্বর শুনে দেওয়ান চমকে উঠলেন)

দেওয়ান। আজ্ঞে?

তারিণী। আমার স্বামী কী করতেন না করতেন সে আলোচনায় আজ আর দরকার নেই। কিন্তু ভার যখন আমার হাতে তিনি দিয়ে গেছেন, তখন আমি যা

করব তাই হবে।

দেওয়ান। যদি কোনো গণ্ডগোল হয়?

তারিণী। ঘর ভেঙে দেবেন। লাঠিয়াল পাঠাবেন। আগুন লাগিয়ে দেবেন। বুঝেছেন?

(নবকিশোর প্রবেশ করল)

নব। কেমন আছো খুড়িমা?

তারিণী। নবকিশোর যে! এসো—এসো—(নবকিশোর একপাশে বারান্দায় বসল) দেওয়ানজী মশাই, তাহলে আপনি এখন আসুন। যা বললাম, তাই করবেন।

(দেওয়ান চলে গেলেন)

তারপর, খবর কী নব?

নব। এই একরকম চলে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার কী খুড়িমা? নিজেই বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করছ নাকি?

তারিণী। দেখছেন গৃহদেবতা রাজরাজেশ্বর। আমি শুধু তাঁর সেবায়েৎ।

নব। ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝি নে খুড়িমা! চাষাভুষো মানুষ—মাঠে দাঁড়িয়ে চাষবাসের তদারক করি, আমার মাথায় ওসব বিশেষ ঢোকেও না। আমি বলছিলাম, তুমি মেয়েমানুষ—এ বয়েসে কোথায় তীর্থধর্ম করবে—তা নয় এসব কী কচকচি নিয়ে পড়েছো! কুডোজালিতে তো হরিনাম জপছো না—কষছো জমিদারী প্যাঁচ! ছাড়ো—ছাড়ো এসব—

তারিণী। কী করে ছাড়ব নব? আশা ছিল লোচন বড় হয়ে উঠলে তার হাতেই সব তুলে দেব। কিন্তু রায়রায়ান বংশের কপালগুণে নারায়ণ তাকে তো আগেই পায়ে টেনে নিয়েছেন! কার ওপর ছাড়ব এ সমস্ত? তীর্থ-ধর্ম! হ্যাঁ, ভেবেছিলাম একবার শ্রীক্ষেত্রে যাব, জন্মের সাধ মিটিয়ে দর্শন করে আসব নীলমাধবকে। কিন্তু তাও বুঝি আর হল না। যে বোঝা স্বামী আমার ওপর তুলে দিয়ে গেছেন—তার ভার বয়েই বুঝি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমায় কাটিয়ে যেতে হয়।

নব। ইচ্ছে করে এই ভোগান্তি ভুগছ খুড়িমা। অনেক তো হল—আর কেন? এবার মিটিয়ে ফেল!

তারিণী। মেটাব! কার সঙ্গে?

নব। তাও কি আমায় বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি? অমন দিকপাল ছেলে তোমার—দেশজোড়া নাম এখন! কালেক্টার ডিগ্‌বী সাহেবের সঙ্গে ঘুরে আর

ব্যবসা বাণিজ্য করে দু'পয়সা কামিয়েও নিয়েছে। রংপুরে গিয়ে আমি তো দেখেছি সায়েবদের কাছে তার খাতির কত! দেশী লোকের মধ্যে একা রাম-মোহনই সাহেবদের সঙ্গে সমানে আদর পায়! কোথায় এমন ছেলের হাতে সব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে তা নয়—মিথ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছ? সে রইল রাধানগরে গিয়ে আলাদা বাড়ি করে আর তুমি এখানে ভূতের ব্যাগার খেটে মরছ! কোনো দরকার আছে এ-সবের?

তারিণী। (তীব্রস্বরে) নব!

নব। (চমকে) বলছিলাম'কি, একটা মিটমাট—

তারিণী। মিটমাট? কার সঙ্গে মিটমাট? যেটুকু বাকী ছিল, সে পথ তোমরাই তো বন্ধ করে দিয়েছ! এই তুমিই কি রংপুর থেকে ফিরে এসে বলোনি যে মোহন আজকাল মাংস খাওয়া ধরেছে?

নব। (বিব্রত হয়ে) ইয়ে—হ্যাঁ—তা বলেছিলাম বৈকি। মানে কথাটা কী, ওখানে খেঁশারীর ডাল খেয়ে নাকি রামমোহনের রক্তে দোষ হয়েছিল, তাই—

তারিণী। (থামিয়ে দিয়ে) এই বৈষ্ণব পরিবারে অসুখ-বিসুখ সকলেরই করে—সে অসুখ সেরেও যায়। তার জন্যে কখনো অখাদ্য খাওয়ার দরকার হয় না!

নব। এ-ও ভারী তাজ্জব কথা খুড়িমা। গোঁড়া শাক্তের ঘরের মেয়ে তুমি—মাংস খেয়েছে শুনে তুমিই বা এমন ক্ষেপে যাও কেন?

তারিণী। আজ আমি বৈষ্ণবেরই স্ত্রী। মোহনও বৈষ্ণবের ছেলে। শুধু তাই নয়। কিন্তু তুমিই কি একথাও বলোনি নব, যে রংপুরে মোহন তার নতুন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করে বেড়িয়েছে? কী এক পণ্ডিতের সঙ্গে বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি করেছে তাই নিয়ে?

নব। আহা—আহা—সে তো আছেই। রংপুরের সেই গৌরীকান্ত ভট্টচায লোকটাও এক উদ্দাম পাগল। আর তাছাড়া তুমি তো জানোই, এসব নিয়ে তর্ক করা রামমোহনের বরাবরের স্বভাব?

তারিণী। আজ আমায় মিথ্যে ভোলাতে চেষ্টা করো না নব। কত বড় আঘাত পেয়ে উনি মারা গেলেন সে কথা আমি ভুলিনি। ওঁর শ্রাদ্ধের সময় সে অপমান এখনো বুকের ভেতর আগুন হয়ে জ্বলছে। তারপর অসংখ্য খুঁটিনাটি ঘটনা—না নব, কিছুতেই না! সন্তান বলে যাকে স্বীকার করতে পারি না, সেই বিধর্মী সম্পর্কে কোনো আলোচনাই আমি করব না!

নব। তোমার পাথরের প্রাণ খুড়িমা! তাছাড়া রামমোহনেরও তো সম্পত্তিতে

অধিকার আছে। খুড়োমশাই তো সমানে তিন ভাইকেই সব উইল করে দিয়ে গেছেন—

তারিণী। তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু আমি করব না। বাপের শ্রাদ্ধের মর্যাদা পর্যন্ত যে রাখল না, বাপের সম্পত্তিতে এক তিলও তার অধিকার নেই! যতদিন আমি বাঁচব, বিষয়ের একটি পয়সা ছুঁতে দেব না তাকে!

নব। আচ্ছা খুড়িমা, তুমি কী! অমন পণ্ডিত ছেলে তোমার, দেশ জোড়া নাম—

তারিণী। হাঁ—দেশজোড়া নাম ব্রাহ্মণের ছেলে কালাপাহাড়েরও ছিল! একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের সে মুখ উজ্জ্বল করেছিল হিন্দুর সর্বনাশ করে। নব, আমার কী ইচ্ছে করে জানো? যদি আজ লাঠিয়াল পাঠিয়ে কুলাঙ্গারের মাথাটা শুদ্ধ—

নব। (সভয়ে) খুড়িমা! কী বলছ তুমি?

তারিণী। থাক, বিচার রাজরাজেশ্বর করবেন! তাঁর হাতে সুদর্শন চক্র আছে—ধর্মরক্ষাই তাঁর কাজ।

(রামনগরের সমাজপতি রামজয় বটব্যাল এসে ঢুকলেন। প্রবীণ, বিচক্ষণ লোক। ঘরে ঢুকে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একবার কাশলেন।)

তারিণী। আসুন বটব্যাল মশাই, কী মনে করে?

রামজয়। একটু কাজের কথা আছে মা। (নবকে) কেমন আছো নবকিশোর, ভালো তো?

নব। এতক্ষণ তো ভালোই ছিলাম। কিন্তু বামনগবের সমাজপতি রামজয় বটব্যালকে দেখলেই কেমন বুক কাঁপে। মনে হয়, কখন ভুলে কি অনাচাব করে বসেছি—এখনি আমার হুঁকো-নাপিত বন্ধ হবে!

তারিণী। আঃ, কী হচ্ছে নব! বসুন বটব্যাল মশাই, বসুন।

রামজয়। বসব না মা, এখনো পুজা-আর্চা বাকী আছে। আমি বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিবেদনটা শেষ করে যাই!

নব। বটব্যালমশাই, কেউ কেউ খুব নিরীহের মতোই আসে। আবির্ভাবটা ধূমকেতুর মতন আকাশের একটি কোণায়, কিন্তু ফলং সর্বনাশং।

তারিণী। থামো নব! কী আবোল-তাবোল বলছ একজন মানী লোককে! কী বলতে চান আপনি?

রামজয়। বড়োই অপ্রিয় কথা বলতে এসেছি, মা। শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন।

তারিণী। না, কষ্ট আমি পাবো না। জানি, কী আপনি বলতে এসেছেন। মোহন আপনাদের গাঁয়ের পাশে রাধানগরে গিয়ে বাড়ি করেছে। সেটা আপনারা

পছন্দ করেন না, এইতো ?

রামজয়। (বিনীত ভাবে) মা আমার সাক্ষাৎ অন্তর্যামী ! কিছুই বলতে হয় না—শুনেই পেটের কথা আঁচ করে নেন। তা বাস রামমোহন করুক,—যেখানে ইচ্ছে সেখানেই করুক। কিন্তু সমাজের বুকের মধ্যে বসে কী এসব ?

নব। ধর্মকর্ম বুঝি বানচাল হতে বসেছে ?

রামজয়। (উত্তেজিত হয়ে) তুমি ঠাট্টা করছ নবকিশোর, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে তাই ! বাড়ি করেছেন লোক-বসতি ছেড়ে এক শ্মশানের মধ্যে। তা ভূতের ভয় তাঁর থাক বা না থাক আমাদের কিছু যায় আসে না। বাড়ির সামনে এক বেদী বানিয়ে তার গায়ে লিখেছেন : (ব্যঙ্গভরে) ওঁ তৎসৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ! সেইখানে বসে চোখ বুজে তপিস্যে হয় ! আর যে যায় —তাকেই বুঝিয়ে দেন—দেবদেবী সবই মিথ্যে ! ঈশ্বর এক—হিন্দু—মোছলমান—খেরেস্টান—সব এক !

নব। তা আমরাও দেশশুদ্ধ সবাই আদা-নুন খেয়ে লেগে যাই না ! চিৎকার করে বলতে থাকি : ঈশ্বর শুধু তেত্রিশ কোটি নয়—তিন লক্ষ তেত্রিশ কোটি ! ওলাই-চণ্ডী, ঘেঁটু দেবতা, বাঁশবনের ব্রহ্মদত্যি—শ্যাওড়া গাছের মেছো পেত্নী—সকলের পায়ে মাথা না খুঁড়লে অনন্ত নরক ?

তারিণী। ছেলেমানুষি কোরো না নবকিশোর। ভাইয়ের বাতাস তোমার গায়েও লেগেছে দেখছি, তাই দেবদেবী নিয়ে এসব রসিকতা করতে সাহস পাও ! কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে জিনিসটা এত সহজে উড়িয়ে দেবার নয় !

রামজয়। (মাথা নাড়তে লাগলেন) উড়িয়ে দেব কি মা ! শুধু এই ! দিনরাত বাড়িতে মোছলমান গিজগিজ করছে। যত মোল্লার সঙ্গে বসে শাস্ত্রপাঠ চলছে ! না আছে ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার—না আছে ধর্মকর্ম ! শুনছি, ফার্সীতে বইও লিখেছেন হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে। এমন লোক আশেপাশে থাকলে তো গাঁয়ে বাস করা—

তারিণী। (চাপা হিংস্র গলায়) অসুবিধে হয়, গ্রাম থেকে ওকে তুলে দিন !

নব। খুড়িমা !

তারিণী। আপনারা যা ভালো মনে করেন—তাই করবেন বটব্যাল মশাই। আপনারা সমাজপতি, আপনাদের বিচারই শেষ কথা। আমার কিছুই বলবার নেই।

রামজয়। করবার তো অনেক কিছুই আছে—শুধু আপনার ছেলে বলেই করিনি। যদি আপনার অনুমতি পাই—

তারিণী। ধর্ম যেখানে বিপন্ন, সেখানে আমার অনুমতির কোনো দরকার নেই। তা সে যেই হোক। আর তাছাড়া তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই —একথা তো আপনিও জানেন রামজয়!

রামজয়। (মৃদু হাসলেন) যাক মা, নিশ্চিন্ত হলাম! ওইটুকুর জন্যই আটকাচ্ছিল। দেওয়ান রামকান্তের বংশ বলেই এতদিন সয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার মত যখন পেলাম তখন দুদিনেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজ আসি তাহলে—

(বেরিয়ে গেলেন)

নব। (সভয়ে) করলে কী খুড়িমা! ওকে উস্‌কে দিলে! ও যে সাক্ষাৎ বিষধর সাপ! সুযোগ পেলেই যে ছোবল দেবে!

তারিণী। (চোখ তুলে নবকিশোরের দিকে চাইলেন। চোখ দপ দপ করে উঠল) সব জেনেশুনে ইচ্ছে করে যে সাপের গর্তে হাত দেয় তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না নব—

(বেরিয়ে গেলেন। নবকিশোর বোকার মতো তাকিয়ে রইল।)

—তিন—

[রামমোহনের রাধানগরের বাড়ি।

রামমোহন এখন মধ্য-যৌবনে। স্ত্রী উমারও কিছু বয়েস বেড়েছে।

একখানা আসনে বসে কাঠের একটি ডেস্কে কী যেন লিখছেন রামমোহন। অত্যন্ত তন্ময়চিত্ত। থেকে থেকে মাথা তুলে কী ভাবছেন, আবার লিখে যাচ্ছেন। আশে-পাশে পর্বতপ্রমাণ বইয়ের স্তূপ।

উমা এসে নিঃশব্দে পাশে বসলেন।]

উমা। আজ সারাদিন কি তোমার ওই লেখা আর পুঁথি ঘাঁটা শেষ হবে না?

রামমোহন। সমুদ্রে যতই ডুব দিচ্ছি উমা, ততই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। এত জিনিস জানবার আছে, এত কথা বলবার আছে। মনে হচ্ছে, জীবনের পরমায়ু যদি হাজার বছর হত, তাহলেও শাস্ত্রের হাজার ভাগের এক ভাগও জানা হত না।

উমা। অত জেনে যে কী হচ্ছে তাও তো বুঝছি না। লাভের মধ্যে দেখছি শত্রু বাড়ছে।

রাম। (হাসলেন) তাই নিয়ম। অজ্ঞতার রাজ্যে আলো জিনিসটা চিরকাল অসহ্য। সে আলো নিভিয়ে দিতে পারলেই লোকে নিশ্চিন্ত হয়।

উমা। আচ্ছা, তুমি কিছু না মানো—মেনো না। গায়ে পড়ে কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করতে আসছে না। কিন্তু ওসব অমন করে বলে লাভ কী? খামোখা লোক চটানো বই তো নয়!

রাম। সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পাওয়াটা মিথ্যেরই ছদ্মবেশ। মিথ্যেকে আমি প্রশ্রয় দেব না উমা! আমার কথা পৃথিবী শুদ্ধু মানুষকে আমি জানাব। প্রচার করব—বইয়ের পর বই লিখব—প্রমাণ করব—

উমা। ওগো, আমার ভয় করছে! দোহাই তোমার—অনেক এগিয়েছ, আর নয়! এইবারে থামো! বাড়ি ছাড়তে হয়েছে—মার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে, চারদিকে শত্রু! একা একা কেন তুমি এমন করে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ?

রাম। (শান্ত স্বরে) যে দাঁড়ায়—সে একাই দাঁড়ায়। অনেক ঝড় ঝাপটা তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেলে তবেই মাটিতে-পড়া মানুষগুলো দাঁড়াবার জোর পায়।

উমা। কী যে তুমি করছ, তুমিই জানো। তোমার সবই বিদ্‌ঘুটে! বাড়ি করবে—তা বেছে বেছে এসে করলে রাধানগরের এই শ্মশানে! সন্ধ্যেবেলা যখন ওদিকে চিতা জ্বলে আর হরিধ্বনি ওঠে—ভয়ে আমার বুক কাঁপে!

রাম। শ্মশানের মতো পবিত্র জায়গা কি আর আছে? কত মানুষের কত চিতাভস্ম এখানে ছড়িয়ে আছে বলো তো? তোমাদের বিশ্বাস মতে এ তো দেবস্থান। শিব এখানে ছাই মেখে নেচে বেড়ান!

উমা। শিব তো নাচেন, কিন্তু সাঙ্গপাঙ্গেরা—

রাম। ভূত? ওইটেতেই আমার আপত্তি আছে। আত্মা হলেন নিত্য শুদ্ধ মুক্ত প্রবুদ্ধ। কুলোর মতো কান আর মূলোর মতো দাঁত দেখিয়ে লোককে ভিমি খাওয়ানো তার পেশা নয়। তাছাড়া (হাসলেন) ভূতটুত নেহাতই যদি দেখতে পাও আমায় ডেকো। মন্তর জানি—এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব। সে যাক—এখন যাও, আমাকে কাজ করতে দাও।

উমা। না, আর কাজ করতে হবে না! (খাতা কলম কেড়ে নিলেন) এখন খাবে, ওঠো!

রাম। চিরকাল পুরুষের ধ্যানভঙ্গ করাটাই প্রকৃতির লীলা! আচ্ছা, তুমি যাও—আমি এখুনি উঠছি। শুধু একটা চিঠি লিখে যাই।

উমা। চিঠি কোথায় লিখবে?

রাম। কাশীতে। হরিহরানন্দ স্বামীর কাছে। জানো তো তাঁকে আমি গুরুর

মতো মান্য করি। কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে একটু সংশয় হয়েছে। তাঁর মত নেব।

উমা। ওই এক বিট্‌লে সন্ন্যাসী জুটিয়েছ বাপু! এদিকে অবধূত—ওদিকে হিন্দুধর্ম মানে না! যেমন শিষ্য, গুরুটিও তেমনি হওয়া চাই তো।

(যুবক গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন)

উমা। আরে এ কে! ভাগনে যে!

গুরুদাস। কেমন চমকে দিলাম তো! বছর খানেকের জন্যে মহলে ছিলাম। ফিরে তোমার খবর শুনে ছুটে এলাম। (এগিয়ে এসে রামমোহন ও উমাকে প্রণাম করলেন)

রাম। জয়োহস্তু! কিন্তু হঠাৎ ছুটে এলে কেন গুরুদাস?

গুরুদাস। রাধানগরে কেমন নতুন বাড়ি করেছ তাই দেখতে। তা জায়গাটি মন্দ নয় মেজ মামা। দিব্যি ফাঁকা। লোকজনের উপদ্রব নেই। (বসলেন)

উমা। তা নেই। কিন্তু ভূতের উপদ্রব আছে।

গুরুদাস। ভূত! সে কি?

রাম। পেছনে সবটাই শ্মশান কিনা। তাই তোমার মেজ মামী ভয়ে তটস্থ। সে যাক। খবর ভালো তো?

উমা। মুখুয্যে মশাই কেমন আছেন? আর দিদি?

গুরুদাস। ভালোই আছেন সবাই। মা শুধু মাঝে মাঝে মেজ মামার জন্যে কান্নাকাটি করেন—দেখতে চান। বাবারও এখানে খুব আসতে ইচ্ছে—কিন্তু সাহস পান না। সমাজের ভয় আছে তো!

রাম। কিন্তু তুমি যে বড় এলে? তোমার সমাজের ভয় নেই গুরুদাস?

গুরুদাস। না মামা! আমি জানি, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। টিকি আর একাদশীর মধ্যে শুধু ভণ্ডামি আছে—ধর্ম নেই!

উমা। (হেসে উঠলেন) যাক, নিশ্চিন্ত। এবার আর ভয় নেই! এতদিনে একজন শিষ্য জুটল তোমার!

রাম। তা জুটল। (হাসলেন) যদি দিন পাই, যদি কোনোদিন আমার নতুন ধর্ম প্রচারের সুযোগ আসে, তাহলে সেদিন গুরুদাসই হবে আমার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য। কিন্তু পরের কথা পরে। এখন যাও দেখি উমা—গুরুদাসের জন্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করো। আর ডাব পাড়াও গোটা দশেক।

গুরুদাস। গোটা দশেক ডাব! কী হবে?

রাম। কেন—খাবে!

গুরুদাস। তাই বলে দশটা ডাব! আমি কি রাক্ষস?

রাম। আরে ছিঃ ছিঃ বেরাদার! ছেলে-ছোকরার দল—দিনের পর দিন তোমরা হচ্ছ কী? দশটা ডাবের নামেই আঁৎকে উঠলে?

উমা। তোমার মামার হালের খবর বুঝি রাখো না? যত বয়েস বাড়ছে, খাওয়াও বাড়ছে সেই সঙ্গে। আজকাল তো একেবারে এক কাঁদি ডাব নইলে চলে না। সের চারেক পাঁটা একাই জলযোগ করতে পারেন। পঞ্চাশটা ল্যাংড়া আম তো নস্যি!

(গুরুদাস খানিকটা হাঁ করে রইলেন; তারপর উঠে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন রামমোহনকে)

গুরুদাস। এর পরে তোমাকে আরেকটা প্রণাম না করে উপায় নেই মেজ মামা।

(উমা হাসলেন—ভিতরে চলে গেলেন)

গুরুদাস। আগে ভাবতাম, তুমি মহাপুরুষ। এখন দেখছি, সাক্ষাৎ অবতার।

রাম। কী অবতাব? নৃসিংহ?

(হেসে উঠলেন, গুরুদাসও হাসতে লাগলেন। কিন্তু আচমকা বাইরে থেকে একটা বিকট শব্দ ভেসে এলো)

নেপথ্যে। (মুরগীর অনুকরণে) কঁর্—কোঁক্কোর—কোঁ!

গুরুদাস। ওকি!

নেপথ্যে (একাধিক কণ্ঠে) কঁর্ কোঁ—। কঁক্-কঁক্-কোঁর—র্—র্—

(উমা ছুটে এলেন)

উমা। ওগো, চুপচাপ বসে আছ কি! সর্বনাশ হল যে!

গুরুদাস। কী—কী হয়েছে মামীমা?

উমা। সেই রামজয় বটব্যাল আর গাঁয়ের লোকেরা। সেদিন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে শাসিয়ে গিয়েছিল। আজ বাড়ি ঘেরাও করেছে!

গুরুদাস। ঘেরাও করেছে! সাহস তো কম নয়!

নেপথ্যে। (সমবেত ছড়ার সুরে)

হিঁদুর ছেলে মোছলমান—
মুর্গী এবং আণ্ডা খান—

(বিকট অট্টহাসি)

গুরুদাস। আমি যাচ্ছি—

রাম। থামো গুরুদাস! (ভাগনের হাত চেপে ধরলেন) **Let the dogs' bark go, the Caravan will pass on—**

নেপথ্যে। কঁর্-র্—কোঁক্র—কোঁ—

গুরুদাস। আর যে সহ্য হয় না মামা!

রাম। ওরা পাগল বলে তুমিও ক্ষেপে যাবে? চ্যাচাক না। আনন্দ করতে এসেছে—গলা ফাটিয়েই আনন্দ করে যাক।

(নেপথ্য থেকে একটা ঢিল উড়ে এল। পড়ল উমার কপালে)

উমা। উঃ! (বসে পড়লেন)

গুরুদাস। রক্ত পড়ছে যে!

রাম। ওকে ভেতরে নিয়ে যাও গুরুদাস। এখানে থাকলে আরো দু-একটা লেগে যেতে পারে!

গুরুদাস। চলো মামীমা—চলো—

(হাত ধরে উমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। রামমোহন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখের পেশীগুলো কঠোর হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে সমানে শোনা যেতে লাগল :)

কঁকর—কঁকর—কোঁ—

হিঁদুর ছেলে মোছলমান—

মুর্গী এবং আণ্ডা খান—

(দু একটা ঢিল এবং হাড় ছিটকে পড়তে লাগল মঞ্চের ওপর। একটা লাঠি নিয়ে গুরুদাস ফিরে এলেন—যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল, ছুটে যেতে চাইলেন সেদিকে—)

রামমোহন। আঃ—কী হচ্ছে! (টেনে ধরলেন গুরুদাসকে)

গুরুদাস। ছেড়ে দাও মামা! মামীমার মাথা ফাটিয়েছে, আজ ওদেরই একদিন কি আমারই একদিন! এই লাঠিতে দশটার মুণ্ডু নামিয়ে ছাড়ব!

রাম। পঞ্চাশজনের মহড়া আমিও নিতে পারি—সে শক্তি আমিও রাখি। কিন্তু গুরুদাস—এর প্রতিশোধ নেবার পন্থা তো ওটা নয়! অজ্ঞতার সঙ্গে তামসিক লড়াইয়ে শুধু শক্তিই ক্ষয় হয়।

[নেপথ্যে : ব্যাটা বেদ-বেদান্ত কপ্‌চে মুখে

তলে তলে গোস্ত চালান—

কঁকর কোঁ—কঁকর কোঁ—]

গুরুদাস। (অধৈর্য) মামা!

রাম। হাঁ—এ আক্রমণের জবাব আমি দেব। কিন্তু এদের ওপর মিথ্যে রাগ করে কী হবে গুরুদাস? যে কুসংস্কারের প্রেত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওদের ঘাড়ে চেপে আছে—সেটাকেই আগে তাড়াতে হবে! গুরুদাস, আমি কলকাতায় যাব।

গুরুদাস। কলকাতায়?

রাম। হাঁ—সেই আমার কর্মক্ষেত্র! কলকাতায় গিয়ে এই মিথ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাব আমি। সেদিন তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ো—শক্তির পরিচয় দিয়ো সেইদিন। তার আগে আমার এদিককার সব ভার তোমায় দিয়ে গেলাম—তুমিই দেখা শোনা কোরো সব।

(নেপথ্যে : কোঁকোর কোঁ—)

(তন্ময়ভাবে) অন্ধকার! অন্ধকারে সারা দেশ মাথা ঠুকে মরছে! না—আর সময় নেই—নির্জন সাধনার সুযোগ নেই আর! গুরুদাস, কলকাতায় আমায় যেতেই হবে—যেতেই হবে—

—পর্দা পড়ল—

তৃতীয় অঙ্ক

—এক—

[কলকাতায় রামমোহনের মানিকতলার বাড়ি। সময়: আনুমানিক ১৮১৬ সাল। বিলিতি কেতায় সাজানো একটি বসবার ঘর। রামমোহন একা পায়চারি করতে করতে একখানা সংবাদপত্র পড়ছেন। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা]

রামমোহন। আশ্চর্য কুসংস্কার! এত ভালো ইংরেজি শিখেছে—শাস্ত্রের ওপরেও প্রচুর দখল, তবু কী অসাধারণ অন্ধতা! (কাগজটা টেবিলে ফেলে দিলেন)

(দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীনাথ মুন্সী প্রবেশ করলেন)

আরে—আরে, কী সৌভাগ্য! একেবারে দিক্‌পালদের আবির্ভাব! জমিদার দ্বারকানাথ—মিস্টার ডেভিড হেয়ার—বসুন—বসুন সব—

(সকলে বসলেন)

রাধাপ্রসাদ—রাধাপ্রসাদ—

(রামমোহনের বড়ো ছেলে—কুড়ি-বাইশ বছরের রাধাপ্রসাদ ঢুকলেন)

রাধাপ্রসাদ। ডাকছেন বাবা?

রামমোহন। দেখছ না—কারা সব এসেছেন? শীগ্‌গির খবর দাও ভেতরে। হরিকে বলো, এদের জন্যে জলখাবার নিয়ে আসুক।

(রাধাপ্রসাদ চলে গেলেন)

দ্বারকানাথ। আঃ—এখন আবার এসব উৎপাত বাড়াচ্ছেন কেন?

রামমোহন। ভাখো দ্বারকানাথ, তোমার সব ভালো—কেবল এইটেই দোষ। আরে, দিনরাত যে মানুষ এত খেটে মরে—সে তো পেটের জন্তেই! প্রাণ খুলে খেতে না পারলে বেঁচে সুখ আছে নাকি? বুঝলে বেরাদার—দিনে অন্তত বারো সের দুধ না হলে আমার চলে না।

ডেভিড হেয়ার। (হেসে উঠলেন) রায় মহাশয় সত্যই সুপারম্যান।

রাম। কথাটার মধ্যে তোমার মৌলিকত্ব নেই—ওটা অনেক আগেই আমার ভাগ্‌নে ঘোষণা করেছিল। তারপর হেয়ার—আজকাল মাগুর মাছ খাচ্ছ কেমন?

অন্নদা। হঠাৎ মাগুর মাছ! ব্যাপার কী?

হেয়ার। আপনি জানেন না অন্নদাবাবু? রায় মহাশয় একদিন আমাকে ইন্‌ভাইট্ করিয়া মাগুর মৎস্যের ঝোল খাওয়াইল। সেই হইতে লোভ লাগিয়া গেল। আজকাল প্রায়ই কিনিয়া খাইতেছি—ওঃ লাভলি!

কালী। তবু তো হেয়ার সাহেব গঙ্গার ইলিশ খাননি—খেলে দিনরাত গঙ্গার ধারেই বসে থাকতেন—আর উঠে আসতেন না।

(হেয়ার হা হা করে হেসে উঠলেন)

হেয়ার। তা যা বলিয়াছেন। বাংলা দেশকে এতদিন সাইকলজিক্যালি ভালো বাসিয়াছি—এবার মনে হইতেছে, ফিজিওলজিক্যালি-ও তাহার প্রেমে পড়িব।

দ্বারকা। (টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিলেন) এটা আবার কী? 'ম্যাড্‌রাস কুরিয়র' দেখছি।

রামমোহন। হাঁ—ওতে মাদ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রীর একটা লেখা বেরিয়েছে। আমার 'বেদান্ত ভাষ্য'কে তুলোধুনো করে দিয়েছে একেবারে। তাছাড়া ক্যালকাটা গেজেটে আমাকে যে প্রশংসা করেছিল তাও বরদাস্ত করতে পারেনি। প্রমাণ করে ছেড়েছে, আমি একটি মূর্তিমান নির্বোধ!

দ্বারকা। আপনি চুপ করে যাবেন নাকি?

রামমোহন। আমাকে তো জানোই। একটি সাক্ষাৎ লড়ায়ে মুর্গী। ঝগড়ার গন্ধ পেলে মন একেবারে উৎসাহে আকুল হয়ে ওঠে! শাস্ত্রীজী এখনো জানেন না—কোথায় খোঁচা দিচ্ছেন! এমন জবাব দেব যে দেব্‌তাটি একেবারে পাকাপাকি মৌন-অবলম্বন করবেন।

অন্নদা। আপনার ঐ তর্কের জন্যেই লোকে এমন করে চটে যায়।

কালী। সেদিন প্রকাণ্ড সভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে অমন করে জব্দ করলেন—ওদের

দলবল এখন আপনার নামে যা নয় তাই বলে বেড়াচ্ছে!

হেয়ার। ভেরি ব্যাড্!

রামমোহন। সব চাইতে আশ্চর্য কী, জানো হেয়ার? তর্ক হল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ন্যায়-শাস্ত্রের চরম উন্নতি বাঙালিরই হাতে। এই বাংলাই নৈয়ায়িক গৌতমের দেশ। অথচ আজ এমন অধোগতি হয়েছে যে বিচারে হেরে গেলে রাগে-হিংসেয় খুন করে বসতে চায়।

দ্বারকানাথ। অধঃপতনটা সব দিক থেকেই হয়েছে বলে ন্যায়-তর্কও জাত হারিয়েছে।

হেয়ার। ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া আমার অত্যন্ত বেদনা জাগে, রায় সাহেব! এত বড় দেশ—এত বড জাতি—আজ তারা কোথায় নামিয়া দাঁড়াইয়াছে!

রামমোহন। বিদেশী হয়েও আমাদের জন্যে তুমি যা করছ হেয়ার, তার ঋণ দেশ কখনো শুধতে পারবে না। তোমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি, আজ ব্রিটেন এত বড হয়েছে কী করে।

হেয়ার। (লজ্জিত) ছিঃ ছিঃ—এসব বলিয়া আমাকে লজ্জা দেওয়া কেন? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র—সামান্য একজন ঘড়ির ব্যবসাদার মাত্র।

অন্নদা। (সকৌতুকে) কিন্তু হেয়ারের ঘডির ব্যবসাদার এবার ফেল পড়বে। এ দেশের ছেলেদের লেখাপডা শেখাতে গিয়ে লালবাতি জ্বলবে ওর দোকানে।

দ্বারকা। (ম্যাড্রাস কুরিয়ারখানা পর্ডছিলেন, নামিয়ে রাখলেন) তাছাড়া হেয়ারের অবস্থাও দাঁডিয়েছে চমৎকার। না ঘরকা, না ঘাটকা! ওর স্বজাতিরা ওকে নেটিব্-ঘেঁষা নাস্তিক বলে উডিয়ে দেয়, আবার দেশী লোকের ঘরে উঠলে তারা কলসীর জল ফেলে!

হেয়ার। (হেসে উঠলেন) ভালোই তো, আমি মাঝখানে থাকিব। ইউরোপ আর ভারতের মাঝখানে সেতু রচনা করিব।

রামমোহন। বেরাদার, কথাটা ঠাট্টা করে বললে বটে, কিন্তু নিজেই জানো না আজ কত বড় একটা সত্য তুমি উচ্চারণ করলে। আমি তোমায় বলছি, দিন আসবে। কাল হোক, পরশু হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হোক। তোমার দেশ সেদিন তোমায় চিনবে কিনা জানি না, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ তোমার নামে মাথা নোয়াবে!

হেয়ার। (বিব্রত) ওসব এখন থাকুক। যে ব্যাপারের জন্য আমরা আসিয়াছি। বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জির চেষ্টায় কাজ হইয়াছে। কাল সুপ্রীম কোর্টের

চীফ্ জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ইস্টের সঙ্গে দেখা হইল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনিও খুবই আগ্রহী। শীঘ্রই শহরের সমস্ত বিশিষ্ট লোককে লইয়া তাঁহার গৃহে একটা মিটিঙের ব্যবস্থা করিতেছেন। তোমার সঙ্গে আলোচনা করিয়া খুব খুশি হইয়াছেন তাহাও বলিলেন।

দ্বারকা। মহারাজ কালীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত দেবের দলবল আবার বাগড়া না দেয়। ওঁরা তো সংস্কৃতওয়ালাদের চাঁই! ইংরেজি শিখলে নাকি জাত যাবে!

অন্নদা। রাধাকান্ত দেব কিন্তু একটু শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন মনে হয়। বিহারী চেবের বাড়িতে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে বিধ্বস্ত করবার পরে রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের খুব প্রশংসা করে বেড়াচ্ছেন।

কালী। ও মুখেই—কাজে বিরোধিতা তো সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা নয়—আসলে হয়তো সায়েবদের খুশি করতে চান।

দ্বারকা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা সবাই মত দিচ্ছেন শুনলাম। এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

অন্নদা। হবেন না? চাকরীর মায়া আছে তো!

রামমোহন। এটা অপবাদ হচ্ছে অন্নদা। আর সকলের সম্পর্কে যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় খাঁটি মানুষ। হোন রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁর চরিত্রে যেমন ফাঁক নেই, তেমনি বিদ্যাতেও নয়। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সঙ্গে আমার মত না মিলতে পারে, কিন্তু 'রাজাবলি'র মতো বইয়ের যিনি স্রষ্টা, তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

দ্বারকা। (মাথা নাড়লেন) ঠিক।

রামমোহন। বৈদ্যনাথবাবু কাজের মতো কাজ করেছেন একটা। হাওয়া যেন একটু অনুকূলে বইছে—আশা পাচ্ছি। ভালো কথা হেয়ার, তোমার কি এর মধ্যে অ্যাডাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হেয়ার। হাঁ, কাল আমার দোকানে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই শত মুখে তোমার প্রশংসা! অমন গোঁড়া পাদ্রী অ্যাডাম—তিনি যেভাবে তোমার প্রেজ্ করিলেন, আমার খুব আশ্চর্য লাগিল। হয়তো বা একদিন তোমার ডিসাইপল হইয়াই বসিবেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[একজন বেয়ারা প্রবেশ করল। সেলাম করে রামমোহনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, একখানা চিঠি দিলে, আবার সেলাম করে বিদায় নিলে।
খাম খুলে চিঠি পড়লেন রামমোহন। প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে তাঁর মুখ]

দ্বারকা। কার চিঠি দাদা ?

রামমোহন। নিমন্ত্রণপত্র। তোমরাও পাবে।

কালী। কি রকম ?

রামমোহন। বৈদ্যনাথবাবু লিখছেন। কাল বিকেলে ঈস্ট্ সাহেবের কুঠিতে একটা সভা বসছে। শহরের গণ্যমান্য সবাই আসছেন—এ দেশের ছেলেদের জন্যে ইংরেজি কলেজ করবার একটা প্ল্যান চক্-আউট করা হবে।

অন্নদা। খুব ভালো খবর।

রামমোহন। আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে দ্বারকা। কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছি আমি! দেশের বুক থেকে মোহের জাল কেটে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে কুসংস্কারের রাত্রি! পৃথিবীর দশ দিক থেকে আসছে জ্ঞানের আলোক-বন্যা। লোকাচারের নাগপাশ ছিঁড়ে জেগে উঠছে একটা সুস্থ সবল নতুন জাতি। এ বুঝি তারই সূচনা!

হেয়ার। হাঁ, ইহা তাহারি সূচনা। তুমি ঠিকই বলিয়াছ রায়!

(রাধাপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন)

রাধাপ্রসাদ। ভেতরে খাবার দেওয়া হয়েছে বাবা। আপনারা চলুন।

দ্বারকা। ডোবালে দেখছি! এই অসময়ে আবার খাওয়া ?

রাধা। বেশি কিছু নয় কাকা, সামান্য জলযোগ।

দ্বারকা। সামান্য তোমার বাবার পক্ষে, আমাদের পক্ষে প্রাণান্তকর।

(রাধাপ্রসাদ হেসে ফেললেন)

রামমোহন। ছাখো দ্বারকানাথ, তোমার ওসব জমিদারী বুলি ছাড়ো। যতই যা করো, বামুনের ছেলে তো বটে। অগস্ত্যের ট্র্যাডিশন ভুলে যাচ্ছ কেন ? খাওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তত চক্ষুলজ্জা করা উচিত নয় বেরাদার। চলো হেয়ার। ওঠো হে কালীনাথ, অন্নদা—

হেয়ার। হাঁ, হাঁ, হট্ মীল ডাকিতেছে, দেরী করিলেই ঠকিতে হইবে।

কালীনাথ। হেয়ারের জন্যে মাগুর মাছের ঝোল আছে তো রাধু ?

(সকলে হাসলেন)

রাধাপ্রসাদ। (হেসে) না।

হেয়ার। না থাকিলে অন্য কমপেন্‌সেশন্ আছে, সে আমি জানি। চলো, চলো—

রামমোহন। রাধাপ্রসাদ, ওঁদের নিয়ে যাও, আমি আসছি—

(সকলে রাধাপ্রসাদকে অনুসরণ করে চলে গেলেন। রামমোহন কিছু কাগজপত্র গোছানো শেষ করলেন, তারপর বেরোতে যাবেন, এমন সময় :

বছর ষোলো-সতেরোর নন্দকিশোর বসু এবং তাঁর বালিকা স্ত্রী প্রবেশ করলেন।)

নন্দকিশোরের স্ত্রী কাঁদছেন।
রামমোহন চমকে উঠলেন)

রামমোহন। খবর কি হে নন্দকিশোর ? এটি কে ?

নন্দকিশোর। (বিবর্ণ মুখে) আমার—আমার স্ত্রী।

রামমোহন। (মৃদু ভর্ৎসনাভরা গলায়) এরই মধ্যে বিয়ে করে বসেছ তা হলে ! আঃ —এই বাল্যবিবাহের পাপ দেশ থেকে কবে যে যাবে ! তা হয়েছে কী ? কাঁদছে কেন মেয়েটি ?

(মেয়েটি রামমোহনের পায়ের কাছে বসে পড়ল, কাঁদতে লাগল)

মেয়েটি। আমায় ওরা তাড়িয়ে দেবে বাবা। আমার মুখ দেখবে না !

রামমোহন। বটে—বটে। ব্যাপার কিহে নন্দকিশোর ? অনর্থক এই কচি মেয়েটার ওপর এরকম বীবত্ব কেন ?

নন্দকিশোর। (বার কয়েক খাবি খেলেন) আপনাকে বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু ভারী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে একটা।

মেয়েটি। (কেঁদে চলল) কিন্তু আমাব কী দোষ ? কী করেছি আমি ? কেন ওরা আমায় তাড়িয়ে দেবে ?

রামমোহন। (আশ্বাস দিয়ে) কেউ তোমায় তাড়াতে পারবে না মা—তোমাব কোনো ভয় নেই। নন্দ, লজ্জা করলে চলবে না। খুলে বলো সব।

নন্দকিশোর। কথাটা হল—ইয়ে—বাবা বেজায় চটে গেছেন। বিয়ের আগে ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে শেষে কালো—

রামমোহন। বুঝেছি, আব বলতে হবে না। ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু কে দায়ী এই ছলনার জন্যে ? এই মিথ্যে কাব সৃষ্টি ? নন্দকিশোর, নিজেদের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে আর একজনকে অপরাধী কোবো না।

নন্দকিশোর। (মাথা নিচু করে রইলেন) তবু কালো মেয়ে—

রামমোহন। কালো মেয়ে। (উত্তেজিত হয়ে উঠলেন) কালো মেয়ে বলেই তার দাম কানাকড়ি ! শোনো নন্দকিশোব। স্ত্রীর পরিচয় মাত্র একটা ফর্সা চামড়ায় নয়—সে পরিচয় জীবনের মধ্যে। আমার কথা শোনো— মাথায় করে নিয়ে যাও ওকে। হয়তো দেখবে এই স্ত্রীই এমন সন্তানের জননী হবে—যার মধ্য দিয়ে তোমারই নাম থাকবে উজ্জ্বল হয়ে।*

---

* রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। এই কালো মেয়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

মেয়েটি। বাবা !

রামমোহন। (মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, সস্নেহে) সব ঠিক হয়ে যাবে মা, ঘরে যাও। কিছু হলে আমি দেখব। যাও নন্দ, মা লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাও—

(মেয়েটি তার পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করল)

কল্যাণী হও মা, স্বামীর জীবনের জয়লক্ষ্মী হও। নিয়ে যাও নন্দ—

(নন্দ স্ত্রীকে নিয়ে বিদায় নিলেন। রামমোহন তাকিয়ে রইলেন)

কালো মেয়ে—তাই তার দাম নেই ! সমাজ ! আশ্চর্য !

(ভেতর থেকে হেয়ারের কণ্ঠ ভেসে এল)

হেয়ার। কই রায় মহাশয়, আমাদের খাওয়াইতে বসিয়া হোস্ট-এরই সাক্ষাৎ নাই !

রামমোহন। (হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলেন) হাঁ—হাঁ—আমি আসছি—

—দুই—

[সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড্ ঈস্টের কুঠি।

এই কুঠির একটি হলঘর। দুধারে সার-দেওয়া চেয়ার আর এই দুটি সারির পেছনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে মুখ করে একখানা বড় টেবিল ও উঁচু চেয়ার। দুধারের চেয়ারগুলিতে কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি আসীন। তাঁদের মধ্যে রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতিকে চিনতে পারা যাচ্ছে।

স্যার এডওয়ার্ড ও তাঁর পেছনে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে ঢুকলেন। সকলে দাঁড়ালেন। বৈদ্যনাথের হাতে কিছু কাগজপত্র।]

বৈদ্যনাথ। লেট মি ইনট্রোডিউস, লর্ডশিপ ! রাধাকান্ত দেব—

[তরুণ রাধাকান্তের সঙ্গে ঈস্ট্ করমর্দন করলেন]

মতিলাল শীল—

[কৃষ্ণবর্ণ, কুরূপ মতিলালের সঙ্গে করমর্দন]

তারাচাঁদ দত্ত—ভৈরবধর মল্লিক—জয়কৃষ্ণ সিংহ—মহারাজ কালীকৃষ্ণ, পণ্ডিত (হ্যাণ্ডশেকের পর নমস্কারও করলেন একটা) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—দ্বারকানাথ ঠাকুর—রামমোহন রায়—ডেভিড্ হেয়ার—

[করমর্দন শেষ করে ঈস্ট্ বড় চেয়ারখানায় আসন নিলেন। তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন]

ঈস্ট্। তাহা হইলে—উইথ ইওর পারমিশন—আমরা কার্য আরম্ভ করতে পারি ?

বৈদ্যনাথ। আরো দু-চারজন যদি আসেন—

রাধাকান্ত। মোটামুটি সবাই এসেছেন। আর অপেক্ষা করা যায় না। (নিজের সোনার ঘড়ি দেখলেন) চারটেও বেজে গেছে।

তারাচাঁদ। হাঁ, দেরি করে লাভ নেই। বলুন বৈদ্যনাথবাবু।

(বৈদ্যনাথ ঈস্টের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন)

বৈদ্যনাথ। আজকের এটা অবশ্য ফর্মাল মিটিং নয়। এখানে আমরা ঘরোয়া ভাবেই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব। নিজেদের ভেতরে একটা সেট্‌ল্ করে নিয়ে পরে আমরা কোম্পানিকে মুভ করতে পারি।

রামমোহন। বেশ, বলুন সেটা।

ঈস্ট্। (দাঁড়িয়ে উঠে) আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। এ দেশীয় বালকদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সকল দিকেই বাঞ্ছনীয়। দেশীয় লোকেরা এতদিন ওয়েস্টার্ন এডুকেশন-এ বাধা দিয়াছেন বলিয়াই এ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। রিসেণ্ট্‌লিংএ আপনারা অনেকেই উৎসাহিত হইয়াছেন বলিয়া আমি এই মিটিং কল করিতে সাহসী হইয়াছি। এ জন্যে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইব ঢাকা কালেক্টরীর ট্রেজারার বাবু বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে। তাঁহার চেষ্টাতেই এই আয়োজন।

বৈদ্যনাথ। আমি কিছুই করতে পারতাম না—যদি রামমোহন রায় আর হেয়ার সাহেব আমাকে সবরকমে উৎসাহ আর উপদেশ না দিতেন।

ঈস্ট্। হাঁ, রায়ের সঙ্গে **I had very long discussions. He is the brightest man in this country—I think !** (রাধাকান্ত, জয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। তারাচাঁদের ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল)

মৃত্যুঞ্জয়। তাতে আর সন্দেহ কি। ওঁর মতো বিচক্ষণ লোক এখন এ দেশে দুর্লভ।

তারাচাঁদ। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে—বিরক্তভাবে) রামমোহনের প্রশস্তি বন্ধ করে সভার কাজটা চালিয়ে গেলেই কি ভালো হয় না।

(ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। সব চাইতে বেশি অপ্রতিভ হলেন ঈস্ট্।)

ঈস্ট্। **Why—of course ! But every one must get**—(একটু চুপ করে) **Any way,** এখন কিভাবে আমরা **proceed** করিব ?

রাধাকান্ত। প্রথমে প্রতিষ্ঠানের একটা নাম—

বৈদ্যনাথ। **Provisionally** মহাবিদ্যালয় ঠিক করা হয়েছে।

ঈস্ট্। (হেসে) যাহাতে আপনারা **misunderstand** না করেন। **Western Education** মানেই যে **Christianity preach** করা নয়—সেটা আমরা **clear** রাখিতে চাই। আপনাদের মহাবিদ্যালয়ে ভারতীয়

শিক্ষাই দেওয়া হইবে।

রাধাকান্ত। (শুকনো গলায়) **Thank you!**

বৈদ্যনাথ। প্রথম হল **finance**-এর প্রশ্ন। কলেজ শুরু করতে যে টাকাটা গোড়াতেই দরকার হবে, তার কী ব্যবস্থা করা যাবে?

রামমোহন। কোম্পানির কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ যে টাকাটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সেটা কী হল?

ঈস্ট্‌। **You see Mr. Roy,** টাকাটা কিভাবে যে দেওয়া হইবে—the **process is not yet clearly defined. So it may take months, if not years!**

রামমোহন। তা হলে ও জন্যে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

বৈদ্যনাথ সেই জন্যেই আজ আরো বিশেষ করে সকলকে ডাকা। কার কাছে থেকে কী সাহায্য পাওয়া যাবে—

ভৈরবধর টাকার ব্যবস্থা আমরা করতে রাজী আছি—যদি তার সদ্ব্যয় হয়।

দ্বারকানাথ। আমাদেরই ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, টাকার অপব্যয় হবে কেন? তা ছাড়া চীপ জাস্টিস নিজেও তো রয়েছেন মাথার ওপর।

ভৈরব। চীপ জাস্টিস তো আর নিজে সব দেখবেন না। কারা কল-কাঠি নাড়বেন, সেটাও বোঝা দরকার। (বাঁকা চোখে তাকালেন)

রাধাকান্ত। থামুন মল্লিক মশাই। তা আপনি কি donation-এর কথা বলছেন বৈদ্যনাথবাবু?

ঈস্ট্‌। **Yes—yes donations.** (হাসলেন) **Generous donations from leading citizens like you!**

কালীকৃষ্ণ। একটা হিসেব করুন না তা হলে। কত লাগবে দেখি।

বৈদ্যনাথ। হিসেব আমি করেই রেখেছি রাজা বাহাদুর। (কাগজপত্র উল্টে) আপাতত—এই লাখখানেক টাকার মতো হলেই শুরু করে দেওয়া যাবে। তারপর চাপ দেওয়া যাবে কোম্পানিকে।

রামমোহন। সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কোম্পানির টাকা আদায় করা যাবেই।

রাধাকান্ত। (ঘড়ি দেখে—অধৈর্যভাবে) সময় নষ্ট করে কী হবে বৈদ্যনাথবাবু? কোম্পানির টাকা আদায়ের দায়িত্ব নেবার লোকের অভাব হবে না। (একবার তির্যক কটাক্ষে রামমোহনের দিকে তাকিয়ে নিলেন) নিন— চাঁদা ধরুন।

ঈস্ট্। চাঁদা ধরিবার কিছু নাই। এ তো আর জোর করিয়া লওয়া যাইবে না। যাঁহার যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেইভাবেই দিবেন। এবং যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক লইয়াই অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হইবে।

রাধাকান্ত। আমি দশ হাজার টাকা দেব।

ঈস্ট্। (হাসলেন) **Thank you very much.**

(বৈদ্যনাথ একটা কাগজে লিখে নিতে লাগলেন)

বৈদ্যনাথ। মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ?

কালীকৃষ্ণ। লিখুন দশ হাজার—

বৈদ্যনাথ। বাবু মতিলাল শীল ?

মতিলাল। পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ। বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ ?

জয়কৃষ্ণ। পাঁচ হাজার।

বৈদ্যনাথ। বাবু রামমোহন রায় ?

তারাচাঁদ। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন) আমি আপত্তি করছি। রামমোহন রায়ের কাছ থেকে কোনো চাঁদা নেওয়া চলতে পারে না।

দ্বারকানাথ। } তার অর্থ ?

হেয়ার। } **What do you mean ?**

[কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন উঠলেন ; একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছেন।]

কাশীনাথ। মাননীয় বিচারপতি বাহাদুর, অস্মদ্দিগের বক্তব্য এই যে পরম অধর্মাচারী ম্লেচ্ছ বাবু রামমোহন রায় এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হইলে সনাতনধর্মসেবী নৈষ্ঠিক আর্যসন্তানগণ ইহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইবেক।

ঈস্ট্। (হতবাক্) **Strange !**

হেয়ার। (চেঁচিয়ে উঠলেন) **Highly objectionable !**

দ্বারকা। (দাঁড়িয়ে উঠে) অত্যন্ত অন্যায় ! অত্যন্ত আপত্তিকর !

রামমোহন। আঃ—কী হচ্ছে হেয়ার। দ্বারকা স্থির হয়ে বোসো। ওঁরা কী বলছেন, বলতে দাও।

বৈদ্যনাথ। (হতভম্বের মতো) এক্ষেত্রে এ-রকম আপত্তির কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

মৃত্যুঞ্জয়। (মাথা নেড়ে) নিশ্চয় না ; তর্কপঞ্চানন মহাশয়, শাস্ত্র নিয়ে আমাদের

পুরনো তর্কের স্থান এটা নয়। বাবু রামমোহনের সঙ্গে আমারও প্রচুর মতভেদ আছে। কিন্তু এ তো শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে এসব অনাবশ্যক কথা তোলা কেন ?

কালীকৃষ্ণ। পুরনো তর্ক নয়। অনাবশ্যক কথাও নয় বিদ্যালঙ্কার মশাই। আপনি নিজেই জানেন, রামমোহন রায় এই দু বছর ধরে সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁর বেদান্ত, বেদান্তসার, উপনিষদের ব্যাখ্যা—হিন্দুর চরম অপমান। ব্যক্তিগত ভাবেও তিনি যা ইচ্ছে করেন, হিন্দুত্বের কোনো কিছুই মানেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যে আমাদের সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি ভ্রষ্টাচারী। তিনি যদি এই প্রতিষ্ঠানে থাকেন, তাহলে আমাদের সরে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই।

হেয়ার। **This is senseless Raja Sahib !**

রামমোহন। আঃ, থামো না হেয়ার ! ওঁরা তো অন্যায় কিছু বলছেন না। হিন্দুধর্ম বলতে ওঁরা যা বোঝেন, তা তো সত্যিই মানি না। তোমাকেও কোনো মিশনারী ধার্মিক বলে স্বীকার করবে না হেয়ার।

দ্বারকানাথ। তাই বলে—

মতিলাল। হাঁ, সেই জন্যেই উনি থাকলে আমাদের আপত্তি আছে।

ঈস্ট্। **I do not know what Rammohan's religion is !** কিন্তু আমি একজন **Christian—rather a very sincere Christian**—আমি যদি সাধ্যমতো আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে চাই, তবে আপনারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন না ?

তারাচাঁদ। না, না, কক্ষনো না।

ঈস্ট্। **Why ?**

রাধাকান্ত। আপনি টাকা দিলে আমরা আন্তরিক খুশিই হবো। কারণ, আপনি ক্রীশ্চান হলেও ধার্মিক। ধার্মিকের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নয়—বিরোধ নাস্তিকের সঙ্গে। আমরা মনে করি, রামমোহন রায় নাস্তিক।

কালীকৃষ্ণ। ঠিক কথা। এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ভৈরব। এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত।

কাশীনাথ। অস্মদ্দিগের আর্য-শাস্ত্রেরও এবম্ প্রকার নির্দেশ আছে।

দ্বারকানাথ। (উত্তেজিত) বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে আমরাও সবাই সরে দাঁড়াচ্ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে এমন সংকীর্ণতা সেখানে আমরাও কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

কাশীনাথ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

রামমোহন। (দাঁড়িয়ে উঠে) বোসো দ্বারকানাথ। হেয়ার থামো। এমন মারাত্মক ভুল কেন করছ ? কেন আমার জন্যে দেশের ক্ষতি করবে—কেন জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দেবে ? তা হতে পারে না। আমার অর্গানাইজিং কমিটিতে থাকাটাই কি বড় কথা হল ? কী আমি ? কতটুকু আমার সামর্থ্য ? আমি সরে গেলে যদি সবাই দ্বিধাহীন হয়ে শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী আছে ? সেই আনন্দের অংশ নিয়েই এ সভা থেকে আমি বিদায় নিলাম (ঈস্ট্‌কে) **Sir, if you kindly permit me to leave—**

(ঈস্ট্‌ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন, রামমোহন বেরিয়ে গেলেন।)

মৃত্যুঞ্জয়। ছিঃ ছিঃ—ভারী অন্যায় হল, ভারী বিশ্রী হল !

ঈস্ট্‌। (আত্মগত ভাবে) **A man, but what a man !**

—তিন—

[আরো কয়েক বছর পরের কথা।

রামমোহনের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির একটি কক্ষ। ঘরখানি ইওরোপীয় রুচি অনুসারে প্রায় আধুনিক ভাবে সাজানো। বৃদ্ধা তারিণী মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসনে বসে মালা জপ করছেন। মধ্যবয়সী উমা একটু দূরে মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন।]

উমা। আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি মা, একটু জলটল কিছু মুখে দিন এবার।

তারিণী। কেন মিথ্যে অনুরোধ করছ মেজো বৌ ! বলেছি তো, আমি কিছু খাব না।

উমা। আজ বারো বছর পরে ছেলের বাড়িতে আপনি পা দিলেন। এত দিনেও কি আপনার রাগ পড়েনি মা ? আজো কি আপনি ক্ষমা করতে পারেননি ?

তারিণী। ক্ষমা ! জেনে শুনেও কেন একথা জিজ্ঞেস করছ বউমা ! ক্ষমা করবার আমি কে ! সে তো আমার কাছে কোনো অপরাধ করেনি। তার অপরাধ ধর্মের কাছে। ধর্ম যদি তাকে ক্ষমা না করে—আমি কী করে করব ?

উমা। (কাতর কণ্ঠে) আপনার কি পাষাণের প্রাণ মা ? নিজের সন্তান—

তারিণী। শুধু সন্তান নয় মেজ বৌ। আর সকলকে নারায়ণ টেনে নিয়েছেন, শিব-

রাত্রির সলতে বলতে ওই একা ! তুমিও তো মা ! বোঝো না, সন্তানের জন্যে মায়ের বুক কেমন করে ? কেমন করে ভুলব—দশ মাস ওকে আমি পেটে ধরেছি—কেমন করে ভুলব বৌমা ও আমার কত দুঃখের ধন ?

উমা। তবু কেন এমন করে কঠোর হচ্ছেন মা ? আপনি তো জানেন না, আপনার আশীর্বাদের উনি কত বড় কাঙাল ? আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম না করে উনি কোনোদিন জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না !

তারিণী। জানি—সব জানি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। সমাজ, ধর্ম, সংসারের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছে। সে যেই হোক, কেমন করে তাকে স্বীকার করব ? সন্তানের চেয়ে ধর্ম বড়, তারও চেয়ে বড় আমার স্বামীর আদেশ।

উমা। মা !

তারিণী। না, দোষ ওরও নয়। এ হতই—কেউ আটকাতে পারত না। বাবার অভিশাপ ! বাবার অভিশাপ তো মিথ্যে হতে পারে না।

উমা। (সবিস্ময়ে) কিসের অভিশাপ মা ?

তারিণী। ওর দু'বছর বয়সের সময় ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। একদিন দেখি—দরদালানে বাবা পূজো করছেন আর মোহন তাঁর পাশে বসে পূজোর বেলপাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। যেমন ভয় হল, তেমনি রাগ হল ! এ কি অনাচার ! অসাবধান বলে বাবাকে যা নয় তাই গালাগালি করলাম। আগুনের মতো মানুষ আমার বাবা—সইতে পারলেন না। অভিশাপ দিয়ে বললেন, যে সন্তানের জন্যে মেয়ে হয়ে আমি তাঁকে অপমান করেছি—সে সন্তান বড় হয়ে ম্লেচ্ছ হবে !

(উমা বিহ্বল হয়ে রইলেন)

জানতাম—আমি জানতাম ! বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য—তাঁর কথা মিথ্যে হবে না ! না, ওর দোষ নয়। এ আমারই পাপ—আমারই অপরাধ ! বড় হয়ে যেদিন মোহন এ অভিশাপের কথা ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—সেদিন—সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম ! বুঝেছিলাম পিতৃশাপ ফলতে শুরু করেছে। আমার শাস্তি আমি পাচ্ছি—মোহন শুধু নিমিত্ত মাত্র !

(নেপথ্যে রামমোহন—উমা উমা। রামমোহন প্রবেশ করলেন। উমা ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ালেন)

উমা। এখুনি এলেন ?

রাম। এ কী ! মা ! মা !

(ছুটে প্রণাম করতে গেলেন। তারিণী পা সরিয়ে নিলেন)

তারিণী। থাক বাবা। তোমার ও কাপড়ে আমায় ছুঁয়ো না !

(রামমোহন স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ)

রামমোহন। বুঝেছি। আমার প্রণাম তুমি নেবে না।

(তারিণী কোনো জবাব দিলেন না)

না নিলে, কিন্তু আমার মনের প্রণাম তো তুমি ঠেকাতে পারবে না ! আজ বারো বছর তোমায় দেখিনি। এর মধ্যে কত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি ! মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। তোমায় যে চিনতেই পারা যায় না !

তারিণী। বয়স বাড়লেই লোকে বুড়ো হয় বাবা—চুলও পাকে। তুমিও অনেক বদলে গেছ। শুনেছি দেশজোড়া নাম হয়েছে তোমার। মিত্র যত বেড়েছে—শত্রু বেড়েছে তার হাজারগুণ।

রামমোহন। সত্যের জন্যে যে দাঁড়ায়—শত্রু তার বেশিই থাকে মা।

তারিণী। সত্য। তোমার কাছে যা সত্য—অন্যের কাছে তা সর্বনাশ। আমিও তাদেরই দলে। তুমি তো জানো মোহন, আমিও তোমার শত্রু। জগমোহনের বড় ছেলে গোবিন্দকে দিয়ে তাই তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলাম—সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম—

রামমোহন। কিন্তু কোনো দরকার ছিল না মা। তুমি আদেশ করলে ও আমি এমনিই গোবিন্দকে ধরে দিতাম। আর যে সম্পত্তি তোমরা আমায় দিতে চাওনি—আমি তো তা দাবীও করিনি। তার প্রায় সবই আমি গুরুদাসকে দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের শক্তি আছে—সামান্য শিক্ষাও আছে—নিজের জীবিকা উপার্জন করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ও সব কথা থাক না। (মৃদু হাসলেন) কিন্তু আমি জানি—বাইরে তুমি আমার যত শত্রুতার ভানই করো—মনে মনে রোজই আমায় আশীর্বাদ করে চলেছ।

তারিণী। না। মনে মনেও তোমায় আমি আশীর্বাদ করিনি মোহন ! প্রতি মুহূর্তে অভিশাপ দিয়েছি—সর্বনাশ কামনা করেছি !

রামমোহন। মায়ের অভিশাপ সন্তানকে লাগে না মা। আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়।

তারিণী। জানি না। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কাছে কেন এসেছি —সে কথা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না !

রামমোহন। আমাকে দেখতে এসেছ—এর আর কী জিজ্ঞাসা করব মা ?

তারিণী। না—নিঃস্বার্থ ভাবে দেখতে আসিনি। সে প্রাণের টান তোমার ওপর আমার থাকতে নেই। আজ তোমার কাছে আমি ভিক্ষের জন্যে হাত পেতেছি বাবা !

রামমোহন। ভিক্ষে ! সে কি মা ?

তারিণী। হাঁ—কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছি।

রামমোহন। সাহায্য ! আমার কাছে সাহায্য চাও তুমি ? হুকুম করো মা ! কত টাকা তোমার চাই ? পাঁচ হাজার ? দশ হাজার ? আরো বেশি ?

তারিণী। তোমার ওপর হুকুম করার জোর আমি রাখিনি বাবা। সে দাবি নয়। শুধু বড়লোকের কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। বেশি নয়—মাত্র পাঁচ শো টাকা !

রামমোহন। মাত্র পাঁচ শো টাকা !

তারিণী। হাঁ বাবা। সম্পত্তির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। সব ডুবে গেছে বললেই হয়। রাজরাজেশ্বরের নিত্য সেবা পর্যন্ত হচ্ছে না ! সেই সেবার জন্যেই—

রামমোহন। মা।

তারিণী। হাঁ বাবা। রাজরাজেশ্বর রাধারাণীর সেবার জন্যেই এ টাকা চাইতে এসেছি তোমার কাছে।

রামমোহন। (একটু চুপ করে থেকে) তোমায় আমি দশ হাজার টাকা এই মুহূর্তেই দিচ্ছি মা। কিন্তু পাথরের বিগ্রহ পূজোর জন্য নয় ! এই টাকা নিয়ে গিয়ে তুমি দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাও—সেই হবে দেবতার সব চেয়ে বড় পূজো !

(তারিণী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন)

তারিণী। (শান্তকণ্ঠে) এ কথাই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম বাবা। কিন্তু তোমার দরিদ্র-নারায়ণকে আমি দেবতা বলে মানতে পারব না—তোমার টাকাও আমি নিতে পারব না !

(উঠে দাঁড়ালেন)

উমা। মা !

তারিণী। আমি যাচ্ছি মেজ বৌ ! মোহন, তোমায় আজ আমি অভিশাপ দেব না —আশীর্বাদও করব না। শুধু বলে যাই—যে সত্যের ওপর ভর দিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ, তা থেকে তোমার পা যেন কখনো না টলে !

উমা। মা—মা—

(তারিণী বেরিয়ে গেলেন)

ওগো—মা যে রাগ করে চলে গেলেন ! মাকে ফেরাও !

রামমোহন। মা ফিরবেন না।

উমা। উনি যে জল-গণ্ডূষও মুখে দিলেন না।

রামমোহন। দেবেন না।

উমা। (উঁকি দিয়ে) ওই যে—ওই যাচ্ছেন ! রোদের মধ্যে বুড়ো মানুষ রাস্তায় নেমে গেলেন ! বড্ড কষ্ট হবে যে ! (মিনতি করে) ওগো, তুমি যাও— তোমার গাড়ি করে যেখানে যেতে চাইছেন—পৌছে দাও।

রামমোহন। আমার গাড়িতে উনি চড়বেন না উমা। পথের মধ্যে মরে গেলেও না। আমার মাকে তুমি চেনো না—আমি চিনি।

(উমা নীরব হয়ে রইলেন। রামমোহন দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। স্তব্ধতা। তারপর :)

উমা। আশ্চর্য তোমাদের জেদ ! যেমন মা, তেমনি ছেলে !

রামমোহন। ঠিক বলেছ উমা। অমন মা বলেই জীবনে এমন করে দাঁড়াবার জোর আমি পেয়েছি।

(আবার স্তব্ধতা)

উমা। (কিছুক্ষণ পরে) খাবে না ?

রামমোহন। (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) না—এখন নয়।

উমা। বুঝেছি। মা না খেয়ে এই ভরা দুপুরে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। তাই তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

রামমোহন। একবেলা না খেয়ে কী প্রায়শ্চিত্ত করব ? দেশের খবর আমি সব জানি। বিষয়-সম্পত্তির যে অবস্থা—হয়তো এমন অনেকদিনই মাকে না খেয়ে থাকতে হয় ! আজ সেজন্যে মিথ্যে সেন্টিমেণ্ট দেখিয়ে লাভ নেই। আমার কাজ আছে। এক্ষুণি 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'র জন্যে আমায় লিখতে বসতে হবে।

উমা। উঃ—ওই তোমার এক কথা। দিনরাত খালি কাজ আর কাজ— লেখা আর লেখা !

রামমোহন। হাঁ—কাজ ! অফুরন্ত—অজস্র কাজ ! দিনরাত কেন চুরাশি ঘণ্টা হয় না, কেন জীবনটাকে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না হাজার বছর ? (পায়চারি করতে করতে) জানো উমা—আমার মরতে ইচ্ছে করে না। কাজের কি শেষ আছে ? যেদিকে তাকাই সেইদিকেই অন্ধকার ! চারদিক থেকে শাস্ত্র-বিচারের নামে আসছে কুৎসা—বইয়ের পর বই লিখে তার জবাব দিতে হচ্ছে। ক্রীশ্চানদের সমালোচনা করেছি বলে তারা চটে

লাল হয়েছে; কয়েকটা কড়া উত্তর দিয়ে পাদ্রী সাহেবদের মুখ বন্ধ করতে হচ্ছে। ওদিকে অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের দায়িত্ব! খবরের কাগজের ওপর সরকারী আইনের দাপট—সেটা বন্ধ করতে হলে লড়াই করতে হবে সরকারের সঙ্গে। ভূমি-স্বত্ব আইনের সংস্কার চাই—জুরীর বিচার চাই—রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থা সভায় দেশীয় প্রজার প্রতিনিধি চাই—নারীর আইনগত মর্যাদা চাই—উমা—উমা! প্রাচীরের পর প্রাচীর ভাঙতে হবে—দশদিক থেকে আলো আনতে হবে—আনতে হবে মুক্তি। উমা, আমি বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই—হাজার বছর, দশ হাজার বছর—

[নেপথ্যে চিৎকার :

বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—]

কে? কে?

[একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রামমোহনের পায়ে আছড়ে পড়ল]

কে তুমি মা? কী হয়েছে?

মেয়েটি। ওরা আমায় মেরে ফেলবে—আমায় পুড়িবে মারবে—বাঁচাও আমায়—

রামমোহন। কোনো ভয় নেই—এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু কে পুড়িয়ে মারবে? কারা তারা?

মেয়েটি। ওই যে—নিমতলার শ্মশান থেকে আমার পিছে পিছে ছুটে আসছে। না—না—মরতে চাই না আমি, আমি সতী হতে চাই না—পুড়ে মরতে পারব না আমি!

উমা। (সভয়ে) সতী! পালিয়ে এসেছে!

রামমোহন। হাঁ—সতী! উমা—এর নাম ধর্ম—এই হত্যার নাম সমাজ! এর পরিণাম স্বর্গ!

মেয়েটি। আমায় বাঁচাও বাবা—

রামমোহন। বাঁচাব বইকি মা! আমার আশ্রয়ে যখন এসেছ তখন কেউ আর তোমায় ছুঁতে পারবে না। উমা, ওকে নিয়ে যাও—দোতলার কোণের ঘরটায় রেখে দাও। আর আমি এখুনি বেরুচ্ছি একবার—

উমা। সে কি! এমন অসময়ে কোথায় যাবে? বিশ্রাম করলে না, খেলে না—

রামমোহন। সময় নেই—সময় নেই উমা! জীবনে একটা মুহূর্ত নষ্ট করলে চলবে না। বৌঠানের চিতার কাছে দাঁড়িয়ে একদিন যে শপথ নিয়েছিলাম, প্রায় ভুলতে বসেছিলাম তার কথা। আজ বুঝেছি—একটি মুহূর্ত বিলম্বের অর্থ একটি করে নারী-হত্যা! আমি এখনি যাব দ্বারকানাথের কাছে—

সেখান থেকে রাজা মথুরানাথ মল্লিকের বাড়ি, তারপরে যেতে হবে রাজনারায়ণ সেনের ওখানেও। সব কাজ ফেলে আগে সতীদাহ আমায় বন্ধ করতে হবে—বন্ধ করতেই হবে—

—চার—

[রাধাকান্ত দেবের বৈঠকখানা। ১৮২৮ সাল।

প্রকাণ্ড হলঘরে ঢালাও ফরাস। ঝাড়, দেওয়ালগিরি। বিস্তৃত বহুমূল্য ফ্রেমে বিলিতী ছবি। ফরাসের ওপর একটি পরিপুষ্ট তাকিয়ায় বুক পেতে রাধাকান্ত দেব একখানা বই পড়ছেন। মুখে আলবোলার সুদীর্ঘ নল। পড়তে পড়তে ভ্রূকুটি করলেন রাধাকান্ত। মুখ থেকে নল নামালেন, একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে দাগাতে লাগলেন বইয়ের পাতায়।

তারিণীচরণ মিত্র ঢুকলেন। পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন রাধাকান্ত।]

রাধাকান্ত। এসো তারিণীদা—বোসো।

(তারিণীচরণ বসলেন)

তারিণী। কী পড়ছিলে ওটা?

রাধাকান্ত। (সোজা হয়ে উঠে বসলেন—মৃদু হেসে এগিয়ে দিলেন বইটা) দেখো।

তারিণী। (বইটা তুলে নিয়ে) ও! 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব!' এ তো পুরনো বই!

রাধাকান্ত। বই পুরনো হলেও যুক্তিগুলো এখনো সমান ধারালো। তা ছাড়া আশ্চর্য আন্তরিকতা লোকটার। শুধু তর্কের জন্যে তর্ক তোলেনি রামমোহন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। বুদ্ধির সঙ্গে ইমোশনের চমৎকার যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

তারিণী। কিন্তু হৃদয় নিয়ে কারবার করা তো ধর্মের কাজ নয়। কঠিন তার নীতি, অলঙ্ঘ্য তার শাসন।

রাধাকান্ত। বিপদ তো সেইখানেই। কি জানো তারিণীদা, মাঝে মাঝে বড় ভয় করে আমার। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে—হয়তো হৃদয়ের দাবি ধর্মকে একদিন পেছনে ফেলেই এগিয়ে যাবে। রামমোহনের মতো এমন সর্বনাশা প্রতিভা আরো গোটাকতক জন্মালে কী যে হবে কল্পনাও করা যায় না। একা রামমোহনের তোড়েই আমরা হিমসিম খাচ্ছি—এর পরে বান ডাকলে তাকে রোধ করবে কে? শোনো না একবার (পড়তে লাগলেন) "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর

গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীত-কালে কি বর্ষাতে স্থানমার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে ; এবং সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।…ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশ ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী দেবর প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন ; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে—"

তারিণী। (বাধা দিলেন) থাক—থাক। এসব কথা শুধু ইংরিজী শেখার ফল। এদেশের মেয়েরা চিরদিন স্বামী-সংসারের সেবা করেই সুখী হয়েছে—নিজেদের তারা বড় করে দেখেনি। ম্লেচ্ছের চোখ দিয়ে দেখলে আদর্শের অমনি একটা অপব্যাখ্যাই হয় বটে !

রাধাকান্ত। কিন্তু চিরন্তন আদর্শ আর জীবনের মধ্যে কোথায় যেন বিরোধ ঘনিয়ে আসছে তারিণীদা ! দেখা দিচ্ছে ঝড়ের সংকেত। রামমোহন হয়তো তারই অগ্রদূত !

(তারাচাঁদ দত্ত, মতিলাল শীল এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন)

আসুন আসুন দত্ত মশাই, এসো মতিলাল। আরে—আবার দুর্ধর্ষ সম্পাদক ভবানীচরণ বাঁড়ুয্যেকেও দেখছি যে ! বসুন, বসুন সব—

(সকলে বসলেন)

ব্যাপার কী ? একেবারে সদলবলে ?

তারাচাঁদ। এখনো চুপ করে বসে আছো রাধাকান্ত ? একটা উপায় করো ! সব যে যায় !

রাধাকান্ত। এত উত্তেজনা কেন দত্ত মশাই ? কী যায় ?

তারাচাঁদ। ধর্ম।

রাধাকান্ত। রাতারাতি ধর্ম যাবে কোথায় ? (হাসলেন) যেতে দিচ্ছেই বা কে ? কিন্তু হল কী ?

মতিলাল। নতুন করে আর কী হবে ? ওদিকে রামমোহন যে সতীদাহ বন্ধ করবার জন্যে তোড়জোড় করছে !

রাধাকান্ত। তোড়জোড় শুধু বলছ কেন ? বন্ধ করে ফেলেছে ধরে নিতে পারো। এই তো ওর 'প্রবর্তক-নিবর্তক' পড়ছিলাম নতুন করে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে যুক্তিগুলো যা দিয়েছে প্রায় অকাট্য।

ভবানীচরণ। (উত্তেজিতভাবে) যুক্তি দেওয়াটা শক্ত নয় রাধাকান্তবাবু। ন্যায়ে

ফাঁকির অভাব নেই। শাস্ত্রকে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা যে কেউ করতে পারে। চার্বাকও এক সময়ে সব নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কণাদের দর্শনও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাতে মিথ্যে হয়ে যায়নি। তাই প্রতিজ্ঞা নিয়ে 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় কলম ধরেছি আমি। দেখা যাক, সনাতন ধর্মের জয় হয়, না সতীদাহ বিরোধ আইন পাস হয়ে যায়!

রাধাকান্ত। রামমোহনের কলমও কম জোরালো নয়। আমার সন্দেহ হয়, ওতেই হয়তো অর্ধেক বাজী জিতে নেবে।

ভবানীচরণ। রামমোহনের লেখা! ও আবার গদ্য নাকি! দশ বছর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাকরেদি করলে তবে যদি লিখতে শেখে।

রাধাকান্ত। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। একটা নিখুঁত পণ্ডিতী গদ্য, আর একটা প্রাণের ভাষা। মুশকিলটা কোথায় জানো ভবানীচরণ? পণ্ডিতী লেখা পড়ে লোকে হাততালি দেয়, কিন্তু প্রাণের ডাক শুনলে তখনি সাড়া দিয়ে ওঠে।

মতিলাল। (অধৈর্যভাবে) গদ্যতত্ত্ব এখন থাকুক। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে কাজে না নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারিণী। আরে, শর্ষের মধ্যেই যে ভূতে বাসা করেছে। লড়াইটা যে এখন ঘরের মধ্যেই এসে পৌঁছেছে। এই তো আমাদের তারাচাঁদ দত্ত মশাই—ম্লেচ্ছ রামমোহনকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করেন—আবার ওঁরই ছেলে হরিহর দিনরাত গিয়ে রামমোহনের ব্রহ্মসভায় বসে আছে।

তারাচাঁদ। (ক্রুদ্ধ হয়ে) হতভাগা—নচ্ছার! ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব আমি—বাড়ি থেকে বের করে দেব। চাবকে তুলে দেব পিঠের চামড়া।

ভবানীচরণ। কাগজে আমরা লিখছি, আরো লিখব।

রাধাকান্ত। কাগজের লড়াইতে যে ঠিক পেরে ওঠা যাবে না, সে তো বারে বারেই প্রমাণ হয়ে গেছে! বড় বড় দিক্‌পাল পণ্ডিত থেকে ফ্রেণ্ড্‌ অব ইণ্ডিয়ার অমন দুঁদে মার্শম্যান-টাইটলার সাহেব সব একেবারে ঠাণ্ডা। আর মুখও তেমনি। প্রকাশ্য বিচারসভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কী অবস্থা করে ছাড়ল, দেখলেন তো? যাই বলুন—লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত।

তারিণী। ওই পাণ্ডিত্যই কাল হয়েছে দেখছি।

রাধাকান্ত। তা যা বলেছ তারিণীদা। লড়াইটা একেবারে 'আন্‌ইকুয়্যাল ম্যাচ্‌'। ও যদি জ্ঞানে সমুদ্র হয়, আমরা প্রায় খানা-ডোবার সামিল। পৃথিবীতে এমন কোন শাস্ত্র নেই, যা ওর পড়া নয়। ভাষাই তো শিখেছে কমসে

কম সাত আটটা।

মতিলাল। আপনি যদি এভাবে রামমোহনকে সমর্থন করেন, তা হলে আমরা জোর পাই কোত্থেকে বলুন তো ?

রাধাকান্ত। ভুল বুঝছ কেন—সমর্থন আমি করছি না। যুদ্ধ করতে গেলে শত্রুর শক্তির পরিমাণটা জেনে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কর্মশক্তিও দেখো একবার। কী করল, কী না করল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, **Western Education**—কী নয় ? আত্মীয় সভা করল, অ্যাডামের সঙ্গে ইউনিট্যারিয়ান কমিটি করে গোঁড়া ক্রীশ্চানদের সঙ্গে লড়াই চালালো। তারপরে আবার এই ব্রহ্মসভার পত্তন। দিনের পর দিন শক্তি বাড়ছে লোকটার—ওদিকে আবার সতীদাহ নিয়ে খোদ বেণ্টিঙ্ককে গিয়ে পাকড়েছে।

ভবানী। বেণ্টিঙ্ক সম্বন্ধে যা শুনেছি সে কিন্তু সুবিধের নয়। ভারতবর্ষের সংস্কার করবার নাকি মতলব আছে তলে তলে।

তারাচাঁদ। (মুখভঙ্গি করে) মার চেয়ে মাসীর দরদ ! আমাদের ধর্ম নিয়ে আমরা আছি—তোমাদের নাক গলানো কেন বাপু। লাট আছো, লাট হয়েই থাকো। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সাজতে যাও কেন ?

মতিলাল। কিন্তু রামমোহন আবার ওই বেণ্টিঙ্ককে দিয়ে সতী বিলটা পাস করিয়ে না নেয়।

রাধাকান্ত। অসম্ভব নয়। আমার সেইরকম সন্দেহই হচ্ছে।

ভবানী। কিছুতেই নয়। একেবারে তোলপাড় করে ফেলব চারদিক।

তারাচাঁদ। শুধু লিখে না হয়, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে ! ব্রহ্ম সমাজ ! ওই সমাজই হয়েছে বিষের জড়। 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র উপাসনা হচ্ছে ওখানে বসে। আবার মুখে বলে, 'আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়—এখানে সকলের ঠাঁই আছে।' বুলি শুনলে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে যায়। শোনো রাধাকান্ত, ওসব লেখালেখির কাজ নয়। মূর্খের জন্যে লাঠ্যৌষধিই প্রশস্ত।

(জয়কৃষ্ণ সিংহ ঢুকলেন)

রাধাকান্ত। এই যে—মেঘ না চাইতেই জল ! জয়কৃষ্ণ সিংহ এসে পড়েছেন।

মতিলাল। ওঁর তো আবার ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়ে চোখ বুজে বসা অভ্যেস আছে। কী মশাই, পরম ব্রহ্মের সন্ধানে কতদূর এগোলেন ?

জয়কৃষ্ণ। (বসতে বসতে) পরম ব্রহ্ম—হাঃ হাঃ হাঃ। (অট্টহাসি করলেন) যা বলেছেন ! বড় ভালো লাগে ওদের ভড়ং ! সেই রাম বিদ্যেবাগীশটা

আছে না? সে হল আচার্য—ব্যাখ্যা করে। বাওজী বলে খোট্টাটা পড়ে উপনিষদ। একটা মুসলমানকেও জুটিয়েছে—তার কাজ হল পাখোয়াজ বাজানো। বিষ্টু চক্কোত্তি চোখ বুজে রামমোহনের বেহ্মসঙ্গীত গায়।

রাধাকান্ত। খুব জমেছে তা হলে?

জয়কৃষ্ণ। সে আর বলতে! রগড় কত! তারাচাঁদ চক্কোত্তি, চন্দ্রশেখর দেব, দ্বারকা ঠাকুর, কালী মুন্সী, ভৈরব দত্ত, মথুর মল্লিক—নিরাকারের প্রেমে কেঁদে একেবারে গড়াগড়ি। ওদিকে গান হচ্ছে: 'নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন—' এদিকে সমানে মদ্যপান আর গো-মাংস ভক্ষণ চলছে।

মতিলাল।
তারিণীচরণ। } ছিঃ—ছিঃ

তারাচাঁদ। উঃ—কী পাষণ্ড! এখুনি ওদের নিপাত করা কর্তব্য। ধর্ম কি রসাতলে গেছে? কল্কি-অবতার কি এখনো ঘুমিয়ে?

রাধাকান্ত। (অস্বস্তিভরে) দেখুন জয়কৃষ্ণবাবু, ব্রহ্মসভার নিন্দে আমরা অন্যভাবে যা খুশি করতে পারি। কিন্তু বেশি নিচে গেলে নিজেদেরই কি ছোট করা হয় না?

জয়কৃষ্ণ। (বিস্মিত) অর্থাৎ?

রাধাকান্ত। গো-মাংস ভক্ষণের কথাটা সর্বৈব মিথ্যে এ আমরা সবাই জানি। আর ব্রহ্মসভায় মদ্যপান চলে—একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

তারিণী। তাহলে তুমি বলতে চাও রামমোহন মদ খান না?

রাধাকান্ত। তা বলব কেন? মদ খাওয়ার উপকারিতা তিনি নিজেই তো প্রচার করেছেন তাঁর 'কায়স্থের সঙ্গে বিচারে'। ওটা তাঁর মতে স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকেরই যে ও কাজটা প্রচুর পরিমাণেই চলে, তাও কি অস্বীকার করা যায়? ব্রহ্মসভার সঙ্গে আমাদের মত মেলে না তা ঠিক। কিন্তু ওখানে গো-মাংস আর মদের আড্ডা বসেছে—এসব মিথ্যে নোংরামির ঢাক পিটিয়ে লাভ কী?

ভবানী। আপনার একটা অন্যায় পক্ষপাত আছে ওদের ওপর।

রাধাকান্ত। পক্ষপাতের কথা হচ্ছে না ভবানীচরণ। শত্রু যেই হোক, তাকে কাপুরুষের মতো মিথ্যে অপবাদ দেওয়া আমি সমর্থন করি না।

(চাকর করসীর তামাক বদলে দিয়ে গেল। নলটা মুখে তুলে নিয়ে খানিক ধোঁয়া ছাড়লেন রাধাকান্ত।)

রামমোহন হিন্দুধর্মের বিপক্ষে যাচ্ছেন। দাঁড়াতেই হবে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। বীরের মতোই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

মতিলাল। বীর!

তারাচাঁদ। (মুখভঙ্গি করলেন) ওই বীরদের জন্যে একটিমাত্র ব্যবস্থাই আছে। সে হল লাঠ্যোষধি!

জয়কৃষ্ণ। (ক্রুদ্ধ) ভাব দেখে সন্দেহ হচ্ছে কোন্‌দিন রাধাকান্ত দেব গিয়ে ব্রহ্ম-সভার খাতায় নাম লেখাবেন।

রাধাকান্ত। (উত্তেজিত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। নামালেন ফরসীর নল) ব্রহ্ম-সভায় নাম লেখাবার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন সিঙ্গি মশাই, আজ সারা দেশে অমন তেজী, অমন স্বাধীন মানুষ আর দুটি নেই?

জয়কৃষ্ণ। (ব্যঙ্গভরে) তা বটে!

রাধাকান্ত। (আরও উত্তেজিত) ঠাট্টার কথা নয়। নেপল্‌সের স্বাধীনতা-লড়াইয়ের যখন গলা টিপে ধরল অষ্ট্রিয়ার সৈন্য, তখন সিল্‌ক বাকিংহামকে একমাত্র তিনিই লিখতে পেরেছিলেন: **"Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful।"** দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলো যেদিন স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল—সেদিন ভারতবর্ষে এই একটি মানুষই প্রীতিভোজ ডেকে সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এ দেশে ফরাসী বিপ্লবকে তিনি সব চেয়ে অভ্যর্থনা করেছেন।

তারিণী। (বিব্রত) সে সব তো আমরা জানিই রাধাকান্ত!

রাধাকান্ত। না, সবটা জানি না। এই তো সম্পাদক ভবানীচরণ রয়েছেন। উনি জার্নালিস্ট্‌—কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে 'মিরাৎ উল্‌ আখবার' রামমোহনই বন্ধ করে দিয়েছেন—আর কারো তো সে সাহস হয়নি!

ভবানী। কিন্তু—

রাধাকান্ত। কিন্তু নেই ভবানীচরণ! আজ আমরা পোলিটিক্‌সের বুলি শিখছি, কিন্তু সে চেতনা এনে দিয়েছে কে? আমরা জমিদার—প্রজার রক্ত শুষে খাই—কিন্তু প্রজার উন্নতির জন্যে আন্দোলন তো তিনি একাই করেছেন। হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার তুলে ধরেছেন তিনিই। গরীবের পক্ষ থেকে অত্যাচারী বড়লোককে শাস্তি দেবার কথা তাঁরই। সিঙ্গি মশাই, তাঁর ধর্মমতের বিরোধিতা যা খুশি আমরা করতে পারি। কিন্তু একদিন

যখন ইতিহাস লেখা হবে—তখন সে ইতিহাসে হয়তো আমরা ঠাঁই পাব না। আর রামমোহন সম্বন্ধে হয়তো সেদিন ভারতবর্ষ জানবে : "He is the maker of new India !"

(উত্তেজনায় রাধাকান্ত কাঁপতে লাগলেন। সমস্ত ঘর স্তব্ধ হয়ে রইল)

তারিণী। (কিছুক্ষণ পরে) রাধাকান্ত—কী হচ্ছে এ সব ?

রাধাকান্ত (নিজেকে সামলে নিয়ে) ভয় নেই তারিণীদা—নিশ্চিন্ত থাকুন। (হাসলেন) ব্যক্তি রামমোহনকে আমরা যত শ্রদ্ধাই করি, ধর্ম আর সমাজের বিচারে তিনি আমাদের চিরশত্রু। কথা হচ্ছে : Even the Devil must get his due ! (হাসলেন) যাক সে সব। আসল কথাই চলুক। রামমোহন তো সতীদাহ বন্ধ করবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের কর্তব্য কী ?

ভবানী। কাগজে আগুন ছুটিয়ে দেব। জ্বালাময়ী সমালোচনা লিখব।

রাধাকান্ত। উঁহু, ওতে হবে না। শুধু কাগজের কাজ নয়। আরো কিছু চাই—আরো concrete suggestions—

(রামকমল সেন ঢুকলেন)

রামকমল। ভালো খবর আছে মশাই—খাইয়ে দিন।

রাধাকান্ত। আরে রামকমল সেন যে ! এগ্রিকালচারের কোনো সুখবর নাকি ?

রামকমল। এগ্রিকালচার নয়—এগ্রিকালচার নয়। হিন্দু কালচার ! ব্রাহ্মসমাজের দলে ভাঙন ধরেছে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও ভেগেছে !

ভবানী। (সবিস্ময়ে) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ! সে কি ! সে যে রামমোহনের ডান হাত ! ওর সেই বিট্‌লে গুরুদেব হরিহরানন্দের আপন ভাই।

জয়কৃষ্ণ। শেষকালে বেহ্ম-সমাজের আচার্যিই চম্পটং !

রামকমল। এতদিন সয়ে ছিল—শাস্ত্র-টাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিল নিশ্চিন্তে। কিন্তু কতটা বরদাস্ত করবে আর ! সতীদাহ-বিলের তোড়জোড় দেখেই সরে পড়েছে। রামমোহন খুব দমে গেছে শুনলাম।

মতিলাল। একটা বড় কাতলাই তবে জাল কাটল। যাবে—এমনি করেই সব যাবে।

রাধাকান্ত। (চিন্তিত) হাঁ, সকলের শক্তি সমান নয়। রামমোহন রায় সবাই হন না।

তারাচাঁদ। জয় মা কালীঘাটের কালী ! এবার যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

রাধাকান্ত (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) কিন্তু আমি দেখছি না। পৃথিবীর সবাই যদি সরেও দাঁড়ায়—তবু একা লড়বার শক্তি নিয়েই এগিয়ে চলবে রামমোহন

রায়। সে যাক্—আমাদের কাজ আমরা করি। আসুন, উঠে পড়েই লাগা যাক—

—পাঁচ—

[ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাসাদ। খাস কামরায় একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন গবর্ণর-জেনারেল ও রামমোহন রায়। লাটসাহেবের মর্যাদা অনুসারে ঘরখানা সাজানো। সময়: বিকেল।]

বেণ্টিঙ্ক। কাল আপনাকে আমি অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

রামমোহন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ইয়োর এক্‌সেলেন্সি! বিশেষ কাজেই আমি আসতে পারিনি।

বেণ্টিঙ্ক। আমি জানি রায়, কী জন্য আপনি আসেন নাই। কাল যখন আমার এ-ডি-কং আপনার নিকট হইয়া ফিরিয়া আমাকে জানাইল যে আপনি আসিবেন না, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: তুমি তাঁহাকে কী বলিয়াছিলে? সে কহিল: বলিয়াছিলাম, 'ভারতের গবর্ণর জেনারেল মাননীয় লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ডাকিয়াছেন।' তাই আজ তাহাকে আদেশ দিলাম, গিয়া বলিবে: 'মিস্টার বেণ্টিঙ্ক আপনার সহিত কিছু আলাপ করিয়া সুখী হইতে চান।' সেই জন্যেই আপনি আসিয়াছেন—নহিলে আসিতেন না।

রামমোহন। (অপ্রতিভ) না—ঠিক তা নয়—

বেণ্টিঙ্ক। আপনি লজ্জা পাইবেন না রামমোহন। **I highly appreciate your sentiment**! এ দেশীয় **native** দিগের নিকট হইতে এইরূপ **spirit**-ই আমি প্রত্যাশা করি। বন্ধুভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, সেখানে পদমর্যাদার সুযোগ লওয়া আমারই অপরাধ হইয়াছে। **I appologise**!

রামমোহন। **My Lord**, দুঃখের বিষয়, আপনার মতো গবর্ণর জেনারেল এ দেশে বেশি আসেন না। অধিকাংশই ওয়ারেন হেস্টিংসের সগোত্র। কিন্তু সে কথা যাক। সতীদাহ সম্পর্কে কাগজপত্রগুলো আপনি ভালো করে দেখেছেন কি?

বেণ্টিঙ্ক। দেখিয়াছি। ইহা অত্যন্ত বীভৎস প্রথা। ভারতবর্ষের মতো এমন **advanced** দেশে কী করিয়া ইহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই আশ্চর্য।

বেলি সাহেবের রিপোর্ট আমি পড়িতেছিলাম। দেখিলাম, এক 1827-এই কলিকাতা এবং অন্য কয়েকটি জেলায় প্রায় সাড়ে ছয় শত সতীদাহ ঘটিয়াছে।

রামমোহন। এবং এদের মধ্যে ছয়শোকেই জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। My Lord—দেশের আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক হয়েও এই হত্যাকাণ্ড আপনারা বন্ধ করেন না।

বেণ্টিঙ্ক। আমরা কী করিতে পারি বলুন! আমরা বিদেশী—ক্রীশ্চান। আপনাদের ধর্মে তো আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না! অথচ জেলার পর জেলা হইতে পুলিস রিপোর্ট আসিতেছে। তাহাদের চোখের সামনে widow-কে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারা হয়—সে পলাইয়া গেলে ধরিয়া আনিয়া আগুনে চাপানো হয়! কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নয় বলিয়া এমন horrible sight-ও তাহাদের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়।

রামমোহন। ধর্ম! না—এ ধর্ম নয়। শাস্ত্রে এমন কোনও উল্লেখ নেই যে অনিচ্ছুক সতীকে সহমরণে যেতেই হবে। তা ছাড়া রক্ষণশীল সমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও সতীদাহের বিপক্ষেই মত দিয়েছেন।

বেণ্টিঙ্ক। আপনাদের ধর্মের খবর আপনারাই জানেন। আমাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। এই দেখুন—(কাগজপত্র উল্টে) লর্ড ওয়েলেসলির time হইতেই আমরা move করিতেছি। সেই সময় নিজামৎ আদালতের পণ্ডিতদের কাছে এ সম্পর্কে opinion চাওয়া হয়। পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা যাহা জানাইয়াছিলেন, তাহা দেখুন—

(কাগজগুলি রামমোহনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন)

রামমোহন। (দ্রুত চোখ বুলিয়ে) My Lord, এ থেকে আমার যুক্তিই প্রমাণ হচ্ছে। ঘনশ্যাম শর্মা বলেছেন, রজঃস্বলা, অন্তঃসত্ত্বা, নাবালিকা বা শিশু জননীর সহমরণে যাওয়া স্পষ্টত অশাস্ত্রীয়। তা ছাড়া কোনো রকম মাদক ইত্যাদি খাইয়ে অনিচ্ছুক সতীকে সহমৃতা করাও বে-আইনী। অথচ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে। যাদের এমনিতে মাদক খাওয়ানো হয় না—তারা মাতাল হয় ধর্মের মদ খেয়ে। মারাত্মক এই ধর্মের নেশা! এমনও হয়েছে—শ্মশানে গিয়ে চেষ্টা করেও সতীদাহ আটকাতে পারিনি—নেশার ঝোঁকে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে মেয়েরা।

বেণ্টিঙ্ক। তা ছাড়া একটা কথাও আছে। সংকল্প করিয়া যদি কোনো নারী

সহমৃতা না হয়, আপনাদের শাস্ত্রমতে তাহার অনন্ত নরক—

রামমোহন। সংকল্প ! সদ্য স্বামীর শোকে পাগল হয়ে সহমরণের সংকল্প করা অনেক সহজ My Lord। কিন্তু আগুনে পুড়ে মরা অত সহজ নয়। আর তা ছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকে বিধবাকে চিতায় চড়িয়ে নিষ্কণ্টকভাবে তার সম্পত্তি দখল করা। My Lord, from the stand-point of humanity জিনিসটাকে আপনি বিচার করুন। আফ্রিকার লোকের ধর্ম নরমাংস খাওয়া—কিন্তু সে ধর্মকে আপনারা কি স্বীকার করতে রাজী হবেন ? তাদের সে ধর্মকে তো আপনারা বন্দুকের গুলিই উপহার দেন। ধর্ম যদি barbarism হয়, তা হলে সে ধর্মে আঘাত করা যে আরো greater religion, My Lord !

বেণ্টিঙ্ক। হাঁ—গোঁড়ামির পরিণাম কী ভয়ানক হইতে পারে, তাহা ইংল্যাণ্ডেও আমরা জানি। এক সময়ে আমাদের দেশে witchcraft সম্বন্ধে লোকের এমন prejudice বাড়িয়াছিল যে হাজার হাজার বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডাইনি সন্দেহ করিয়া hang করা হইয়াছিল—many were burnt alive !

রামমোহন। সে প্রথা যদি আপনারা বন্ধ করে থাকেন, সতীদাহই বা কেন করবেন না ? My lord—এই পৈশাচিকতা যে করেই হোক রোধ করতে হবে। এবং আপনারা ইচ্ছা করলেই তা হতে পারে।

বেণ্টিঙ্ক। ইচ্ছা ! আপনি জানেন না রামমোহন—What I feel ! এই তো recently একখানি বই পড়িলাম : "The Suttee's Cry to Britain". লিখিয়াছেন মিস্টার জে. পেগ্‌স। What a horror ! রামমোহন, আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—I must abolish this nuisance !

রামমোহন। সাহায্য ! I stake my life—I stake my everything for it !

বেণ্টিঙ্ক। You are great রামমোহন। আপনি মহৎ। আপনার অন্য সমস্ত activityর কথাও আমি শুনিয়াছি। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর কী জানেন ? আপনাদেরই দেশের সমস্ত বড় লোক—যেমন ধরুন, রাধাকান্ত দেব—মহারাজা গিরিশচন্দ্র, মহারাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার বিরোধিতা করিতেছেন।

রামমোহন। শুধু বিরোধিতা নয়—আমার ওপর শারীরিক আক্রমণের চেষ্টাও চলছে। অন্ধকারে থেকে যারা কানা হয়ে গেছে, আলো তাদের সহ্য হয় না। কিন্তু প্যাঁচাদের জন্যে দুর্ভাবনা আমার নেই—My Lord, সতীদাহ

আপনি বন্ধ করুন। এ শুধু আমার কথা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষ থেকেই আমি বলছি।

বেণ্টিঙ্ক। আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(বেয়ারা এসে একখানা কাগজ দিল, বেণ্টিঙ্ক পড়লেন)

যাও—পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে আসিতে বলো।

রামমোহন। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে, আমি উঠি।

বেণ্টিঙ্ক। না না, বিশেষ কিছু নয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের rebelদের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়াছে—সেই বিষয়ে military officerদের সঙ্গে কিছু discuss করিব। সম্ভবত সৈন্য পাঠাইতে হইবে।

রামমোহন। ওয়াহাবী আন্দোলন!

বেণ্টিঙ্ক। শুনিয়াছেন আশা করি। ইহা একটি communal movement! তিতুমীর বলিয়া একটা fanatic নদীয়া-ফরিদপুর অঞ্চলে খুব disturbance সৃষ্টি করিতেছে—

রামমোহন। Communal movement! No my lord, এ সম্বন্ধে আমি একমত নই। এ আন্দোলন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ! এ স্বাধীনতার সংগ্রাম! কিন্তু সব চাইতে painful কী জানেন My Lord? আজ দেশে ধর্মে ধর্মে বিরোধ—আচারে-বিচারে সংঘাত। এক হিন্দুর মধ্যেই অজস্র শাখা-প্রশাখা, হিন্দু-মুসলমানে তো সমুদ্রের ব্যবধান। তাই এ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকবে—এর পরিণাম ব্যর্থতাতেই তলিয়ে যাবে! কিন্তু আজ যদি সারা দেশে একটি মাত্র জাত থাকত—থাকত এক ধর্মে বিশ্বাসী একটি মাত্র ভারতবাসী—তা হলে—তা হলে—! কিন্তু কী হবে সে কথা, বলে? সাধনা আমরা শুরু করেছি—আমার ভারতবর্ষ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাজাতির প্রতিষ্ঠা। যদি কোনো দিন আমার স্বপ্ন সফল হয়—তবে সেদিন তা ওয়াহাবী আন্দোলনেই ফুরিয়ে যাবে না—তা হবে সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রাম!

বেণ্টিঙ্ক। কিন্তু ইহা তো পরাধীন জাতির মুক্তি আন্দোলন নয়। ইহা শুধুই rebellion।

রামমোহন। Rebellion থেকেই Revolution আসে। Excuse me My Lord, আপনাদের সমস্ত মহত্বকে স্বীকার করেও আমি বলব—সে Revolution-এর ভূমিকা তৈরি হচ্ছে দেশে। "India for Indians"—এ সত্য

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। বিদেশী শাসনকে একদিন এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে—সেদিন এই ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে ভারতবাসীর জন্যেই। সে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঠাঁই পাবে—ইংরেজ ভারতীয়ের ভেদ থাকবে না—ক্রীশ্চান-মুসলমান-বৌদ্ধ-হিন্দুর এক জাতি গড়ে উঠবে। সে কবে হবে জানি না—কিন্তু **My Lord, it will come—it must come !**

বেণ্টিঙ্ক। গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে ইহা রাজদ্রোহ। কিন্তু আমি বন্ধু বেণ্টিঙ্ক বলিতেছি—**Yes Rammohan, it will come—it must come !**

—পর্দা পড়ল—

চতুর্থ অঙ্ক

—এক—

[ভূতপূর্ব মহাবিদ্যালয়, অধুনা হিন্দু কলেজের একটি ঘর। সভা বসেছে। সতীদাহ নিবারণ বিল পাস হয়ে গেছে, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জড়ো হয়েছেন কলকাতার জনকয়েক শ্রেষ্ঠ সমাজপতি। তাঁদের মধ্যে আছেন রামগোপাল মল্লিক, তারিণীচরণ মিত্র, তারাচাঁদ দত্ত, রামকমল সেন, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ভৈরব মল্লিক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরনাথ তর্কভূষণ এবং রাধাকান্ত দেব।

১৮৩০ সালের প্রথম দিক। সময়: সকাল।]

কালীকৃষ্ণ। সতীবিল পাস হয়েছে বলে সাহেবরা সভা করে বেণ্টিঙ্ককে ধন্যবাদ দিয়েছে! দিক। ওরা বিধর্মী, আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারলেই ওরা খুশি হয়। তাই বলে রামমোহনের এত সাহস যে বাড়ি বয়ে মানপত্র দিয়ে আসে বেণ্টিঙ্ককে!

ভৈরব। আপনারা মিথ্যেই সমাজপতি বলে গর্ব করেন মহারাজ কালীকৃষ্ণ। সতীবিল তো শেষ পর্যন্ত পাস করিয়ে নিলেই—আপনারা রুখতে পারলেন? এর পরে রামমোহন রায় হাতে আপনাদের মাথা কাটবে—দেখে নেবেন।

কালীকৃষ্ণ। (সরোষে)। হুঁ, দেখছি। মানপত্র দিতে কে কে গিয়েছিল হে ভবানীচরণ?

ভবানী। টাকীর কালীনাথ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠ রায়, কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল—

হরনাথ। কী! ভূ-কৈলাসের সত্যকিঙ্কর ঘোষাল! অমন পরমভক্ত রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের বংশধর হয়ে শেষ পর্যন্ত সেও ওই ম্লেচ্ছের দলে গিয়ে ভিড়েছে!

কালীকৃষ্ণ। হুঁ, আর কে কে ছিল ভবানীচরণ?

ভবানী। রামমোহন তো ছিলই, সঙ্গে সাকরেদ হরিহর দত্ত। কালীনাথ বাংলায় অভিনন্দন দিলে আর হরিহর সেইটে ইংরেজিতে পড়ে শোনালে।

রাধাকান্ত। (তারাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন) দত্ত মশাই, শুনলেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড?

তারাচাঁদ। (সরোষে চিৎকার করে) ত্যাজ্যপুত্র করেছি হারামজাদাকে—বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি! ব্যাটা আমার ছেলে হয়ে এমন অধঃপাতে গেল! বলে, সতীদাহ বিল পাস হয়ে দেশ একেবারে চতুর্ভুজ হয়েছে। নচ্ছার—শুয়োরের বাচ্ছা! ফের যদি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকে তো ওকে আমি চাকর দিয়ে জুতোব।

তারিণী। মিথ্যে হরিহরকে তাড়িয়ে তো কিছু লাভ হবে না দত্ত মশাই, বিষের ঝাড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলতে হবে।

কালীকৃষ্ণ। (দাঁতে দাঁত চেপে) হুঁ, ঝাড়সুদ্ধুই ওপড়াতে হবে। সেই জন্যেই তো আমাদের এই ধর্মসভা। ওহে রামকমল, আমাদের সেই দরখাস্তটার কিছু হল?

রামকমল। (হতাশভাবে) ও কিছুই হবে না। এখন প্রিভি কাউন্সিল অবধি লড়া পর্যন্ত ছাড়া আর পথ নেই!

হরনাথ। স্পর্ধা! মহারাজ গিরিশচন্দ্র বাহাদুর থেকে শুরু করে শহরের আটশো লোক তাতে সই দিয়েছেন। নির্ণয়সিন্ধু, সুধীতত্ত্ব, মনু, দত্তক-চন্দ্রিকা—সব কিছু থেকে শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে দিয়েছি। তবু সতী বিল পাস করাবে? তোমরা কি সব মরেছ?

ভবানী। তর্কভূষণ মশাই, এখনো আশা ছাড়বার কিছু হয়নি। এতবড় অন্যায় দেখে দু-চারজন সায়েবের পর্যন্ত টনক নড়ছে। শুধু আমাদের 'সমাচার-চন্দ্রিকা'তেই যে আমরা লিখছি তা নয়, 'জন বুলে'র রেভারেণ্ড ব্রাইস্ পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করছেন।

কালীকৃষ্ণ। ব্রাইস্কে আমার বিশ্বাস নেই—কী একটা মতলব আছে ওর তলে তলে। ওই প্রিভি কাউন্সিলেই আপীল করতে হবে। ওহে ভৈরবধর, তুমি তো ধর্মসভার ট্রেজারার—কত টাকা উঠল?

ভৈরব। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার।

তারাচাঁদ। আরো চাই। দরকার হলে আমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেব। বড় ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি—আর আমার কিসের মায়া? (উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন) শুয়োরটাকে একবার হাতের কাছে পাই তো—

তারিণী। মিথ্যে উত্তেজিত হবেন না দত্ত মশাই, এখনো সময় আছে। ওহে রাধাকান্ত, তোমার অ্যাটর্নী যে আসবে বলেছিল আজ। কখন আসবে?

রাধাকান্ত। (ঘড়ি দেখে) সাড়ে ন'টায় আসবার কথা—প্রায় সময় হয়ে এল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। নীলমণি তাকে আনতে গেছে।

কালীকৃষ্ণ। অ্যাটর্নীটা আবার কে?

তারিণী। বেথি সাহেব। ফ্রান্সিস্ বেথি।

তারাচাঁদ। লোকটা সায়েব। আমাদের হয়ে যে পুরোপুরি লড়বে, এমন ভরসা হয় না।

ভবানী। কেন লড়বে না? সব সাহেবই কি বেন্টিঙ্ক কিংবা মার্টিনের মতো? ওদের মধ্যে দু-চারজন ভালো লোকও আছে। যেমন ব্রাইস্ সাহেব, যেমন আমাদের বেথি।

কালীকৃষ্ণ। যাই বলো, ব্রাইস্‌কে আমার সুবিধে বলে মনে হয় না। মহা পাজী লোক, তলায় তলায় কিছু একটা মতলব আঁটছে নিশ্চয়!

[ইংরেজ অ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথিকে নিয়ে নীলমণি দে প্রবেশ করলেন]

রাধাকান্ত। এসো নীলমণি, এই যে, এসো বেথি।

বেথি। গুড মর্নিং!

রাধাকান্ত। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ইনি আমাদের ধর্মসভার সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি কোষাধ্যক্ষ ভৈরবধর মল্লিক, ইনি পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ, আর বাকি সকলের সঙ্গে তোমার তো পরিচয় আছেই। আর ইনি হলেন অ্যাটর্নী ফ্রান্সিস্ বেথি।

[বেথি করমর্দন শেষ করল, তারপর আসন নিলে]

কালীকৃষ্ণ। আপনি আমাদের ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহ বিলের বিরুদ্ধে আবেদন নিয়ে বিলেতে যেতে প্রস্তুত আছেন?

বেথি। অবশ্য। মোস্ট্ গ্ল্যাডলি!

হরনাথ। আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্য সমর্থন করেন?

বেথি। কেন করিব না? আমাদের ইংলিশ ল অত্যন্ত লিবারাল্। সেখানে

প্রত্যেকেরই ধর্মের স্বাধীনতা আছে। অন্যায়ভাবে অন্যের রিলিজিয়স্ প্র্যাক্‌টিসে কেহই ইণ্টারফিয়ার করিতে পারে না।

কালীকৃষ্ণ। তা হলে কি আপনি মনে করেন যে সতীদাহ বিল অন্যায় ?

বেথি। অবশ্যই অন্যায়। গুরুতর অন্যায়। যে কোনো অনেস্ট্ ইংলিশম্যানও ইহাই মনে করেন। দেখুন না, হোরেস্ হেম্যান উইলসনের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহা স্বীকার করেন নাই।

ভবানী। টাকার ব্যবস্থা আমাদের হয়ে গেছে। আপনি কবে রওনা হতে চান ? বেশি দেরি করলে আবার—

বেথি। ওহো না—না, দেরি হইবে কেন ? আমি খোঁজ করিয়াছি, দুই মাসের আগে জাহাজে প্যাসেজ পাওয়া যাইবে না। ইহার মধ্যে আমরা কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া লইব।

হরনাথ। বিলেতে গিয়ে আপনি আমাদের জন্য যথাসাধ্য করবেন আশা করি।

বেথি। নিশ্চয়। You see, I am an Englishman—আমরা সত্যের জন্য সব সময় লড়িয়া থাকি—to our last drop of blood ! আপনারা আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। (ঘড়ি দেখে) Well মহারাজা, আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাতে ইম্পর্ট্যাণ্ট কেস্ আছে। পরে আবার আসিব।

রাধাকান্ত। কাজ থাকলে আটকাবো না। সকলের সামনে তোমার মতটা জানবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম। আচ্ছা—এসো তুমি।

বেথি। থ্যাঙ্ক ইউ। (উঠে দাঁড়ালে) কিছু ভাবিবেন না, Sutee Bill আমি নিশ্চয় রদ করিতে পারিব। আচ্ছা—So long, good-bye—

[বেথি বেরিয়ে গেল]

কালীকৃষ্ণ। হুঁ, কাজের লোক মনে হচ্ছে। একে দিয়ে কিছু হতেও পারে—হাজার হোক বীরের জাত তো। ওহে রাধাকান্ত, আজ ওঠা যাক তা হলে। (উঠলেন, হরনাথকে বললেন) তর্কভূষণ মশাই, আপনি তো আমাদের ওদিকেই যাবেন বলেছিলেন। আমার গাড়িতেই চলুন।

হরনাথ। চলুন। (ভবানীচরণকে) আসি তা হলে। কিন্তু তোমার ওপরেই সব ভরসা ভবানীচরণ। তোমার বুদ্ধি আর কলমের জোর।

ভবানী। আমরাও যাব। চলুন, একসঙ্গেই বেরুই—

[রাধাকান্ত এবং তারিণীচরণ ছাড়া সবাই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন]

তারাচাঁদ। (থেমে দাঁড়িয়ে) আপীলই বলো আর বেথি সাহেবই বলো—সকলের

সেরা হল লাঠ্যোষধি। ওই রামমোহন রায় আর তার দলবলকে ধরে জুৎমতো ঠ্যাঙাতে পারলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রামকমল। (মৃদু হাসলেন) কিছু ভাববেন না দত্ত মশাই। দেশের লোকে যা খেপেছে ও ব্যবস্থাটা তারাই করবে এখন।

(সকলে বেরিয়ে গেলেন। তারিণীচরণও উঠে দাঁড়ালেন। শুধু নিজের আসনে বসে রইলেন রাধাকান্ত)

তারিণী। কী হল রাধাকান্ত, উঠবে না?

রাধাকান্ত। (একটু হাসলেন) বেথি সাহেবের কথা ভাবছিলাম তারিণীদা!

তারিণী। কী ব্যাপার?

রাধাকান্ত। উইলসন ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন, আমাদের ওপর তাঁর সহানুভূতিটা আন্তরিক। কিন্তু বেথি ইংরেজ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাটা আমার একেবারে নষ্ট করে দিলে।

তারিণী। কেন?

রাধাকান্ত। ভেবেছিলাম, ওরা বীরের জাত, ওদের মধ্যে মহত্ত্ব আছে! কিন্তু দেখছি, বেথি সাহেবের মতো ইংরেজের অভাব নেই—ওয়ারেন হেস্টিংসের রক্ত ওরা অনেকেই বয়ে এনেছে! টাকার জন্যে ওরা সব করতে পারে—টাকার বিনিময়ে সত্যকে বিক্রি করতে ওদেরও বাধে না। (আবার হাসলেন) থাক সে কথা, বেলা হলো, এবার যাওয়া যাক্—

—দুই—

[আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে রামমোহনের বাগান।

বাগানের ভেতরে একটি বেদী। সেই বেদীর উপর পা গুটিয়ে বসে রামমোহন কী একখানা মোটা ইংরেজী বই পড়ছেন। তিনি এখন প্রৌঢ়, কিন্তু তাঁর শক্তিমান দীর্ঘদেহে বয়সের কোনো ছাপই পড়েনি।

সময়: বিকেল।

ভৃত্য হরি একখানা থালা নিয়ে প্রবেশ করল: থালায় খানকয়েক রুটি, একটি ছোট বাটিতে কিছু মধু, এক গ্লাস জল।]

রামমোহন। রেখে যা হরি।

[হরি থালা নামিয়ে চলে গেল। রামমোহন বইখানা পাশে রাখলেন, মধু দিয়ে একটু রুটি মুখে পুরলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল দশ-বারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে একবার উঁকি দিয়েই সরে পড়ছে। রামমোহন সকৌতুকে তাকে ডাকলেন:]

কে ও বেরাদার? পালাচ্ছ কেন? এসো—এসো—

(ছেলেটি দ্বিধাভয়ে ঢুকল; একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।)

আরে, এ যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধরটি দেখছি! তারপর দেবেন্দ্রনাথ, কী মনে করে?

দেবেন্দ্র। (লজ্জিত) রমাপ্রসাদের সঙ্গে এসেছিলাম।

রামমোহন। ওহো—তোমরা তো আবার একসঙ্গেই পড়ো। তা শুধু নিঃস্বার্থভাবেই বেড়াতে এসছ? যাও, অভিযান করো, লিচু-টিচু খাও—

দেবেন্দ্র। লিচু এখনো পাকেনি।

রামমোহন। সন্ধানটা তবে সেরে এসেছ? কিছু কাঁচা বলেই পিছু হটলে? আরে বেরাদার, পাকা ফল তো পাকা চুলের জন্যে। আর কাঁচাই হল কাঁচার

দেবেন্দ্র। না, অসুখ করবে।

রামমোহন। কী সর্বনাশ! এই বয়সেই একেবারে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে বসেছ! ছাখো বেরাদার, শক্ত হওয়া চাই। দুর্বলের জায়গা নেই পৃথিবীতে। শরীরকে ভয় করবে না, শরীর যাতে তোমায় ভয় করে, তাই দেখতে হবে। কাঁচা কি বলছ, এই বয়সেও আমি গাছসুদ্ধু চিবিয়ে হজম করে ফেলতে পারি। যাও—যাও। যদি টক লাগে তো নুন নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।

দেবেন্দ্র। বড্ড কাঠপিঁপড়ে গাছে।

রামমোহন। কাঠপিঁপড়েকে ভয় করলে চলে বেরাদার! বাঘ-সিঙ্গীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হবে—তবে তো জীবন। বেশ, চলো। তুমি গাছে উঠতে না পারো, আমি উঠছি।

দেবেন্দ্র। আপনি গাছে উঠবেন? (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল)

রামমোহন। বাজী রাখো। তোমার চাইতে ভালো উঠব।

দেবেন্দ্র। (ভয় পেয়ে) না, না—থাক!

রামমোহন। (দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) নাঃ, তোমরা সব ভালো ছেলে হয়ে যাচ্ছ। তা অতিথি হয়ে এসে একেবারে শুধু মুখে ফিরে যাবে? এসো, কিছু খাও আমার সঙ্গে—

দেবেন্দ্র। নাঃ, থাক।

রামমোহন। এও থাক? মিথ্যেই তুমি বামুনের ছেলে বেরাদার—খাওয়ার নামে ঘাবড়ে যাও? (একটু চুপ করে থেকে) ওহো বুঝতে পেরেছি। লোকে বলে, আমি অখাদ্য-কুখাদ্য খাই, তাই নয়? (হাসলেন) আমার

হাতযশ আছে বটে। খাচ্ছি রুটি আর মধু, কোনো ভট্‌চাযের চোখে পড়লে বলবে, ম্লেচ্ছটা গো-মাংস সাবাড় করছে! থাক, তা হলে খেয়ো না। মিছেমিছি জাতটা আর খোয়াবে কেন?

(দু-এক টুকরো খেয়ে থালা সরিয়ে দিলেন)

(জল খেলেন, হাত ধুলেন। তারপর ডাকলেন) হরি—হরি—

(হরি এসে থালাটা তুলে নিয়ে গেল)

তারপর বেরাদার?

দেবেন্দ্র। বলুন।

রামমোহন। তুমি মাংস খাও?

দেবেন্দ্র। না।

রামমোহন। কেন খাও না? আরে, মাংস না খেলে শক্তি আসে? সাহেবদের দেখেছ তো? না খায় এমন মাংস নেই—গায়েও তাই বাঘের মতো জোর। আর আমরা? ঘাসপাতা চিবিয়ে চিবিয়ে প্রায় গোরু-ছাগল বনতে বসেছি। (দেবেন্দ্র চুপ করে রইলেন) মাংস খাবে, নিয়মিত মাংস খাবে। শক্তি চাই। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। হাঁ, মনে পড়ে গেল। তুমি দোলনায় দুলতে ভালোবাসো?

দেবেন্দ্র। (মাথা নেড়ে—সাগ্রহে) হাঁ—খুব।

রামমোহন। তবে চলো। বাগানের ওদিকটায় একটা দোলনা টাঙিয়েছি, চলো তোমায় দোল দেব। কিন্তু একটা কথা আছে। শুধু একতরফা নয়—আমাকেও কিন্তু দোলাতে হবে, এমনি ছাড়ব না।

দেবেন্দ্র। (সোৎসাহে) আচ্ছা—(কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে কী দেখে তীরবেগে অদৃশ্য হল)

রামমোহন। আরে আরে কী হল! পালাচ্ছ কেন? (বিপরীত দিক থেকে দ্বারকানাথ ঢুকলেন) ও বুঝেছি! দ্বারকানাথের আবির্ভাব!

(দ্বারকানাথ এসে রামমোহনের পাশে বসলেন)

সব মাটি করে দিলে হে! সে যাক, খাবে নাকি কিছু? (ডাকলেন) রাধাপ্রসাদ—

দ্বারকানাথ। (তটস্থ) থাক থাক, রক্ষা করুন! এখন খাওয়া নয়—গলা পর্যন্ত ঠাসা। কিন্তু কী হল? কী মাটি করলাম?

রামমোহন। এমন চমৎকার প্ল্যানটা। তোমার ছেলের সঙ্গে দিব্যি জমে উঠেছিল, তোমাকে দেখে দেবেন পালাতে পথ পেল না।

দ্বারকানাথ। ও—দেবেন এসেছে বুঝি? ও তো আবার রমাপ্রসাদের পরম বন্ধু।

রামমোহন। হাঁ, বেশ ছেলেটি তোমার। ওকে আমার বড় ভালো লাগে, he is a nice boy! আমারই স্কুলের ছাত্র তো! আমি জানি, বড় হয়ে ও একটা দিকপাল হবে।

দ্বারকানাথ। এখন থেকেই দিকপাল করবার প্ল্যান হচ্ছিল বুঝি?

রামমোহন। প্রায় তাই। (হাসলেন) ওকে বলছিলাম, আমি ওকে দোলনায় দোল দেব, ও-ও পাল্‌টা দোলাবে আমাকে।

দ্বারকানাথ। এই বুড়ো বয়সে দুলবেন কি রকম?

রামমোহন। তাও তো বটে! বুড়ো হচ্ছি—সে কথা মনেও থাকে না। কিন্তু বয়েস বাড়াটা এমন কি অপরাধ যে তার জন্যে দোলটা অবধি খেতে পাব না! (হেসে) কিন্তু ধর্মসভার বিরুদ্ধে লড়তে বিলেত তো যেতেই হবে আমাকে। সমুদ্রের দোলানি শুনেছি সাংঘাতিক। তাই এখন থেকে রপ্ত করে নিচ্ছি—সী-সিক্‌নেসে আর কষ্ট হবে না।

দ্বারকানাথ। আশ্চর্য 'উইট' আপনার! সব সময়ে একটা তৈরি জবাব আছেই! ভালো কথা, বিলেত যাওয়ার খরচা বাবদ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি।

রামমোহন। দরকার হবে না। ও টাকা আমি নেব না।

দ্বারকানাথ। সে কি কথা! দেশের হয়ে আপনি লড়তে যাচ্ছেন, কেন নেবেন না টাকা।

রামমোহন। ও টাকা দিয়ে আরো অনেক কাজ করা যাবে দ্বারকানাথ—দেশের দুঃখের তো অন্ত নেই। আমার জন্যে ভেবো না। আমার টাকা আমি যোগাড় করে নেবই। দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা হয়ে গেলে সেই টাকাতেই আমার সব কুলিয়ে যাবে।

দ্বারকানাথ। হাঁ—হাঁ, ওটা কতদূর এগোল? বাদশার খবর?

(রামমোহন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বছর বারোর একটি ছেলে ছুটে এসে রামমোহনের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল।)

রামমোহন। কী বাবা রাজারাম?

রাজারাম। আমার ঘুড়ি ছিঁড়ে গেছে বাবা। জুড়ে দাও।

রামমোহন। আচ্ছা যাও, একটু পরেই আমি যাচ্ছি।

রাজারাম। না, পরে নয়। এক্ষুনি জুড়ে দিতে হবে। আমি ঘুড়ি ওড়াতে পারছি না।

রামমোহন। (সস্নেহে) এই এলাম বলে। তুমি ততক্ষণ আর একটা ঘুড়ি

ওড়াও—কেমন ?

(রাজারাম ঘাড় নেড়ে দৌড়ে গেল)

দ্বারকানাথ। এইটিই তো আপনার পালিতপুত্র রাজারাম।

রামমোহন। হাঁ। সিভিলিয়ান ভিক সাহেব ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন হরিদ্বারের মেলায়। বিলেত যাওয়ার সময় আর কার হাতে তুলে দেবেন—আমিই ভার নিলাম।

দ্বারকানাথ। শুনেছি, মুসলমানের ছেলে।

রামমোহন। হয়তো। আর এই অপরাধে যাঁরা বাকী ছিলেন, তাঁরাও আমাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, শিশুর কোনো জাত নেই, সে সব জাতের ঊর্ধ্বে !

দ্বারকানাথ। তা ছাড়া ওই রাজারামকে নিয়ে নানারকম কুৎসা—(দ্বিধাভরে থেমে গেলেন)।

রামমোহন। যেতে দাও ওসব। সত্য আমার, নিন্দেটা ওদেরই থাক। (একটু চুপ করে) হাঁ—কী বলছিলে যেন ? সেই দিল্লীর বাদশার ব্যাপারটা তো ? ওঁর কেস্‌টা খুবই 'জেনুইন'। অন্যায়ভাবে কোম্পানি ওঁকে পাওনা থেকে ঠকাচ্ছে। আমাকে দূত করে বিলেতে পাঠাতে পারলে সুবিধে হবে আশা করছেন। আর আমার কথা তো জানোই। ওঁর কাজটা ছাড়াও প্রিভি-কাউন্সিলে সতী-বিল নিয়ে লড়তে হবে। আর ভালো করে জানতে হবে সভ্যতার তীর্থ ইওরোপকেও। সে আমার কত দিনের স্বপ্ন !

দ্বারকানাথ। ধর্মসভার দরখাস্ত নিয়ে বেথি সাহেব বিলেত রওনা হয়ে গেছে।

রামমোহন। যাক্। আমিও যাচ্ছি।

দ্বারকানাথ। গণ্ডগোলটার কী হল ?

রামমোহন। কোম্পানীর সঙ্গে কোন settlement সম্ভব নয়। তারা এখন দেশের মালিক, বাদশার দূতকে দূত বলেই মানে না। তাছাড়া দ্বিতীয় আকবর আমাকে যে 'রাজা' উপাধি দিতে চাইতেন, তাও তারা স্বীকার করে না।

দ্বারকানাথ। তবে তো মুশকিল হল !

রামমোহন। (হাসলেন) মুশকিল কিছু নেই ! চাল চালতে আমিও জানি। কোম্পানি deny করুক আমার embassy, আমার tittle—সাধারণ মানুষ হিসাবেই পাসপোর্ট যোগাড় করব আমি। তারপর ইংল্যাণ্ডের

মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা করব, আমি শুধু রামমোহন নই—রাজা রামমোহন রায়! দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরের মহামান্য রাজদূত।

দ্বারকানাথ। (মুগ্ধকণ্ঠে) ইচ্ছে করলে আপনি সব পারেন।

রামমোহন। (বিষণ্ণভাবে হাসলেন) সব পারি? না বন্ধু, কিছুই পারিনি। এত কাজ ছিল, এত সমস্যা ছিল! কতটুকু এগিয়েছি সে-সব নিয়ে? 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে যে মহাজাতি আমি গড়তে চেয়েছিলাম, সে সাধনা আমার কতটা সফল হল? আজও ধর্মভেদ বর্ণভেদ—আজও অশিক্ষার অন্ধকার! আজও শাসন-পরিষদে আমাদের **representation** নেই, আজও আমরা জানতে শিখিনি : **'India for Indians**।' দ্বারকানাথ, আমার সে **Industrial India**-র কল্পনা এখন তো আকাশ-কুসুম! হল না—কিছুই হল না! অথচ জানি, জীবন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, শুরুতেই আসে শেষের পালা! যদি সেকালের ঋষিদের মতো আমি শক্তি পেতাম—

(উঠে পায়চারি করতে লাগলেন)

যদি হাজার হাজার বছর বাঁচতে পারতাম, **East**-এর সঙ্গে **West**-কে মিলিয়ে সেরা দেশ গড়ে দিয়ে যেতাম আমার ভারতবর্ষকে—!

দ্বারকানাথ। আপনার আদর্শ মিথ্যে হবে না। নতুন কাল আসছে, আপনার অসমাপ্ত সাধনা সে যুগ মাথায় তুলে নেবে।

রামমোহন। জানি। দিকে দিকে তারই সাড়া আমি পেয়েছি। সেই আমার ভরসা। হিন্দু কলেজ হয়েছে, আলো আসছে ইংরেজী শিক্ষার। সরে যাচ্ছে শাস্ত্রের নামে মূঢ়তার জগদ্দল পাথর। হিন্দু কলেজের ছেলেরা ঐ ডিরোজিওকে নিয়ে ইতিমধ্যেই কী সব কাণ্ড বাধিয়েছে শুনেছ বোধ হয়।

দ্বারকানাথ। একটু বাড়াবাড়ি করছে না? ডাফ্ সাহেবও ওদের বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছে। কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুয্যের মতো আরো গোটাকতক কালা-পাহাড় ছোকরা জুটলে যে দেশকে দেশ ক্রীশ্চান হয়ে যাবে!

রামমোহন। বজ্র-আঁটুনির ফসকা গেরো এমনিই হয় দ্বারকানাথ। আজ হিন্দু কলেজের ভেতর দিয়ে আসছে নতুনের বিদ্রোহ—সব ভেঙে শেষ করে দেবে। আর ওই ভাঙনের পালা শেষ হলেই শুরু হবে সৃষ্টির নতুন পর্ব। বানের জল থিতিয়ে সরে গেলেই তার উপর দেখা দেবে পলিমাটির ফসল। সেই সান্ত্বনা নিয়েই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেব আমি। (থামলেন —হাসলেন) তারপর, তোমাদের ধর্মসভার নতুন খবর কী? ধর্মচর্চা

কেমন চলছে ?

দ্বারকানাথ। যেমন চলে। আমাদের মুণ্ডপাত। ব্রহ্মসভায় যারা আসে তাদের একঘরে করার বন্দোবস্ত। তবে বেথি সাহেব ওদের ওপর খুব ভরসা দিয়ে গেছে, সেই আশাতেই আছে এখন।

রামমোহন। আশায় ছাই পড়বে। আমিও যাচ্ছি। ডেভিড হেয়ারের ফ্যামিলি, তা ছাড়া তাদের বন্ধু-বান্ধব—সকলেরই সহযোগিতা পাব।

(হঠাৎ নেপথ্য থেকে ছড়া-মেলানো বিকট চিৎকার)

"জাতের নিকেশ রামমোহন
বিত্তের নিকেশ করেছে,
হৃদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে—"

দ্বারকানাথ। (সভয়ে) এ কী কাণ্ড ?

(নেপথ্যে : "হৃদ্দ এক নিকেশের ধুয়ো উঠেছে।" সেই সঙ্গে মুরগী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির মিশ্র রাগিণী।)

রামমোহন। (হাসলেন) হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে আমার অভ্যর্থনা হচ্ছে। ধর্মরক্ষার জন্যে বিধর্মীকে যে করে হোক তারা সাবাড় করবে।

দ্বারকানাথ। সাবাড় !

রামমোহন। হাঁ, একেবারে সাফ করে ফেলতে পারলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। ধর্মধ্বজীরা লোক লাগিয়েছে চারিদিকে—আমাকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছে তারা। রাত দিন আমার বাড়ির ওপর তারা নজর রাখে, পথে বেরুলে দমাদম ইট পড়ে আমার গাড়িতে। জানো বোধ হয় সাময়িক police protection-ও আমায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘেন্না ধরে গেছে এখন। ওভাবে বাঁচতে আমি শিখিনি। ভেবেছি, আসুক সামনে, নিজেই রুখে দাঁড়াব এবার। শক্তি-পরীক্ষা সামনাসামনিই হয়ে যাক।

দ্বারকানাথ। একটু বেশি রিস্‌ক্ নিচ্ছেন নাকি ? একদল খ্যাপা লোকের ব্যাপার—

রামমোহন। 'রিস্‌ক্' ! 'রিস্‌ক্' সেদিনই চরম নিয়েছি—যেদিন আমার অমন মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত সম্পর্ক আমি রাখতে পারিনি। আজ আমার কাউকেই আর ভয় নেই, দ্বারকানাথ। ক্রীশ্চানদের গোঁড়ামিকে নিন্দে করেছি—তারা আমাকে সহ্য করতে পারে না, মুসলমানের রক্ষণশীলতাকে ঘা দিয়েছি, তারা আমার শত্রু ; হিন্দুত্বের ভণ্ডামিকে আঘাত করেছি—হিন্দুরা আমার মাথা চায়। তবু যদি পিছু হটে না থাকি, একদল খ্যাপা লোকের কাছে হার মানব ? বন্ধু, সত্যের জন্যে দাঁড়াতে যদি আমি শিখে থাকি, তবে সেজন্যে মরতেও আমি জানি—

—তিন—

[১৮৩০ সালে কলকাতার একটি রাজপথ। একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে। পেছনে পচা ডোবা। দূরে খানকয়েক খোলার চাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

একটি বিধবা—আন্দাজ পঞ্চাশ বয়েস হবে—প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরো জনচারেক লোক। তাদের বয়েস চল্লিশ থেকে কুড়ির ভিতর।]

বিধবা। আর পারি নে বাপু, পা ধরে গেছে। এখানে এই বটতলাতেই একটু বসি।

প্রথম। সে কি পিসিমা! এই কলুটোলায় এসে হাঁফ ধরলে চলবে কেন। কালীঘাট কি চাট্টিখানি রাস্তা! এমন করে জিরোতে জিরোতে গেলে সাঁঝ পেরিয়ে যাবে যে!

পিসিমা। তা আর কী করব বাপু! কালীঘাট দেখতে বেরিয়েছি বলে তো মরতে পারব না। (বটতলায় বসে পড়লেন)

দ্বিতীয়। এখানে বসে থাকলেও মরবার ভয় আছে পিসিমা। শুনলুম, ভবানীপুরের ওদিকপানে সন্ধ্যের পর নাকি বাঘ বেরুচ্ছে আজকাল। গোরু-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে, দু-একটা মানুষকেও চোট দিয়েছে।

পিসিমা। দিয়েছে তো দিয়েছে। এতগুলো জোয়ান মর্দ রয়েছিস তোরা, তবু বাঘের ভয় কিসের? না বাবা—একটু না জিরিয়ে আমি উঠছি নে।

তৃতীয়। তবে বসাই যাক। এসো হে—হুঁকোটা বের করো।

(সকলে বসল, একজন হুঁকো বের করলে)

প্রথম। চকমকি কই? শোলা?

[প্রথম লোকটি চকমকি আর শোলা বার করে দিলে; আর একজন কলকেতে তামাক সাজাতে লাগল।

এমন সময় দূর থেকে সংকীর্তনের মতো একটা অস্পষ্ট আওয়াজ এল। সঙ্গে খোলকরতালের শব্দ।]

ও আবার কিসের কেত্তন রে কানাই!

(সর্বকনিষ্ঠ চতুর্থ ব্যক্তি—অর্থাৎ কানাই কান পাতল)

কানাই। সতী বিলের সংকেত্তন বেরিয়েছে খুড়ো!

পিসিমা। সতী বিলের সংকেত্তন! সে আবার কী বাছা?

দ্বিতীয়। রামমোহন রায়ের নামে ছড়া বেঁধেছে আর কি! তারই শ্রাদ্ধ করছে!

(তামাক সেজে প্রথম লোকটিকে এগিয়ে দিলে)

প্রথম। যাই বলো করাই উচিত। হিন্দুর বিধবা চিরকাল স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় পুড়ে মরছে—আইন করে তা বন্ধ করা কেন বাপু! (হুঁকোয় টান দিলেন)

পিসিমা। ছ্যাখ্ বাছা, আর যাই বলিস্, সখ করে সব বিধবা চিতায় পোড়ে এমন মিথ্যে কথা কোস্‌নি। আগুনে পুড়ে মরতে বড্ড সুখ হয় কিনা! আর সেই সুখের আশায় মেয়েগুলো একেবারে মুখিয়ে বসে আছে!

তৃতীয়। তা যা বলেছ! এই তো বাগবাজারে বিষ্টু গাঙ্গুলির বৌ বিন্ধ্যবাসিনীকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই হল!* সতী পুড়ে মরেছে শুনে কেল্লা থেকে এক সাহেব মেম তাই দেখতে গেল। চিতায় আগুন পড়তেই লাফ দিয়ে বৌটা দে দৌড়! জোর করে পুড়িয়ে মারত ঠিকই—সায়েবরা বাগড়া দিলে। ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব পর্যন্ত গড়ালে—মেয়েটা বেঁচে গেল।

পিসিমা। ভাগ্যিস সায়েবরা ছিল! এমন কত বিন্ধ্যবাসিনীকে যে হতচ্ছাড়ারা পুড়িয়ে মেরেছে তার ঠিক ঠিকানা আছে! আইন করেছে, বেশ করেছে! বেঁচে থাকুক রামমোহন রায়—রাজরাজেশ্বর হোক।

প্রথম। বলো কি পিসিমা! বুড়োবয়সে তোমার এখন মতিচ্ছন্ন হোল! তোমার যে নরকেও জায়গা হবে না!

পিসিমা। নাই বা হল। চোখের সামনে কচি কচি মেয়েগুলোকে দগ্ধে মারবে আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলবে: হরি হরি! আহা-হা, বাছাদের আমার কী হরিভক্তি রে! হরি কিনা মানুষখেকো দেবতা, তাই পোড়া মাংস না খেলে তাঁর আর পেট ভরছে না!

দ্বিতীয়। আমাদের এ দেশ তবু তো ভালো পিসিমা। সেদিন আর একটা মজার খবর শুনলুম। দিল্লীর এক শেঠজী যখন মারা গেলেন—তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমানুষ বৌকে পুড়িয়ে মারবে ঠিক করা হল। বৌটা কিছুতেই রাজী হয় না, শেষে তাকে বেশ দামী শাড়ি পরিয়ে গা-ভর্তি গয়না দিয়ে আর বেশ করে ঘি মাখিয়ে স্বামীর চিতায় কষে বেঁধে দিলে!

পিসিমা। ছিঃ—ছিঃ!

দ্বিতীয়। এখুনি ছিঃ ছিঃ করলে চলবে কেন! আরো মজা আজ্ঞে। শেঠজী স্বর্গে যাবেন—সেখানে তো তাঁর শেঠের হালেই থাকা চাই! তাই ঠিক হল, তাঁর দেওয়ান, পেশকার, খিদ্‌মদ্‌গার, হুঁকোবর্দার—কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাছাড়া শেঠজী তার সখের আরবী ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গের দেউড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন, নইলে ওখানকার লোকজন তাঁকে খাতির করবে কেন! তাই মস্ত একটা আকাশ-ছোঁয়া চিতা তৈরী করা হল,

* 'সম্বাদ-কৌমুদী', মার্চ, ১৮২৮।

ঘোড়াসুদ্ধু, ঝি-চাকর-দেওয়ান-পেশকারে প্রায় পঁচিশজন লোককে শেঠের পিছে পিছে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলে !

পিসিমা। কী সর্বনাশ ! পঁচিশজন লোক—আবার একটা ঘোড়াও সেই সঙ্গে !

দ্বিতীয় হুঁ—হুঁ—তবে ! এরই নাম পুণ্য—বুঝলে পিসিমা ? একটা মেয়ে পোড়ালে সাতকুল স্বর্গে যায়, আর পঁচিশজন মেয়ে-মরদ আর একটি আরবী ঘোড়া পোড়ালে কত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে সেইটে একবার হিসেব করো দেখি ?

পিসিমা। আর দরকার নেই হিসেব করে—এতেই আমার দম আটকে আসছে। হাঁ রে—এসব লোকগুলো মানুষ, না রাক্ষস ?

(লম্বা লম্বা খাতা হাতে দুই ব্যক্তির প্রবেশ)

প্রথম খাতাওলা। এই যে—কী জাত তোমাদের ?

তৃতীয়। আমরা ব্রাহ্মণ। কেন, পৈতে দেখতে পাচ্ছ না !

প্রথম খাতাওলা। ব্রাহ্মণ ? বেশ বেশ। তা কী চাও তোমরা ? দেশে ধর্ম থাকে, না যায় ?

কানাই। বেশ কথা তো বলছেন মশাইরা। ধর্ম যায়, সেটা আবার কেউ চায় নাকি ?

দ্বিতীয় খাতাওলা। চাও না তো ? শুনে খুশি হলুম। (মনে মনে কী একটা গুনে নিয়ে) তোমরা পাঁচজন আছো দেখছি। পাঁচ আনা পয়সা বের করো তো এখন।

প্রথম (খুড়ো)। পাঁচ আনা পয়সা ? কেন মশাই ?

প্রথম খাতাওলা। চাঁদা।

কানাই। কিসের চাঁদা ? কে আপনারা ?

দ্বিতীয় খাতাওলা। আমরা 'ধর্মসভা'র লোক। সতী বিল বন্ধ করব বলে চাঁদা আদায়ে বেরিয়েছি। নাও—ঝট্‌পট পাঁচ আনা পয়সা বের করে ফেলো। আমাদের সময় নেই।

পিসিমা। এ তো তোমাদের ভারী আবদার দেখছি। কথা নেই, বার্তা নেই, চাঁদা চাইলেই হল ?

প্রথম খাতাওলা। বাজে কথা বন্ধ করো ঠাকরুণ। চাঁদা দিতেই হবে !

প্রথম (খুড়ো)। অত পয়সা তো সঙ্গে নেই মশাই। আমরা কালীঘাটে পুজো দিতে চলেছি। তা ছাড়া লম্বা পথ—জলপান-টলপান খাওয়া আছে—

দ্বিতীয় খাতাওলা। কালীঘাটে পুজো পরে দিলেও হবে। আগে সতী বিল বন্ধ

দরকার। কই, দাও—দাও—

পিসিমা। ওঃ. ভারী আমার সব এলেন রে? মা-কালীর নাম করে বেরিয়েছি তার চাইতে চাঁদাই ওঁদের বেশি হল! পয়সা যেন গাছের ফল, নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে পড়ে? দেবো না চাঁদা—কী করবে?

প্রথম খাতাওলা। কী করব? (চটে গিয়ে) তোমাদের হুঁকো নাপিত বন্ধ করে দেব, জল অচল করে দেব, সমাজে একঘরে করে দেব—

কানাই। ইস্, একেবারে ভাটপাড়ার পণ্ডিত সব? চাঁদা না দিলেই হুঁকো-নাপিত বন্ধ! যাও—যাও—যা পারো করো গে। আমরা চাঁদা দেব না!

প্রথম খাতাওলা। তোমরা ম্লেচ্ছ! তোমরা জাহান্নামে যাবে!

কানাই। খবরদার, মুখ সামলে কথা কইবে। ফের যদি গালাগাল দাও তো, (খুড়োর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে) এই কলকের আগুনে মুখ পুড়িয়ে দেব, হুঁকোর জল মাথায় ঢেলে দেব—

(দ্বিতীয় খাতাওলা প্রথমকে টেনে ধরল)

দ্বিতীয় খাতাওলা। চলে এসো—চলে এসো। এ সব নির্বোধের কথায় কর্ণপাত করতে নেই।

প্রথম খাতাওলা। আচ্ছা, দেখে নেব—(দুজনে প্রস্থান করল)

পিসিমা। যথেষ্ট জিরোনো হয়েছে বাপু, আর কাজ নেই। আবার কোত্থেকে চাঁদার খাতা নিয়ে তেড়ে আসবে। এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে—রাস্তায় হাঁটবারও আর জো রাখেনি! চল্ চল্—এগো—

(দূরে সংকীর্তন এবং খোলকরতালের আওয়াজ)

তৃতীয়। ওই রে—আবার সংকীর্তনের দল! যে রকম নাচতে নাচতে আসছে, ওরা আবার কী ল্যাঠা বাধাবে কে জানে? না বাবা—স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ! এসো এসো পিসি, আর দেরী নয়।

(পিসিমা এবং বাকী সকলে দ্রুতবেগে উঠে পড়লেন এবং বেরিয়ে গেলেন।
শূন্য মঞ্চের উপর সংকীর্তনের আওয়াজ নিকটতর হতে লাগল। তারপর খোলকরতাল বাজিয়ে নাচতে নাচতে একদল মানুষ প্রবেশ করল।
কিছুক্ষণ ধরে মঞ্চের ওপর চলল তাদের উদ্দাম নৃত্যগীত)

গান

ব্যাটার স্থরাইমেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল—

(সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসি ও জীবজন্তুর ডাক)

ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল

ওঁ তৎ সৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল,

ধর্মাধর্ম গেল ব্যাটা মজালে জাতকুল !

(বিকট আনন্দে কিছুক্ষণ নাচানাচি, মুখভঙ্গি ও চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে জনতা অদৃশ্য হল।

বিপরীত দিক থেকে রামমোহন রায় ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন। গুরুদাস এখন মধ্যবয়সী—কিন্তু বলিষ্ঠ ও পেশল চেহারা। রামমোহনের হাতে 'ওয়াকিং স্টিক'-জাতীয় বেশ মোটা একটা লাঠি।)

গুরুদাস। (সক্রোধে) মামা—আবার ! উঃ অসহ্য ! ইচ্ছে করছে এখনি গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ওদের মধ্যে। দু-দশটার মাথা ভেঙে কেত্তন গাওয়া বন্ধ করে দিই !

রামমোহন। বয়েস হয়েছে গুরুদাস, তবু এখনো তোমার গোঁয়ার্তুমি গেল না ?

গুরুদাস। গোঁয়ার্তুমি কী বলছ মেজ মামা ? এই রকম অত্যাচার সয়ে যেতে হবে ? প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারব না ?

রামমোহন। শোনো গুরুদাস। একদিন কথা দিয়েছিলাম, যদি কখনো কোনো নতুন ধর্ম আমি প্রচার করি, তার প্রথম দীক্ষা নেবে তুমিই। সে কথা আমি রেখেছি, আজ তুমিই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাই ব্রহ্মের দায়িত্ব তোমাকে ভুললে চলবে না। তোমার সাধনা জ্ঞানের জন্যে, তোমার লক্ষ্য সত্যের দিকে। কতগুলো অজ্ঞানের ওপর শক্তি ক্ষয় করে সে লক্ষ্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হতে চাও ?

গুরুদাস। দ্যাখো মেজ মামা, কিছু মনে করো না। জানোই তো আমি বরাবর বেয়াড়া—মেজাজ আমার তোমার মতো ঠাণ্ডা জল নয়। কুকুর যদি কামড়াতে আসে, তাহলে তাকে না ঠেঙিয়ে বেদবাক্য শোনাব, এমন ব্রাহ্মণ হওয়া আমার ধাতে কুলুবে না।

রামমোহন। ছিঃ গুরুদাস—ছি ! মতভেদ থাকতেই পারে, তাই বলে মানুষকে কুকুর বলে গাল দেবে ?

গুরুদাস। কিন্তু ওরা যে গাল দিচ্ছে ! ওরা তো ছেড়ে কথা কইছে না !

রামমোহন। তা হোক। ওরা পাঁকে নেমেছে বলে তুমিও নামবে ?

গুরুদাস। আর ওরা যদি আক্রমণ করে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে নাকি ? প্রাণ দেবে ?

রামমোহন। না, তা দেব না। (কঠিনভাবে হাসলেন) বৈষ্ণবকুলে জন্ম হলেও আমি

বৈষ্ণব নই—আমি শক্তির সাধক। আত্মরক্ষার জন্যে একদিন বুদ্ধকেও গ্রহণ করতে হয়েছিল সুজাতার অন্ন। আমার হাতেও এই লাঠি আছে —এর ভেতরে আছে গুপ্তি। এর প্রয়োজন হোক তা আমি চাই না, কিন্তু যদি—

(রামমোহনের বাকী কথাটা আর শোনা গেল না। হঠাৎ আবার সেই ভারস্বর কীর্তন জেগে উঠল :

ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা

মজালে জাতকুল)

গুরুদাস। (চকিত) মামা—মামা ! ওই যে—মোড় ঘুরে ওরা এদিকেই আবার আসছে !

রামমোহন। আসতে দাও।

গুরুদাস। আর এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে ? চলো বরং অন্যদিকে—

রামমোহন। (দৃঢ়স্বরে) না। ভীরুর মতো অনেক পালিয়ে থেকেছি, আর নয়। গুরুদাস, আজ এই ছাপ্পান্ন বছর বয়েসেও পঞ্চাশজনের মহড়া নেবার মতো শক্তি শরীরে আমি রাখি। আসুক ওরা—মুখোমুখি ওদের আমি একবার দেখতে চাই—

[নেপথ্যে চিৎকার :

—ওই যে শালা—ওখানে— !

—ভাগ্নেটাও আছে—

—মার—শালাদের মার—।]

গুরুদাস। (ক্ষিপ্তভাবে) তোমার গুপ্তিটা দাও মামা। ভাগ্‌নের জোরটাই পরখ হোক আগে !

রামমোহন। স্থির হও—দাঁড়াও গুরুদাস—

[নেপথ্যে :

—মার শালাকে—

—খুন করে ফ্যাল—

—চালাও ঢিল—

কয়েকটা ঢিল-পাটকেল এসেও পড়ল।]

গুরুদাস। মামা, ওরা এদিকেই আসছে। আমি যাই—(এগোতে চাইলেন, রামমোহন বাধা দিলেন)

রামমোহন। থামো, আমি দেখছি—

(এগিয়ে গিয়ে)

কারা তোমরা ? কী বলতে চাও ? সামনে এসো—

[—মার শালাদের—মার—মার
আরো কিছু ইট-পাটকেল এল।]

এসো—সামনে এসো। যুদ্ধ করতে চাও? বেশ আমিও তৈরী। কার শক্তি আছে, এগিয়ে এসো! (হঠাৎ গুপ্তিটা টেনে বের করলেন) জেনে রেখো, কয়েকটা প্রাণ এখানে না রেখে আমার প্রাণ নিতে পারবে না—

[রামমোহনের কণ্ঠস্বর বজ্রধ্বনির মতো শোনালো: নেপথ্যে অর্থহীন কোলাহল।]

পালাচ্ছ? (রামমোহন আরো এগিয়ে গেলেন) পালাচ্ছ কেন? এটুকু নৈতিক সাহস নেই? ধর্মের জন্যে এতই যদি আকুল হয়ে থাকো, তা হলে প্রাণ দেবার শক্তি নেই তোমাদের? পালিয়ো না—এগিয়ে এসো—এসো এগিয়ে—

[নেপথ্যে কোলাহল ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল]

পালালো—ওরা পালিয়ে গেল গুরুদাস। ভীরু—ভীরুর দল! (গুপ্তিটা মাটিতে ফেলে দিলেন) তুমিই ঠিক বুঝেছিলে গুরুদাস। সব গেছে, এ অভিশপ্ত দেশ থেকে সব গেছে! একটা মানুষও আজ আর কোথাও বেঁচে নেই, না, একটাও না—

—চার—

[রামমোহনের বাড়ির অন্তঃপুরের একটি ঘর। সন্ধ্যা।
একখানা ছোট জলচৌকির উপরে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন উমা। উচ্ছ্বসিত কান্নায় তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছে।
কিছুক্ষণ স্তব্ধতায় কাটল। প্রায় আধ মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে রামমোহন প্রবেশ করলেন। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইলেন উমার দিকে। শেষে মৃদুগতিতে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন উমার কাঁধের ওপর।]

রামমোহন। (স্নিগ্ধস্বরে) ছিঃ—কাঁদতে নেই! দ্বারকানাথ ওঁরা সবাই এইমাত্র প্রসন্ন মুখে বিদায়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন, আর তুমি কাঁদছ?

(উমা জলভরা চোখ তুলে তাকালেন)

কেন এমন অবুঝ হচ্ছ উমা? জীবনের সমস্ত দুর্দিনেই তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ—কোনোদিন তো ভেঙে পড়োনি। আজ এ দুর্বলতা কেন তোমার?

উমা। তুমি যেয়ো না—বিলেতে তুমি যেয়ো না—

(রামমোহনের বুকে মাথা রাখলেন)

রামমোহন। (উমার মাথায় হাত বুলিয়ে) শোনো উমা—আমার কথা শোনো। সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে দূর-দেশান্তে চলেছি, তাতে আমার ভয় নেই। কোম্পানির রাজত্ব বাধা দিয়েছিল, সে বাধা আমি পার হয়েছি। এই রক্ষণশীল দেশে বিলেত যাওয়ার পরিণাম কী, তাও আমি জানি। কিন্তু তোমার চোখের জলের বাধা যে আমার কাছে সব চেয়ে দুস্তর উমা! নীলাচলে মা যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তাঁর কাছ থেকে শেষ আশীর্বাদ পাওয়ার ভাগ্যও আমার হল না। আজ তুমিও কি আমার যাত্রার পথ দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ভরে দেবে?

উমা। সব সয়েছি, কোনদিন একটি কথাও বলিনি। কিন্তু আজ আমি এ কী করে সইব? কোথায় তুমি চলেছ—কালাপানি পার হয়ে কোন্ নির্বান্ধব দেশে! শরীরও তোমার ভালো নয়। সেখানে কে তোমায় দেখবে? বিপদে-আপদে কে রক্ষা করবে? ওগো—না, না! আমার বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে, আমার সামনে থেকে সরে গেলে আর হয়তো তোমায় দেখতে পাব না!

রামমোহন। (হাসলেন) কেন মিথ্যে এসব তুমি ভাবছ? তা ছাড়া ফিরে যদি নাই-ই আসি, তাতেই বা ক্ষতি কী উমা? একদিন তো সকলকেই চলে যেতে হবে! (উমা কেঁদে ফেললেন) আবার পাগলামি করছ? কেন আজ আমি বিলেতে চলেছি, সে তো তুমিই সব চাইতে ভালো করে জানো। দিল্লীর বাদশার দূতগিরি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ বিল বন্ধ করবে বলে ওদের দরখাস্ত নিয়ে রওনা হয়েছে বেথি সাহেব। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ আমায় করতেই হবে। উমা, সিদ্ধির পথে এতটা এগিয়ে এখন তুমি আমায় হার মানতে বলো?

উমা। কিন্তু—

রামমোহন। কিন্তুর শেষ নেই উমা। তাই আমার অভিধান থেকে ও শব্দটাকেই মুছে ফেলেছি আমি। তা ছাড়া সভ্যতার মহাতীর্থ ইওরোপের সাধনার রহস্যও যে আমাকে জানতে হবে! ওদের শিক্ষা, ওদের শিল্প, ওদের জীবন-সত্য—সব যে আমায় বুঝতে হবে উমা। আমায় প্রণাম করতে হবে স্বাধীনতার বৈকুণ্ঠ ফ্রান্সকে—Equality, Liberty, Fraternity! সেই একমুঠো মাটি যে আমার দেশের কপালে তিলক পরিয়ে দেবার জন্যে কুড়িয়ে আনব! মার্সেই! কবে আমাদের দেশের কবিও অমনি করে জাতীয়-সঙ্গীত লিখবে? কবে?

[তন্ময় হয়ে গেলেন।
—বাবা—ডাক দিয়ে রাধাপ্রসাদ ঘরে ঢুকেই সলজ্জভাবে বেরিয়ে যেতে চাইলেন।]

রামমোহন। কী খবর রাধাপ্রসাদ ?

রাধাপ্রসাদ। একটা ঘটনা শুনলাম বাবা।

রামমোহন। কী হয়েছে ?

রাধাপ্রসাদ। ফ্রান্সিস বেথি যে জাহাজে করে ধর্মসভার দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ে সে জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে।

(উমা বিহ্বলভাবে তাকালেন, রামমোহন চমকে উঠলেন)

রামমোহন। জাহাজ ডুবে গেছে! তা হলে বেথি সাহেব—

রাধাপ্রসাদ। কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছেন। কিন্তু দরখাস্ত-টরখাস্ত সব গেছে।

রামমোহন। (হেসে উঠলেন) তবে তো দেখা যাচ্ছে, ধর্মসভার ওপরেই ধর্ম বিরূপ! এ আমাদেরই শুভ-সূচনা রাধাপ্রসাদ!

রাধাপ্রসাদ। তাই তো মনে হচ্ছে বাবা।

(বেরিয়ে গেলেন)

উমা। (ব্যাকুল হয়ে) শুনলে তো ? সমুদ্রে বেথি সাহেবের জাহাজ ডুবে গেছে। (কেঁদে ফেললেন) কোন্ প্রাণে তোমায় আমি যেতে দেব ? না, না, কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।

রামমোহন। এত বড় সুখবরটাকে তুমি ভুল বুঝলে উমা ? বেথির জাহাজ ডুবেছে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সতীর দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড়ে। কিন্তু আমার জাহাজে তাদের আশীর্বাদে উনপঞ্চাশ পবনের বেগ লাগবে! আমার জাহাজ কখনো ডুববে না উমা, কিছুতেই না!

উমা। (চোখের জল মুছলেন) না, আর কাঁদব না। মিথ্যেই চোখের জল ফেলছিলাম। পৃথিবীতে কেউ তোমায় রুখতে পারেনি, জানি, আমিও পারব না। শুধু একটা কথা রাখো আমার। যদি যাবেই, রাধাপ্রসাদকেও সঙ্গে নাও। ও কাছে থাকলে তবু খানিক ভরসা পাব।

রামমোহন। তা হয় না উমা। এখানে অনেক কাজ—রাধাপ্রসাদ গেলে সে সব দেখবে কে ? তা ছাড়া ব্রহ্মসভার সমস্ত ভারও ওর ওপরে। ওকে নিয়ে গেলে এখানে যে সব অচল হয়ে যাবে!

উমা। কিন্তু এমন একা একা তোমায় কী করে যেতে দেব ?

রামমোহন। একা কেন ? রামরতন মুখুয্যে যাবে, হরি যাবে, বক্সু শেখকেও সঙ্গে নেব—

উমা। ওরা তো কেউ আপন জন নয়!

রামমোহন। আপন কি শুধু রক্তে? তা যে কত মিথ্যে, আমার জীবনেই কি সেটা দেখোনি উমা? তা ছাড়া যে দেশে চলেছি, জানি—সেখানেও আমার আপন জন আমাকে কাছে টেনে নেবেই—

(ছুটে রাজারাম প্রবেশ করল)

রাজারাম। বাবা—বাবা—

রামমোহন। কী বাবা?

রাজারাম। বাগানের সেই দোলনাটায় আমায় দোল দেবে বলেছিলে যে! (হাত ধরে টানল) এসো—

রামমোহন। তুমি যাও রাজারাম—আমি এক্ষুণি আসছি—

রাজারাম। হাঁ, এখুনি এসো। দেরী করো না কিন্তু—(ছুটে চলে গেল)

রামমোহন। (কিছুক্ষণ রাজারামের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে) পেয়েছি—পেয়েছি!

উমা। কী পেয়েছ তুমি?

রামমোহন। আমার সঙ্গী—আমার আপন জন।

উমা। কে তোমার সঙ্গী? কে তোমার আপন জন?

রামমোহন। ওই রাজারাম। (একটু চুপ করে রইলেন) হাঁ, ওই আমার সঙ্গে যাবে। বাপ-মা-মরা মুসলমানের ছেলে, সাহেবেরা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আমি ওকে সন্তান বলে বুকে টেনে নিয়েছি। মুসলমান—ক্রীশ্চান—হিন্দু—ও তো কেও না! ওর কোনো জাত, কোনো ধর্ম নেই, তাই ও সকলের! ওর মধ্যে এসে সব জাত এক হয়ে গেছে—ওর মুখে আমি আমার স্বপ্নের মহাজাতিকে দেখতে পেলাম!

(মঞ্চের একেবারে সম্মুখের দিকে এগিয়ে এলেন)

তাই আমার যাত্রাপথে ও আমার আলো, বিদেশে ও আমার প্রেরণা, ওই-ই আমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'! উমা—উমা! এই জীবন্ত ভারতবর্ষকে বুকে নিয়েই আজ আমি ইওরোপ যাত্রা করলাম। এই ভারতবর্ষই রক্ষাকবচ হয়ে আমায় ঘিরে থাকবে, আমায় শক্তি দেবে! আর আমার কোনো দ্বিধা নেই! উমা—উমা, পেয়েছি, আমার পাথেয় আমি পেয়েছি—

(দিনান্তিক সূর্যের একটা রক্তিম আলো জানলা দিয়ে রামমোহনের প্রদীপ্ত মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রইল।)

—পর্দা পড়ল—

কলকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৫৯